ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : : কলিকাতা-১২

নিবেদন

'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' জীবনীগ্রন্থ। এই গ্রন্থে বিবিধ রচনা হইতে উপাদান আহরণ করিয়া যথাসম্ভব ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। এযাবৎ অপ্রকাশিত লেখকের কিছু মূল্যবান সংগ্রহও ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

শ্রীরামচন্দ্র দত্ত, শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন, স্বামী সারদানন্দ ও শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ সান্যাল ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য। ইঁহাদের প্রণীত ও পরে পরে প্রকাশিত জীবনীগ্রন্থসমূহ : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত। জীবনী না হইয়াও শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত জীবনীর উপাদানে পরিপূর্ণ।

জীবনীচতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের স্থান সর্বাগ্রগণ্য। পাঁচখণ্ডে বিভক্ত এই মহাগ্রন্থে ঠাকুরের দেবমানবচরিত্র সুষ্ঠুভাবে অনুশীলিত হইয়াছে সকল দিক দিয়া। লীলাপ্রসঙ্গের ভাব ও বর্ণনার ধারা অনুসরণ করিয়া লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী-সাহিত্যে লীলাপ্রসঙ্গের পরেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথির স্থান বলা যাইতে পারে। পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে লেখা বৃহদাকার এই পুঁথি বৃন্দাবনদাস-রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের অনুরূপ গ্রন্থ। অপর কোন গ্রন্থেই পাওয়া যাইবে না এমন বহু ঘটনা ইহাতে বিধৃত ও ভক্তের উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় বিবৃত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলি ব্যতীত অন্যান্য যেসব রচনা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি তন্মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের কথা, শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষের 'ঠাকুরের কথা' ও আত্মকথা, স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিকথা, শ্রীনির্লেপানন্দ-কৃত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতি, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত-রচিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমণি দেবী, আর লেখকের তিন-খানি বই—শ্রীশ্রীসারদা দেবী, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী সারদানন্দের জীবনী—উল্লেখযোগ্য। স্বামী অদ্ভুতানন্দের সৎকথা, শ্রীনিত্যাত্মানন্দ-লিখিত শ্রীম-দর্শন (তৃতীয় ভাগ), এবং অপর কতিপয় পুস্তক-পুস্তিকা হইতে একটি দুইটি করিয়া কথা কুড়াইয়াছি।

ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরামলালের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণময়ী তাঁহার পিতার ও পিসীমাতা শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীর মুখে শুনিয়া শুনিয়া ঠাকুরের অনেক রসমধুর লীলাকথা কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, আর অকৃপণভাবে সব কথাগুলিই লেখককে তিনি উপহার দিয়াছিলেন দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যপীঠে বসিয়া।

প্রায় সাত বৎসর পূর্বে, ৺কাশীক্ষেত্রে, স্বামী প্রেমেশানন্দ লেখককে উপর উপর দুইবার বলিয়াছিলেন: আমার বড় ইচ্ছা হয় লীলাপ্রসঙ্গ অবলম্বন করে ঠাকুরের একখানি জীবনী তুমি লেখ। অশীতিপর বৃদ্ধ এই সন্ন্যাসিপ্রবর ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতেই চলচ্ছক্তিরহিত হইয়াছিলেন। আজীবন তিনি ঠাকুরের লীলামাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন অক্লান্তভাবে। আসন্ন মহাযাত্রার মুখেও তাঁহার সেই প্রচারবাসনা কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই দেখিয়া মুগ্ধ হইলেও, আমি তখন মৌনাবলম্বন করিয়াছিলাম, আমার পক্ষে হয়তো ইহা কখনও সম্ভব হইবে না ভাবিয়া। আমার জীবনে ভাগবতী লীলাকথা লেখার প্রেরণা আগে আগেও আসিয়াছে তাঁহার প্রিয় ভক্তজনের ভিতর দিয়া।

অনেক সাধ করিয়া, ছড়ানো বস্তুগুলি নানাস্থান হইতে কুড়াইয়া আনিয়া আপনার মনে পূজার নৈবেদ্য সাজাইয়াছি দীর্ঘ চৌদ্দমাস ধরিয়া। আজ শুধু এই একটি প্রার্থনাই উত্থিত হইতেছে সমগ্র অন্তর মথিত করিয়া: আমার দুঃখময় জীবনের এই শেষ নৈবেদ্যটি হে দীনের ঠাকুর, তুমি নাও!

শ্রীঅক্ষয়চৈতন্য

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

কামারপুকুর

ধর্মময় ভারতের একতম কেন্দ্রবিন্দু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবভূমি কামারপুকুর। নবযুগের প্রথম উষায় যে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছিল এখানে, তাঁহার দিব্যজন্ম বিঘোষিত করিয়া, তাহাই অনুরণিত হইয়া চলিয়াছে ভক্তজনের প্রাণে প্রাণে, বিশ্বময় হইয়া। অনুরণিত হইতে থাকিবে অনাগত ভবিষ্যতের যুগযুগ ধরিয়া।

কামারপুকুরের কথায় শ্রীশ্রীসারদামাতা বলিয়াছিলেন : ঠাকুরের জন্মস্থান—পুণ্যস্থান—মহাপীঠস্থান—তীর্থভূমি।

বাঁকুড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলাত্রয় যেখানে একত্র মিলিত হইয়াছে সেই সন্ধিস্থলের কিছু ব্যবধানে, হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায় শ্রীপুর, কামারপুকুর ও মুকুন্দপুর গ্রামত্রয় ত্রিকোণমণ্ডলে, পরস্পর ঘনসন্নিবেশে অবস্থিত এবং দূরবর্তী স্থানেব লোকদের কাছে কামারপুকুর নামেই পরিচিত। কামারপুকুর প্রাচীনকাল হইতেই সমধিক প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, স্থানীয় জমিদার বাস করিতেন এখানে। শ্রীপুরে বা বৃহত্তর কামারপুকুরে হাট বসিত, আজও বসে, প্রত্যেক শনি ও মঙ্গলবারে। সুতা, গামছা, কাপড় এবং আবলুস কাঠের হুঁকার নল প্রস্তুত করিয়া কামারপুকুর কলিকাতাদি স্থানের সঙ্গে কারবার করিত। উপাদানবিশেষে তৈরি মিঠাই ও জিলাপির জন্য কামারপুকুর চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া আছে।

বর্ধমানের মহারাজার গুরুবংশীয় গোস্বামীদিগের লাখেরাজ জমিদারিভুক্ত ছিল এই গ্রাম। ঐবংশীয় সুখলাল গোস্বামীর কথা স্থানীয় অধিবাসীদের মুখে মুখে ফিরিত। তাঁহারই পুত্রের নিকট হইতে লাহাবাবুরা গ্রামেব অধিকাংশ জমি ক্রয় করিয়া নিয়াছিলেন। গোস্বামি-বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে ; গোপীলাল গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত গোপীশ্বর নামক বৃহৎ শিবলিঙ্গটি তাঁহাদের পূর্বকীর্তির পরিচায়ক হইয়া আছে।

আনন্দোৎসবের অভাব ছিল না এই অঞ্চলে। জমিদারবাড়ীতে বার মাসে তের পার্বণ হইত। মনসাপূজায়, শিবের গাজনে ও চব্বিশ প্রহরীয় হরিবাসরে আজও গ্রামগুলি মুখরিত হইয়া উঠে।

ধর্মঠাকুরের পূজা-মহোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইত পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিতে। কামারপুকুরের 'রাজাধিরাজ' ধর্মের রথযাত্রায় বিরাট মেলা বসিত। কিন্তু সেইদিন বহুকাল গত হইয়াছে।[১]

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ-শ্রেণীভুক্ত ও অন্যান্য সকল জাতির বাস কামারপুকুরে। বিজাতীয় শিক্ষার বহির্মুখী প্রভাব হইতে মুক্ত থাকায় তাহাদের জীবনযাত্রা সরল ও ধর্মভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। গ্রামস্থ বৃহৎ পুষ্করিণীগুলি, এবং মন্দিরগুলিও, তাহাদের ধর্মার্থে কর্মানুষ্ঠানের সাক্ষ্য দিতেছে। গ্রামটির কামারপুকুর নামের উদ্ভব যে কামারদের একটি পুষ্করিণী হইতে, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। 'কামারপুকুর' আজও বিদ্যমান। শ্রীরামকৃষ্ণলীলার অঙ্গীভূত হইয়া যুগীদের শিবমন্দির, হালদারপুকুর ও লাহাদের চণ্ডীমণ্ডপ মহিমান্বিত হইয়াছে; মন্দির ও পুকুর যথাক্রমে রামানন্দ যুগী ও ফকিরচন্দ্র হালদারের কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

বর্ধমান হইতে কামারপুকুর ষোল ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। বর্ধমান হইতে একটি রাস্তা কামারপুকুরে আসিয়া ও গ্রামটিকে অর্ধবেষ্টন করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে পুরী পর্যন্ত গিয়াছে। গরীব যাত্রী ও সাধুসন্তরা ঐ পথ দিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেন। তাঁহাদের বিশ্রামের জন্য লাহাবাবুরা একটি চটি বা পান্থনিবাস নির্মাণ করিয়াছিলেন গ্রামের দক্ষিণপূর্ব কোণে।

গ্রামের দুইদিকে দুইটি শ্মশান আছে; ঈশানকোণে বুধুই মোড়লের ও বায়ুকোণে ভূতির খালের শ্মশান। শেষোক্ত শ্মশানের পশ্চিমে গোচর-

---

১ প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসর আগে একবার আমরা শ্রীপুরে হরিবাসর দেখিতে গিয়াছিলাম জয়রামবাটী হইতে। স্মৃতিপটে আজও উহা অম্লান হইয়া আছে। মন্দিরাকারে নির্মিত যে সমুচ্চ বেদীটি বেষ্টন করিয়া নামকীর্তন হইতেছিল উহার চারপাশের তিন তিনটি থাকে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মূর্তিসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছিল। উপরের থাকের মূর্তিগুলিতে ছিল তাঁহাদের একীভূত অর্ধনারীশ্বর রূপ; মাঝের থাকের মূর্তিগুলিতে ছিল ঊর্ধ্বাঙ্গে পৃথক্‌কৃত ও নিম্নাঙ্গে একীভূত রূপ; নীচের থাকের মূর্তিগুলিতে ছিল সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ পৃথক্ রূপ। শাস্ত্রীয় সৃষ্টিতত্ত্বকে এইরূপে জনসাধারণের গোচরীভূত করা হইয়াছিল চিত্তাকর্ষণীয়ভাবে, মূর্তিশিল্পের মাধ্যমে।

প্রান্তর, মাণিক রাজার আমবাগান ও আমোদর নদ। ভূতির খাল দক্ষিণে বহিয়া আমোদরে মিলিত হইয়াছে। আমবাগানের দুইচারিটি বৃক্ষমাত্র অবশিষ্ট আছে।

কামারপুকুরের আধ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত ভূরসুবো গ্রামে মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে বিপুল ধনের অধিকারী এক ধার্মিক ব্যক্তি বাস করিতেন। সুন্দর ছায়াশীতল আমবাগানটি তিনিই করিয়াছিলেন। সুখসায়ের ও হাতিসায়ের নামক দুইটি অতিবৃহৎ দীঘি আজও তাঁহার কথা মনে করাইয়া দেয়।

এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভাও অতুলনীয়। পুষ্করিণীগুলির কোন কোনটিতে শতদল পদ্ম, কোনটিতে বা নীল কুমুদ বিকশিত থাকিয়া রূপে ও গন্ধে পথিকের মনোহরণ করে। সহস্রদল পদ্মও দেখিতে পাওয়া যায় প্রান্তরের কোন কোন পুকুরে, বিশেষতঃ বর্ষাকালে।

শ্রীচৈতন্য-অবতারে ভগবান যে প্রেমধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন নিজের ও নিজ পরিকরগণের জীবনে আচরণ করিয়া দেখাইয়া, উহার প্রভাব কখনও একেবারে মুছিয়া যায় নাই বাঙ্গলার পল্লীজীবন হইতে। আশৈশব শুনিয়া শুনিয়া সরলপ্রাণ নরনারী বিশ্বাস করিতেন,—ভগবান অবতীর্ণ হন যুগে যুগে ; আসেন মানুষের মাঝে মানুষ হইয়া ; আসেন মানুষকে খেলার সাথী করিয়া তাহাকে ভালবাসিতে ও তাহার ভালবাসা আকর্ষণ করিয়া স্বয়ং তাহা সম্ভোগ করিতে ; প্রেমই তাঁহার পূজার শ্রেষ্ঠ উপচার ; প্রেমের পরিচয় আত্মবৎ সেবায়, পরিণতি আত্মনিবেদনে—তাঁহার সহিত চিরমিলনে। ঈদৃশ অকপট বিশ্বাসকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গকার শ্রীসারদানন্দ 'কবিতাময় বিশ্বাস' নামে অভিহিত করিয়াছেন। কামারপুকুরলীলায় দেখা যায়, ভাবগ্রাহী ঠাকুর ভক্তজনের বিশ্বাসের কাছে নিজেকে ধরা দিয়াছেন আপনহারা হইয়া. বিশ্বাসের অনুরূপ খেলায় মাতিয়া। মাটির কামারপুকুরের বুকে চিন্ময়ধামরূপ অনাহতপদ্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বিশ্বাসের মাধুর্যেই তিনি এখানে শরীর পরিগ্রহ করিতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন কি-না কে বলিবে!

মাতাপিতা

কামারপুকুরের পশ্চিমে প্রায় এক ক্রোশ ব্যবধানে সাতবেড়ে, নারায়ণপুর ও দেরে নামক তিনখানি গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত। এই গ্রামত্রয়ের জমিদার রামানন্দ রায় প্রজাপীড়ক ছিলেন। কাহারও উপর কুপিত হইলে তাহাকে সর্বস্বান্ত না করিয়া ছাড়িতেন না। প্রজাপীড়ন-অপরাধেই তিনি নির্বংশ হইয়াছিলেন, লোকে বলিত।

সদাচারী, কুলীন ও শ্রীরামচন্দ্রেব উপাসক এক ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করিতেন দেরে গ্রামে। শিবালয়সমন্বিত 'চাটুজ্যেপুকুর' আজও তাঁহাদের পরিচয় বহন কবিতেছে। এই বংশেব মাণিকরাম চট্টোপাধ্যায়ের খুদিরাম, রামশীলা, নিধিরাম ও রামকানাই নামে চারিটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

সত্যনিষ্ঠা, সন্তোষ, ক্ষমা, ত্যাগ প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন খুদিরাম। দীর্ঘ, সবল, গৌরবর্ণ ও প্রিয়দর্শন ছিলেন তিনি, কিন্তু স্থূলকায় ছিলেন না। সন্ধ্যাবন্দনা ও স্বহস্তে পুষ্পচয়নপূর্বক ৺রঘুবীরের অর্চনা না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। শূদ্রের দান তিনি নিতেন না, শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না, যে সকল ব্রাহ্মণ পণ নিয়া কন্যাব বিবাহ দিত তাহাদের হাতে জলও খাইতেন না। গ্রামবাসীরা তাঁহাকে বিশেষ মান্য করিত।

বিবাহেব কিছুকাল পরেই খুদিরামের পত্নীবিয়োগ হয় ও আন্দাজ চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি আবার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর নাম শ্রীমতী চন্দ্রমণি, ডাকনাম চন্দ্রা। চন্দ্রার পিত্রালয় সরাটি-মায়াপুর গ্রামে। সুরূপা, সরলা, দেবদ্বিজে ভক্তিমতী ও স্নেহমমতাময়ী চন্দ্রাকে সকলেরই ভাল লাগিত। তাঁহার সরলতা এমনই অদ্ভুত ছিল যে, তিনি মিথ্যাকথা কাহাকে বলে জানিতেন না, লোকে কেন মিথ্যা বলে, বুঝিতে পারিতেন না। অনেকে তাঁহাকে হাবা মনে করিত।

১২০৫ সালে মাত্র আট বছর বয়সে শ্রীমতী চন্দ্রার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমার সম্ভবতঃ ১২১১ সালে, কন্যা কাত্যায়নী ইহার

প্রায় পাঁচ বৎসর পরে এবং দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বর ১২৩২ সালে জন্মগ্রহণ করে।

পুত্রকন্যাদের নামকরণের সঙ্গে খুদিরামের তীর্থভ্রমণের স্মৃতি বিজড়িত হইয়া আছে। রামকুমারের জন্মের পূর্বে কোন সময়ে তিনি ৺কাশী, ৺অযোধ্যা ও শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন; রামেশ্বরের জন্মের পূর্বে পায়ে হাঁটিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত গিয়াছিলেন এবং দক্ষিণ ভারতের তীর্থসমূহ পর্যটন করিয়া বৎসরান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। রামেশ্বর হইতে তিনি ৺রামেশ্বর নামক শিবলিঙ্গটি নিয়া আসেন।

নিয়তিচক্র কখন কিভাবে আবর্তিত হইবে তাহা মানুষ আগেভাগে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ধর্মপথে থাকিয়া ও নিজেদের জমিজমার তত্ত্বাবধান করিয়া খুদিরাম যখন তাঁহাদের তিন ভাইয়ের মিলিত সংসারটি পরিচালনা করিতেছিলেন, সহসা একটা প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক উপস্থিত হইয়া সুখের নীড় সেই সংসারটিকে চূরমার করিয়া দিতে উদ্যত হয়। অত্যাচারী জমিদার রামানন্দ রায় একজনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিয়া খুদিরামকে মিথ্যাসাক্ষ্য দিতে প্ররোচিত করেন, আর খুদিরাম তাহাতে অসম্মত হইলে তাঁহার বিরুদ্ধেও অনুরূপ মামলা রুজু করিয়া ও সেই মামলায় জয়ী হইয়া বসতবাটীসমেত তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি নিলাম করিয়া লন। শুনা যায়, দেরে গ্রামে খুদিরামের প্রায় দেড়শত বিঘা জমি ছিল। প্রায় ঊনচল্লিশ বছর বয়সে উদ্বাস্তু হইয়া, স্ত্রী, জ্যেষ্ঠপুত্র ও কন্যাকে নিয়া খুদিরামকে পথে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল। তাঁহার দুই ভাই নিধিরাম ও রামকানাই সম্ভবতঃ শ্বশুরবাড়ীর মাধ্যমে নিজেদের বাসের ব্যবস্থা করিয়া নিয়াছিলেন।

অভাবনীয় আকাস্মিক আঘাতের প্রতিক্রিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া ক্ষুদ্র আধারগুলি তলাইয়া যায় দুঃখের পাথারে, কিন্তু প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তিগণের ভগবন্নিষ্ঠা তাহাতে বাড়িয়া যায় ও গভীরতা লাভ করে। নিরাশ্রয় খুদিরাম যখন একচিত্তে স্মরণ করিতেছিলেন অকূলের একমাত্র কাণ্ডারী তাঁহার ইষ্টদেবতাকে, তখনই কামারপুকুরে গিয়া স্থায়িভাবে তথায় বাস

করিবার জন্য তাঁহার দরদী সুহৃদ সুখলাল গোস্বামীর নিকট হইতে সাদর আহ্বান ও অনুরোধ আসে। ৺রঘুবীরের ইচ্ছাতেই সব হইতেছে জানিয়া খুদিরাম কামারপুকুরে চলিয়া আসিলেন। সুখলাল তাঁহাকে নিজবাটীর সংলগ্ন কয়েকখানি চালাঘর ও এক বিঘা দশ ছটাক ধান্যজমি চিরকালের জন্য দান করিলেন।

বৈষয়িক পুনরুন্নয়নের চেষ্টায় বিরত থাকিয়া খুদিরাম এই সময় হইতে প্রাচীন বানপ্রস্থসকলের ন্যায় জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। একদিন গ্রামান্তর হইতে ফিরিবার পথে তিনি এক বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে বসেন ও নিদ্রাকৃষ্ট হইয়া সেখানেই শুইয়া পড়েন। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন : তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীরঘুবীর নবদূর্বাদলশ্যাম বালকবেশে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া ও স্থানবিশেষ দেখাইয়া বলিতেছেন, আমি এখানে অনেকদিন অযত্নে অনাহারে আছি, আমাকে তোমার বাড়ীতে লইয়া চল। নিদ্রাভঙ্গে তিনি নিকটবর্তী ধান্যক্ষেত্রে সেই নির্দিষ্ট স্থানটি দেখিতে পাইলেন ও সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটি সুন্দর শালগ্রামশিলার উপরে এক সাপ ফণাছত্র ধরিয়া রহিয়াছে। তিনি শিলাটি ধরিতে উদ্যত হইবামাত্র সাপ অন্তর্হিত হইল ও 'জয় রঘুবীর' বলিয়া চীৎকার-পূর্বক তিনি শিলা গ্রহণ করিলেন। শিলার লক্ষণসমূহ দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, বাস্তবিকই উহা রঘুবীর নামক শিলা। গৃহে ফিরিয়া ও শাস্ত্রীয় বিধানে সংস্কার করিয়া তিনি উহাঁকে গৃহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠা করিলেন। পূর্ব হইতেই তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করিয়া আসিতেছিলেন, শীতলাদেবীও ঘটে পূজিতা হইতেছিলেন পূর্ব হইতেই তাঁহাদের সংসারে, ৺রামেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের আগমন হয় কয়েক বৎসর পরে।

সন্ধ্যাবন্দনা করিতে বসিয়া ধ্যানাবৃত্তিপূর্বক তিনি যখন গায়ত্রীদেবীকে আবাহন করিতেন 'আয়াহি বরদে দেবি' বলিয়া, সেই সময়ে তাঁহার বক্ষঃস্থল আরক্তিম হইয়া উঠিত ও চক্ষু দুইটি অবিরল ধারায় প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিত। প্রত্যূষে যখন তিনি সাজিহাতে ফুল তুলিতে যাইতেন তখন দেখিতেন, রক্তবস্ত্রপরিহিতা রত্নালঙ্কারভূষিতা শীতলাদেবী অষ্টমবর্ষীয়া কন্যারূপিণী হইয়া

হাসিমুখে তাঁহার সঙ্গে চলিয়াছেন ও গাছের ডাল নুয়াইয়া ধরিয়া ফুল তুলিতে তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন। এসকল দিব্যদর্শনে তাঁহার অন্তর উল্লাসে পূর্ণ হইয়া থাকিত। গ্রামবাসীরা তাঁহাকে ঋষির ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিত তাঁহার সৌম্যশান্ত মুখশ্রী দেখিয়া মোহিত হইয়া। তাঁহাকে আসিতে দেখিলেই তাহারা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইত; পুষ্করিণীতে স্নানের সময় তাঁহার স্নানসমাপন না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিত; বিপদে সম্পদে তাঁহার আশীর্বাদ-প্রত্যাশী হইত।

বাৎসল্যময়ী চন্দ্রাদেবী প্রতিবেশী বালকবালিকাদিগকে অপত্যনির্বিশেষে ভালবাসিতেন। প্রতিবেশী স্ত্রীলোকেরা আসিতেন তাঁহার কাছে নিজেদের সুখদুঃখের কথা বলিবার জন্য; আন্তরিকতার সহিত তিনি গ্রহণ করিতেন সকলকেই। গরীবরা জানিত, তাঁহার কাছে আসিলেই তাঁহারা একমুঠা খাইতে পাইবে ও সেই সঙ্গে এক অকৃত্রিম স্নেহযত্নও পাইবে। ভিক্ষুক সাধুরা জানিত, এই বাড়ীর দরজা তাহাদের জন্য খোলা আছে সকল সময়েই। প্রশস্ত পথের পাশে বাড়ী, স্বভাবতই এখানে অতিথি-সমাগম হইত।

কোনদিন হয়তো ঘরে অন্নাভাব হইয়াছে—কামারপুকুরে আসিবার পর মাঝে মধ্যে এইরূপ হইত—আর চন্দ্রা সেকথা নিবেদন করিয়াছেন স্বামীকে, স্বামী আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন, ভয় কী, ঘরে রঘুবীর আছেন, তিনি যদি উপোসী থাকেন আমরাও উপোস করব। কোনরূপে সেদিন অন্নের সংস্থান হইয়া যাইত।

অন্নাভাবজনিত কষ্ট কিন্তু বেশীদিন তাঁহাদিগকে সহ্য করিতে হয় নাই। সুখলাল গোস্বামী যে এক বিঘা দশ ছটাক ধানের জমি দিয়াছিলেন, 'লক্ষ্মীজলা' নামে পরিচিত সেই জমিতে তাঁহাদের ছোট সংসারের পক্ষে পর্যাপ্ত ফসল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। জমি প্রস্তুত হইবার পর খুদিরাম প্রথমেই ঈশানকোণে স্বহস্তে কয়েক গোছা ধান রোপণ করিতেন রঘুবীরের নাম উচ্চারণ করিয়া। তারপরে অবশিষ্ট রোপণকার্যটি মুনিষ নিষ্পন্ন করিত তাঁহার নির্দেশে।

কামারপুকুরের প্রায় ছয় ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত সেলিমপুরের শ্রীভাগবত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত খুদিরাম-ভগিনী শ্রীমতী রামশীলার বিবাহ হইয়াছিল। রামশীলার রামচাঁদ নামে এক পুত্র ও হেমাঙ্গিনী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। হেমাঙ্গিনীর জন্ম হইয়াছিল মাতুলালয়ে, মাতুলদের অত্যন্ত স্নেহপাত্রী ছিল সে। কন্যানির্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া খুদিরাম তাহাকে শিহড় গ্রামের শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে স্বয়ং সম্প্রদান করিয়াছিলেন। শিহড় কামারপুকুরের দুই ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে।

জমিদারের সহিত বিবাদে খুদিরাম যখন সর্বস্বান্ত হন, রামচাঁদের বয়স তখন একুশ বৎসর ও হেমাঙ্গিনীর ষোল বৎসর হইবে। রামচাঁদ তখন মেদিনীপুরে মোক্তারি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মোক্তারিতে ভাল উপার্জন হইতে থাকিলে রামচাঁদ মাতুলদের দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া বড় মাতুলকে মাসিক পনর টাকা ও অপর দুই মাতুলের প্রত্যেককে মাসিক দশ টাকা অর্থসাহায্য করিতেন। অবশ্য ইহা কয়েক বৎসর পরের কথা।

খুদিরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামকানাই অত্যন্ত ভক্তিমান লোক ছিলেন। তাঁহার রামতারক ওরফে হলধারী ও কালিদাস নামে দুই পুত্র জন্মে। নিধিরামের কোন সন্তান হইয়াছিল কি-না জানা যায় না।

কামারপুকুরের প্রায় বিশ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে মেদিনীপুর অবস্থিত। অনেকদিনের মধ্যে ভাগিনেয়ের কুশলসংবাদ না পাইয়া খুদিরাম চিন্তিত হইয়া একদিন অতি প্রত্যূষে মেদিনীপুর যাত্রা করেন। মাঘ বা ফাল্গুন মাস হইবে। বেলা প্রায় দশটা পর্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে চলিয়া তিনি এক গ্রামে পৌঁছিয়া দেখিলেন, তথাকার বেলগাছগুলিতে নূতন পাতা হইয়াছে। শিবপূজা করিতে বসিয়া বেলপাতার অভাবে তিনি বিশেষ কষ্ট অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন, মেদিনীপুর যাওয়ার কথা ভুলিয়া গিয়া তিনি একটি নূতন ঝুড়ি ও গামছা কিনিয়া আনিলেন, এবং ঝুড়িটি বেলপাতায় ভর্তি করিয়া, ভিজা গামছাখানি উপরে চাপা দিয়া লইয়া কামারপুকুর অভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন। অপরাহ্ণ প্রায় তিনটায় বাড়ীতে পৌঁছিয়া স্নানান্তে সেই বেলপাতা লইয়া মনের আনন্দে ৺মহাদেব ও ৺শীতলা-

মাতার পূজা করিলেন অনেকক্ষণ ধরিয়া। পরদিন পুনরায় মেদিনীপুর যাত্রা করিলেন।

কামারপুকুরে সংসার পাতিয়া খুদিরামের এক দুই করিয়া ছয় বৎসর অতিক্রান্ত হইল। তাঁহার কন্যা কাত্যায়নী তখন একাদশ বর্ষে পড়িয়া বিবাহযোগ্যা হইয়াছে। কামারপুকুরের এক ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত আনুড় গ্রামের শ্রীকেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়কে কন্যা-সম্প্রদান করিয়া তিনি কেনারামের ভগিনীর সহিত স্বীয় পুত্র শ্রীরামকুমারের বিবাহ নিষ্পন্ন করিলেন। রামকুমার তখন ব্যাকরণ ও সাহিত্য-পাঠ সম্পূর্ণ করিয়া স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। চারি বৎসরে স্মৃতি-অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি সংসার-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলে খুদিরাম নিশ্চিন্ত হইয়া, সম্ভবতঃ ১২৩০ সালে, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর দর্শনে বহির্গত হন। তাঁহার রামেশ্বর-যাত্রার পূর্বে কোন সময়ে তাঁহার হিতৈষী বন্ধু সুখলাল গোস্বামী দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

একবার কোজাগরী লক্ষ্মী-পূজা করিতে রামকুমার গিয়াছিলেন ভূরসুবো গ্রামে, যজমান-বাড়ীতে। তখন তাঁহার বয়স কম, বড়জোর পনর বৎসর হইবে। রাত্রি দ্বিপ্রহর গত হইলেও ছেলে বাড়ী ফিরিল না দেখিয়া চন্দ্রাদেবী রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন উৎকণ্ঠিতা হইয়া। তিনি দেখিতে পাইলেন ভূরসুবোর দিক হইতে কে একজন আসিতেছে কামারপুকুরে। ছেলে আসিতেছে মনে করিয়া তিনি কয়েক পা আগাইয়া গেলেন, কিন্তু আগন্তুক নিকটবর্তী হইলে দেখিলেন সে রামকুমার নহে, এক পরমাসুন্দরী রমণী। 'মা, তুমি কোথা থেকে আসচ?' চন্দ্রা প্রশ্ন করিলেন। রমণী কহিলেন, ভূরসুবো থেকে। 'আমার ছেলে রামকুমারের সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়েছিল? সে কি ফিরচে?' চন্দ্রা ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন। রমণী কহিলেন, হাঁ, তোমার ছেলে যে বাড়ীতে পূজো করতে গেছে আমি সেই বাড়ী থেকেই আসচি, এখনি সে ফিরবে। আশ্বস্তা হইয়া চন্দ্রা অন্য কথা ভাবিবার অবসর পাইলেন ও কহিলেন, মা, তোমার অল্প বয়েস, এত গয়নাগাঁটি পরে এত রাত্রে কোথা যাচ্চ?

তোমার কানে ও কী গয়না? রমণী সহাস্যে উত্তর দিলেন, ওর নাম কুণ্ডল; আমাকে এখনো অনেক দূর যেতে হবে। 'চল না, আমাদের ঘরে আজ রাত্রের মত বিশ্রাম করে কাল সকালে যেখানে যাবার যাবে এখন।' 'না মা, আমাকে এখনি যেতে হবে, তোমাদের বাড়ীতে আমি অন্য সময়ে আসব।'

চন্দ্রাদেবীর বাড়ীর পাশেই লাহাবাবুদের অনেকগুলি ধানের মরাই, রমণী সেই দিকে গেলেন দেখিয়া চন্দ্রা তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন মেয়েটি পথ ভুলিয়াছে মনে করিয়া; কিন্তু তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। 'মা-লক্ষ্মীকে দর্শন কল্লুম নাকি?' সহসা তাঁহার মনে হইল। 'লক্ষ্মীদেবীই কৃপা করে তোমাকে দর্শন দিয়েচেন।' খুদিরাম কহিলেন, সকল কথা শুনিয়া।

জন্মকথা

১২৪১ সালের শেষের দিকে খুদিরাম ৺গয়াধাম যাত্রা করেন। তিনি পায়ে হাঁটিয়া গিয়াছিলেন, এবং চৈত্র মাসের সুরুতে সেখানে পৌছিয়া শাস্ত্র-বিহিত কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন প্রায় একমাস ধরিয়া। মধুমাসে গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান করিলে পিতৃপুরুষদের অক্ষয় পরিতৃপ্তি হয় এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। খুদিরামের গয়াযাত্রার কারণ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত ঘটনাটি কথিত হইয়া থাকে।

নিজ দুহিতা শ্রীমতী কাত্যায়নীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া খুদিরাম তাহাকে দেখিতে যান আনুড় গ্রামে। কন্যার হাবভাবে ও কথাবার্তায় তাঁহার ধারণা জন্মে যে, সে ভূতাবিষ্ট হইয়াছে। কন্যাশরীরে প্রবিষ্ট জীবকে উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন, তুমি দেবতা বা উপদেবতা যেই হও, কেন আমার মেয়েকে কষ্ট দিচ্চ? এখনি আমার মেয়েকে ছেড়ে চলে যাও। কাত্যায়নীর দেহাবলম্বনে সেই জীব উত্তর করিল, আমি বড়ই কষ্ট পাচ্চি, গয়ায় গিয়ে যদি আপনি আমার নামে পিণ্ডদান করেন তা হলেই আমার এই কষ্টের অবসান হবে। যখন আপনি ঐ উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন তখন থেকেই আপনার মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠবে—আমি তার শরীর ছেড়ে চলে যাব—আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করচি। ঐ জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া খুদিরাম কহিলেন, যত শীঘ্র সম্ভব তিনি গয়াধামে গিয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। দেহপ্রবিষ্ট জীবও কহিল যে, পিণ্ডদানের পরে তাহার যে উদ্ধার হইয়াছে ইহার নিদর্শনস্বরূপ সে সম্মুখস্থ নিমগাছের বড় ডালটি ভাঙ্গিয়া রাখিয়া যাইবে। খুদিরামের গয়াযাত্রার কিছুকাল পরে ঐ নিমগাছের বড় ডালটি সহসা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

৺গদাধর-পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিয়া খুদিরাম যেদিন ক্ষেত্রকর্ম সম্পূর্ণ করিলেন সেদিন তাঁহার বিশ্বাসী হৃদয় তৃপ্তি ও শান্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল, শ্রীভগবানের কৃপায় পিতৃঋণ যথাশক্তি পরিশোধ করিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া। রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখিলেন: "... অদৃষ্টপূর্ব দিব্য জ্যোতিতে মন্দির পূর্ণ হইয়াছে এবং পিতৃপুরুষগণ সসম্ভ্রমে সংযতভাবে

দুই পার্শ্বে করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকিয়া মন্দিরমধ্যে বিচিত্র সিংহাসনে সুখাসীন এক অদ্ভুত পুরুষের উপাসনা করিতেছেন। দেখিলেন, নবদূর্বাদলশ্যাম জ্যোতির্মণ্ডিততনু ঐ পুরুষ স্নিগ্ধপ্রসন্নদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে অবলোকনপূর্বক হাস্যমুখে তাঁহাকে নিকটে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন।" যন্ত্রচালিতবৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম-পূর্বক হৃদয়ের আবেগে তিনি নানা স্তুতি ও বন্দনা করিতে থাকিলে, ঐ দিব্য পুরুষ "বীণানিস্যন্দি মধুর স্বরে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, খুদিরাম, তোমার ভক্তিতে পরম প্রসন্ন হইয়াছি, পুত্ররূপে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়া আমি তোমার সেবা গ্রহণ করিব।" কল্পনারও অতীত ঐ কথা শুনিয়া তিনি যারপরনাই আনন্দিত হইলেও, পরক্ষণেই নিজের দারিদ্র্য চিন্তা করিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। সেবাপরাধী হওয়ার ভয়ে অত বড় সৌভাগ্যও তিনি স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন দেখিয়া ঐ অমানব পুরুষ পুনরায় কহিলেন, "ভয় নাই খুদিরাম, তুমি যাহা প্রদান করিবে তাহাই আমি তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিব; আমার অভিলাষ পূরণ করিতে আপত্তি করিও না।"

নিদ্রাভঙ্গে খুদিরাম অনেকক্ষণ অবধি বুঝিতেই পারিলেন না কোথায় তিনি আছেন। ক্রমশঃ যখন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, স্বপ্নকথা স্মরণ করিয়া তিনি স্থিরনিশ্চয় করিলেন, দেবস্বপ্ন কখনও বৃথা হয় না, কোন মহাপুরুষ শীঘ্রই তাঁহার গৃহে জন্মপরিগ্রহ করিবেন।

১২৪২ সালের বৈশাখ মাসে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন কামারপুকুরে। খুদিরামের বাড়ীর উত্তর পাশ দিয়া যে রাস্তাটি গিয়াছে তাহারই উত্তর পাশে, বাড়ীর সন্নিকটে, যুগীদের শিবমন্দির। মন্দিরস্থ শিবের নাম শান্তিনাথ। মন্দিরের উত্তরে একটা মাঠের মত ফাঁকা জায়গা ও তাহার উত্তরে হালদারপুকুর নামক বৃহৎ পুষ্করিণী। অভ্যন্তর ভাগের কিয়দংশ ভরাট করিয়া সংস্কার করার ফলে ইদানীং ঐ পুকুরের আয়তন হ্রাস পাইয়াছে।

কামারপুকুরে চন্দ্রাদেবীর সখীস্থানীয় দুইজন স্ত্রীলোক ছিলেন। একজন ধর্মদাস লাহার বিধবা কন্যা প্রসন্নময়ী, আরেক জন মধুসূদন

কর্মকারের বিধবা মেয়ে ধনী। চন্দ্রা ইঁহাদের কাছে নিজের সকল কথাই বলিতেন। খুদিরাম যখন গয়া যান সেই সময় হইতে চন্দ্রার জীবনে দেবদর্শনাদি নানা অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হইতে থাকে। একদিন তিনি যুগীদের শিবমন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধনীর সহিত কথা কহিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন শিবের অঙ্গ হইতে দিব্য জ্যোতি নিঃসৃত হইয়া মন্দির পূর্ণ করিয়াছে ও বায়ুতরঙ্গের আকারে তাঁহারই অভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে। ধনীকে তিনি সে কথা বলিতে যাইতেছেন এমন সময় উহা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে যেন ছাইয়া ফেলিল ও প্রবলবেগে তাঁহার ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন। ধনীর শুশ্রূষায়, চৈতন্য হইলে চন্দ্রা তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন। ধনী প্রথমে অবাক হইলেন ও পরে বলিলেন, তোমার বায়ু-রোগ হয়েচে। সকল কথা শুনিয়া প্রসন্নও ধনীর অভিমতে সায় দিলেন। চন্দ্রার কিন্তু কেবলই মনে হইত, অন্তঃপ্রবিষ্ট ঐ জ্যোতি তাঁহার উদরে থাকিয়া গিয়াছে—তাঁহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে!

গয়া হইতে ফিরিয়া খুদিরাম একমনে—নিজের দেবস্বপ্নের কথা স্মরণ করিতে করিতে—পত্নী-মুখে তাঁহার দর্শন ও অনুভবের কথা শুনিলেন। খুদিরাম কহিলেনঃ এখন থেকে তোমার যা সব দর্শন হবে, আমাকে ছাড়া আর কাকেও বোলো নি; রঘুবীর কৃপা করে যাই দেখান না কেন, আমাদেরই মঙ্গলের জন্যে—এই কথা মনে করে নিশ্চিন্ত থাকবে, গয়াধামে গদাধর আমাকেও জানিয়েচেন আমাদিকে আবার পুত্রমুখ দেখতে হবে।

কালের অগ্রগতির সঙ্গে সকলেই বুঝিতে পারিল যে, খুদিরাম-গৃহিণী চন্দ্রা সত্যসত্যই অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে। প্রতি-বেশিনীরা জল্পনা করিত, বুড়ো বয়সে গর্ভবতী হয়ে মাগীর এত রূপ! বোধ হয় প্রসবের সময় ব্রাহ্মণী এবার মারা পড়বে।

শুনা যায়, এই কালে চন্দ্রাদেবী প্রায় নিত্যই নানা দেবদেবী দর্শন করিতেন, সাদা চোখে, সহজ অবস্থায়। কখন বা অনুভব করিতেন

তাঁহাদের দেহের দিব্যগন্ধে ঘর ভরিয়া গিয়াছে ; কখন বা দৈববাণী শুনিতে পাইতেন। আরও শুনা যায়, সকল দেবদেবীর উপরেই—গৃহদেবতা রঘুবীর, শীতলা এবং মহাদেবের উপরেও—তাঁহার মাতৃস্নেহ যেন উছলিয়া উঠিয়াছিল। একদিন দেখেন, হাঁসের উপর চড়িয়া একজন আসিয়াছেন, রৌদ্রের তাপে তাঁহার মুখখানি রক্তবর্ণ হইয়াছে। দেখিয়া তাঁহার মন কেমন করিতে লাগিল ও তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, ওরে বাপ হাঁসে-চড়া ঠাকুর, রোদে তোর মুখখানি যে শুকিয়ে গেছে, ঘরে আমানি পান্তা আছে, দুটি খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যা। ঠাকুরটি হাসিয়া যেন হাওয়ায় মিলাইয়া গেলেন।

নিত্যই ঐসকল দর্শনের কথা শুনিয়া, গয়ায় দৃষ্ট নিজের স্বপ্নের কথা বলিয়া খুদিরাম পত্নীকে বুঝাইতেন যে, অশেষ সৌভাগ্যের ফলে তিনি পুরুষোত্তমকে গর্ভে ধরিয়াছেন ও তাঁহার পুণ্যস্পর্শেই তাঁহার ঐ সকল দিব্যদর্শন হইতেছে। গর্ভধারণের সমকাল হইতেই চন্দ্রাদেবীর মন "সংসারের বাসনাময় কোলাহল" হইতে অনেক উচ্চে উঠিয়া গিয়াছিল, একটা সর্বজনীন প্রেম অধিকার করিয়াছিল তাঁহার মাতৃহৃদয়। নিজের সংসারের কাজ করিতে করিতে তিনি মাঝে মাঝে গরীব প্রতিবেশীদের ঘরে গিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন, এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের মধ্যে যাহার যে বস্তুর অভাব দেখিতেন তাহাই তাহাকে দিয়া আসিতেন নিজের সংসার হইতে লুকাইয়া লইয়া গিয়া। স্বয়ং আহারে বসিবার পূর্বে তিনি তাহাদের প্রত্যেকের ঘরে গিয়া খবর লইতেন তাহাদের সকলেরই খাওয়া হইয়াছে কি-না। যদি দেখিতেন কোন কারণে কাহারও খাওয়া হয় নাই, তাহাকে নিজের অন্ন ধরিয়া দিতেন সাদরে বাড়ীতে লইয়া আসিয়া, আর নিজে দিন কাটাইয়া দিতেন সামান্য জলযোগ করিয়া।

দিনে দিনে দিন গত হইয়া ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন আসিয়া উপস্থিত হইল। ৺রঘুবীরের ভোগ রাঁধিতে রাঁধিতে চন্দ্রার মনে হইতেছিল, শরীরের যা অবস্থা তাহাতে বলা যায় না কখন কী হয়। যদি এখনই প্রসবকাল উপস্থিত হয়, ঘরে এমন কেহ নাই যে আজিকার ঠাকুরসেবা

চালাইতে পারে। তাঁহার আশঙ্কার কথা শুনিয়া খুদিরাম কহিলেন: ভয় নাই, তোমার গর্ভে যিনি এসেচেন তিনি কখনো ঠাকুরসেবার বিঘ্ন ঘটাবেন না, আজকের ঠাকুরসেবা নিশ্চয়ই তুমি চালাতে পারবে।

তাহাই হইল। বাড়ীতে ছোট বড় চালাঘর ছিল সব সুদ্ধ পাঁচখানি: ঠাকুরঘর, বসবাসের দুইখানি ঘর, রান্নাঘর ও ঢেঁকিঘর। স্থানাভাবে শেষোক্ত ক্ষুদ্র চালাঘরখানিই চন্দ্রাদেবীর সূতিকাগৃহরূপে নির্দিষ্ট রহিল।

সূর্যোদয়ের প্রায় অর্ধদণ্ড বাকি, এমন সময়ে চন্দ্রার প্রসববেদনা সুরু হইল। ধনীর সাহায্যে তিনি ঢেঁকিশালে গিয়া শয়ন করিলেন ও অচিরে এক পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। প্রসূতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়া ধনী যখন জাতকের দিকে মন দিলেন, তিনি আর তাহাকে দেখিতে পান না। ভীত হইয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে তিনি দেখিলেন, ধান সিদ্ধ করিবার উনানের ভিতর সে চুপ করিয়া পড়িয়া আছে বিভূতিভূষিতাঙ্গ হইয়া! ধনী সযত্নে তাহাকে তুলিয়া নিলেন ও পরিষ্কৃত করিয়া দেখিলেন—অপূর্বদর্শন শিশু, ঠিক যেন ছয় মাসের ছেলে। সংবাদ পাইয়া প্রসন্ন-প্রমুখ প্রতিবেশিনীরা ততক্ষণে আসিয়া পড়িয়াছেন। খুদিরামের ক্ষুদ্র কুটিরাঙ্গন পূর্ণ করিয়া শুভ শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি ছড়াইয়া পড়িল দিগ্‌দিগন্তে, মহাপুরুষের জন্মবার্তার বাহক হইয়া।[১]

"অনন্তর শাস্ত্রজ্ঞ খুদিরাম নবাগত বালকের জন্মলগ্ন নিরূপণ করিতে যাইয়া দেখিলেন, জাতক বিশেষ শুভক্ষণে সংসারে প্রবেশ করিয়াছে। দেখিলেন—

"ঐদিন সন ১২৪২ সালের অথবা ১৭৫৭ শকাব্দের ৬ই ফাল্গুন, ইংরাজী ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী, শুক্লপক্ষ, বুধবার। রাত্রি একত্রিশ দণ্ড অতীত হইয়া অর্ধদণ্ডমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শুভা দ্বিতীয়া তিথি ঐসময়ে পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের সহিত সংযুক্তা হইয়া সংসারে সিদ্ধিযোগ আনয়ন করিয়াছিল। বালকের জন্মলগ্নে রবি,

---

১ জনশ্রুতি অনুসারে কেওড়া বা হাড়ী-জাতীয়া ধাত্রী 'ভৈরবী' শিশুর জন্মের পর আসিয়া তাহার নাড়ীচ্ছেদন করিয়াছিলেন।

চন্দ্র ও বুধ একত্র মিলিত রহিয়াছে এবং শুক্র, মঙ্গল ও শনি তুঙ্গস্থান অধিকারপূর্বক তাহার অসাধারণ জীবনের পরিচায়ক হইয়া রহিয়াছে। আবার মহামুনি পরাশরের মত অবলম্বনপূর্বক দেখিলে রাহু ও কেতু গ্রহদ্বয়কে তাহার জন্মকালে তুঙ্গস্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তদুপরি বৃহস্পতি তুঙ্গাভিলাষিরূপে বর্তমান থাকিয়া বালকের অদৃষ্টের উপর বিশেষ শুভ প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।"

জ্যোতিষীরা বলিলেন—

"ঐরূপ ব্যক্তি ধর্মবিৎ ও মাননীয় হইবেন এবং সর্বদা পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানে রত থাকিবেন। বহুশিষ্যপরিবৃত হইয়া ঐ ব্যক্তি দেবমন্দিরে বাস করিবেন, এবং নবীন ধর্মসম্প্রদায় প্রবর্তিত করিয়া নারায়ণাংশসম্ভূত মহাপুরুষ বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধিলাভপূর্বক সর্বত্র সকল লোকের পূজ্য হইবেন।"[১]

প্রিয়দর্শন পুত্রের অসাধারণ ভাগ্যের কথা শুনিয়া পিতা খুদিরাম ও মাতা চন্দ্রমণি আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। যথাকালে তাহার নিষ্ক্রামণ-নামকরণাদিও সুনিষ্পন্ন হইল। তাহার কোষ্ঠীতে লিখিত হইয়াছে: তস্য রাশ্যাশ্রিতং নাম শম্ভুরামদেবশর্মা। প্রসিদ্ধনাম গদাধরচট্টোপাধ্যায়ঃ। সাধনাসিদ্ধিপ্রাপ্ত-জগদ্বিখ্যাতনাম শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব-মহোদয়ঃ।

প্রসিদ্ধ-নাম রাখিবার কালে খুদিরাম যেমন স্মরণ করিয়াছিলেন গয়াধামে ৺গদাধরের অভিপ্রায়-প্রকাশের কথা, রাশ্যাশ্রিত-নাম রাখিতে

---

১ ধর্মস্থানাধিপে তুঙ্গে ধর্মস্থে তুঙ্গখেচরে।
গুরুণা দৃষ্টিসংযোগে লগ্নেশে ধর্মসংস্থিতে॥
কেন্দ্রস্থানগতে সৌম্যে গুরৌ চৈব তু কোণভে।
স্থিরলগ্নে যদা জন্ম সম্প্রদায়প্রভুর্হি সঃ॥
ধর্মবিন্মাননীয়স্তু পুণ্যকর্মরতঃ সদা।
দেবমন্দিরবাসী চ বহুশিষ্যসমন্বিতঃ॥
মহাপুরুষসংজ্ঞোহয়ং নারায়ণাংশসম্ভবঃ।
সর্বত্র জনপূজ্যশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
ইতি ভৃগুসংহিতায়াং সম্প্রদায়প্রভুযোগঃ॥

গিয়াও তেমনি মনে করিয়াছিলেন চন্দ্রাদেবীর গর্ভগুহাশ্রয়কারী শিবাঙ্গ-নিঃসৃত দিব্যজ্যোতির কথা। এখানে ভাবিবার বিষয় এই যে, সর্বধর্মের সমন্বয় সকলেরই একদিন দৃষ্টিগোচরীভূত হইবে যাঁহার সাধনা ও অনুভূতির উজ্জ্বল আলোকে, তিনি হরি-হরের সমন্বয় করিয়া, হরি-হর যে অভেদ একথা প্রমাণিত কবিয়াই যেন, সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন! তাঁহার একতম প্রধান জীবনব্রতের সূচনা হইয়াছিল সেই সময় হইতেই।

তাঁহার জগদ্বিখ্যাত শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম কখন কে রাখিয়াছিলেন এবিষয় আজও রহস্যাবৃত রহিয়াছে। দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার প্রধান রসদ্দার-সেবক মথুরামোহন তাঁহাকে ঐ নামে প্রথম অভিহিত করিয়াছিলেন, কেহ কেহ বলিয়াছেন। 'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ' তাঁহারই শ্রীমুখ-নিঃসৃত বেদবাণী। এই বাণীতে নিজেই তিনি নিজনামের প্রকাশক, বলা যায়। এই রামকৃষ্ণ-নামই তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতেছে। তাঁহারই ইচ্ছায়, চিন্ময় নামীর সঙ্গে চিন্ময় নাম একদিন স্বয়ংপ্রকাশ হইয়াছিলেন ভক্তহৃদয়ে, ঋষিহৃদয়ে স্বয়মাবির্ভূত বেদমন্ত্রের মত, ইহাও বলা যাইতে পারে।[১]

---

১ "কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া।"

বাল্যে ও কৈশোরে

খুদিরাম-কুল-চন্দ্রমার উদয়-সংবাদ যখন গিয়া পৌছিল মেদিনীপুরে, রামচাঁদ একটি সবৎসা গাভী পাঠাইয়া দিলেন কামারপুকুরে, মাতুলের সংসারে দুগ্ধের অভাব হইতে পারে ভাবিয়া। শিশুরূপী ভগবানের সুষ্ঠু সেবা-পরিচালনার জন্য যখন যে বস্তুর প্রয়োজন হইত, যখন যে বস্তুর কামনা জাগিত মাতাপিতার মনে, তখন তখনই সেইসব বস্তু আসিয়া যাইত নানাদিক হইতে, অভাবনীয়রূপে। তথাপি তাঁহাদের ভাবনার বিরাম হইল না। এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। এদিকে দ্বিতীয়ার চাঁদ শ্রীমান গদাধরেব মোহিনী শক্তি দিনে দিনে বাড়িয়া মাতাপিতার তো কথাই নাই, পরিবারস্থ সকলের এবং প্রতিবাসিনীগণের উপরেও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। চন্দ্রাদেবীকে বলিতেন প্রতিবাসিনীরা: তোমার ছেলেকে রোজই দেখতে ইচ্ছা করে, তা কী করি বল, রোজই আসতে হয়। নিকটবর্তী গ্রামসকল হইতেও আত্মীয়ারা ঘন ঘন আসিতেন খুদিরাম-কুটিরে, ঐ একই কারণে।

কেমন এ ছেলে, দেখে জীবন জুড়ায়
শুধু অঙ্গ, তবু যেন মণিরত্ন গায়॥

এইরূপে পাঁচমাস গত হইয়া ষষ্ঠমাসে গদাধরের অন্নপ্রাশন কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। ৺রঘুবীরের প্রসাদী অন্ন মুখে দিয়া খুদিরাম সংক্ষেপে কর্ম সমাধা করিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইল না। তাঁহার বন্ধু ও গ্রামের জমিদার ধর্মদাস লাহার প্রেরণায় প্রতিবেশী প্রবীণ ব্রাহ্মণেরা সহসা তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন পুত্রের অন্নপ্রাশনে তাঁহাদের সকলকেই খাওয়াইতে হইবে। একথায় খুদিরাম নিজেকে বিপন্ন জ্ঞান করিলেন। পল্লীবাসীরা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে, তিনি কাহাকে রাখিয়া কাহাকে বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। এবিষয়ে পরামর্শ করিতে আসিয়া তিনি বন্ধুর অভিপ্রায় অবগত হইলেন। ধর্মদাস স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া অনেকাংশে স্বব্যয়ে সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির সকলেই সেদিন ৺রঘুবীরের প্রসাদায় ভোজনে

পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন ; দরিদ্র ভিক্ষুকেরাও পেট পূরিয়া খাইয়া বালকের দীর্ঘজীবন ও মঙ্গল-কামনা করিয়াছিল।

গদাধরের বয়স তখন সাত আট মাস হইবে। একদিন সকালে স্তন্যপান করিতে করিতে সে ঘুমাইয়া পড়িলে চন্দ্রাদেবী তাহাকে মশারির ভিতর শয়ন করাইয়া কার্যান্তরে যান। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন বিছানায় পুত্র নাই, এক অপরিচিত দীর্ঘকায় পুরুষ শুইয়া আছে মশারি জুড়িয়া! চন্দ্রা চীৎকার করিয়া উঠিলেন ও দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া স্বামীকে ডাকিয়া আনিলেন। উভয়ে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন, কেহ কোথাও নাই, বালক যেমন ঘুমাইতেছিল তেমনি ঘুমাইতেছে। চন্দ্রা দৃঢ়তার সহিত পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন যে, তিনি একটুও ভুল দেখেন নাই, নিশ্চয়ই কোন উপদেবতা ছেলেকে ভর করিয়াছে। একজন ভাল রোজা আনিয়া ছেলেকে দেখাইবার জন্য তিনি পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। খুদিরাম তাঁহাকে শান্ত করিলেন এইরূপ বলিয়া : যে পুত্রের জন্মের পূর্ব হইতে তাঁহারা দুইজনেই নানা দিব্যদর্শন পাইয়া আসিতেছেন তাহার সম্বন্ধে ঐরূপ কিছু দেখা অসম্ভব নহে। ইহা কোন অপদেবতার কর্ম নয়, অপদেবতার কর্ম হইতেই পারে না, যেহেতু বাড়ীতে স্বয়ং রঘুবীর বিদ্যমান থাকিয়া ছেলেকে সকল আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন।

পুত্রের অমঙ্গল-আশঙ্কার ছায়া মায়ের মন হইতে গিয়াও যেন যাইতে চাহে না। চন্দ্রা সেদিন প্রাণের বেদনা নিবেদন করিয়াছিলেন কুলদেবতা রঘুবীরকে, অনেকক্ষণ ধরিয়া।

এইরূপে "আনন্দে, আবেগে, উৎসাহে, আশঙ্কায়" গদাধরের জনক-জননীর কাল কাটিতে লাগিল। ক্রমে চারিপাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হইল। ঐকালের মধ্যে তাঁহাদের কনিষ্ঠা কন্যা সর্বমঙ্গলা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে গদাধর চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহাকে কোলে বসাইয়া খুদিরাম পূর্বপুরুষদের নামাবলী, দেবদেবীর স্তোত্রপ্রণামাদি বা রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যানবিশেষ শুনাইতেন, আর সবিস্ময়ে

দেখিতেন একবারমাত্র শুনিয়াই সে ঐসকল মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে —অনেকদিন পরে জিজ্ঞাসিত হইলেও সমভাবে আবৃত্তি করিতে পারে! কিন্তু কোন কোন বিষয়, যেমন গণিতের নামতা, সে শিখিতে চাহিত না।

পঞ্চমবর্ষে বিদ্যারম্ভ করাইয়া খুদিরাম তাহাকে পাঠশালায় ভর্তি করিয়া দিলেন। সমবয়স্ক বালকদের সহিত মিশিতে পাইয়া সে খুশী হইল এবং সরল সপ্রেম ব্যবহারে অচিরে তাহাদের সকলের, এবং শিক্ষক মহাশয়েরও, মনোহরণ করিল। লাহাবাবুদের চণ্ডীমণ্ডপে সকালে ও বিকালে পাঠশালা বসিত। যদুনাথ সরকার নামে এক ব্যক্তি তখন ঐ পাঠশালার একমাত্র শিক্ষক ছিলেন ; কিছুকাল পরে রাজেন্দ্রনাথ সরকার নামে অপর এক ব্যক্তি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া আসেন। 'সরকার' তাঁহাদের কৌলিক পদবী কি-না ঠিক বলা যায় না ; কারণ পাঠশালার গুরুমহাশয়েরা সেই সময়ে সরকার-নামে অভিহিত হইতেন ঐসব গ্রামাঞ্চলে।

পাঠশালায় গদাধরের শিক্ষা মন্দ অগ্রসর হয় নাই। সামান্যভাবে পড়িবার ও লিখিবার শক্তি সে অর্জন করিয়াছিল অল্পদিনের মধ্যেই। অঙ্কশাস্ত্রে বা হিসাবনিকাশের বিদ্যায় যদিও তাহার অনুরাগ ছিল না, তথাপি শেষ পর্যন্ত সে ধারাপাতে কাঠাকিয়া ও পাটীগণিতে সামান্য সামান্য গুণ-ভাগ পর্যন্ত আয়ত্ত করিয়াছিল। অবশ্য ইহা অনেক পরের কথা।

পাড়াগাঁয়ে পাঠশালে প্রচলিত রীতি।
প্রহ্লাদচরিত্র আর দাতাকর্ণ-পুঁথি ॥
সরল বানানযুক্ত বাক্যসমুদয়।
পড়িতে পড়িতে হয় বর্ণপরিচয় ॥

পড়িতে পড়িতে প্রহ্লাদচরিত্র যে গদাধরের কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ঈশ্বরের উপর প্রহ্লাদের অকৃত্রিম অনুরাগও তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল বিশেষভাবে। পাঠশালা হইতে ছুটি পাইয়া পুঁথিখানি হাতে নিয়া প্রতিবেশী মধু যুগীর ঘরে সে চলিয়া যাইত ও সুমিষ্ট-কণ্ঠে আবৃত্তি করিয়া উপস্থিত সকলকে শুনাইত। একদিন যখন সে পুঁথি-পাঠ করিতেছিল, আর নরনারী অনেকে সেই পাঠ শুনিতেছিল

মোহিত হইয়া, তাহাকে ঘেরিয়া বসিয়া, সেই সময় এক হনুমান আমগাছ হইতে নামিয়া আসে ও নির্ভয়ে নিকটে বসিয়া পাঠ শুনিতে থাকে, শিশু-পাঠকের চরণ ধরিয়া।

পাঠান্তে উঠায়ে পুঁথি শিশু গদাধরে।
পরশ করিয়া দিলা হনু-শিরোপরে॥
শ্রীপদে প্রণমি হনুমান্ করপুটে।
পুনরায় পূর্বেকার আমগাছে উঠে॥

গদাধরের অনুকরণশক্তি ছিল অসাধারণ। কুমারদের প্রতিমা গড়া ও পটুয়াদের ছবি আঁকা দেখিয়া দেখিয়া সে ঐ দুই বিদ্যা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এই বয়সেই। গ্রামে কোথাও পুরাণ-কথা ও যাত্রাগান হইতেছে শুনিলেই সে সেখানে গিয়া হাজির হইত, একান্তমনে বসিয়া সব কিছু দেখিত ও শুনিত, এবং সঙ্গীতাদিসহ পালা কণ্ঠস্থ ও অভিনয়ভঙ্গী আয়ত্ত করিয়া লইত। তারপরে যাত্রাদলের অনুকরণে নিজেদের দল গঠন করিয়া সঙ্গীদিগকে সে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়দক্ষ করিয়া তুলিত।

পাঠশালে যত ছেলে সব গেল মেতে।
দিনে যায় পাঠশালা, যাত্রা করে রেতে॥

গুরু-মহাশয়ের কানে গিয়া পৌঁছিল সেই খবর। পুত্রবৎ প্রিয় ছাত্র গদাধরকে সস্নেহে আহ্বান করিয়া তিনি তাহার অভিনয় দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কণ্ঠস্বর ও ভাবভঙ্গী পরিবর্তন করিয়া গদাধর একাই পালার সব চরিত্র অভিনয় করিতে পারিত। গুরুর আদেশ পাইবামাত্র সে যাত্রা সুরু করিয়া দিল। মাঝে মাঝে গান গাওয়া, সং দেওয়া, পায়ে নৃত্য করা, হাতে তাল দেওয়া ও মুখে বাদ্য বাজানো, কিছুই বাকি রহিল না।

হেসে হেসে মরে গুরু সহ ছাত্রগণ।
কতই আনন্দ তাঁর নাহি নিরূপণ॥
... ...
পাঠশালা হৈল ঠিক রঙ্গশালা-মত।
নিত্য প্রায় গদাইয়ের যাত্রা তথা হত॥

দিন দিন বালকের অসীম সাহসেরও পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল। ভূতের ভয়ে বয়স্ক ব্যক্তিরাও যেখানে যাইতে সাহস করিতেন না সেই শিবাসমাকুল নির্জন শ্মশানে সে নির্ভয়ে গমনাগমন করিত। তাহার পিসীমাতা রামশীলার উপর কখন কখন শীতলার ভর হইত ও সেই সময় তিনি যেন আর এক মানুষ হইয়া যাইতেন। একবার কামারপুকুরে তাঁহার ঐরূপ আবেশ হইলে গদাই কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া, তন্নতন্ন করিয়া তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিল ও পরে বলিয়াছিল: পিসীমার ঘাড়ে যে আছে সে যদি আমার ঘাড়ে চাপে তো বেশ হয়।

বালকের স্বভাবে এমন এক বিশেষত্ব ছিল যে, হৃদয়স্পর্শী ভাবে না বলিলে কোন উপদেশই সে গ্রহণ করিতে পারিত না। হালদারপুকুরে পুরুষদের ও স্ত্রীলোকদের স্নানের জন্য স্বতন্ত্র দুইটি ঘাট ছিল। চপল গদাই তাহারই মত চপল বালকদিগকে নিয়া কখনো এঘাটে কখনো ওঘাটে সাঁতার দিয়া বেড়াইত। স্ত্রীলোকদের ঘাটে আসিয়া একদিন সে উল্লম্ফনাদি দ্বারা বিষম গণ্ডগোল আরম্ভ করে; সন্ধ্যাহ্নিক কর্মে নিযুক্তা এক প্রৌঢ়া মহিলা তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলেন: তোরা এঘাটে কী করতে আসিস? পুরুষদের ঘাটে যেতে পারিস না? এঘাটে মেয়েরা স্নান করে কাপড় ছাড়ে—জানিস না, মেয়েদের ন্যাংটা দেখতে নাই? 'কেন দেখতে নাই?' এই প্রশ্নের উত্তরে বালকের বুঝিবার মত কিছু না বলিয়া মহিলাটি কেবল তিরস্কারই করিয়া গেলেন।

গদাইয়ের জিজ্ঞাসাবৃত্তি তাহাতে না দমিয়া আরও প্রবল হইল। ঘটনার তিনদিন পরে ঐ মহিলাকে সে কহিল: গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে পরশু চারজনকে দেখেছি, কাল ছ'জনকে, আজ আটজনকে—কৈ, আমার কিছুই তো হল না! মহিলাটি হাসিতে হাসিতে চন্দ্রাদেবীকে সেকথা বলিয়া দিলেন। অবসরকালে ছেলেকে মা বুঝাইলেন: ওতে তোমার কিছু হয় না বাবা, কিন্তু মেয়েরা তাতে অপমান বোধ করেন। তারা যে আমারই মতন, তাদের অপমান করলে আমাকেই অপমান করা হয়। তাদের মনে আর আমার মনে ব্যথা দেওয়া কি ভাল?

বালক বুঝিয়া গেল। ভবিষ্যতে সে আর কখনও অমন কাজ করে নাই।

ভূরস্থবোর মাণিকরাজা খুদিরামের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন; খুদিরামের ধর্মপরায়ণতা এই ভক্ত-জমিদারকে আকৃষ্ট করিয়াছিল বিশেষভাবে। ছয় বৎসরের বালক গদাধর একদিন মাণিকরাজার বাড়ীতে গিয়াছিল তাহার পিতার সঙ্গে; সেখানে সে সকলের সহিত এমন নিঃসঙ্কোচ ও মধুর ব্যবহার করিয়াছিল যে, সেইদিন হইতেই তাহাদের প্রিয়পাত্র হইয়া গিয়াছিল। মাণিকরাজার ভাই রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন খুদিরামকে: ভায়া, তোমার এই পুত্রটি সামান্য নয়, এর দেবাংশে জন্ম বলে মনে হয়। তুমি যখনি এদিকে আসবে, একেও নিয়ে এসো সঙ্গে করে; একে দেখলে পরম আনন্দ হয়। ইহার পরে খুদিরাম কিছুদিন তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতে পারেন নাই, তাঁহাতে চিন্তিত হইয়া একজন স্ত্রীলোককে তাঁহারা পাঠাইয়াছিলেন কামারপুকুরে, গদাধরকে লইয়া যাইবার জন্য। পিতার আদেশে গদাধর সেদিন ভূরস্থবোয় গিয়াছিল এবং সারাদিন সেখানে থাকিয়া সন্ধ্যার পূর্বে ফিরিয়া আসিয়াছিল নানাপ্রকার মিষ্টান্ন ও কয়েকখানি অলঙ্কার উপহার লইয়া।

গদাধরে মুগ্ধমন এত সবাকার।
না দেখিলে কিছুদিন দেখিতে আঁধার॥
লোক পাঠাইয়া দিত কামারপুকুরে।
আদরের গদাধর আনিবারে ঘরে॥

ক্রমে গদাধর সপ্তমবর্ষে পদার্পণ করিল। শৈশবের মাধুর্য ঘনীভূত হইয়া তাহাকে অধিকতর প্রিয়দর্শন করিয়া তুলিল। মাতাপিতার নয়নমণি সে। স্নেহবশে তাহার জন্মপূর্ব দর্শনাদির কথা তাঁহারা এখন বিস্মৃতপ্রায় হইয়াছেন। ঘরে কোন সুখাদ্য প্রস্তুত করিতে বসিয়া পল্লীবাসিনী মায়েরা চিন্তা করিতেন কেমন করিয়া উহা সকলের আগে খাওয়াইবেন তাঁহাদের আদরের গদাইকে। খেলার সাথী সমবয়সী বালকবালিকারা নিজেদের প্রিয় খাদ্য তাহার সহিত ভাগ করিয়া খাইতে চাহিত, তাহাতেই সমধিক

তৃপ্তি অনুভব করিত। বিষয়বুদ্ধির স্থূল আবরণে যাহাদের দৃষ্টি আচ্ছাদিত তাহারা দেখিতে না পাইলেও, বাৎসল্য ও সখ্যপ্রেমের দুই অনাবিল ধারা বহিয়া যাইতেছিল প্রাণে প্রাণে নীরবে, বালকবেশী ভগবানকে বিষয় করিয়া।

শরীরবোধের অভাব হইতে যে সর্বোত্তম স্বাস্থ্য সূচিত হয়, জন্মাবধি বালক সেই স্বাস্থ্য-সুখ অনুভব করিয়া আসিতেছিল। স্বভাবসিদ্ধ একাগ্রতায় যখন তাহার মন নিবিষ্ট হইত কোনও বিষয়ে, তাহার দেহবুদ্ধি আরও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে যেন ভাবময় করিয়া তুলিত। এই ভাবময়তার পরিণতিস্বরূপ এই কালের একটি ঘটনা সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন পরবর্তী কালে, তাঁহার পার্ষদ ভক্তগণকে ঃ

"সেটা জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাস হবে। আমার তখন ছয় কি সাত বছর বয়স। একদিন সকালবেলা টেকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠের আলপথ দিয়ে খেতে খেতে যাচ্চি। আকাশে একখানা সুন্দর জলভরা মেঘ উঠেচে, তাই দেখচি ও খাচ্চি। দেখতে দেখতে মেঘখানা আকাশ প্রায় ছেয়ে ফেলেচে, এমন সময় এক ঝাঁক সাদা দুধের মত বক ঐ কাল মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগল। সে এমন এক বাহার হল! দেখতে দেখতে অপূর্ব ভাবে তন্ময় হয়ে এমন একটা অবস্থা হল যে, আর হুঁশ রইল না! পড়ে গেলুম, মুড়িগুলি আলের ধারে ছড়িয়ে গেল। কতক্ষণ ঐভাবে পড়েছিলুম বলতে পারি না। লোকে দেখতে পেয়ে ধরাধরি করে বাড়ী নিয়ে এসেছিল। সেই প্রথম ভাবে বেহুঁশ হয়ে যাই।"

এই ঘটনাকে মূর্ছারূপ ব্যাধির সূচনা ভাবিয়া মাতাপিতা উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। বালক কিন্তু বারবার বলিয়াছিল যে, বাহিরে মূর্ছার মত দেখাইলেও ভিতরে তাহার হুঁশ ছিল, এক অপূর্ব আনন্দের অনুভূতিও ছিল। যাহা হউক, গদাধরের স্বাস্থ্যের অবনতি বা সংজ্ঞালোপের পুনরাবৃত্তি হইতে না দেখিয়া খুদিরাম মনে করিয়াছিলেন, কোনরূপ বায়ুর প্রকোপে তাহার ঐ মূর্ছার মত অবস্থা হইয়াছিল ; কিন্তু চন্দ্রা স্থিরনিশ্চয় করিয়াছিলেন, ঐ অবস্থাটি হইয়াছিল উপদেবতার নজর লাগিয়া। এই

তথাকথিত অসুখের জন্য গদাইকে কিছুকাল পাঠশালায় যাইতে দেওয়া হয় নাই ; সেই সুযোগে প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে ও গ্রামের সর্বত্র যথেচ্ছ ঘুরিয়া বেড়াইয়া সে আরও ক্রীড়াকৌতুকপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

১২৪৯ সালের শারদীয়া মহাপূজা। প্রতি বৎসর রামচাঁদ স্বগ্রামে এই মহাপূজার অনুষ্ঠান করিতেন। অষ্টাহকাল ধরিয়া তাঁহার সেলিমপুরের বাড়ীটি গীতবাদ্যে মুখরিত হইতে থাকিত ; ব্রাহ্মণভোজন, পণ্ডিত-বিদায়, দরিদ্রদিগকে অন্ন ও বস্ত্র-দান প্রভৃতি কার্যে তথায় আনন্দের স্রোত বহিত। এই উপলক্ষে রামচাঁদ তাঁহার পূজার্হ মাতুলকে নিজালয়ে লইয়া যাইতেন ; এইবারও খুদিরাম তাঁহার সাদর নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইলেন।

খুদিরামের বয়স এখন প্রায় আটষট্টি বৎসর হইয়াছে, মাঝে মাঝে গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার সুদৃঢ় শরীর কাহিল ও দুর্বল হইয়া গিয়াছে। প্রিয় ভাগিনেয়ের আহ্বান তিনি উপেক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না, অথচ নিজের কুটিরঘর ও পরিবারবর্গকে, বিশেষভাবে গদাধরকে, ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার প্রবল অনিচ্ছা হইতেছিল। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, ৺রঘুবীরকে প্রণামপূর্বক সকলের কাছে বিদায় নিয়া ও গদাধরের মুখচুম্বন করিয়া তিনি সেলিমপুর যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে গেলেন জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমার ; আনন্দিত হইলেন রামচাঁদ মামা ও মামাতো ভাইকে ঘরে পাইয়া।

এখানে আসিবার পরেই কিন্তু খুদিরামের গ্রহণীরোগ আবার দেখা দিল। পূজার তিনদিন একভাবে কাটিয়া যাইবার পর নবমীর দিন সেই কালব্যাধি প্রবলাকার ধারণ করিল। রামচাঁদ, হেমাঙ্গিনী ও রামকুমার সযত্নে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। বিজয়াদশমীর অপরাহ্ণে প্রতিমাবিসর্জন করিয়া, রামচাঁদ তাড়াতাড়ি মাতুলের কাছে আসিয়া দেখেন তাঁহার অন্তিম মুহূর্ত আসন্ন। তাঁহাকে জ্ঞানশূন্যের ন্যায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া রামচাঁদ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন : মামা, তুমি যে সর্বদা রঘুবীর রঘুবীর বলে থাক, এখন বলচ না কেন? রঘুবীর-নাম কানে প্রবেশ করিতেই খুদিরামের চৈতন্য হইল ; তিনি ধীরে ধীরে

কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন : কে, রামচাঁদ ? প্রতিমাবিসর্জন করে এলে ? তবে আমাকে একবার বসিয়ে দাও। অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে বিছানায় বসাইয়া দেওয়া হইলে গম্ভীরস্বরে তিনবার 'রঘুবীর' উচ্চারণ করিয়া তিনি শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। "বিন্দু সিন্ধুর সহিত মিলিত হইল— ৺রঘুবীর ভক্তের পৃথক্ জীবনবিন্দু নিজ অনন্ত জীবনে সম্মিলিত করিয়া তাঁহাকে অমর ও পূর্ণশান্তির অধিকারী করিলেন!"

পরদিন সংবাদ গিয়া পৌঁছিল কামারপুকুরে। আনন্দধাম নিরানন্দে পূর্ণ হইল। অশৌচান্তে বৃষোৎসর্গাদি করিয়া ও বহুব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া রামকুমার পিতার শেষকৃত্য সম্পূর্ণ করিলেন। মাতুলের শ্রাদ্ধে রামচাঁদ পাঁচশত টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন।

সাত বছর বয়সে গদাধর পিতৃহারা হইল। কৈশোরকাল পিতৃস্নেহ অনুভব করিবার শ্রেষ্ঠ সময ; তাহার অভাববোধ তীব্র হইয়া উঠিল। কিন্তু মায়ের মুখ চাহিয়া, ছেলেকে সর্বদা বিষণ্ণ দেখিলে মা আরও মর্মপীড়া ভোগ করিবেন বুঝিয়া, সে বাহিরে চাপিয়া গেল ও আগের মত ক্রীড়া-কৌতুকে কাল কাটাইতে লাগিল। মা দিতে পারিবেন না এমন কোন জিনিসের জন্য তাঁহার কাছে আর আবদার করিত না, অনেক সময়েই মার কাছে থাকিত এবং দেবসেবায় ও ঘরের কাজে তাঁহাকে সাহায্য করিত।

দাদার কথায় আবার সে পাঠশালায় যাইতে আরম্ভ করিল, কিন্তু বিদ্যাভ্যাস অপেক্ষা যাত্রা-কথকতা শ্রবণে ও দেবদেবীর মূর্তি গঠনে তাহার সমধিক রুচি প্রকাশ পাইতে লাগিল। পুরাণ-পাঠে সে শুনিয়াছিল সাধুসঙ্গের মহিমাকথা, এবার সেটি প্রত্যক্ষ করিতে তাহার ইচ্ছা হইল। লাহাবাবুদের পান্থশালায় কতিপয় বৈরাগী সাধু বিশ্রামার্থে কিছুদিন অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদের দিনচর্যা সে নিরীক্ষণ করিত কাছে থাকিয়া, কখনো বা তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ সেবাও করিত ইন্ধনসংগ্রহে ও জল-আনয়নে সহায়তা করিয়া। প্রিয়দর্শন বালকের ঈদৃশ আচরণে মুগ্ধ হইয়া সাধুরা তাহাকে ভজন শিখাইতেন, সদুপদেশ দিতেন, প্রসাদ

পাইতেন তাহাকে সঙ্গে নিয়া বসিয়া। এবিষয় যখন প্রকাশ হইয়া পড়িল, চন্দ্রাদেবীরও কানে গেল, তিনি কিছুই মনে করিলেন না, সাধুদের প্রসন্নতা আশীর্বাদস্বরূপ জ্ঞান করিয়া। কিন্তু তাঁহার গদাই যেদিন বিভূতি মাখিয়া, তিলক করিয়া ও কৌপীন-বহির্বাস পরিয়া আসিয়া বলিল,—কৌপীন-বহির্বাস করিতে সে পরিধেয় বস্ত্রখানিকেই ছিন্ন করিয়াছিল—মা, দেখ সাধুরা আমাকে কেমন সাজিয়ে দিয়েচেন, সেদিন তিনি বিষম উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সন্দেহ হইল সাধুরা তাঁহার পুত্রকে ভুলাইয়া সঙ্গে নিয়া চলিয়া যাইবে। এই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে কিছুতেই শান্ত করিতে না পারিয়া গদাই স্থির করিল সাধুদের কাছে যাওয়া সে বন্ধ করিয়া দিবে। মাকেও সেই কথা বলিল এবং শেষ বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য সাধুদের আড্ডায় গিয়া উপস্থিত হইল। সাধুরা সকল কথা শুনিলেন ও অবিলম্বে চন্দ্রাদেবীর কাছে আসিয়া নিবেদন করিলেন: গদাধরকে সঙ্গে লইয়া যাইবার ইচ্ছা তাঁহাদের নাই, এই ইচ্ছা একবারও তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই; এই জাতীয় কাজ—মাতাপিতার বিনা অনুমতিতে তাহাদের অল্পবয়স্ক ছেলেকে নিয়া সরিয়া পড়া—তাঁহারা মহা অপরাধ জ্ঞান করিয়া থাকেন। চন্দ্রা আশ্বস্তা হইলেন; সাধুদের প্রার্থনায় গদাইকে তিনি পূর্ববৎ তাঁহাদের কাছে যাতায়াত করিবার অনুমতিও দিলেন।

কামারপুকুরের অনেকগুলি স্ত্রীলোক একদিন দলবদ্ধ হইয়া আনুড় গ্রামে ৺বিশালাক্ষী দেবীর পূজা দিতে যান। গদাধরও গিয়াছিল তাঁহাদের সঙ্গে, তাহার বয়স তখন আট বছর। এই দলে ধর্মদাস লাহার কন্যা প্রসন্নময়ীও ছিলেন। প্রসন্ন গদাধরকে আশৈশব স্নেহ করিতেন। বালকের মুখে ঠাকুরদেবতার পুণ্যকথা ও গান শুনিয়া এই পূতস্বভাবা নারী অনেকবার বলিয়াছেন: হ্যাঁ গদাই, তোকে সময়ে সময়ে ঠাকুর বলে মনে হয় কেন বল্ দেখি? হাঁরে, সত্যি সত্যি ঠাকুর মনে হয়। গদাই শুনিয়া মধুর হাসি হাসিত, কিন্তু কিছুই বলিত না; কিংবা অন্য কথা পাড়িয়া তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিত। প্রসন্ন তাহাতে না ভুলিয়া

গম্ভীরভাবে বলিতেন: তুই যাই বলিস, তুই কিন্তু মানুষ নস। পরবর্তী জীবনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ স্থাপন করিয়া প্রসন্ন স্বহস্তে নিত্যসেবার আয়োজন করিয়া দিতেন। পালপার্বণে সেই মন্দিরে যাত্রাগান হইত, প্রসন্ন কিন্তু সে গান বিশেষ শুনিতেন না, বলিতেন: গদাইয়ের গান শুনে আর কোন গান মিঠে লাগে নি—গদাই কান খারাপ করে দিয়ে গেছে।

পূজার ডালি হাতে, স্ত্রীলোকেরা দেবীস্থানে চলিয়াছেন প্রান্তরের পথ বাহিয়া; গদাধরও যাইতেছে দেবীর মহিমাসূচক গানে তাঁহাদের চিত্ত-প্রসাদন করিয়া। প্রান্তর পার হইবার পূর্বেই কিন্তু এক অঘটন ঘটিল—সহসা বালকের গান থামিয়া গেল, দেহ অবশ আড়ষ্ট হইল, চক্ষে অবিরল অশ্রু ঝরিতে লাগিল, গণ্ড প্লাবিত করিয়া। 'কী হয়েচে বাবা?' প্রশ্ন করিয়া মায়েরা কোনই সাড়া পাইলেন না। সর্দিগর্মি হইয়াছে মনে করিয়া, সন্নিহিত পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া তাঁহারা তাহার মাথায় ও চোখে দিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেও চৈতন্য হইল না। পরের বাছাকে সঙ্গে আনিয়াছেন, কী হইবে ভাবিয়া তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইলেন। 'বিশ্বাসী সরল বালকের উপর দেবীর ভর হয় নাই তো?' সহসা প্রসন্নর মনে উদয় হইল। সকলকে তিনি ৺বিশালাক্ষীর নাম করিতে বলিলেন। দেবীজ্ঞানে বালককেই সম্বোধন করিয়া তাঁহারা বলিতে লাগিলেন: মা বিশালাক্ষি, প্রসন্না হও, মা রক্ষা কর, মা বিশালাক্ষি, মুখ তুলে চাও, মা অকূলে কূল দাও। দেখিতে দেখিতে বালকের মুখমণ্ডলে দিব্যহাসি ফুটিয়া উঠিল, তাহার সংজ্ঞার লক্ষণও প্রকাশ পাইল। তখন বালকশরীরে সত্যই দেবীর আবেশ হইয়াছে জানিয়া তাঁহারা প্রণাম প্রার্থনাদি করিতে লাগিলেন। দেবীর উদ্দেশ্যে আনীত নৈবেদ্যও তাঁহারা বালককে ভোজন করাইয়াছিলেন।

ধর্মদাস লাহার ভ্রাতুষ্পুত্র গঙ্গাবিষ্ণু গদাধরের নিকটপ্রতিবেশী। একত্র পড়াশুনা ও খেলাধূলা করিয়া তাহারা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ে ও পরস্পরকে সেঙ্গাত বলিয়া সম্বোধন করিতে থাকে। পল্লী-

বাসিনী মায়েরা যখন গদাধরকে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইতেন নিজেদের ঘরে, কিছু খাওয়াইবেন বলিয়া, সে তখন সেঙ্গাতকে সঙ্গে লইতে ভুলিত না! পরিণত বয়সেও সেঙ্গাতের প্রতি গঙ্গাবিষ্ণুর আনুগত্যের পরিচয় পাওয়া যায়; ৺রঘুবীরের সেবার স্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার জন্য ঠাকুর তাঁহাকে দিয়া ধান্যজমি ক্রয় করাইয়াছিলেন।[১]

অন্য এক বাল্যবন্ধু সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঠাকুর: "দেশে শ্রীরাম মল্লিককে অত ভালবাসতাম; কিন্তু এখানে যখন এল, তখন ছুঁতে পারলাম না। শ্রীরামের সঙ্গে ছেলেবেলায় খুব প্রণয় ছিল—রাতদিন একসঙ্গে থাকতাম। একসঙ্গে শুয়ে থাকতাম, তখন ষোল-সতর বছর বয়স। লোকে বলত, এদের ভিতর একজন মেয়েমানুষ হলে দুজনের বিয়ে হত। তাদের বাড়ীতে দুজনে খেলা করতাম, তখনকার সব কথা মনে পড়চে। তাদের কুটুম্বরা পালকি চড়ে আসত, বেয়ারাগুলো 'হিঙ্গোড়া হিঙ্গোড়া' বলতে থাকত।

"শ্রীরামকে দেখব বলে কতবার লোক পাঠিয়েচি। এখন চানকে দোকান করেচে। সেদিন এসেছিল, দুদিন এখানে [দক্ষিণেশ্বরে] ছিল।"[২]

ঠাকুরের অন্য দুইজন বাল্যসাথীর নাম জানিতে পারা গিয়াছে: এই দুইজন হইলেন কামারপুকুরের গণেশ ঘোষাল ও কুঞ্জবিহারী কর্মকার। বৃদ্ধ গণেশ ঘোষাল মাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করিতে জয়রামবাটী গিয়াছিলেন। মা গলায় আঁচল দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হন, এবং 'আমার মা, আমার মা, এতে অকল্যাণ হয় আমার' বলিয়া বৃদ্ধ তাঁহাকে নিবৃত্ত

---

১ শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে কোথাও গয়াবিষ্ণুকে, কোথাও বা গঙ্গাবিষ্ণুকে গদাধরের সেঙ্গাত বলা হইয়াছে। ইহার ফলে গয়াবিষ্ণু ও গঙ্গাবিষ্ণু অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা নহে। গয়াবিষ্ণু ধর্মদাস লাহার জ্যেষ্ঠপুত্র ও গদাধর অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়, ধর্মদাসের প্রথমা কন্যা প্রসন্নময়ীর পরেই গয়াবিষ্ণুর জন্ম। গঙ্গাবিষ্ণু ধর্মদাসের সহোদর নিধিরামের জ্যেষ্ঠপুত্র ও গদাধরের প্রায় সমবয়সী।

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৩।১৭।২

করেন। কুঞ্জবিহারী কর্মকার বলিয়াছেন: ঠাকুরের সঙ্গে খেলতুম, তাসখেলায় জিতে ঠাকুর আনন্দে উলঙ্গ হয়ে নৃত্য করতেন।[১]

কামারকন্যা ধনী নিঃসন্তান ছিলেন, গদাধরকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন ও মাঝে মাঝে মিষ্টান্ন-মোদকাদি ভোজন করাইতেন, নিজের ঘরে লইয়া গিয়া। তাঁহার বড়ই সাধ ছিল উপনয়নকালে গদাই তাঁহার হাতে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিবে। গদাধরও কথা দিয়াছিল তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিবে। উপনয়নের দিন আসন্ন দেখিয়া অগ্রজের কাছে সে তাহার অঙ্গীকারের কথা প্রকাশ করিল, কিন্তু রামকুমার তাহাতে ঘোরতর আপত্তি করিয়া বসিলেন। ব্রাহ্মণেতর জাতির মেয়ের হাতে ভিক্ষা গ্রহণের রেওয়াজ ছিল না তাঁহাদের বংশে। গদাধর দৃঢ়তার সহিত বলিল যে, সে সত্যভঙ্গ করিতে পারিবে না, তাহাতে তাহার উপনয়ন যদি না হয় তাহাও সে শ্রেয় জ্ঞান করিবে। কিন্তু দাদা তাহার কথায় কান দিলেন না, নিজের যুক্তিতেই অবিচল রহিলেন দেখিয়া সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল এবং সহসা ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা অর্গলবদ্ধ করিল;

> ক্ষুধার সময় যায়, না খুলেন দ্বার।
> নরনারী আসে যত শুনে সমাচার॥
> ... ...
> নাহিক উত্তর, তাঁরে যে যত বুঝায়।
> যেন নাহি যায় কান কাহার কথায়॥

ধর্মদাস লাহা কহিলেন মধ্যস্থের আসনে বসিয়া: ব্রাহ্মণেতর জাতির হাতে ভিক্ষা গ্রহণের রীতি আছে বহু সদ্‌ব্রাহ্মণপরিবারে; সুতরাং ঐরূপ আচরণে দোষ নাই, ইহাতে নিন্দাভাগী হওয়ারও সম্ভাবনা নাই। মীমাংসার একটা সূত্র পাইয়া—

> যবে ভাই রামেশ্বর যাইয়া আপনি।
> বলিলেন ভিক্ষা দিবে ধনী কামারিণী॥
> না হয় হইবে নষ্ট বংশকুলাচার।
> শুনি বাণী তবে মুক্ত করিলেন দ্বার॥

---

১ কুঞ্জবিহারীর মুখে একথা শুনিয়াছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য সৎস্বরূপানন্দ।

অতঃপর নির্বিঘ্নে কর্ম সমাধা হইয়া গেল। ধনীও জীবন ধন্য করিলেন গদাধরের ভিক্ষামাতা হইয়া।

উপনয়নের অনতিকাল পরে, গদাধর তখন দশম বর্ষে পড়িয়াছে, জমিদার লাহাবাবুদের বাড়ীতে এক বড় পণ্ডিতসভা আহূত হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা নানাস্থান হইতে আসিয়াছিলেন, শ্রাদ্ধবাসরে আমন্ত্রিত হইয়া। আলোচনা ও তর্কবিতর্কের ধূম লাগিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ধর্মসংক্রান্ত এক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা কিছুতেই হইয়া উঠিতেছিল না। নিবিষ্টমনে গদাধর সমস্ত আলোচনাটি শুনিয়া যাইতেছিল এক পাশে বসিয়া, সে তাহার পরিচিত কোন পণ্ডিতকে বলিল, কথাটার এভাবে মীমাংসা হয় না কি? সেই পণ্ডিত ঐ মীমাংসার কথা সভাস্থ অপরাপর পণ্ডিতগণকে জানাইলেন, এবং সকলেই স্বীকার করিলেন, উহাই সেই প্রশ্নের একমাত্র মীমাংসা। তারপরে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারা যখন জানিতে পারিলেন যে, এক অল্পবয়স্ক বালকের প্রতিভা ঐ অপূর্ব সমাধানটি দেখিতে পাইয়াছে, তাঁহাদের আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কেহ কেহ তাহাকে দেখিতে লাগিলেন অবাক হইয়া, কেহ বা আশীর্বাদ করিলেন কোলে নিয়া।

শিবরাত্রি উপলক্ষে সীতানাথ পাইনদের বাড়ীতে যাত্রাগান হইবে। শিবমহিমাসূচক পালা, কিন্তু যাত্রার দলে যে শিব সাজিত তাহারই সহসা অসুখ হওয়ায় সমস্ত পণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছে। সকলে পরামর্শ করিয়া গদাধরকেই শিবের ভূমিকায় অভিনয় করিতে বলিল। কেননা, বয়স কম হইলেও তাহার অভিনয়দক্ষতা আছে, এবং শিব সাজিলে সুঠাম সুগৌর শরীরে তাহাকে ভাল মানাইবে। গদাধর সম্মত হইল; সেঙ্গাত গঙ্গাবিষ্ণু দলবল লইয়া শিবের বেশভূষায় তাহাকে সজ্জিত করিল।

শিব সাজিয়া সাজঘরে বসিয়া শিবচিন্তা করিতে করিতে গদাধর পূর্বেই কেমন ভাবাবিষ্ট হইয়াছিল, যখন সহচরচালিত হইয়া ধীর পদক্ষেপে আসরে আসিয়া দাঁড়াইল, "সেই জটাজটিল বিভূতিমণ্ডিত বেশ,...সেই অচল

অটল অবস্থিতি, বিশেষতঃ সেই অপার্থিব অন্তর্মুখী নির্নিমেষ দৃষ্টি ও অধরকোণে ঈষৎ হাস্যরেখা” সাক্ষাৎ ত্রিলোচনকে প্রত্যক্ষ করাইয়া সকলকে আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত করিল। পুরুষেরা হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন, মেয়েরা উলুধ্বনি ও কেহ কেহ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন, আর যাত্রার অধিকারী আরম্ভ করিলেন শিবস্তুতি।

চিনে যারা চিনু-আদি গ্রামবাসিগণ।
তাড়াতাড়ি বিল্বপত্র করিয়া চয়ন॥
চরণে অর্পণ করে মহা অনুরাগে।
মহেশ-সন্তোষ দিব্য নৈবেদ্য-সংযোগে॥
হর হর দিগম্বর স্তুতি মুখে গায়।
ধর ধর মহাভাব আপন ইচ্ছায়॥

শিবরূপী গদাধর একই ভাবে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া; অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল তাহার বক্ষ বাহিয়া।

সেই রাত্রে তাহার বাহ্য সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে নাই। তাহাকে কাঁধে করিয়া বাড়ীতে রাখিয়া আসা হয় ও বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়িয়া যায়।

কামারপুকুরের চিনু (চিনিবাস বা শ্রীনিবাস) শাঁখারী উচ্চকোটির বৈষ্ণব সাধক ছিলেন, গদাধরকে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। বালক গদাধর প্রতিদিনই তাঁহার ঘরে যাইত ও বয়সে অনেক বড় বলিয়া তাঁহাকে দাদা বলিয়া সম্বোধন করিত। দাদা-সম্বোধনে চিনিবাস গলিয়া জল হইতেন।

ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রে চিনিবাসের খুব দখল ছিল। শাস্ত্রীয় বিষয় নিয়া গদাধরের সঙ্গে প্রায়ই তাঁহার তর্কাতর্কি হইত, গদাধর তাঁহার অনেক কথাই উড়াইয়া দিতে চাহিত।

শাস্ত্র লয়ে তর্কদ্বন্দ্ব কভু এতদূর।
সপ্তম ছাড়িয়া রাগ উঠিত চিনুর।
... ...
পুনশ্চ সাক্ষাৎ নহে শপথ করিয়া।
পলাইত নিজ ঘরে দুরু দুরু হিয়া॥

প্রভুর উত্তর-কথা চিনুর মতন।
আমার সংকল্প নহে পুনঃ দরশন॥
হেন বিবাদের মাত্র দণ্ডেকের পর।
উভয়েই মহাখুসি পুনঃ একত্তর॥
... ...
চরিত্রে চিনুর বহে বিদুরের ধারা।
ভক্তিতে বিভোর চিত্ত উন্মাদের পারা॥
বিষয়সম্পত্তিহীন খেটে খেতে হয়।
পোষ্যবর্গ আছে ঘরে একাকী সে নয়॥
সে ভাবনা কখন না উদয় অন্তরে।
মিষ্টান্ন খাওয়ান কিন্তু নিত্য গদাধরে॥

ব্রাহ্মণী 'বৃন্দার মা'ও গদাধরকে খাওয়াইতে বড় ভালবাসিতেন ও হামেশা তাহাকে ঘরে নিমন্ত্রণ করিতেন। গদাধর মহা খুশী হইত তাঁহার হাতের রান্না খাইয়া, এবং আহূত না হইয়াও একএক দিন তাঁহার ঘরে গিয়া হাজির হইত, নিমন্ত্রণ আদায় করিবে বলিয়া।

স্বভাবতই ভাবপ্রবণ মন ছিল গদাধরের। শিবের ভাবাবেশ হওয়ার পর হইতে তাহার ভাবুকতা সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দেবদেবীর ধ্যান করিতে বসিয়া বা দেবদেবীর মহিমাসূচক সঙ্গীতাদি শুনিয়া তাঁহাদের ভাবে সে তন্ময় হইয়া যাইত, আর সেই তন্ময়তা প্রগাঢ় হইলেই কিছুক্ষণের জন্য তাহার বাহ্য সংজ্ঞা লোপ পাইত। বারবার ঐরূপ হইয়া ভাবসমাধি ক্রমে তাহার অভ্যস্ত ও প্রায় ইচ্ছাধীন হইয়া গিয়াছিল। এই সমাধির প্রভাবেই তাহার দেবদেবীবিষয়ক নানা তত্ত্ব অধিগত এবং সূক্ষ্ম বিষয়সমূহে দৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছিল।

প্রথম প্রথম তাহার ভাবসমাধি হইতে দেখিলে চন্দ্রাদেবী ও পরিবারস্থ অন্যান্য সকলে খুবই ভীত হইতেন; কিন্তু এই অবস্থার পরেও তাহার স্বাস্থ্যহানি না হইতে দেখিয়া, তাহাকে সদানন্দে বিচরণ করিতে দেখিয়া, এবং সকল কাজে তাহাকে পূর্ববৎ নিযুক্ত থাকিতে দেখিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

দেখিতে দেখিতে গদাধর দ্বাদশ বর্ষে উপনীত হইল। মেজ ভাই রামেশ্বরের ও কনিষ্ঠা ভগিনী সর্বমঙ্গলার তখন বিবাহযোগ্য বয়স হইয়াছিল; রামকুমার তাহাদের বিবাহের জন্ম উদ্যোগী হইলেন, এবং নিকটবর্তী গৌরহাটি গ্রামের শ্রীরামসদয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্বীয় ভগিনী সম্প্রদান করিয়া রামসদয়ের ভগিনী শাকম্ভরীকে ভ্রাতৃবধূরূপে স্বগৃহে আনয়ন করিলেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে ও শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি কর্মে রামকুমারের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। গুরুর নিকট হইতে তিনি শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইষ্টদেবী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইয়া তাঁহার জিহ্বাগ্রে একটি মন্ত্রবর্ণ অঙ্গুলিদ্বারা লিখিয়া দিয়াছিলেন। ইহার প্রভাবে তিনি ইচ্ছা করিলে কখন বা কী অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু হইবে জানিতে পারিতেন। স্ত্রীর ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, গর্ভধারণ করিলেই তাহার মৃত্যু হইবে। সেই কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। যৌবনাবসানেও গর্ভধারণ না করায় সকলেই যাহাকে বন্ধ্যা মনে করিয়াছিল তিনিই এখন গর্ভবতী হইয়া পরিবারবর্গের দুশ্চিন্তার কারণ হইলেন, এবং ১২৫৫ সালের কোন সময়ে এক রূপবান পুত্র প্রসব করিয়া সূতিকাগৃহেই স্বর্গারোহণ করিলেন।

রামকুমারপত্নী ভাগ্যবতী ছিলেন। তাঁহার কামারপুকুরে আগমনের পর হইতেই আয় বাড়িয়া সংসারের অবস্থা সচ্ছল হইয়াছিল এবং প্রায় ঊনত্রিশ বছর ধরিয়া তাহা অব্যাহত ছিল। তাঁহার গর্ভধারণের কাল হইতে রামকুমারের ভাগ্যবিপর্যয় দেখা দেয়; তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় ও অর্থাগম কমিয়া যাইতে আরম্ভ করে। মেজভাই কৃতবিদ্য হইলেও রামেশ্বর উপার্জনক্ষম হইতে পারেন নাই। আয় কমিয়া ও ব্যয় বাড়িয়া রামকুমার দিনদিন ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে থাকেন। অনেক চিন্তার পর ও বন্ধুগণের পরামর্শে, অবশেষে তিনি বিদেশে গিয়া অর্থার্জনের চেষ্টা করিতে সংকল্পবদ্ধ হন, এবং কলিকাতায় আসিয়া ঝামাপুকুর পল্লীতে টোল খুলিয়া অধ্যাপনাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন।

এই সময় হইতে ৺রঘুবীরের সেবা, রামকুমারের শিশুপুত্র অক্ষয়ের লালনপালন ও রন্ধনাদি সমুদয় গৃহকর্মের দায়িত্ব আসিয়া পড়িল চন্দ্রাদেবীর উপর, তাঁহার বুড়োবয়সে। রামেশ্বরের পত্নী তখন নিতান্ত বালিকা। চন্দ্রা যখন রন্ধনাদি কার্যে অতিব্যস্ত থাকিতেন, গদাধর তখন শিশু ভাইপোর যত্ন লইত বাড়ীতে থাকিয়া। সংসারী হইলেও রামেশ্বর সঞ্চয়ী হইতে পারেন নাই কোন দিনই। পরিব্রাজক সাধু ও সাধকগণকে দেখিতে পাইলে তাঁহাদের সঙ্গে তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন, তাঁহাদের কোন বস্তুর অভাব দেখিলে তাহা দূর করিতে গিয়া অতিরিক্ত ব্যয় করিয়াও বসিতেন। অনেক সময় আয়ের অধিক ব্যয় করিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন, রঘুবীর কোনরূপে চালাইয়া নিবেন ভাবিয়া।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, কিন্তু তাহার শিক্ষাদি অগ্রসর হইতেছে কি-না সেই বিষয়ে লক্ষ্য করিতেন না মোটেই। অল্প বয়সেই বালকের ধর্মপ্রবৃত্তির অদ্ভুত পরিণতি দেখিয়া তাঁহার প্রতীতি হইয়াছিল যে, তাহার উন্নত প্রকৃতি কখনও তাহাকে বিপথে পরিচালিত করিবে না। পল্লীর আবালবৃদ্ধ নরনারী তাহাকে পরম আত্মীয়বোধে ভালবাসে ও বিশ্বাস করে দেখিয়া তাঁহার সে ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। সুতরাং চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়া গদাধর একপ্রকার অভিভাবকশূন্য হইয়া পড়িল।

তথাপি তাহার পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ হয় নাই। বয়স্যদের প্রতি প্রীতিবশতঃ রোজই সে একবার পাঠশালায় যাইত, যদিও প্রচলিত বিদ্যাভ্যাসে তাহার উদাসীনতা দিনদিনই বৃদ্ধি পাইতেছিল। ঐ অপরাবিদ্যা যে পরাবিদ্যালাভে তেমন সাহায্য করে না, তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে এই বয়সেই সে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল। উপাধিধারী তথাকথিত পণ্ডিতদের ভোগ্যবস্তু-লাভের দিকেই কেবল নজর দেখিয়া তাহার ঐ প্রত্যয় দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল; পিতার চরিত্রের সহিত তুলনা করিয়া সহজেই সে তাঁহাদের যাবতীয় প্রয়াসের অকিঞ্চিৎকরতা দেখিতে পাইয়াছিল।

যাহা হউক, এই বয়সে সে মাতৃভাষায় লেখা মুদ্রিত গ্রন্থসমূহ পড়িতে ও উহাদের প্রতিলিপি করিতে বিশেষ পটু হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার স্বহস্তলিখিত রামকৃষ্ণায়নপুঁথি, যোগাদ্যার পালা, সুবাহুর পালা প্রভৃতি কামারপুকুরের বাড়ীতে সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিকার লিখিয়াছেন :

এক পুঁথি লেখা তাঁর দীর্ঘাক্ষরে চমৎকার
দেখিয়াছি আপন নয়নে।
সুবাহুর পালা সেটি, লেখা অতি পরিপাটি,
হেলায় পড়িবে অন্ধজনে ॥
সাঙ্গ দিন নিরূপণ, বারশ ছাপ্পান্ন সন,
ঊনবিংশ আষাঢ় মাহায।
প্রার্থনা করিয়া রামে রাখিতে তাঁরে কল্যাণে,
শ্রীপ্রভুর স্বাক্ষর তাহায় ॥

গদাধরের আর দুইটি প্রিয় শিক্ষণীয় বিষয় ছিল চিত্রকলা ও মূর্তিশিল্প। চিত্রকলা-শিক্ষা তাহার বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই, সম্ভবতঃ সময় ও সুযোগের অভাবে। গৌরহাটি গ্রামে গিয়া একদিন সে দেখিয়াছিল তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী সর্বমঙ্গলা প্রসন্নমুখে নিজের স্বামীর সেবা করিতেছে। দৃশ্যটি তাহার হৃদয়গ্রাহী হয় ও বাড়ীতে ফিরিয়া সে স্বামিসেবারতা স্বীয় ভগিনীর একখানি ছবি আঁকে। সেই ছবিতে সর্বমঙ্গলা ও তাহার স্বামীর চেহারার সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাইয়া পরিবারস্থ লোকেরা বিস্মিত হইয়াছিলেন।

দেবদেবীর মূর্তি-নির্মাণে কিন্তু সে বিশেষ নিপুণ হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সকল মূর্তি নির্মাণ করিবার পর সে যথাবিধি অর্চনাও করিত বয়স্যগণকে সাথে নিয়া। বয়স্যরা তাহার কথামত পত্রপুষ্পাদি পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিত।

ক্রীড়াকৌতুকে, আবৃত্তি-অভিনয়ে ও মধুবর্ষী সঙ্গীতে কামারপুকুর-বাসীদের প্রায় সকলেরই মনোহরণ করিয়া, তাহাদিগকে ভালবাসিয়া ও

তাহাদের ভালবাসা ও বিশ্বাসের কাছে নিজেকে অল্পবিস্তর ধরা দিয়া গদাধর তাহার কৈশোর সফল করিতেছিল ; এবং সকলের অলক্ষ্যে, হয়তো বা তাহার নিজেরও অলক্ষ্যে, এক অনশ্বর প্রেমের হাট পত্তন করিতেছিল যে হাটে সে নিজেকেই বিকাইতে থাকিবে প্রেমিক প্রিয়জনের কাছে, চিরদিন ধরিয়া।

কমবেশী সকলের সঙ্গে ভালবাসা।
সঙ্গ-সহবাসে কারো না মিটে পিপাসা॥
ল'য়ে আসা ভালবাসা অপার অতুল।
যাহে গড়িলেন লীলাখেলার দেউল॥
গুণনিধি, সর্বগুণ তাঁহাতে বিরাজে।
কেহ বা এগুণে কেহ অন্যগুণে মজে॥

ঐ সময়ে গ্রামে তিনদল যাত্রা, একদল বাউল ও দুইএক দল কবি ছিল। বৈষ্ণবপ্রধান স্থান, সন্ধ্যাসমাগমে কাহারও কাহারও ঘরে ভাগবত পাঠ ও সংকীর্তন হইত। গদাধর সকল দলের পালা, গান, সংকীর্তন আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে। গৃহকাজ সারিয়া পাড়ার মেয়েরা বেলা তৃতীয় প্রহরে চাটুজ্যে বাড়ীতে আসিয়া মিলিত হইতেন ও গদাধরকে পুরাণকথা পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন, গদাধর পাঠ করিয়া শুনাইত ; অধিকন্তু কোনদিন যাত্রা, কোনদিন বাউল গান, কোনদিন কবিগান, কোনদিন বা সংকীর্তন করিয়া তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিত। নিজের জননী বা অপর কাহারও বিরসমুখ দেখিলে সে যাত্রার সঙের পালা বা সকলের পরিচিত ব্যক্তিবিশেষের উদ্ভট চরিত্র এমন নিখুঁত অভিনয় করিত যে, হাস্যরোলে বাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিত।

সন্ধ্যাকালে গ্রামের পুরুষেরা যেসব স্থানে মিলিত হইয়া পাঠ-কীর্তনাদি করিতেন উহাদের সকলগুলিতেই গদাধরের যাতায়াত ছিল ; আর যেদিন যেখানে গিয়া সে হাজির হইত সেখানে সেদিন আনন্দের বন্যা বহিয়া যাইত। তাহার মত পাঠ ও ধর্মতত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা অন্য কেহই করিতে পারিত না ; সংকীর্তনে তাহার মত ভাবোন্মত্ততা, আখর দিবার শক্তি, মধুর

কণ্ঠ ও রমণীয় নৃত্য অন্য কাহারও ছিল না; রঙ্গপরিহাসস্থলে তাহার মত সঙ্ দিতে ও নরনারীর সকলপ্রকার আচরণ অনুকরণ করিতে অন্য কেহই সক্ষম ছিল না। যুবক ও বৃদ্ধেরা সকলেই তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন ও সন্ধ্যাসমাগমে সাগ্রহে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেন।

ভক্তিমতী মেয়েদের মনেই গদাধর সমধিক প্রভাব বিস্তার করিযাছিল। তাহার জন্মপূর্ব বিবরণ—পিতার স্বপ্ন ও মাতার দিব্যদর্শন-কথা—তাঁহারা শুনিয়াছিলেন; তাহার ঈশ্বরীয় ভাবাবেশ স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহার অতুলন দেবভক্তি, তন্ময় হইয়া পুরাণ পাঠ, অনিন্দ্যকণ্ঠের সঙ্গীত ও তাহাদের প্রতি আত্মীয়বৎ আচরণ তাঁহাদের কোমল হৃদয়ে অপূর্ব ভক্তিভালবাসা উদ্রিক্ত করিয়াছিল। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-জ্ঞানে, প্রসন্নময়ী-প্রমুখ বর্ষীয়সী মহিলারা তাহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন, অল্পবয়স্কারা সখ্যভাবে তাহার সহিত সম্বদ্ধা হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবকুলে ইহারা জন্মিয়াছিলেন, "সরল কবিতাময় বিশ্বাসই" ছিল তাহাদের ধর্মজীবনের প্রধান উপজীব্য। নির্ভর বিশ্বাসে গদাধরের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারা অসঙ্কোচে মনের কথা খুলিয়া বলিতেন ও অনেক বিষয়ে তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া চলিতেন। গদাধরও এমন ভাবে তাহাদের সহিত মিলিত হইত যে অনেক সময়ে তাহাকে পুরুষ বলিয়াই তাহাদের মনে হইত না।

গদাধর-চরিত্রে পুরুষ ও প্রকৃতি-ভাবের সম্মিলন ছিল। প্রকৃতি-ভাবের প্রেরণায় ঐ সময়ে এইপ্রকার এক বাসনার উদয় হইত তাহার মনে: যদি আবার তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় তো ব্রাহ্মণের ঘরের পরমাসুন্দরী দীর্ঘকেশী বালবিধবা সে হইবে ও শ্রীকৃষ্ণকে তাহার পতি বলিয়া জানিবে, মোটা ভাতকাপড়ের সংস্থান থাকিবে; কুঁড়েঘরের পাশে দুইএক কাঠা জমিও থাকিবে, যাহাতে নিজের হাতে কয়েকপ্রকার শাকসবজি সে করিতে পারে; একজন বৃদ্ধা অভিভাবিকা, একটি গাভী ও একখানি চরকা থাকিবে; গাভীটিকে সে নিজে দোহন করিবে, দিনের কাজ সারিয়া চরকা নিয়া বসিবে ও শ্রীকৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে চরকায় সূতা কাটিবে, আর সন্ধ্যার পর গাভীর দুগ্ধে প্রস্তুত মোদকাদি নিয়া শ্রীকৃষ্ণকে

খাওয়াইবার জন্য গোপনে ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে থাকিবে; শ্রীকৃষ্ণ সহসা তাহার কুটিরে আগমন করিবেন এবং প্রতিদিন গমনাগমন করিতে থাকিবেন, অন্যের অগোচরে!

গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ সীতানাথ পাইনের বাড়ী ছিল কামারপুকুরের বেনেপাড়ায়, খুদিরামের বাড়ীর সন্নিকটে। সীতানাথের ছিল সাত পুত্র ও আট কন্যা। কন্যারা পিতৃগৃহেই বাস করিতেছিল, তাহাদের বিবাহ হইয়া যাইবার পরেও। সেই সময়ের কথা তাহাদের অন্যতমা শ্রীমতী রুক্মিণী বলিয়াছিলেন—তাঁহার বয়স তখন ষাট বৎসর হইবে—শ্রীসারদানন্দ-প্রমুখ ঠাকুরের শিষ্যদের কাছে, কামারপুকুরে: আমাদের বাড়ী এখান থেকে একটু উত্তরে, ঐ দেখা যাচ্চে। এখন আমাদের বাড়ীর ভাঙ্গা দশা, লোকজন নাই বল্লেই হয়। কিন্তু আমার যখন সতর-আটার বছর বয়স তখন বাড়ীটি দেখলে লক্ষ্মীমন্তের বাড়ী বলেই মনে হত। খুড়তুতো, জাঠতুতো সব বোনে মিলে আমরা সতর-আঠারটি ছিলুম, বয়সে দু'পাঁচ বছরের ছোটবড় হলেও সবাই যৌবনে পড়েছিলুম। গদাধর শিশুকাল থেকেই আমাদের সঙ্গে খেলাধূলা কত্তেন, সেজন্যে আমাদের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। আমরা যৌবনে পড়লেও তিনি আমাদের বাড়ী আসতেন; তিনি নিজে বড় হবার পরেও আমাদের বাড়ীর অন্দরে যাওয়া আসা কত্তেন। বাবা তাঁকে বড় ভালবাসতেন; আপন ইষ্টের মত দেখতেন, ভক্তি কত্তেন। পাড়ার কেউ কেউ বাবাকে বলত, তোমার বাড়ীতে অতগুলি যুবতী মেয়ে রয়েচে, গদাধরও এখন বড় হয়েচে, তাকে এখনো অত বাড়ীর ভিতরে যেতে দাও কেন? বাবা বলতেন, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, আমি গদাধরকে খুব চিনি। তারা সাহস করে আর কিছু বলতে পাত্ত না! বাড়ীর অন্দরে এসে গদাধর আমাদিকে কত পুরাণকথা শোনাতেন, কত রঙ্গরস কত্তেন! তিনি যখন আমাদের কাছে থাকতেন তখন কত আনন্দে যে সময় কাটত তা একমুখে কী আর বলব! যেদিন তিনি না আসতেন সেদিন তাঁর অসুখ হয়েচে ভেবে আমাদের মন ছটফট কত্ত। সেদিন যতক্ষণ না আমাদের একজন জল আনার বা আর কোনো

কাজের অছিলায় গিয়ে বামুনমার সাথে দেখা করে তার খবর নিয়ে আসত ততক্ষণ কারু মনে সোয়াস্তি থাকত না। তাঁর প্রত্যেকটি কথা আমাদের অমৃতের মত বোধ হত। যেদিন তিনি আমাদের বাড়ী না আসতেন সেদিন তাঁর কথা নিয়েই আমরা দিন কাটাতুম।

সীতানাথ পাইনের ভবনে বেনেপাড়ার অন্যান্য পরিবারের মেয়েরাও আসিতেন গদাধরের পুরাণপাঠাদি শুনিবার জন্য, কিন্তু সীতানাথের খুড়তুতো ভাই দুর্গাদাসের বাড়ীর মেয়েরা আসিতে পাইতেন না। কঠোর অবরোধপ্রথা ছিল সেই পরিবারে। দুর্গাদাস অহঙ্কার করিয়া বলিতেন, তাঁহার বাড়ীর মেয়েদের মুখ কখনও কোন বাহিরের লোকই দেখিতে পায় নাই। তাঁহার মুখে একদিন ঐ অহঙ্কারের কথা শুনিয়া গদাধর বলিয়াছিল: সৎশিক্ষা ধর্মশিক্ষা না দিয়ে, কেবল বাড়ীতে আটকে রেখেই কি মেয়েদের রক্ষা করা যায়? ইচ্ছা করলে আমি তোমার অন্দরের সবাইকে দেখতে ও সব কথা জানতে পারি। 'কেমন জানতে পার, জান দেখি?' দুর্গাদাস অধিকতর অহঙ্কারের সহিত কহিলেন। 'আচ্ছা দেখা যাবে' বলিয়া গদাধরও চলিয়া গেল।

ইহার কয়েকদিন পরে, পরিধানে মোটা মলিন শাড়ি ও হাতে রূপার পৈঁছা, এক তাঁতি-বৌ বগলে চুবড়ি নিয়া ও ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া সন্ধ্যার মুখে হাটের দিক হইতে দুর্গাদাসের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। দুর্গাদাস তখন বন্ধুদের সহিত বৈঠকখানায় বসিয়া ছিলেন, একরাত্রির জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া সে কহিল যে, সঙ্গিনীরা ফেলিয়া যাওয়ায় সে বিপন্না হইয়াছে, গ্রামান্তর হইতে হাটে সূতা বেচিতে সে আসিয়াছিল। কোন্ গ্রামে তাহার নিবাস, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া দুর্গাদাস তাহাকে ভিতরে গিয়া মেয়েদের কাছে আশ্রয় নিতে বলিলেন; তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাঁতি-বৌও অন্দরে প্রবেশ করিল। তাহার অল্পবয়স দেখিয়া ও মুখের মিষ্টকথা শুনিয়া অন্তঃপুরবাসিনীরা আকৃষ্ট হইলেন ও বিশ্রামের স্থান দেখাইয়া দিয়া কিছু মুড়িমুড়কি তাহাকে খাইতে দিলেন। খাইতে খাইতে সে অন্দরের সকল ঘর ও প্রত্যেক রমণীকে তন্ন তন্ন করিয়া

লক্ষ্য করিতে ও তাঁহাদের সকল কথাবার্তা শুনিতে লাগিল। মাঝে মাঝে তাঁহাদের কথায় যোগদান করিয়া নানা প্রশ্ন করিতেও সে ভুলিল না। এইরূপে রাত্রি প্রায় এক প্রহর গত হইল।

এত রাত্রেও গদাধর বাড়ী ফিরিল না দেখিয়া রামেশ্বর তাহার খোঁজে বাহির হইলেন এবং বেনেপাড়ায় আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। 'দাদা, যাচ্ছি গো!' বলিয়া দুর্গাদাসের অন্তঃপুর হইতে সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া আসিল। প্রতারিত হইয়াছেন বুঝিয়া দুর্গাদাস অপ্রতিভ ও কিছুটা রুষ্ট হইলেও, তাহার তাঁতি-বৌয়ের সাজ ও চালচলন কতদূর স্বাভাবিক হইয়াছে ভাবিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে জানিয়া সীতানাথ-প্রমুখ তাঁহার আত্মীয়েরা আনন্দিত হইলেন। এখন হইতে গদাধরের পাঠাদি শুনিতে দুর্গাদাসের বাড়ীর মেয়েরাও আসিতে আরম্ভ করিলেন।

সীতানাথের পরিবারবর্গের তো কথাই নাই, বেনেপাড়ার অন্যান্য মেয়েরাও গদাধরের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সীতানাথ-ভবনে পাঠ-কীর্তন-অভিনয় করিতে করিতে গদাধর কখন কখন ভাবে স্থির হইয়া যাইত ও এক দিব্য হাসিতে তাহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত; সেই ভাবসমাধির অবস্থায় অনেকে তাহাকে পূজাও করিয়াছেন ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীকৃষ্ণের জীবন্ত বিগ্রহ মনে করিয়া। অভিনয়কালে তাহার শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকাটি মনের মত করিবার জন্য তাঁহারা একটি সোনার বাঁশী গড়াইয়া দিয়াছিলেন নিজেদের অলঙ্কার ভাঙ্গাইয়া; শ্রীরাধার ও বৃন্দাদূতীর ভূমিকার উপযোগী পরিচ্ছদাদিও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

> আকারেতে গদাধর বালকের সাজ।
> নানা রঙ্গরস জ্ঞাত যেন রসরাজ॥
> স্ত্রীলোকের যত খেলা জানিতেন তিনি।
> ঘুলিম খেলার সঙ্গী গুসি নাপিতিনী॥

... ...

কভু বকুলের ফুলে আভরণ গাঁথি।
দুহাতে পুঁইছা বাজু, শিরে ধরা সিঁথি॥
পরিধান পাছাপেড়ে বসন সুন্দর।
কাঁখেতে কলসী, গতি বেনেদের ঘর॥
দরজায় নারীগণে ডাকিতেন এঁটে।
আয় কে লো যাবি জলে, সূর্য যায় পাটে॥
নারীগণ ফুল্লমন দেখি গদাধর।
একে একে কুড়ি দরে হয় একত্তর॥
যে জনার প্রয়োজন কিছু নাই জলে।
সেও কাঁখে কুম্ভ করি এসে মিশে দলে॥
... ...
এরূপ খেলেন প্রতিবাসিনীর সনে।
ব্রজভাবোদয় হয় বাল্যলীলা শুনে॥

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়াই যেন গদাধরের ভাবুকতা বাড়িয়া চলিয়াছিল এবং অর্থকরী শিক্ষা চালাইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। বয়স্যদের প্রতি প্রীতি-বশে, কেবলমাত্র তাহাদের সহিত মিলিত হওয়ার বাসনাতেই, দিনে একবার করিয়া সে পাঠশালায় যাইত। এক অনতিপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাহাও বন্ধ হইয়া গেল।

গদাধরের অভিনয় করিবার শক্তি দেখিয়া তাহার বয়স্যরা একটি যাত্রার দল খুলিতে অভিলাষী হইল ও তাহাদিগকে শিক্ষাদানের ভার লইতে গদাধরকে অনুরোধ করিয়া বসিল। গদাধর সম্মত হইল। সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, পাঠশালা হইতে পলায়ন করিয়া প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে তাহারা প্রান্তরে অবস্থিত মাণিকরাজার আমবাগানে গিয়া মিলিত হইবে।

সংকল্প শীঘ্রই কার্যে পরিণত হইল এবং গদাধরের শিক্ষাদানগুণে স্বল্পকালের মধ্যেই নিজ নিজ ভূমিকা আয়ত্ত করিয়া বালকেরা 'রামায়ণ' ও 'কালীয়দমন' যাত্রাভিনয়ে নির্জন আম্রকানন মুখরিত করিয়া তুলিল।[১]

১ পশ্চিম বাঙ্গলায় পল্লীগ্রামের লোকেরা রামলীলাশ্রিত যাত্রাসমূহকে 'রামায়ণ' ও কৃষ্ণলীলাশ্রিত যাত্রাসমূহকে 'কালীয়দমন' নামে অভিহিত করিত।

গ্রামান্তরগামী পথিকেরা তরুণ অভিনেতাদের কণ্ঠস্বরে ও সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইতে ও কিছুক্ষণের জন্য পথ-চলা ভুলিয়া যাইতে লাগিল। সীতা-রাধাদি প্রধান প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় গদাধরের দিব্য ভাবাবেশ দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া শূন্যপথে যাতায়াতকারী দেবতারাও পথ-চলা ভুলিয়া যাইতেছিলেন কি-না, কে বলিবে!

মানবাকারে মূর্ত হইয়া যে এক অমানব প্রেম উহার অন্তর্নিহিত শক্তির বলেই স্বয়ং বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল অভিনয়াদি আশ্রয় করিয়া, অভিনয় করিতে করিতেই যেন তাহা পূর্ণ পরিণতির অভিমুখে দ্রুত একটি সোপান অতিক্রম করিল। গদাধর যৌবনে পদার্পণ করিলেন।

যৌবনারম্ভে

যৌবনে পদার্পণ করিবার পর হইতেই, একটা আসন্ন পরিবর্তনের মুখে আসিয়া, গদাধর পূর্বাপেক্ষা গম্ভীর ও নির্জনতাপ্রিয় হইয়া উঠিলেন।

এখন শ্রীপ্রভুদেব না বলিয়া কারে।
থাকিতেন দুইচারি দিন স্থানান্তরে ॥
কোথায় গমন কিবা স্থান কোন্খানে।
সে তত্ত্ব সুগুপ্ত কেহ কিছু নাহি জানে ॥
লুপ্ত পূর্বকার ভাব, নাহিক উল্লাস।
চিন্তাতুর মুখভাব উদাস উদাস ॥
... ...
সব তত্ত্ব সুবিদিত ছিল চিনিবাস।
বলিতেন প্রভুদেবে করিয়া সম্ভাষ ॥
বুঝেছি বুঝেছি তত্ত্ব ওরে গদাধর।
এবার উঠেছে তোর ভিতরেতে ঝড় ॥
যাবি চলে, লীলাস্থলে না রহিবি আর।
তাই কর খেলা ছেড়ে বৈরাগ্য-বিচার ॥

দুইচারি দিন তিনি কোথায় কিভাবে অজ্ঞাতবাস করিতেন? কোনও দূরবর্তী স্থানের শ্মশানে সাধনায় নিমগ্ন থাকিয়া কি? আবাল্য তিনি কখন কখন মনুষ্যজীবনের শেষগতি শ্মশানক্ষেত্রে গতায়াত করিতেন নির্ভয়ে, কিন্তু সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম ও কুলদেবতা ৺রঘুবীরের পূজা ব্যতীত অপর কোন সাধনা করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। অথবা আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কাহারও ঘরে গিয়াও তিনি কয়েকদিন কাটাইয়া থাকিতে পারেন, বিশেষতঃ শিহড় গ্রামে তাঁহার দিদি শ্রীমতী হেমাঙ্গিনীর বাড়ীতে। শিহড়ে তিনি মনের আনন্দে থাকিতেন। হেমাঙ্গিনীর চারিপুত্র—রাঘব, রামরতন, হৃদয়রাম ও রাজারাম; হৃদয়রাম তাঁহার প্রায় সমবয়সী কনিষ্ঠ মাতুলকে অত্যন্ত ভালবাসিত।

ভাবী জীবনের একটা ছায়া যে তাঁহার বিশুদ্ধ মনে আপতিত হইবে ইহা অসম্ভাবিত নহে। এখন হইতে তিনি যেন অনুভব করিতেছিলেন,

বিশেষ একটি কার্য করিবার জন্যই তিনি সংসারে আগমন করিয়াছেন—তাহাকে ধর্মসাক্ষাৎকার করিতে হইবে সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া। এই কথা মনে হইবামাত্র তাঁহার বিচারশীল বুদ্ধি তাঁহাকে সংসার-ত্যাগ করিতে বলিত, তাঁহার কল্পনার পটে ভাসিয়া উঠিত "গৈরিক বসন, পবিত্র অগ্নি, ভিক্ষা-লব্ধ ভোজন এবং নিঃসঙ্গ বিচরণের ছবি।" পরক্ষণেই তাঁহার প্রেমপূর্ণ হৃদয় মা-ভাইদের সাংসারিক অবস্থা স্মরণ করাইয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসের অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে, এবং পিতার ন্যায় ঈশ্বরে নির্ভরশীল হইয়া সংসারে থাকিয়াই তাঁহাদিগকে যথাশক্তি সাহায্য করিতে, উত্তেজিত করিত। আবার গ্রামবাসী নরনারীগণের অকপট স্নেহপ্রীতি ও তাঁহার প্রতি অসীম বিশ্বাসের কথা স্মরণ করাইয়া হৃদয় তাঁহাকে এমনভাবে নিজজীবন নিয়োজিত করিতে বলিত যাহা দেখিয়া তাহারা নিজেদের জীবন পরিচালিত করিবার উচ্চাদর্শ লাভ করিবে, যাহাতে তাহাদের সহিত তাঁহার বর্তমান সম্বন্ধ পারমার্থিক সম্বন্ধে পরিণত হইয়া অবিনশ্বর হইবে। তাঁহার স্বার্থগন্ধহীন হৃদয় এই বিষয়ের স্পষ্ট আভাস দিয়াই বলিতেছিল: "আপনার জন্য সংসার ত্যাগ করা—সে তো স্বার্থপরতা, যাহাতে ইহারা সকলে উপকৃত হয় এমন কিছু কর।"

বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস বন্ধ করিয়া দিলেও গদাধর অন্যান্য সকল কর্ম—পুরাণপাঠ, কীর্তন, যাত্রাগান, প্রতিমাগঠন ইত্যাদি—পূর্ববৎ করিয়া যাইতেছিলেন। মাতৃহীন শিশু অক্ষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ—তাহাকে কোলে করা ও খেলা দিয়া ভুলাইয়া রাখা—তাঁহার অন্যতম নিত্যকর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মা-ভাইদের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য রামকুমার বৎসরান্তে একবার বাড়ী আসিতেন। তিন বৎসরের পরিশ্রমে তাঁহার কলিকাতাস্থ চতুষ্পাঠীতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাঁহার আয়ের পথও কিছুটা সুগম হইয়াছিল। গদাধরের বিদ্যার্জনে উদাসীনতা দেখিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন, এবং মা ও মেজভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবেন স্থির করিলেন। ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধিতে গৃহকর্ম অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল, গদাধর কলিকাতায় থাকি

জীর দোকানে

এই ঘটনার পরবর্তী দুই বৎসরে রামকুমারের আর্থিক অবস্থার ক্রমাবনতি হইতেছিল; কিছুতেই ইহা প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া তিনি কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হইয়াছিলেন, ঋণগ্রস্ত হওয়ার ভয়ে। তথাপি উপায়ান্তর খুঁজিয়া না পাইয়া—সাধুপ্রকৃতি রামকুমার বৈষয়িক ব্যাপারে তেমন উদ্যমী পুরুষ ছিলেন না—তিনি এতকাল যাহা করিয়া আসিয়াছেন, ভগ্নহৃদয়ে তাহাই করিয়া যাইতেছিলেন। এইরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে এক অভাবিত ঘটনা পথ দেখাইয়া অনতিকালমধ্যে তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করিয়াছিল।

এই দুই বৎসরের মধ্যে কোনও সময়ে গদাধর যে একবার আঁটপুরে গিয়াছিলেন, নিম্নোক্ত বিবরণ হইতে তাহা জানা যায়। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীবাবুরাম (প্রেমানন্দ) যেদিন তাঁহাকে প্রথম দর্শন করেন দক্ষিণেশ্বরে, সেইদিন তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে এইরূপ কথাবার্তা হয়ঃ

'তোমাদের বাড়ী কোথায়?'

'আজ্ঞে, তড়া-আঁটপুর।'

'বটে? তবে তো তোমাদের দেশেও একবার গেছি। ঝামাপুকুরের কালী-ভুলুর বাড়ীও সেইখানে না?'

'হ্যাঁ। আপনি তাঁদের কেমন করে জানলেন?'

'তারা যে রামপ্রসাদ মিত্রের ছেলে। যখন ঝামাপুকুরে ছিলুম তখন দিগম্বর মিত্রের বাড়ী আর ওদের বাড়ী যখন তখন যেতুম।'

খুব সম্ভবতঃ ১২৬১ সালের দুর্গাপূজায় নিমন্ত্রিত হইয়া গদাধর আঁটপুরে গিয়াছিলেন। মিত্র-বংশে মা-দশভুজার পূজা যে এককালে আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইত, কাষ্ঠনির্মিত প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপের খোদাইয়ের কাজ দেখিয়া আজও তাহা বোঝা যায়। আঁটপুর হইতে তিনি কামারপুকুরেও গিয়াছিলেন ইহাও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। আঁটপুর হইতে কামারপুকুরের দূরত্ব আট ক্রোশের অধিক নহে। কামারপুকুর হইতে তিনি শিহড়ে তাঁহার দিদির বাড়ীতেও গিয়াছিলেন।[১]

---

১ ঝামাপুকুরে থাকিতে গদাধর একবারও তাঁহার জননীকে দেখিতে যান নাই বা জননী তাঁহাকে দেখিতে ব্যাকুলা হন নাই, ইহা ভাবিতে পারা যায় না।

ঝামাপুকুরে গদাধর কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর ছিলেন। ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার স্নানযাত্রার দিন কলিকাতা জানবাজারের সুবিখ্যাতা রাণী রাসমণি গঙ্গার উপরে, পূর্বকূলে, চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত দক্ষিণেশ্বর গ্রামে কালীবাটী প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরে 'শ্রীশ্রীভবতারিণী'র প্রতিষ্ঠা-পূজা করিবার জন্য রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন পৌরোহিত্যকর্মে বৃত হইয়া; এবং প্রতিষ্ঠাকার্য হইয়া যাইবার পরেও, দেবীর নিত্যপূজা করিবার উপযুক্ত সদ্‌ব্রাহ্মণের অভাব হওয়ায় ভক্তিমতী রাণী ও তাঁহার ভক্তিমান কনিষ্ঠ জামাতা মথুরামোহনের ঐকান্তিক অনুরোধে দক্ষিণেশ্বরেই থাকিয়া যান, ঐ কাজের ভার লইয়া। ঝামাপুকুরের টোল উঠিয়া যায়, গদাধরকে ঝামাপুকুর হইতে চলিয়া আসিতে হয় দক্ষিণেশ্বরে।

অশূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ-কুলের সন্তান হইয়াও রামকুমার কৈবর্তকুলোদ্ভবা রাণীর দেবালয়ে পূজকের পদ গ্রহণ করিতে গেলেন কেন, সে এক বিচিত্র কাহিনী। অন্নদানাদি বহু সৎকার্য ও ওজস্বিতার জন্য বিশ্রুতকীর্তি রাণী মা-কালীর উপাসিকা ছিলেন; সকল কাজেই তাঁহার হৃদ্‌গত দেবীভক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। জমিদারি সেরেস্তার কাগজপত্র নামাঙ্কিত করিবার জন্য যে শীলমোহর তিনি করাইয়াছিলেন তাহাতে ক্ষোদিত ছিল—কালীপদ-অভিলাষী শ্রীমতী রাসমণি দাসী। তাঁহার সংকল্প ছিল একবার ৺কাশীধামে গিয়া শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণামাতাকে বিশেষভাবে পূজা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথির মতে, দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরপ্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই তিনি কামারপুকুরে ও শিহড়ে গিয়াছিলেন। কিন্তু মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিন হইতেই ঘটনা-প্রবাহ দ্রুতগতিতে বহিয়া সাধনার সূক্ষ্ম রাজ্যে তাঁহাকে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল; ঐ সময়ে তাঁহার দেশে যাওয়ার মত অবসর বা অবস্থা কোনটিই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সময়-নির্ণয় ব্যাপারে এই কথাটিও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই যাত্রায় শিহড়ে তাঁহার ভাবী পত্নীর সঙ্গে দৈবাধীন দেখা হইয়াছিল; শ্রীমতী সারদা তখন মায়ের কোলের শিশুমাত্র, ১২৬০ সালের ৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার রাত্রে তাঁহার জন্ম।

করিবেন এবং সেইজন্য বিপুল ধনও তিনি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া যাইবাব পর যেদিন যাত্রা করিবেন তাহার অব্যবহিত পূর্বরাত্রে তিনি প্রত্যাদেশ পাইলেন—স্বপ্নে দেখা দিয়া দেবী তাঁহাকে বলিলেন: কাশী যাইবার আবশ্যক নাই; গঙ্গাতীরে মনোরম স্থানে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর, ঐ মূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়া আমি তোমার নিত্যসেবা গ্রহণ করিব।

মন্দিরাদি নির্মাণ করিবার জন্য ষাট বিঘা-পরিমাণ জমি সংগৃহীত হইল ও অন্যূন আট বৎসর কালেব মধ্যে দেবীর নবরত্নশোভিত সুবৃহৎ মন্দির, শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউর মন্দির, দ্বাদশ শিবমন্দির, গঙ্গাবতরণের ঘাট ও চাঁদনী ইত্যাদির নির্মাণকার্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া গেল। রাণীর প্রাণের সাধ ছিল তাঁহার ইষ্টদেবীকে অন্নভোগ দিবেন, কিন্তু এই পথে প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়াইল তাঁহার জাতি ও সামাজিক প্রথা। তিনি পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে ব্যবস্থাপত্র আনাইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু একজন পণ্ডিতও অন্নভোগ দেওয়ার স্বপক্ষে ব্যবস্থা দিতে পারিলেন না। তাঁহার আশা যখন নির্মূলপ্রায়, তখন ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠী হইতে নিম্নোক্ত মর্মে এক ব্যবস্থাপত্র আসিল: "প্রতিষ্ঠার পূর্বে রাণী যদি উক্ত সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন এবং সেই ব্রাহ্মণ ঐ মন্দিরে দেবী প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে শাস্ত্রনিয়ম যথাযথ রক্ষিত হইবে এবং ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ উক্ত দেবালয়ে প্রসাদ গ্রহণ করিলেও দোষভাগী হইবেন না।"

এই ব্যবস্থাপত্র পাইয়া রাণীর হতাশ হৃদয়ে আবার আশার সঞ্চার হইল। তিনি নিজগুরুর নামে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহার অনুমতিক্রমে, দেবসেবার তত্ত্বাবধায়করূপে থাকিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু কাজটি তৎকালীন সামাজিক প্রথার বিরোধী বলিয়া যজনযাজনক্ষম সদাচারী কোন ব্রাহ্মণই তাঁহার দেবালয়ে পূজকের পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। নিরুপায় হইয়া অতি দীনভাবে তিনি রামকুমারকে বলিয়া পাঠাইলেন: শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রতিষ্ঠা করিতে আপনার ব্যবস্থাবলেই আমি অগ্রসর হইয়াছি, এবং ঐকার্য সম্পন্ন করিবার জন্য যাবতীয় আয়োজনও

সম্পূর্ণ করিয়াছি; শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউর জন্য পূজক পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন সুযোগ্য ব্রাহ্মণই শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজক হইতে চাহিতেছেন না; সত্বর যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করিয়া আপনি আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। এইরূপে, দেবীর প্রতিষ্ঠা বন্ধ হওয়ার আশঙ্কাতেই, দেবীভক্ত রামকুমার প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন। জগন্মাতার ইচ্ছাতেই সংসারে ছোটবড় সকল কাজ হইয়া থাকে, সাধক রামকুমার এই বিষয়ে তাঁহার ইষ্টদেবীর ইচ্ছা দেখিতে পাইয়াছিলেন কি-না কে বলিবে!

দেবালয়ের নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠাকার্যে রাণী নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। আমন্ত্রিত হইয়া কান্যকুব্জ, কাশী, নবদ্বীপ, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি পণ্ডিত-প্রধান স্থানসমূহ হইতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা বিদায় নিতে আসিয়াছিলেন; তাঁহাদের প্রত্যেকে রেশমী বস্ত্র ও উত্তরীয় এবং একটি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠাপূর্ব দিবসে কালীকীর্তন, ভাগবতপাঠ, রামায়ণকথা, যাত্রাগান ইত্যাদি হইয়া কালীবাটী আনন্দমুখরিত হইয়াছিল, এবং অসংখ্য আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া নিশাকালেও দিবাভাগের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। পরবর্তী কালে ঠাকুর তাঁহার ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন—ঐ আনন্দোৎসব দর্শন করিতে অগ্রজের সহিত তিনি আসিয়াছিলেন: ঐ সময়ে মন্দির দেখে মনে হয়েছিল রাণী যেন রজতগিরি তুলে এনে এখানে বসিয়ে দিয়েছেন!

মন্দিরের স্থান ও মন্দিরপ্রতিষ্ঠার কাল সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন:

দক্ষিণেশ্বরে রাণী যে স্থানটি পছন্দ করেন তার কিছু অংশ ছিল এক সাহেবের; বাকি অংশে ছিল মুসলমানদের কবরডাঙ্গা আর গাজিসাহেব-পীরের আস্তানা। স্থানটি দেখিতে কচ্ছপের পিঠের মতন ছিল; কূর্মপৃষ্ঠ শ্মশানই শক্তিপ্রতিষ্ঠায় শক্তিসাধনায় প্রশস্ত—একথা তন্ত্রে আছে। দৈবের বশেই যেন রাণী এই স্থানটি পছন্দ করেছিলেন।

মন্দির আর মূর্তি হয়ে যাবার পর মূর্তিটি বাক্সবন্দী করে রাখা হয়েছিল, প্রতিষ্ঠার জন্যে ধীরে সুস্থে শুভদিনও দেখা হচ্ছিল, এমন সময়ে যেকারণেই হোক মূর্তি ঘেমে উঠে, আর রাণীকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হয়—'আমাকে আর

কতদিন এভাবে আবদ্ধ করে রাখবি ? আমার যে বড় কষ্ট হচ্ছে, যত শীঘ্র পারিস আমাকে প্রতিষ্ঠা কর্।' রাণী ব্যস্ত হয়ে দিন দেখাতে থাকেন, স্নান-পূর্ণিমার আগে ভাল দিন না পেয়ে সেইদিনই প্রতিষ্ঠা করতে সংকল্প করেন।

সমন্বয়-সাধক ঠাকুরের সাধনপীঠের প্রতিষ্ঠাতিথিকে নিমিত্ত করিয়া বিষ্ণু আর শক্তি যে স্বরূপে অভিন্ন এই কথাটিই যেন পরোক্ষে বলা হইয়া রহিল।

মন্দিরপ্রতিষ্ঠা-মহোৎসবে সানন্দে যোগদান করিলেও গদাধর আহারের বিষয়ে নিজের নিষ্ঠা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন; দিনান্তে এক পয়সার মুড়িমুড়কি কিনিয়া খাইয়া পদব্রজে ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। পরদিন প্রত্যূষে অগ্রজের সংবাদ লইবার জন্য তিনি আবার দক্ষিণেশ্বরে যান, কিন্তু অগ্রজের সেদিন ঝামাপুকুরে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ভোজনকালে ঝামাপুকুরে চলিয়া আসেন। ইহার পর কয়েকদিন তিনি আর দক্ষিণেশ্বরে যান নাই। প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত কাজগুলি সমাপ্ত হইলেই রামকুমার যথাসময়ে প্রত্যাগমন করিবেন, তিনি ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু সপ্তাহকালের মধ্যেও রামকুমার ফিরিয়া আসিলেন না দেখিয়া গদাধর বিচলিত হইলেন, এবং মনে নানা তোলাপাড়া করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া শুনিলেন রামকুমার সেখানে চিরকালের জন্য পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

পিতার অশূদ্রযাজিত্বের কথা স্মরণ করাইয়া গদাধর অগ্রজকে ফিরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, রামকুমারও শাস্ত্র ও যুক্তি-সহায়ে নিজের কার্য সমর্থন করিলেন, কিন্তু কোন কথাই গদাধরের মনে লাগিতেছে না দেখিয়া তাঁহার সম্মতিক্রমে, ধর্মপত্রের অনুষ্ঠান করিলেন। শুনা যায়, ধর্মপত্রে উঠিয়াছিল : "রামকুমার পূজকের পদ-গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া নিন্দিত কর্ম করেন নাই। উহাতে সকলেরই মঙ্গল হইবে।"

ধর্মপত্রের মীমাংসা দেখিয়া গদাধর ঐ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলেন এবং এখন হইতে তাঁহার নিজের করণীয় কী হইবে ভাবিতে লাগিলেন। সেদিন

তিনি কামারপুকুরে ফিরিয়া গেলেন না, ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পাইতেও রাজী হইলেন না। রামকুমার কহিলেন: তবে সিধা নিয়ে পঞ্চবটীতলে গঙ্গাগর্ভে নিজে রান্না করে খাও; গঙ্গাগর্ভে সকল বস্তুই পবিত্র, একথা তো মান? আহার-সম্বন্ধীয় ঐকান্তিক নিষ্ঠা অন্তর্নিহিত গঙ্গাভক্তির নিকট পরাজিত হইল।

"মনোরম ভাগীরথীতীরে বিহগকূজিত পঞ্চবটীশোভিত উদ্যান, সুবিশাল দেবালয়ে ভক্তিমানসাধকানুষ্ঠিত সুসম্পন্ন দেবসেবা, ধার্মিক সদাচারী পিতৃতুল্য অগ্রজের অকৃত্রিম স্নেহ এবং দেবদ্বিজপরায়ণা পুণ্যবতী রাণী রাসমণি ও তজ্জামাতা মথুরবাবুর শ্রদ্ধা ও ভক্তি শীঘ্রই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীকে ঠাকুরের নিকট কামারপুকুরের গৃহের ন্যায় আপনার করিয়া তুলিল, এবং কিছুকাল স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করিলেও তিনি তথায় সানন্দচিত্তে বাস করিয়া মনের পূর্বোক্ত কিংকর্তব্যভাব দূরপরিহার করিতে সমর্থ হইলেন।"

মন্দিরে পূজারী

দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে একমাস কাল পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ—দক্ষিণেশ্বরে ঐ নামেই ঠাকুর সমধিক পরিচিত হইয়াছিলেন—নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলেন, এবং অগ্রজের অনুরোধে দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার সৌম্যদর্শন, কোমলপ্রকৃতি, ধর্মনিষ্ঠা ও অল্প বয়স রাণী রাসমণির জামাতা মথুরামোহনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। দেবীর বেশকারীর কাজে তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল মথুরবাবুর এবং রামকুমার ভট্টাচার্যকে তিনি বলিয়াছিলেন সেই কথা, কিন্তু রামকুমার তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিয়াছিলেন অনুজের মানসিক অবস্থার কথা জানাইয়া। পরের চাকরি স্বীকার করিতে তাঁহার অনুজের যে মোটেই ইচ্ছা ছিল না, রামকুমার ইহা জানিতেন।

ঠাকুরের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এক ব্যক্তি—তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীহৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়—এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হয়। ষোল বৎসরের তরুণ যুবক তখন সে। হৃদয় দেখিতে যেমন সুশ্রী সুপুরুষ, তাহার মনও ছিল তেমনি উদ্যমশীল ও ভয়শূন্য। কনিষ্ঠ মাতুলকে সে সত্যসত্যই ভালবাসিত, তাঁহার সকল কাজের সহায় হইত, তাঁহাকে সুখী করিতে কোন চেষ্টারই ত্রুটি করিত না। হৃদয়কে সহচররূপে পাইয়া ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরবাস ক্রমশঃ সহজ হইয়া আসিল।

হৃদয়ের উক্তি হইতে জানা যায়ঃ

এই সময় হইতে ঠাকুরের প্রতি সে একটা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিত ও ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। এক দণ্ডও তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইলে কষ্ট অনুভব করিত। মধ্যাহ্নে ভোজনকালে কিছুক্ষণের জন্য পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইত ; ঠাকুর পঞ্চবটীতে রান্না করিয়া খাইতেন, হৃদয় মন্দিরে প্রসাদ পাইত। ঠাকুরের রান্নার জোগাড় হৃদয়ই করিয়া দিত। রাত্রে তিনি মা-কালীর প্রসাদী লুচি খাইতেন।

ঠাকুর যে তাহাকে বিশেষ ভালবাসেন ইহা হৃদয় বুঝিত। তাঁহার সম্বন্ধে কেবল একটি বিষয়—মাঝে মাঝে কোথায় যে তিনি উধাও হইয়া যান ও দুইএক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিত পারিত না। জ্যেষ্ঠ মাতুল রামকুমারকে যখন সে কোনও কাজে সাহায্য করিতে যাইত, দুপুরে আহারের পর যখন সে একটু ঘুমাইত, কিংবা সন্ধ্যায় মন্দিরে গিয়া আরতি দর্শন করিত, সেই সেই সময়ে তিনি অন্তর্হিত হইতেন; জিজ্ঞাসা করিলে শুধু বলিতেন, এখানেই ছিলুম। কোনদিন পঞ্চবটীর দিক হইতে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া হৃদয় ভাবিত, তিনি শৌচাদির জন্য ঐদিকে গিয়া থাকিবেন।

এই সময় একদিন প্রতিমায় শিবপূজা করিতে ঠাকুরের ইচ্ছা হয় ও গঙ্গামৃত্তিকায় বৃষভ-ডমরু-ত্রিশূল-সমেত শিবমূর্তি গড়িয়া তিনি পূজা করিতে বসেন। ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে মথুরবাবু সেই স্থানে আসিয়া পড়েন ও দেবভাবান্বিত মূর্তি দেখিয়া মুগ্ধ হন। হৃদয়কে প্রশ্ন করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন, ঠাকুরই স্বহস্তে এই মূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন, সকল দেবদেবীর মূর্তি গড়িতে তিনি জানেন, এবং ভগ্নমূর্তি জুড়িতেও পারেন। শুনিয়া মথুরবাবু বিস্মিত হইলেন ও পূজান্তে মূর্তিটি তাঁহাকে দিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের সম্মতিক্রমে মূর্তিটি হৃদয় তাঁহাকে দিয়া আসিল। মূর্তি হাতে পাইয়া মথুর তন্নতন্ন করিয়া দেখিলেন ও স্বয়ং অতিশয় মুগ্ধ হইয়া রাণীকে দেখাইতে পাঠাইলেন। রাণীও মূর্তিনির্মাতার উচ্চ প্রশংসা করিলেন এবং ঠাকুর ঐ মূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। ঠাকুরকে মন্দিরের কাজে নিযুক্ত করিতে আগেই মথুরের ইচ্ছা হইয়াছিল, সেই ইচ্ছা এখন আরও বলবতী হইল।

মথুরবাবুর অভিপ্রায় ঠাকুর পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার অগ্রজের কাছে; কিন্তু ভগবান ব্যতীত অন্য কাহারও চাকরি করিব না, এইরূপ একটা ভাব বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মনে থাকায় তিনি সহসা

সেকথায় সায় দিতে পারে নাই। সেই দিন হইতে তিনি মথুরবাবুর সম্মুখে আসিতেন না ও যতটা সম্ভব তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতেন।

তবে কি তিনি কামারপুকুরে ফিরিয়া যাইবেন? যতই দিন যাইতেছে দক্ষিণেশ্বরের সুন্দর কালীবাটী ততই তাঁহার প্রিয়তর বোধ হইতেছে। বিশাল ঐ দেবালয়টি উহার সমগ্র সত্তা দিয়াই যেন তথায় তাঁহার অবস্থিতি কামনা করিতেছে, প্রাণে প্রাণে তিনি ইহা অনুভব করিতেছিলেন; আর সেইজন্যই কামারপুকুরে ফিরিয়া যাওয়ার ইচ্ছা তেমন করিয়া এখন আর তাঁহার মনকে চঞ্চল করিতেছিল না।

এইরূপ সময়ে মথুরবাবু একদিন কালীবাটীতে আসেন ও কিছু দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াই ডাকিয়া পাঠান। হৃদয়ের সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে মথুরবাবুকে দেখিতে পাইয়া ঠাকুর সরিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে মথুরের ভৃত্য আসিয়া কহিল, বাবু আপনাকে ডাকচেন। মথুরের কাছে যাইতে ঠাকুর ইতস্তত: করিতেছেন দেখিয়া হৃদয় ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ঠাকুর কহিলেন: গেলেই আমাকে এখানে থাকতে আর চাকরি স্বীকার করতে বলবে। 'তাতে দোষ কী? এমন স্থানে, মহতের আশ্রয়ে থেকে কাজ করা তো ভাল বই মন্দ নয়, তবে কেন ইতস্তত: করচ?' হৃদয় প্রশ্ন করিল। 'আমার চাকরিতে চিরকাল আবদ্ধ হয়ে থাকতে ইচ্ছা নাই। এখানে পূজা করতে হলে দেবীর অঙ্গে যেসব অলঙ্কার আছে তার জন্যে দায়ী থাকতে হবে; সে বড় হাঙ্গামার কথা, আমার দ্বারা তা সম্ভব হবে না। তবে যদি তুমি ঐকাজের ভার নিয়ে এখানে থাক তাহলে আমার পূজা করতে আপত্তি নাই।' ঠাকুর প্রত্যুত্তর করিলেন।

চাকরির অন্বেষণেই হৃদয় এখানে আসিয়াছিল, ঠাকুরের কথায় সে সানন্দে সম্মতি দান করিল। ঠাকুর তখন মথুরবাবুর সহিত দেখা করিলেন ও মথুর তাঁহাকে মন্দিরে কর্ম স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলে পূর্বোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া মথুর তাঁহাকে মা-কালীর বেশকারীর পদে এবং হৃদয়কে তাঁহার ও রামকুমারের সহকারীর

পদে নিযুক্ত করিলেন। ভ্রাতাকে এইরূপে কার্যে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া রামকুমার নিশ্চিন্ত হইলেন।

১২৬২ সালের ভাদ্রমাস। নন্দোৎসবের দিন মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীরাধাকান্ত-জীউর বিশেষ পূজা ও ভোগারতি হইয়া যাওয়ার পর পূজক শয়নকক্ষে প্রথমতঃ শ্রীরাধারাণী-বিগ্রহ রাখিয়া আসিলেন। তারপরে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ লইয়া যাইবার সময় অনবধানতাবশতঃ পড়িয়া গেলেন ও বিগ্রহের একখানি পা দ্বিখণ্ডিত হইল। একেবারে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ভগ্নবিগ্রহে পূজা শাস্ত্রসম্মত কি-না তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য অগৌণে প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের এক সভা আহূত হইল। পণ্ডিতেরা সকলেই একবাক্যে বিধান দিলেন: 'ভগ্ন মূর্তিটি গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেওয়া হউক এবং তৎস্থলে অন্য নূতন মূর্তি স্থাপিত হউক।' সঙ্গে সঙ্গে নূতন মূর্তি নির্মাণ করিবার ব্যবস্থাও হইয়া গেল।

ঠাকুরের উপর মথুরবাবুর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল, এই বিষয়ে তাঁহারও মতামত একবার জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য তিনি মনে করিলেন। মথুরের প্রশ্নের উত্তরে ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন: "রাণীর জামাইদের কেউ যদি পড়ে পা ভেঙ্গে ফেলত, তবে কি তাকে ত্যাগ করে আর একজনকে তার জায়গায় এনে বসানো হত—না তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হত? এখানেও সেইরকম করা হোক—মূর্তিটি জুড়ে যেমন পূজা হচ্চে তেমনি পূজা করা হোক।"

ঠাকুর যে ভগ্নমূর্তি জুড়িতে পারেন একথা মথুরবাবু আগেই শুনিয়াছিলেন। মথুরের অনুরোধে তিনি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের পা এমন নিখুঁতভাবে জুড়িয়া দিয়াছিলেন যে, বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়াও মূর্তিটি যে কোনকালে ভগ্ন হইয়াছিল ইহা বুঝিতে পারা যাইত না। অনবধানতার অপরাধে পূজক ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্মচ্যুত হইলেন ও শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউর পূজার ভার ঠাকুরের উপরে ন্যস্ত হইল।

পরবর্তী কালে হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছেন ঠাকুরের পার্ষদভক্তেরা: ঠাকুরের পূজা একটি দেখিবার বিষয় ছিল; যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইত।

পূজার সময় তাঁহার তেজোময় শরীর ও তন্ময় ভাব দেখিয়া অন্য ব্রাহ্মণেরা বলাবলি করিতেন, সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব যেন পূজা করিতে বসিয়াছেন! সেই সময়ে পূজাস্থানে কেহ আসিলে তিনি দেখিতে পাইতেন না, কেহ নিকটে দাঁড়াইয়া কথা বলিলেও শুনিতে পাইতেন না।

ঠাকুরের উক্তি হইতে জানা যায়ঃ অঙ্গন্যাস-করন্যাস করিবার কালে মন্ত্রাক্ষরগুলি তাঁহার নিজদেহে উজ্জ্বলবর্ণে সন্নিবেশিত আছে বলিয়া তিনি সত্যসত্যই দেখিতে পাইতেন। সত্যসত্যই দেখিতেন, সর্পাকারা কুণ্ডলিনী সুষুম্নাপথ দিয়া সহস্রারে উঠিতেছেন, আর শরীরের যে যে অংশ কুণ্ডলিনী ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন সেই সেই অংশই নিস্পন্দ ও অসাড় হইয়া যাইতেছে। আবার 'রং' এই মন্ত্রবর্ণ উচ্চারণপূর্বক নিজের চারিদিকে জল ছড়াইয়া যেমন তিনি ভাবিতেন অগ্নির প্রাচীর দ্বারা পূজাস্থান বেষ্টিত রহিয়াছে, অমনি দেখিতে পাইতেন অনুল্লঙ্ঘনীয় অগ্নির প্রাচীর সত্যসত্যই পূজাস্থানকে সকল বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিতেছে।

ঠাকুর আরও বলিয়াছিলেনঃ সন্ধ্যাপূজা করবার সময় যখন ভাবতুম, ভিতরের পাপপুরুষ দগ্ধ হয়ে গেল,—এরূপ ভাবনার বিধি শাস্ত্রে আছে,—তখন কে জানত শরীরে সত্যসত্যই পাপপুরুষ আছে, আর তাকে বাস্তবিক বিনষ্ট করা যায়! সাধনার সুরু থেকে গাত্রদাহ দেখা দিল, ভাবলুম এ আবার কী রোগ হল! ক্রমে তা বেড়ে বেড়ে অসহ্য হয়ে উঠল। নানা কবিরাজী তেল মাখলুম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। একদিন পঞ্চবটীতে বসে আছি, সহসা দেখচি কী—মিস্ কালো রঙ, লালচোখ, ভীষণ একটা পুরুষ যেন মদ খেয়ে টলতে টলতে (নিজ শরীর দেখাইয়া) এর ভিতর থেকে বেরিয়ে সামনে বেড়াতে লাগল। পরক্ষণে দেখি কী—আর একজন সৌম্যমূর্তি পুরুষ, গৈরিক-পরা, ত্রিশূল-হাতে, ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে সেই ভীষণ পুরুষটাকে তেড়ে আক্রমণ করে মেরে ফেল্লে। সেদিন থেকে গা-জ্বালা কমে গেল। তার আগে ছমাস গা-জ্বালায় দারুণ কষ্ট পেয়েছিলুম।

পূজার অনুরূপ, কিংবা তাহারও অধিক, মোহিনী শক্তি ছিল ঠাকুরের গানে। সে গান যে একবার শুনিত সে কখনও ভুলিতে পারিত না। 'তিনি যেন গানে ভাসতেন।' শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন।

মধুর সুস্বর কিবা নহে বলিবার।
পিক-অলি-বীণা-বেণু একত্র ঝঙ্কার॥—

পুঁথিকার লিখিয়াছেন। আর লীলাপ্রসঙ্গকার বলিয়াছেন: ঠাকুর যে গান গাহিতেন তাহাতে ওস্তাদি কালোয়াতি ঢং ঢাং কিছুই থাকিত না। থাকিত কেবল গীতোক্ত ভাবটি নিজেতে আরোপ করিয়া মর্মস্পর্শী মধুর স্বরে যথাযথ প্রকাশ এবং তাল-লয়ের বিশুদ্ধতা। গীতোক্ত ভাবে তিনি নিজে এত মুগ্ধ হইতেন যে, অন্য কাহারও তৃপ্তির জন্য গান গাহিতেছেন একথা একেবারে ভুলিয়া যাইতেন। গীতোক্ত ভাবে মুগ্ধ হইয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মবিস্মৃত হইতে জীবনে আমরা অপর কাহাকেও দেখি নাই।

হৃদয়ের মুখে তাঁহারা অনেকেই শুনিয়াছিলেন: ঐকালে গীত গাহিতে গাহিতে চোখের জলে ঠাকুরের বুক ভাসিয়া যাইত। রাণী রাসমণি যখনই দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন ঠাকুরকে ডাকাইয়া তাঁহার গান শুনিতেন। এই গীতটি রাণীর বিশেষ প্রিয় ছিল—

কোন্ হিসাবে হরহৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।
সাধ করে জিব্ বাড়ায়েছ, যেন কত ন্যাকা মেয়ে॥

ঠাকুরকে পরপর বেশকারীর ও পূজকের পদে ব্রতী হইতে দেখিয়া রামকুমার অন্তরে সুখী হইয়াছিলেন, এবং দক্ষতার সহিত প্রাপ্তকর্তব্য করিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্তও হইয়াছিলেন। কিছুদিন ধরিয়া তিনি তাঁহাকে চণ্ডীপাঠ এবং মা-কালী ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজা শিখাইলেন, ঠাকুরও অচিরে সেই সব আয়ত্ত করিয়া নিলেন।

শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে শক্তিপূজা করা প্রশস্ত নহে শুনিয়া ঠাকুর এখন দীক্ষা নিতে ইচ্ছুক হন এবং শ্রীকেনারাম ভট্টাচার্য নামে এক প্রবীণ ও অনুরাগী শক্তিসাধককে গুরুপদে বরণ করেন। কেনারাম কলিকাতার বৈঠকখানা বাজারে বাস করিতেন এবং রামকুমার ভট্টাচার্যের সহিত পূর্ব

হইতেই পরিচিত ছিলেন ; রাণী রাসমণির দেবালয়েও তাঁহার যাতায়াত ছিল। শুনা যায়, মন্ত্রশ্রবণ করিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবেগে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, কেনারামও ইষ্টলাভবিষয়ে প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

ইহার পর রামকুমার ঠাকুরকে মা-কালীর পূজা করিতে দিয়া স্বয়ং বিষ্ণুঘরে পূজা করিতে লাগিলেন। মথুরবাবুও তাঁহার এই কার্য সমর্থন করিলেন কালীমন্দিরের শ্রমসাধ্য কাজ করিতে তাঁহার এখন কষ্ট হইতেছে ভাবিয়া, এবং ঠাকুরও দেবীপূজায় পারদর্শী হইয়াছেন জানিয়া। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে রামকুমার মথুরকে বলিয়া হৃদয়কে বিষ্ণুঘরের পূজায় নিযুক্ত করিলেন, এবং অবসর লইয়া কিছুদিনের জন্য গৃহে ফিরিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। গৃহে ফিরিবার পূর্বেই, শ্যামনগর-মূলাজোড় নামক স্থানে গিয়া, তিনি সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হন। মন্দিরপ্রতিষ্ঠার দিন হইতে রামকুমার প্রায় এক বৎসর জগন্মাতার পূজা করিয়াছিলেন।

মহাশক্তির উদ্বোধন সাধকভাবের আবেশে

শাক্তী দীক্ষা গ্রহণ করার সময় হইতেই ঠাকুরের জীবনে সাধকভাবের বিশেষ প্রকাশ ঘটে। ঐ সাধকভাবের আবেশে সর্বপ্রথম তিনি মাতৃভাবে জগৎকারণের আরাধনা করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিবার পরেও, তাঁহারই ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়া একে একে অন্যান্য সকল ভাবের ও সকল ধর্মমতের সাধনা করিয়াছেন প্রায় একযুগ ধরিয়া।

পিতৃতুল্য অগ্রজের আকস্মিক মৃত্যুতে ঠাকুর যারপরনাই ব্যথিত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা তাঁহার শুদ্ধমনে সংসারের অনিত্যতাবোধ আরও দৃঢ় করিয়া উহাতে বৈরাগ্যানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল। দেখা যায়, এই সময় হইতেই তিনি আনন্দপ্রতিমা দেবীমূর্তির পূজাকার্যে সমধিক মনোনিবেশ করিতেছেন।

"কিন্তু এখানেও শান্তি কোথায়? মন বলিল, সত্যই কি ইনি আনন্দঘনমূর্তি জগজ্জননী, অথবা পাষাণপ্রতিমামাত্র? সত্যই কি ইনি ভক্তিসমাহৃত পত্রপুষ্পফলমূলাদি গ্রহণ করেন? সত্যই কি মানব ইঁহার কৃপাকটাক্ষলাভে সর্বপ্রকারবন্ধনমুক্ত হইয়া দিব্য দর্শন লাভ করে? অথবা মানবমনের বহুকালসঞ্চিত কুসংস্কাররাজি কল্পনাসহায়ে দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া ছায়াময়ী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে এবং মানব ঐরূপে আপনি আবহমানকাল ধরিয়া প্রতারিত হইয়া আসিতেছে? প্রাণ এ-সন্দেহ-নিরসনে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।"

পূজান্তে দেবীর সম্মুখে বসিয়া তিনি রামপ্রসাদ-প্রমুখ সাধকগণের রচিত সঙ্গীতসমূহ তাঁহাকে গাহিয়া শুনাইতেন ও গাহিতে গাহিতে প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। বৃথা বাক্যালাপ করিতেন না, এবং নিশীথে পঞ্চবটী-সন্নিহিত জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া জগন্মাতার ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। দেবসেবার পরিশ্রম, অপেক্ষাকৃত অল্পাহার ও রাত্রে অনিদ্রা, এইসব মিলিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া হৃদয় চিন্তান্বিত হইল।

পঞ্চবটী-সন্নিহিত জঙ্গলে নীচু জমিতে একটি আমলকীবৃক্ষ জন্মিয়াছিল, উহার তলায় কেহ বসিয়া থাকিলে জঙ্গলের বাহির হইতে দেখিতে পাওয়া যাইত না। 'রাত্রে জঙ্গলের ভিতর গিয়ে কী কর বল দেখি?' হৃদয়ের জিজ্ঞাসার উত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন: ওখানে একটা আমলকীগাছ আছে, তার তলায় বসে ধ্যান করি। শাস্ত্রে বলে, আমলকীতলায় যে যা কামনা করে ধ্যান করে তার তাই সিদ্ধ হয়।

ইহার পরে কয়েকদিন ঠাকুর আমলকীতলায় ধ্যান করিতে বসিলেই তাঁহার আশেপাশে ঢিল পড়িতে লাগিল। উহা যে হৃদয়ের কর্ম ইহা বুঝিতে পারিয়াও ঠাকুর তাহাকে কিছুই বলিতেন না। এক রাত্রে নিঃশব্দে জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে হৃদয় দেখিল, ঠাকুর দিগম্বর ও সুখাসীন হইয়া ধ্যানমগ্ন! 'মামা কি পাগল হল নাকি?' সে ভাবিতে লাগিল ও সহসা তাঁহার নিকটে গিয়া কহিল: এ কী হচ্চে? পৈতে কাপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে বসেচ যে? কয়েকবার ডাকাডাকির পর ঠাকুরের হুঁশ হইল ও হৃদয়ের কথার উত্তরে বলিতে লাগিলেন: তুই কী জানিস? এইরূপে পাশমুক্ত হয়ে ধ্যান করতে হয়। জন্মাবধি মানুষ ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি, অভিমান—এই অষ্ট পাশে বদ্ধ হয়ে আছে; পৈতেগাছটাও 'আমি ব্রাহ্মণ, সকলের চেয়ে বড়'—এই অভিমানের চিহ্ন, একটা পাশ; মাকে ডাকতে হলে ঐসব পাশ ফেলে দিয়ে একমনে ডাকতে হয়, তাই ঐসব খুলে রেখেচি; ধ্যান করা শেষ হলে আবার পরব। ইতঃপূর্বে এরূপ কথা হৃদয় কখনও শুনে নাই, সে অবাক হইয়া গেল ও নীরবে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

সিদ্ধ ভক্তগণের রচিত সঙ্গীতসমূহ জগন্মাতাকে শ্রবণ করানো পূজারই অঙ্গবিশেষ, ঠাকুর মনে করিতেন। প্রাণের গভীর উচ্ছ্বাসে ভরা ঐ সকল গীত গাহিতে গাহিতে তাঁহার চিত্ত আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত ও সকল সংশয় তখনকার মত দূরে অপসৃত হইত। রামপ্রসাদ-প্রমুখ ভক্তেরা মার দেখা পাইয়াছিলেন, মার দেখা তাহা হইলে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, তিনি ভাবিতেন। ব্যাকুলহৃদয়ে বলিতেন: মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা

দিয়েছিস, আমায় তবে কেন দেখা দিবি না? আমি ধন জন ভোগসুখ কিছুই চাই না, আমায় দেখা দে। এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে নয়নজলে তাঁহার বক্ষ প্লাবিত হইত ও হৃদয়ের ভার লঘু হইত। তিনি পুনরায় গীত গাহিয়া মাকে শুনাইতে থাকিতেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেবাপূজা নিষ্পন্ন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

প্রত্যূষে নিজের হাতে ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া দেবীকে সাজাইতে তিনি বহু সময় ব্যয় করিতেন; পূজা করিতে বসিয়া, যথাবিধি নিজের মাথায় একটি ফুল দিয়াই হয়তো দুই ঘণ্টা ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতেন; ভোগ নিবেদন করিয়া মা খাইতেছেন ভাবিতে ভাবিতে বহুক্ষণ কাটাইতেন। তাঁহার সন্ধ্যাকালীন আরতি যেন আর শেষ হইতে চাহিত না! কিছুকাল পূজা চলিতে লাগিল এইভাবে।

নানালোকে নানা কথা বলাবলি করিতে থাকিল। অনেকে তাঁহাকে পরিহাস করিল তাঁহার অসাধারণ কাজগুলিকে বিকৃত বুদ্ধির খেয়াল ভাবিয়া; কেহ কেহ আবার তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিল তাঁহার অদ্ভুত নিষ্ঠা ও লোকের মতামতে উপেক্ষা দেখিয়া। এই সময়ে ঠাকুরের পূজাকালীন আচরণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধিমান মথুরবাবু বলিয়াছিলেন রাণী রাসমণিকে: অদ্ভুত পূজক পাওয়া গেছে, দেবী বোধ হয় শীঘ্রই জাগ্রতা হবেন।

যতই দিন যাইতে লাগিল ঠাকুরের অনুরাগ-ব্যাকুলতাও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মনের অবিরাম একমুখী গতির ফলে তাঁহার "আহার এবং নিদ্রা কমিয়া গেল। শরীরের রক্তপ্রবাহ বক্ষে ও মস্তিষ্কে নিরন্তর দ্রুত প্রধাবিত হওয়ায় বক্ষঃস্থল সর্বদা আরক্তিম হইয়া রহিল, চক্ষু মধ্যে মধ্যে সহসা জলভারাক্রান্ত হইতে লাগিল, এবং ভগবদ্দর্শনের জন্য একান্ত ব্যাকুলতাবশতঃ 'কী করিব, কেমনে পাইব' এইরূপ একটা চিন্তা নিরন্তর পোষণ করায় ধ্যানপূজাদির কাল ভিন্ন অন্য সময়ে তাঁহার শরীরে একটা অশান্তি ও চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষিত হইতে লাগিল।"

"ঠাকুর বলিতেন ঃ শরীরসংস্কারের দিকে মন আদৌ না থাকায় ঐকালে মস্তকের কেশ বড় হইয়া ধূলামাটি লাগিয়া আপনা আপনি জটা পাকাইয়া গিয়াছিল। ধ্যান করিতে বসিলে মনের একাগ্রতায় শরীরটা এমন স্থাণুবৎ স্থির হইয়া থাকিত যে, পক্ষীসকল জড়পদার্থজ্ঞানে নিঃসঙ্কোচে মাথার উপর আসিয়া বসিয়া থাকিত এবং কেশমধ্যগত ধূলিরাশি চঞ্চুদ্বারা নাড়িয়া চাড়িয়া তন্মধ্যে তণ্ডুলকণার অন্বেষণ করিত! আবার সময়ে সময়ে ভগবদ্বিরহে অধীর হইয়া ভূমিতে এমন মুখ ঘর্ষণ করিতাম যে, কাটিয়া যাইয়া স্থানে স্থানে রক্ত বাহির হইত। ঐরূপে ধ্যান-ভজন-প্রার্থনা-আত্মনিবেদনাদিতে সমস্ত দিন যে কোথা দিয়া এ সময়ে চলিয়া যাইত তাঁহার হুঁশই থাকিত না। পরে সন্ধ্যাসমাগমে যখন চারিদিকে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি হইতে থাকিত তখন মনে পড়িত—দিবা অবসান হইল, আর একটা দিন বৃথা চলিয়া গেল, মার দেখা পাইলাম না। তখন তীব্র আক্ষেপ আসিয়া প্রাণ এমন ব্যাকুল করিয়া তুলিত যে, আর স্থির থাকিতে পারিতাম না; আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া 'মা, এখনও দেখা দিলি না ?' বলিয়া চীৎকার ক্রন্দনে দিক পূর্ণ করিতাম ও যন্ত্রণায় ছটফট করিতাম! লোকে বলিত, পেটে শূলব্যথা ধরিয়াছে, তাই অত কাঁদিতেছে।"

লীলাপ্রসঙ্গকার শ্রীসারদানন্দকে ঠাকুর শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন ঃ একদিন মাকে গান শোনাচ্ছিলুম আর তাঁর দেখা পাবার জন্যে প্রার্থনা করছিলুম কেঁদে কেঁদে। বলছিলুম, মা, এত যে ডাকচি তার কিছুই তুই কি শুনচিস না? রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েচিস, আমাকে কি দেখা দিবি না? মার দেখা পেলুম না বলে তখন হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা; লোকে যেমন করে জোরে গামছা নিংড়ায়, মনে হল হৃদয়টাকে ধরে কে যেন তেমনি নিংড়াচ্চে! মার দেখা বোধ হয় কোনকালেই পাব না ভেবে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলুম। অস্থির হয়ে ভাবলুম, তবে আর এ জীবনে কাজ নাই। মার ঘরে যে অসি ছিল সহসা তার উপর দৃষ্টি পড়ল। এই মুহূর্তেই জীবন শেষ করব ভেবে, পাগলের মত ছুটে ধরতে যাচ্ছি, এমন সময় সহসা মার অদ্ভুত দর্শন পেলুম আর

বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলুম। তারপর বাইরে কী যে হয়েচে, কোন্ দিক দিয়ে সেদিন আর তার পরদিন যে গেছে, তার কিছুই জানতে পারি নি! ভিতরে কিন্তু একটা অপূর্ব জমাটবাঁধা আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল আর মার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করেছিলুম!

এই দর্শন সম্বন্ধে অন্য একদিন ঠাকুর বলিয়াছিলেন : ঘর দোর মন্দির সব যেন কোথায় মিলিয়ে গেল—কোথাও যেন আর কিছুই নাই—আর দেখচি কী, এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতি-সমুদ্র! যেদিকে যতদূর দেখি, চারদিক থেকে তার উজ্জ্বল ঢেউগুলি তর্জন গর্জন করে গ্রাস করবার জন্য মহাবেগে এগিয়ে আসচে! দেখতে দেখতে আমার উপর এসে পড়ল আর আমাকে কোথায় একেবারে তলিয়ে দিলে! হাঁপিয়ে হাবুডুবু খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলুম!

ঠাকুরের কথানুযায়ী পূর্বোক্তরূপ বর্ণনা দিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন : "প্রথম দর্শনকালে তিনি চেতন জ্যোতিঃসমুদ্রের দর্শনলাভের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যঘন জগদম্বার বরাভয়করা মূর্তি? ঠাকুর কি এখন তাহারও দর্শন এই জ্যোতিঃসমুদ্রের মধ্যে পাইয়াছিলেন? পাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, কারণ শুনিয়াছি, প্রথম দর্শনের সময়ে তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা যখন হইয়াছিল তখন তিনি কাতরকণ্ঠে 'মা, মা,' শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন।"

পূর্বোক্ত প্রথম দর্শনের পর, জগন্মাতার ভুবনমোহন রূপ দর্শন করিবার জন্য ঠাকুরের প্রাণে একটা আকুল ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল। এই ক্রন্দন অন্তরে সর্বদা বিদ্যমান থাকিত, আর কখন কখন এতই বৃদ্ধি পাইত যে, আর চাপিতে না পারিয়া মাটিতে পড়িয়া উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিতেন 'মা, আমায় কৃপা কর্, দেখা দে' বলিয়া। চারিপাশে লোক দাঁড়াইয়া যাইত। তাহাদিগকে ছায়া বা ছবিতে আঁকা মূর্তির মত মনে হইত ও কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ তাঁহার হইত না। অসহ্য যন্ত্রণায় একএক সময়ে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান একেবারে লোপ পাইত, আর তখনই দেখিতেন—মার বরাভয়া চিন্ময়ী মূর্তি হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, অশেষপ্রকারে সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে।

শাস্ত্রীয়াচার উল্লঙ্ঘন রাগভক্তির আবির্ভাবে

জগন্মাতার দর্শনলাভ করিয়া আনন্দাতিশয্যে ঠাকুর কয়েকদিনের জন্য একেবারে কাজের বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঐ দিনগুলিতে হৃদয় কোনরূপে মন্দিরে সেবাপূজা চালাইয়া নিয়াছিল অন্য এক ব্রাহ্মণের সাহায্য লইয়া, এবং মাতুলের চিকিৎসায় মন দিয়াছিল তাঁহার বায়ুরোগ হইয়াছে ভাবিয়া। বালকভাবাপন্ন ঠাকুর তাঁহার অসুখ হইয়াছে শুনিয়া চিকিৎসায় অমত করেন নাই। হৃদয়ের পূর্বপরিচিত, ভূকৈলাস রাজবাটীর চিকিৎসক এক বিজ্ঞ কবিরাজ কিছুদিন চিকিৎসাও করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সেই তথাকথিত বায়ুরোগের কিছুমাত্র উপশম হয় নাই।

এই সময়ে পূজা বা ধ্যান করিতে গিয়া ঠাকুরের যেসব চিন্তা, দর্শন, বা অনুভব হইত সেই সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন: মার নাটমন্দিরের ছাদের আলিশায় যে ধ্যানস্থ ভৈরবমূর্তি আছে তাকে দেখিয়ে মনকে বলতুম, ঐরকম স্থির নিস্পন্দভাবে বসে মার পাদপদ্ম চিন্তা করতে হবে। ধ্যান করতে বসামাত্র শুনতে পেতুম, শরীরের গ্রন্থিগুলিতে, পায়ের দিক থেকে ঊর্ধ্বে, খটখট করে শব্দ হচ্চে, আর একটার পর একটা করে গ্রন্থিগুলি আবদ্ধ হয়ে যাচ্চে—কে যেন ঐ জায়গাগুলি তালাবদ্ধ করে দিচ্চে! যতক্ষণ ধ্যান করতুম ততক্ষণ শরীরটাকে একটু নেড়েচেড়ে আসন পালটাতে পারতুম না, ইচ্ছামাত্র ধ্যান ছেড়ে উঠতেও পারতুম না। আগের মত খটখট শব্দ করে, উপরের দিক থেকে পা পর্যন্ত, ঐ গ্রন্থিগুলি যতক্ষণ না খুলে যেত ততক্ষণ কে যেন জোর করে একভাবে বসিয়ে রাখত। ধ্যান করতে বসে প্রথম প্রথম দেখতে পেতুম রাশীকৃত জোনাকির মত বিন্দু বিন্দু জ্যোতির রাশি; কখন বা কুয়াশার মত পুঞ্জপুঞ্জ জ্যোতিতে চারদিক আচ্ছন্ন দেখতুম; আবার কখন তরল রূপার মত উজ্জ্বল জ্যোতি সকল পদার্থ ছেয়ে আছে দেখতুম। চক্ষু বুজে ঐরকম দেখতুম, আবার অনেক সময় চক্ষু চেয়েও ঐরকম দেখতে পেতুম। কী দেখছি তা বুঝতুম না, ঐরকম দেখা ভাল কি মন্দ তাও জানতুম না। মার কাছে

ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতুম,—মা, আমার কী হচ্চে কিছুই বুঝি না; তোকে ডাকবার মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি না; যা করলে তোকে পাওয়া যায় তুইই আমাকে তা শিখিয়ে দে। তুই না শিখালে কে আর আমাকে শিখাবে মা? তুই ছাড়া আমার গতি, আমার সহায় আর কেউই যে নাই! একমনে ঐরকম প্রার্থনা করতুম আর প্রাণের ব্যাকুলতায় কাঁদতুম।

জগন্মাতার বালক ঠাকুর এখন সংসারে থাকিয়াও সংসারে ছিলেন না। বহির্জগৎ তাঁহার নিকট অবাস্তব স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল, এবং জগন্মাতার চিদানন্দময়ী মূর্তিই একমাত্র সারবস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল।

পূজা বা ধ্যানকালে তো কথাই নাই, অন্য সময়েও তিনি দেখিতে পাইতেন, সর্বাবয়বসম্পন্না জ্যোতির্ময়ী মা হাসিতেছেন, কথা কহিতেছেন, 'এটা কর্, ওটা করিস না' বলিয়া তাঁহার সঙ্গে ফিরিতেছেন!

পূর্বে ভোগ নিবেদন করিয়া তিনি দেখিতেন মার চক্ষু হইতে জ্যোতি নির্গত হইয়া নিবেদিত আহার্যবস্তু স্পর্শ করিতেছে; কিন্তু এখন দেখেন ভোগ নিবেদন করিবামাত্র, কখন বা নিবেদন না করিতেই, মন্দির আলো করিয়া মা খাইতে বসিয়াছেন! পূজাকালে একদিন হঠাৎ মন্দিরে গিয়া হৃদয় দেখিয়াছিল, জবাবিল্বপত্রের অর্ঘ্য হাতে নিয়া তন্ময় হইয়া চিন্তা করিতে করিতে ঠাকুর সহসা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'রোস্ রোস্, আগে মন্ত্রটা বলি, তারপরে খাস' এবং সঙ্গে সঙ্গে নৈবেদ্য নিবেদন করিয়াও দিলেন!

আগে ধ্যানপূজাদি করিবার সময় তিনি দেখিতেন পাষাণময়ী মূর্তিতে দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু এখন আর পাষাণময়ীকে দেখিতেই পান না। মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিতে পান, বরাভয়করা চিন্ময়ী মা সেখানে সাক্ষাৎ বিরাজিতা! ঠাকুর বলিতেন: নাকে হাত দিয়ে দেখেছি মা সত্যসত্যই নিশ্বাস ফেলচেন। তন্ন তন্ন করে দেখেও দীপের আলোয় মার দিব্য অঙ্গের ছায়া কখনো পড়তে দেখি নি। নিজের ঘরে বসে শুনেচি মা পাঁইজর পরে বালিকার মত আনন্দিত হয়ে ঝম্‌ঝম্ শব্দ করতে করতে মন্দিরের উপরতলায় উঠচেন! তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে এসে দেখেচি

সত্যসত্যই মা মন্দিরের দোতলার বারান্দায় এলোচুলে দাঁড়িয়ে কখন কলকাতা, কখন গঙ্গা দর্শন করচেন!

পরবর্তী কালে হৃদয় বলিয়াছিল :

পূজাকালে একএক দিন সহসা মন্দিরে গিয়ে দেখতুম, জবাফুল আর বেলপাতা দিয়ে অর্ঘ্য সাজিয়ে মামা নিজের মাথায়, বুকে, সারাদেহে, এমনকি নিজের পায়ে পর্যন্ত ঠেকালেন, তারপরে মা-কালীর পায়ে দিলেন।

দেখতুম, মাতালের মত তাঁর বুক আর চোখ লাল হয়ে উঠেচে, আর সেই অবস্থায় টলতে টলতে আসন ছেড়ে সিংহাসনের উপর উঠে মার চিবুক ধরে আদর, গান, রঙ্গরস করচেন, বা কথা কইচেন, অথবা মার হাত ধরে নাচতে আরম্ভ করেচেন!

দেখতুম, মাকে ভোগ নিবেদন করতে করতে তিনি সহসা উঠে পড়লেন, আর থালা থেকে একগ্রাস অন্নব্যঞ্জন নিয়ে তাড়াতাড়ি সিংহাসনে উঠে মার মুখে ছুঁইয়ে বলতে লাগলেন, 'খা মা খা, বেশ করে খা!' পরে হয়তো বল্লেন, 'আমি খাব? আচ্ছা খাচ্চি!' কিছুটা নিজে খেয়ে বাকিটা আবার মার মুখে দিয়ে বলতে লাগলেন, 'আমি তো খেয়েচি, এইবার তুই খা!'

একদিন দেখি, ভোগ নিবেদন করবার সময় একটা বিড়ালকে কালী-ঘরে ঢুকে ম্যাও ম্যাও করে ডাকতে দেখে মামা 'খাবি মা, খাবি মা' বলে ভোগের অন্ন তাকেই খাওয়াতে লাগলেন!

দেখতুম, রাত্রে একএক দিন মাকে শয়ন দিয়ে মামা 'আমাকে কাছে শুতে বলচিস, আচ্ছা শুচ্চি' বলে মার রূপোর খাটে কিছুক্ষণ শুয়ে রইলেন।

আবার দেখতুম, পূজা করতে বসে তিনি ধ্যানে এমন ডুবে গেলেন যে, বহুক্ষণ তাঁর হুঁশই হল না!

ভোরে উঠে মা-কালীর মালা গাঁথবার জন্যে মামা রোজ ফুল তুলতেন, দেখতুম তখনো তিনি যেন কার সাথে কথা কইচেন, হাসচেন, আদর আব্দার রঙ্গরস করচেন!

আর দেখতুম রাত্রিকালে মামার আদৌ ঘুম নাই। যখনি জেগেচি তখনি দেখেচি তিনি ভাবের ঘোরে কথা কইচেন, গান গাইচেন, বা পঞ্চবটীতে গিয়ে ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছেন!

কর্মচারীদের কেহ কেহ মন্দিরে গিয়া ঠাকুরের পূজাকালীন আচরণ প্রত্যক্ষ করিল, কিন্তু কেহই তাঁহাকে কিছু বলিতে সাহস পাইল না। হয় ছোট ভট্টাচার্য পাগল হইয়াছেন, নয় তো তাঁহাতে উপদেবতার আবেশ হইয়াছে, আর অনাচারে স্বেচ্ছাচারে দেবীর পূজা পণ্ড হইতেছে, তাহারা সিদ্ধান্ত করিল। মথুরবাবু সেই সংবাদ পাইলেন।

কাহাকেও কিছু না জানাইয়া মথুরবাবু একদিন পূজাকালে সহসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরের ক্রিয়াকলাপ দেখিতে লাগিলেন। ভাবে বিভোর ঠাকুর তখন মাকে লইয়াই ব্যস্ত; মন্দিরে কে আসিতেছে যাইতেছে সে বিষয়ে তাঁহার কোনই খেয়াল নাই, মথুরবাবু ইহা প্রথমেই বুঝিতে পারিলেন। পূজা করিতে করিতে তাঁহার নয়নধারা, উল্লাস, জড়বৎ ধ্যান ও বাহ্যবিষয়ে উদাসদৃষ্টি দেখিয়া মথুরের মন এক অপূর্ব আনন্দে পূর্ণ হইল। দেবতার আবির্ভাবে মন্দির জমজম করিতেছে তিনি অনুভব করিলেন। ছোট ভট্টাচার্য জগন্মাতার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছেন, তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইল।

অতঃপর সজলনয়নে জগন্মাতা ও তাঁহার অদ্ভুত পূজককে দূর হইতে বারবার প্রণাম করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন: এতদিনের পর দেবীপ্রতিষ্ঠা সার্থক হল, এতদিনে মার ঠিকঠিক পূজা হচ্চে, এতদিনে জগন্মাতা সত্যই এখানে আবির্ভূতা হলেন! কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেদিন তিনি বাড়ী ফিরিলেন। পরদিন মন্দিরের প্রধান কর্মচারীর উপর এই মর্মে তাঁহার নির্দেশ আসিল,—ভট্টাচার্য মহাশয় যে ভাবেই পূজা করুন না কেন, তাঁহাকে বাধা দিবে না।

মথুরবাবুর মুখে ঠাকুরের সপ্রেম সেবাপূজার বিবরণ শুনিয়া রাণী রাসমণি পুলকিতা হইলেন। জগন্মাতার কৃপালাভ যে ছোট ভট্টাচার্যের মত সরল পবিত্র হৃদয়ের পক্ষেই সম্ভব ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সাধিকা রাণীর

বিলম্ব হয় নাই। ইহার পরে একদিন তিনি স্বয়ং কালীবাটীতে আসিলেন ও স্নানান্তে মন্দিরে মাকে প্রণাম করিয়া আহ্নিকপূজা করিতে বসিলেন। মা-কালীর পূজা ও বেশ তখন হইয়া গিয়াছে। ছোট ভট্টাচার্য মন্দিরেই আছেন দেখিয়া রাণী তাঁহাকে মায়ের গান গাহিয়া শুনাইতে অনুরোধ করিলেন।

কাছে বসিয়া ও ভাবে বিভোর হইয়া ঠাকুর রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকদিগের পদাবলী একটার পর একটা গাহিয়া চলিয়াছেন, আর পূজা ও জপ করিতে করিতে রাণীও শুনিয়া যাইতেছেন। হঠাৎ ঠাকুরের ভাবভঙ্গ হইল ও গান বন্ধ করিয়া 'কেবল ঐ ভাবনা, এখানেও ঐ চিন্তা!'—উগ্রভাবে রুক্ষস্বরে এই কথাটি বলিয়াই তিনি রাণীর অঙ্গে চপেটাঘাত করিলেন। সন্তানের অন্যায় আচরণে কুপিত হইয়া পিতা যেমন কখন কখন দণ্ডবিধান করেন ঠাকুরেরও এখন ঠিক সেই ভাব। মন্দিরের কর্মচারী ও রাণীর পরিচারিকারা হৈচৈ করিয়া উঠিল। কিন্তু ঐ গোলযোগের প্রধান কারণ যাঁহারা—ঠাকুর ও রাণী রাসমণি—তাঁহারা উভয়েই এখন স্থির, গম্ভীর। কর্মচারীদের বকাবকি ছুটাছুটির প্রতি একান্ত উদাসীন ঠাকুর আপনাতে আপনি স্থির ও তাঁহার মুখে মৃদু মৃদু হাসি; আর জগন্মাতার ধ্যান না করিয়া আজ কেবলই একটি মকদ্দমার ফলাফল চিন্তা করিতেছিলেন বলিয়া রাণী অপ্রতিভ ও অনুশোচনায় গম্ভীর। পরে কর্মচারীদের চেঁচামেচিতে রাণীর চমক ভাঙ্গিল; হীনবুদ্ধি লোকেরা ঠাকুরের উপর অত্যাচার করিতে পারে বুঝিয়া গম্ভীরভাবে তিনি আদেশ করিলেন: ভটচাজ্যি মশায়ের কোন দোষ নাই; ওঁকে তোমরা কেউ কিছু বলবে না।

দিনে দিনে জগন্মাতার দর্শন-জনিত উল্লাস ঠাকুরের এতই বাড়িয়া যাইতেছিল যে, দেবীর নিত্যনৈমিত্তিক সেবাপূজা সম্পন্ন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। সেবাপূজার কালাকাল-বিচারও তাঁহার লোপ পাইয়াছিল। মাকে যখন যেরূপ সেবা করিবার ইচ্ছা তাঁহার হইত তিনি তখন সেইরূপই করিতেন। যেমন, পূজা না করিয়াই হয়তো ভোগ নিবেদন করিয়া দিলেন, কিংবা নিজের পৃথক্‌সত্তা একেবারে বিস্মৃত হইয়া পূজার

ফুলচন্দন দিয়া নিজের অঙ্গই ভূষিত করিয়া বসিলেন। ভিতরে বাহিরে মাকে দর্শন করিতেন অবিচ্ছেদে, তাঁহারই শ্রীমুখে শুনিয়াছেন তাঁহার পার্ষদ ভক্তেরা; আর সেই দর্শন কয়েক দণ্ড ব্যাহত হইলেই "আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িয়া মুখ ঘর্ষণ করিতে করিতে ব্যাকুল ক্রন্দনে দিক পূর্ণ করিতেন। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া প্রাণ ছটফট করিত। ··· সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরলিপ্ত হইয়া যাইতেছে, সে বিষয় লক্ষ্য হইত না। জলে পড়িলেন বা অগ্নিতে পড়িলেন, কখন কখন তাহারও জ্ঞান থাকিত না। পরক্ষণেই আবার শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শন পাইয়া ঐভাব কটিয়া যাইত এবং তাঁহার মুখমণ্ডল অদ্ভুত জ্যোতি ও উল্লাসে পূর্ণ হইত—তিনি যেন সম্পূর্ণ আর এক ব্যক্তি হইয়া যাইতেন।"

কালীবাটীর শিবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর একদিন 'শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্' পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী ।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥

সমুদ্ররূপ মসীপাত্রে নীলপর্বততুল্য কাজল, কল্পতরু পারিজাতের শ্রেষ্ঠ শাখা লেখনী, এবং পৃথিবী লিখিবার পত্রস্বরূপ যদি হয়, আর এই সমস্ত উপকরণ লইয়া যদি সরস্বতী সর্বকাল ধরিয়া লিখিতে থাকেন, তাহা হইলেও, হে ঈশ, তিনি তোমার গুণের পার পান না!

এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিবামাত্র তাঁহার এক অপূর্ব ভাবের উদয় হইল। 'মহাদেব গো, তোমার গুণের কথা আমি কেমন করে বলব!'—চীৎকার করিয়া ঐ একই কথা বারবার বলিতে লাগিলেন, আর দরদরিত ধারে অশ্রু ঝরিয়া, তাঁহার কপোল ও বক্ষ বাহিয়া মন্দিরতল সিক্ত করিতে লাগিল। ঠাকুরের সেই চীৎকার-ক্রন্দন শুনিয়া অনেক লোক ছুটিয়া আসিল ও নানাজনে নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিল। মথুরবাবু সেদিন ঠাকুরবাড়ীতে ছিলেন, ছোট ভট্টাচার্যকে নিয়া গোলমাল হইতেছে শুনিয়াই

তিনি আসিলেন ও তাঁহার ভাববিহ্বল অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কোন কর্মচারী জোর করিয়া ঠাকুরকে শিবের নিকট হইতে সরাইয়া আনিতে কহিলে বিরক্তির সহিত মথুর বলিয়াছিলেন, যার মাথার উপর মাথা আছে সেই যেন এখন ভটচাজ্যি মশায়কে স্পর্শ করতে যায়! কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের বাহ্য জগতের হুঁশ আসিল ও কর্মচারীদের সহিত মথুরবাবুকে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বালকবৎ ভীত হইয়া বলিলেন, 'আমি বেসামাল হয়ে কিছু করে ফেলেচি কি?' 'না বাবা, তুমি স্তবপাঠ করছিলে, পাছে কেউ না বুঝে তোমায় বিরক্ত করে তাই আমি এখানে দাড়িয়েছিলুম।' মথুর প্রণাম করিয়া কহিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শনের দিন হইতেই ঠাকুরের প্রতি মথুরবাবু আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তিনি যাহাতে এখানেই থাকিয়া যান তাহার জন্য চেষ্টাও করিয়াছিলেন আন্তরিকতাসহকারে। পূজাকর্মের আংশিক ভার লইয়া ঠাকুর যখন অবশেষে থাকিয়াই গেলেন, তখন হইতে মথুর তাঁহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ঠাকুরের বায়ুপ্রধান ধাত জানিয়া তাঁহার জন্য মিছরির পানার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং বিষয়ী লোকের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া সাধনপথে তাঁহার স্বচ্ছন্দ বিচরণের আনুকূল্য করিয়াছিলেন। কিন্তু রাণী রাসমণির অঙ্গে আঘাত করিয়া যেদিন ঠাকুর তাঁহাকে শিক্ষাদান করেন সেইদিন হইতে মথুর তাঁহার আধ্যাত্মিকতার সহিত উন্মত্ততার সংযোগ অনুমান করিয়া থাকিবেন। কারণ, দেখা যায় তিনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গা-প্রসাদ সেনের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।

কেবল চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াই মথুর নিরস্ত হন নাই, কিন্তু মনকে সুসংযত রাখিয়া ঠাকুর যাহাতে সাধনপথে অগ্রসর হন, ভাবের আতিশয্যে আত্মহারা হইয়া না পড়েন, তর্কযুক্তির সাহায্যে সেই বিষয় তাঁহাকে বুঝাইতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন। মথুরের একদিনের তর্কযুক্তি সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন: "মথুর বলেছিল, ঈশ্বরকেও আইন মেনে চলতে হয়; তিনি যা নিয়ম একবার করে দিয়েচেন তা রদ করবার ক্ষমতা

তাঁরও নাই। আমি বল্লুম, ও কী কথা তোমার? যার আইন, ইচ্ছে করলে সে তখনি তা রদ করতে পারে বা তার জায়গায় আর একটা আইন করতে পারে। ওকথা সে কিছুতেই মানলে না। বল্লে, লালফুলের গাছে লাল ফুলই হয়, সাদা ফুল কখনো হয় না; কেননা তিনি নিয়ম করে দিয়েচেন। কৈ, লালফুলের গাছে সাদা ফুল তিনি এখন করুন দেখি? আমি বল্লুম, তিনি ইচ্ছে করলে তাও করতে পারেন। সে কিন্তু ওকথা নিলে না। তার পরদিন ঝাউতলার দিকে শৌচে গেছি, দেখি যে একটা লাল জবাফুলের গাছে একই ডালে দুটো ফেঁকাড়িতে দুটো ফুল—একটি লাল, আর একটি ধপধপে সাদা, এক ছিটেও লাল দাগ তাতে নাই। দেখেই ডালটি-সুদ্ধ ভেঙ্গে এনে মথুরের সামনে ফেলে দিয়ে বল্লুম, এই দেখ। তখন মথুর বল্লে, হাঁ বাবা, আমার হার হয়েচে!"

কালীমন্দিরের নিয়মিত সেবাপূজার জন্য মথুরবাবু এখন অন্য ব্যবস্থা করা সঙ্গত মনে করিয়াছিলেন। ঠাকুরের খুড়তুতো ভাই রামতারক ওরফে হলধারী কাজের সন্ধানে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন, মথুরবাবুর অনুরোধে তিনিই এখন মা-কালীর পূজকের পদ গ্রহণ করিলেন।

হলধারী সুপণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান সাধক ছিলেন, শ্রীমদ্‌ভাগবত, অধ্যাত্ম-রামায়ণাদি গ্রন্থসকল নিত্য পাঠ করিতেন। বিষ্ণুর উপাসক হইলেও শক্তি-পূজার বিরোধী তিনি ছিলেন না, কিন্তু দেবীকে পশুবলি দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না। যে যে দিনে মন্দিরে পশুবলি বিহিত ছিল সেই সেই দিনে তিনি প্রসন্নমনে পূজা করিতে পারিতেন না। মাসেক কাল এইভাবে গত হইলে সন্ধ্যা করিতে বসিয়া হলধারী দেখিলেন: দেবী ভয়ঙ্করী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন,—আমার পূজা তোকে করতে হবে না, করলে সেবাপরাধে তোর ছেলের মৃত্যু হবে। মাথার খেয়াল ভাবিয়া হলধারী সেকথা গ্রাহ্য করিলেন না, কিন্তু কিছুকাল পরে সত্যসত্যই তাঁহার পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ আসিল। দেবীপূজায় বিরত হইয়া তিনি শ্রীশ্রীরাধাকান্তের পূজা করিতে লাগিলেন এবং একেবারে পাকা ধারণা করিয়া বসিলেন যে, কালী তমোগুণময়ী বা তামসী দেবতা।

ঐরূপ ধারণার বশে তিনি একদিন ঠাকুরকে বলিয়াও বসিলেন: তামসী মূর্তির উপাসনায় কখনো আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে পারে কি? তুমি ঐ দেবীর আরাধনা কর কেন? ইষ্টনিন্দা শুনিয়া ঠাকুর ব্যথিত হইলেন এবং কালীমন্দিরে গিয়া সাশ্রুনয়নে মাকে প্রশ্ন করিলেন: মা, হলধারী শাস্ত্রজানা পণ্ডিত লোক, সে তোকে তমোগুণময়ী বলে; তুই কি সত্যিই তাই? মার মুখে মার স্বরূপতত্ত্ব শুনিয়া ঠাকুর সহর্ষে হলধারীর কাছে ছুটিয়া গেলেন ও ভাবাবেশে তাঁহার স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া উত্তেজিতভাবে বলিলেন: তুই মাকে তামসী বলিস? মা কি তামসী? মা যে সব— ত্রিগুণময়ী, আবার শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ী। হলধারীর অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া গেল। তিনি তখন বিষ্ণুঘরে পূজার আসনে বসিয়াছিলেন, ঠাকুরের মধ্যে জগদম্বাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ভক্তির সহিত তাঁহার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দান করিলেন।

সাধন-সমীক্ষা ও অন্যান্য কথা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলিয়াছিলেন: "দেখলাম খোলটি ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাইরে এল; এসে বল্লে, 'আমি যুগে যুগে অবতার।' তখন ভাবলাম, বুঝি মনের খেয়ালে ঐসব কথা বলচি। তারপর চুপ করে থেকে দেখলাম। তখন দেখি আপনি বলচে, 'শক্তির আরাধনা চৈতন্যও করেছিল।" [কথামৃত]

এই কথায় স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, ঠাকুরের মধ্যে যেন আপাতভিন্ন দুইটি 'আমি' রহিয়াছে। একটি ভক্তের বা সাধকের আমি, আর একটি ভগবানের বা সাধ্যের আমি। সাধ্যবস্তু সচ্চিদানন্দই প্রকারান্তরে শক্তি বা আদ্যাশক্তি হইয়াছেন। ত্রিগুণাত্মিকা, জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের আদিভূতা ও নিয়ামিকা এই মহাশক্তিকে শ্রীরামকৃষ্ণ আরাধনা করিয়াছিলেন মাতৃভাবে, জগদম্বার বালক হইয়া।

'জৈবভাবে আচরণ জীবের উদ্ধারে।' পুঁথিকার লিখিয়াছেন। 'নরলীলা নরবৎ', 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে' ইত্যাদি ঠাকুরের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া লীলাপ্রসঙ্গকার লিখিয়াছেন: "নরশরীর স্বীকার করিয়া ভগবানকে নরের ন্যায় সুখদুঃখ ভোগ করিতে এবং নরের ন্যায় উদ্যম, চেষ্টা ও তপস্যা দ্বারা সকল বিষয়ে পূর্ণত্ব লাভ করিতে হয়।"

'লীলা ঠিক যাত্রা করা মায়া-বেশ গায়।' অভিনয়ে সেই সেই ভাবের আবেশ আসিয়া উপস্থিত হইলেই অভিনয় জমে, উহা স্বাভাবিক ও মর্মস্পর্শী হয়। শ্রীরামচন্দ্র সীতা-হারা হইয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। অবতার-পুরুষের জীবনে এই স্বরূপবিস্মৃতি অস্বীকার করিলে তৎকৃত সাধনা অর্থহীন হইয়া পড়ে, এবং আমাদের মত দুর্বল মানবের প্রতি করুণায় অনুষ্ঠিত ঐ সাধনার উদ্দেশ্য ও ফল আমাদের জীবনে কার্যকর হইতেও বাধা জন্মে।

বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট ও শ্রীচৈতন্য এই তিনজন অবতার-খ্যাত মহাপুরুষ, যাঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া কথিত হন, তাঁহারাও প্রত্যেকে কঠোর সাধনা করিয়াছেন দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যের সাধনা সম্বন্ধে তাঁহার

অনুগামীরা বলিয়াছেন : 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়' ; 'হরি হয়ে বলচে হরি' ইত্যাদি কথা।

অবতার-পুরুষগণের আচরণ হইতেই ভারতে শক্তিপূজা বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছে। তাঁহাদের শক্তি-উপাসনার কারণ সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছেন—সকলেই সেই মহামায়া আদ্যাশক্তির অধীনে ; অবতার-আদি পর্যন্ত মায়া আশ্রয় করিয়া তবে লীলা করেন, তাই তাঁহারা আদ্যাশক্তির পূজা করেন।

শ্রীরামচন্দ্রের শক্তিপূজা বা দুর্গাপূজা পুরাণপ্রসিদ্ধ। ঠাকুরের উক্তি হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ রাধা-যন্ত্র কুড়াইয়া পাইয়া তাহা লইয়া অনেক সাধনা করিয়াছিলেন। 'যন্ত্র ব্রহ্মযোনি, তাঁরই পূজা, তাঁরই ধ্যান। এই ব্রহ্মযোনি থেকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হচ্চে।'

শ্রীশঙ্করাচার্য শক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন কাঞ্চীর ৺কামাক্ষী-মন্দিরে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠে ত্রিপুরা-যন্ত্র স্থাপিত আছে ও সেই যন্ত্রে পূজা হয়। সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে নানাভাবে ভগবতীর প্রসন্নতালাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা সরস্বতীর অবতার 'উভয়ভারতী'র নিকট বর-গ্রহণ হইতেই বুঝা যায়।

ঠাকুর এই স্থূল-সূক্ষ্ম জগৎপ্রপঞ্চকে 'শক্তির এলাকা' বলিতেন। শক্তির এলাকার মধ্যে বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় বহুকালস্থায়ী ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, প্রবল ধর্মতরঙ্গে দেশ আপ্লাবিত করিতে হইলে, আগে তাঁহার প্রসন্নতা-লাভ অত্যাবশ্যক।

পূর্বে বলা হইয়াছে, ঠাকুর তাঁহার সাধনকালের প্রথমদিকে কেনারাম ভট্টাচার্যের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াই কেনারাম কোথায় যে চলিয়া গেলেন তাহা কেহই বলিতে পারে নাই। তাঁহার তিনচারি বৎসর-ব্যাপী সাধনার বিভিন্ন অবস্থায় বাহির হইতে নির্দেশ দিয়া পরিচালিত করিতে পারে এমন কাহারও সাহায্যই তিনি পান নাই। নিজের আজন্মশুদ্ধ মনের নির্দেশে তিনি ঐকালে পরিচালিত হইয়াছিলেন সর্বতোভাবে।

'শেষকালে মনই গুরু হয়', ঠাকুর বলিতেন। এই মন সাধনা-পরিশুদ্ধ মন, যে কখনও ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে না, এবং গন্তব্য লক্ষ্যে আশু পৌঁছাইয়া দেয়। তিনি আরও বলিতেন, 'শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা একই বস্তু।'

লীলাপ্রসঙ্গকার লিখিয়াছেন : "ঠাকুরের আজন্ম পরিশুদ্ধ মন গুরুর ন্যায় পথ প্রদর্শন করিয়া সাধনার প্রথম চারি বৎসরেই তাঁহাকে ঈশ্বরলাভ বিষয়ে সিদ্ধকাম করিয়াছিল। তাঁহার নিকটে শুনিয়াছি, উহা তাঁহাকে ঐকালে কোন্ কার্য করিতে হইবে এবং কোন্‌টি হইতে বিরত থাকিতে হইবে তাহা শিক্ষা দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল না, কিন্তু সময়ে সময়ে মূর্তিপরিগ্রহপূর্বক পৃথক্ এক ব্যক্তির ন্যায় দেহমধ্য হইতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সাধনপথে উৎসাহিত করিত, ভয় প্রদর্শনপূর্বক ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিত, অনুষ্ঠানবিশেষ কেন করিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিত এবং কৃতকার্যের ফলাফল জানাইয়া দিত। ঐকালে ধ্যান করিতে বসিয়া তিনি দেখিতেন, শাণিতত্রিশূলধারী জনৈক সন্ন্যাসী দেহমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, 'অন্য চিন্তাসকল পরিত্যাগপূর্বক ইষ্টচিন্তা যদি না করিবি ত এই ত্রিশূল তোর বুকে বসাইয়া দিব।' ... দূরস্থ দেবদেবীর মূর্তি-দর্শনে অথবা কীর্তনাদি-শ্রবণে অভিলাষী হইয়া ঐ সন্নাসী যুবক কখন কখন ঐরূপে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জ্যোতির্ময় পথে ঐসকল স্থানে গমন করিতেন এবং কিয়ৎকাল আনন্দ উপভোগপূর্বক পুনরায় পূর্বোক্ত জ্যোতির্ময় বর্ত্ম অবলম্বনে আসিয়া তাঁহার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেন।...

"সাধনকালের প্রায় প্রারম্ভ হইতে ঠাকুর দর্পণে দৃষ্ট প্রতিবিম্বের ন্যায় তাঁহারই অনুরূপ আকারবিশিষ্ট শরীরমধ্যগত ঐ যুবক সন্ন্যাসীর দর্শন পাইয়াছিলেন এবং ক্রমে সকল কার্যের মীমাংসাস্থলে তাঁহার পরামর্শমত চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।"

ঠাকুরের উক্তি হইতে আরও জানা যায় : যখন তখন দেহ হইতে বাহির হইয়া ঐ সন্ন্যাসী যুবক সকল বিষয়ে তাঁহাকে উপদেশ করিতেন। তিনি

বাহিরে আসিলে বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায় হইত, কখন বা একেবারেই লোপ পাইত, আর জড়বৎ পড়িয়া থাকিয়া ঠাকুর কেবল তাঁহারই চেষ্টা দেখিতে ও কথা শুনিতে পাইতেন। তাঁহার মুখ হইতে যেসকল তত্ত্বকথা তিনি শুনিয়াছিলেন, পরবর্তী কালের লৌকিক গুরুগণ—ভৈরবী ব্রাহ্মণী, ন্যাংটা তোতাপুরী প্রভৃতি—সেই সকল কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন; আগে হইতেই যাহা তিনি জানিতেন তাহাই আবার জানাইয়া দিয়াছিলেন। আর সেইজন্যই, শাস্ত্রবিধির মর্যাদা রক্ষা করা ব্যতীত, তাঁহাদিগকে গুরুরূপে গ্রহণ করার অপর কোন প্রয়োজন তিনি দেখিতে পাইতেন না।

ভাবমুখে জগন্মাতার দর্শনলাভের পর নিজের কুলদেবতা ৺রঘুবীরের দিকে ঠাকুরের মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। মহাবীর হনুমানের মত ঐকান্তিক দাস্যভক্তিতেই শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনলাভ সম্ভব বুঝিয়া তিনি নিজেতে মহাবীরের ভাব আরোপ করিয়াছিলেন এবং সর্বদা মহাবীরের চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া কিছুদিনের জন্য নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন: ঐ সময়ে আহার-বিহার সব কাজ হনুমানের মত করতে হত—ইচ্ছা করে যে করতুম তা নয়, আপনা আপনিই হয়ে পড়ত। পরবার কাপড়খানাকে লেজের মত করে কোমরে জড়িয়ে বাঁধতুম, লাফিয়ে চলতুম, ফলমূল ছাড়া আর কিছুই খেতুম না—তাও আবার খোসা ফেলে খেতে প্রবৃত্তি হত না, গাছের উপরেই অনেক সময় থাকতুম, আর সর্বদা রঘুবীর রঘুবীর বলে গম্ভীরস্বরে চীৎকার করতুম। চক্ষু দুইটি তখন সর্বদাই চঞ্চল থাকত, আর আশ্চর্যের বিষয়, মেরুদণ্ডের শেষভাগটা ঐসময়ে প্রায় এক ইঞ্চি বেড়ে গিয়েছিল।

তিনি আরও বলিতেন: এইকালে একদিন পঞ্চবটীতলায় বসে ছিলুম—ধ্যানচিন্তা কিছু যে করছিলুম তা নয়, অমনি বসেছিলুম—এমন সময়ে এক নিরুপমা স্ত্রীমূর্তির আবির্ভাব হল, আর তাঁর অঙ্গের আভায় স্থানটি আলোকিত হয়ে উঠল। সেই মূর্তিকেই যে কেবল দেখতে পাচ্ছিলুম তা নয়, পঞ্চবটীর গাছপালা, গঙ্গা, সব কিছুই দেখতে পাচ্ছিলুম। দেখলুম মূর্তিটি মানবীর, দেবীমূর্তির মত ত্রিনয়না নয়। কিন্তু প্রেম-দুঃখ-করুণা-

সহিষ্ণুতায় পূর্ণ সেই মুখের অপূর্ব তেজ আর গম্ভীর [illegible] বড় একটা দেখা যায় না। প্রসন্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে [illegible] করে [illegible] ধীরে ধীরে উত্তর থেকে দক্ষিণে, আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। [illegible] হয়ে ভাবছি, কে ইনি? এমন সময় একটা হনু[illegible] কোথা থেকে [illegible] উ-উপ্ শব্দ করে এসে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল, আর ভিতর থেকে মন বলে উঠল, 'সীতা, জনমদুঃখিনী সীতা, জনকরাজনন্দিনী সীতা, রামময়জীবিতা সীতা!' তখন মা, মা, বলে অধীর হয়ে পায়ে পড়তে যাচ্চি, এমন সময় তিনি চকিতে এসে (নিজ শরীর দেখাইয়া) এর ভিতর ঢুকে গেলেন! আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলুম। ধ্যানচিন্তা কিছু না করে এমনভাবে কোন দর্শন এর আগে আর হয় নি। জনমদুঃখিনী সীতাকে সকলের আগে দেখেছিলুম বলেই বোধ হয় তাঁর মত আজীবন দুঃখভোগ করচি!

মা-সীতার হাসি ছিল অতি মধুর; এই দর্শনের ফলে তাঁহার সেই ভুবনমোহন হাসিটিও ঠাকুর পাইয়াছিলেন। অন্য এক সময়ে একথা তিনি বলিয়াছিলেন।

পঞ্চবটীর পূর্বদিকে হাঁসপুকুর নামে যে পুষ্করিণীটি আছে উহা এই সময়ে ঝালানো হইয়াছিল। উহার মাটি ফেলিয়া নিকটস্থ নিম্ন জমি ভরাট করা হয়, আর ইহার ফলে ঠাকুর যে আমলকী বৃক্ষের তলায় ধ্যান করিতেন সেই বৃক্ষটি নষ্ট হইয়া যায়।

তপস্যার অনুকূল একটি নূতন পঞ্চবটী করিতে অভিলাষী হইয়া ঠাকুর এখন যেখানে সাধনকুটীর আছে উহার পশ্চিমে স্বহস্তে একটি অশ্বত্থবৃক্ষ রোপণ করেন ও হৃদয়কে দিয়া বট, অশোক, বেল ও আমলকী বৃক্ষের চারা রোপণ করান। তারপরে তুলসী ও অপরাজিতার অনেকগুলি চারা দিয়া সমগ্র স্থানটি বেষ্টন করাইয়া লন। ছাগল-গরুর কবল হইতে চারাগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি ঐ বেষ্টনীর চারিদিকে বেড়া দেওয়ার সংকল্প করেন, আর ইহার কিছুক্ষণ পরেই গঙ্গায় বান ডাকিয়া বেড়ার উপযোগী যাবতীয় দ্রব্য—একখানি কাটারি-সমেত কতকগুলি গরাণের

[illegible]টি, [illegible] [illegible]—আঁটি-বাঁধা অবস্থায় সেখানে ভাসিয়া [illegible] [illegible] [illegible]থায় বাগানের মালী ভর্তাভারী বেড়াটি কবিয়া [illegible]

[illegible] ও সিদ্ধপুরুষেরা সময়ে সময়ে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আসিয়া [illegible]র আতিথ্যে কয়েকদিন বাস করিতেন। ইঁহাদের কাহারও উপদেশানুসারে ঠাকুর এই সময়ে হঠযোগের প্রাণায়ামাদি ক্রিয়াসকল অভ্যাস করিয়া থাকিবেন। পরজীবনে হঠযোগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি-দিগকে তিনি বলিতেন: ওসব সাধন একালের পক্ষে নয়। কলির জীব অল্পায়ু, অন্নগতপ্রাণ; হঠযোগে শরীরটা শক্ত কবে নিয়ে তাবপরে ঈশ্বর'কে ডাকবে, তার সময় কোথায়? হঠযোগের ক্রিয়া অভ্যাস করতে হলে সিদ্ধ গুরুর সঙ্গে সর্বদা থাকতে হয়, আহার বিহার সব বিষয়ে তাঁর উপদেশ নিযে কঠোর নিয়ম মেনে চলতে হয়। নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম হলে ব্যাধি হতে পারে, অনেক সময়ে মৃত্যুও হয়ে থাকে। সেজন্যে ওসব করাব দরকার নাই। ভক্তিযোগে কুম্ভক আপনি হয়। কলিকালে জীব অল্পায়ু আব অল্পশক্তি বলে ভগবান কৃপা করে তাঁকে লাভ করার পথও সুগম করে দিয়েচেন। স্ত্রী-পুত্রের মৃত্যুতে প্রাণে যেরূপ ব্যাকুলতা আর শূন্যতাবোধ আসে, ঈশ্বরের জন্যে সেরূপ ব্যাকুলতা কারো প্রাণে চব্বিশ ঘণ্টা মাত্র স্থাযী হলে তিনি তাকে দেখা দিবেনই দিবেন।

কোন কারণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলধারীব লোকে ভিতরে ভিতরে নিন্দা করিতেছে জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলেন। হলধাবী তাহাতে হিতে বিপরীত বুঝিয়া রোষভরে কহিলেন, কনিষ্ঠ হয়ে তুই আমাকে অবজ্ঞা করলি, তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে। ঠাকুর তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি কোন কথাই শুনিতে চাহিলেন না। হলধারী বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন।

একদিন রাত্রে ঠাকুরের তালুদেশ সহসা অতিশয় সড়সড় করিয়া মুখ দিয়া সত্যসত্যই রক্ত বাহির হইতে লাগিল। ঠাকুর বলিয়াছিলেন: সিমপাতার রসের মত মিস্‌কালো তার রঙ, এত গাঢ় যে কতক বাইরে

পড়তে লাগল, আর কতক মুখের ভিতরে জমে গিয়ে দাঁত থেকে বটের জটের মত ঝুলতে লাগল। মুখের ভিতর কাপড় চাপা দিয়ে রক্ত বন্ধ করতে চেষ্টা করলুম, তবুও থামল না দেখে বড় ভয় হল। সংবাদ পেয়ে সবাই ছুটে এল। হলধারী তখন মন্দিরে সেবার কাজ সারছিল, সেও শশব্যস্ত হয়ে এসে পড়ল। তাকে বল্লুম, দাদা, শাপ দিয়ে তুমি আমার এ কী অবস্থা করলে, দেখ দেখি! আমার কাতরতা দেখে সেও কাঁদতে লাগল। কালীবাড়ীতে সেদিন একজন প্রাচীন বিজ্ঞ সাধু এসেছিলেন, গোলমাল শুনে তিনিও দেখতে এলেন। রক্তের রঙ আর মুখের ভিতরে যে স্থানটা থেকে তা বেরুচ্চে তা পরীক্ষা করে বল্লেন: 'রক্ত বেরিয়ে গিয়ে ভালই হয়েচে। দেখচি তুমি যোগ-সাধনা করতে। হঠযোগের চরমে জড় সমাধি হয়, তোমারও তাই হচ্ছিল। সুষুম্নাদ্বার খুলে গিয়ে শরীরের রক্ত মাথায় উঠছিল। মাথায় না উঠে ঐ রক্ত যে মুখের ভিতরে একটা বেরিয়ে যাবার পথ আপনাআপনি করে নিয়ে বেরিয়ে গেল, এতে বড়ই ভাল হল। জড় সমাধি হলে তা কিছুতেই ভাঙ্গত না। তোমার শরীরটার দ্বারা জগন্মাতার বিশেষ কোন কাজ আছে, তাই তিনি তোমাকে এভাবে রক্ষা করলেন।' সাধুর কথা শুনে আশ্বস্ত হলুম।

মানুষকে 'ক্ষুদ্র আমি'তে আবদ্ধ করিয়া রাখে এমন কতকগুলি প্রবল সংস্কার মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য ঠাকুর এই সময়ে এক অশ্রুতপূর্ব কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি সচ্চিদানন্দ ভগবানকে লাভ করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়াছে তাহার কাছে মৃত্তিকা ও কাঞ্চন তুল্যমূল্য, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া—এই ধারণা সুদৃঢ় করিবার জন্য—তিনি কয়েকটি মুদ্রা ও মাটি হাতে করিয়া বারবার 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলিতে বলিতে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণত্বের অভিমান দূর করিবার ও সর্বজীবে শিবজ্ঞান দৃঢ় করিবার জন্য তিনি কাঙ্গালীদের ভোজনাবশেষ প্রসাদজ্ঞানে মুখে দিয়া, তাহাদের উচ্ছিষ্ট পত্রাদি মাথায় করিয়া ফেলিয়া আসিয়া, ঝাঁটা-হাতে তাহাদের ভোজনস্থান পরিষ্কার করিয়াছিলেন; মেথর অপেক্ষাও তিনি কোন অংশে বড় নহেন এইরূপ

ধারণা করিয়া স্বহস্তে অশুচি স্থান ধৌত করিয়াছিলেন; এবং চন্দন হইতে বিষ্ঠা পর্যন্ত সকল বস্তুই পঞ্চভূতের বিকার জানিয়া হেয়োপাদেয়-জ্ঞান দূর করিবার জন্য জিহ্বা দ্বারা অপরের বিষ্ঠা স্পর্শ করিয়াছিলেন।

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে রাণী রাসমণি ও তাঁহার জামাতা মথুরবাবু ভাবিয়াছিলেন, অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের জন্যই ঠাকুরের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে এবং উহাই আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতারূপে প্রকাশ পাইতেছে। ঐরূপ ধারণার বশে বিভিন্ন সময়ে তাঁহারা দুইজনেই তাঁহার ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রাণী রাসমণিই ঠাকুরকে প্রথম প্রলোভিত করিতে গিয়াছিলেন দুইটি সুসজ্জিতা সুন্দরী বারাঙ্গনা প্রেরণ করিয়া রাত্রিকালে তাঁহার ঘরে, দক্ষিণেশ্বরে। আর মথুরবাবু উহা করিয়াছিলেন মেছুয়াবাজার পল্লীর এক বাড়ীতে, অনেক আটঘাট বাঁধিয়া, লছমীবাঈ-প্রমুখ কলিকাতার তৎকালীন শ্রেষ্ঠহাবভাবসম্পন্না সতরটি সুন্দরী যুবতীর পাতা ফাঁদে সহসা ঠাকুরকে রাখিয়া আসিয়া। ঐসকল বারনারীর মধ্যেও গৌরীকে প্রত্যক্ষ করিয়া ঠাকুর মা, মা, বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন ও তাঁহার ইন্দ্রিয় সঙ্কুচিত হইয়া দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

দেখিয়া চাঁদের মেলা চক্ষের উপর।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে হয় আবেশের ভর॥
খসিল কটির বাস দিগম্বর তনু।
রূপোজ্জ্বল কলেবর যেন বাল ভানু॥
মোহিনী-মোহিত কণ্ঠে শ্যামা-গুণগান।
ভাবে স্বরে তালে লয়ে সর্বাঙ্গে সমান॥
সুগায়িকা বেশ্যাগণ স্তব্ধ গীত শুনি।
বেদের বাঁশীর স্বরে যেমন নাগিনী॥

... ...

শ্যামা-গীত গাইতে গাইতে শ্রীপ্রভুর।
গভীরসমাধিগত, বাহ্য গেল দূর॥

অশ্রুত অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার দেখিয়ে।
সশঙ্কিত-চিত যত বারাঙ্গনা মেয়ে॥
মূর্ছাগত দেখি যেন নিজের সন্তান।
স্নেহময়ী জননীর আকুল পরাণ॥
সেইমত হইল যত বারাঙ্গনাগণে।
সুশীতল জল কেহ সিঞ্চে শ্রীবদনে॥
কেহ বা ব্যজন করে ব্যাকুলা হইয়ে।
বুদ্ধিশূন্যে অন্যে কেহ ডাকে ফুকুরিয়ে॥
মথুর শুনিয়া গোল আইল ত্বরায়।
আসিলে কিঞ্চিৎ বাহ্য ফেটিনে উঠায়॥

ফিটন-গাড়ীতে করিয়া মথুরবাবু ঠাকুরকে গড়ের মাঠে বেড়াইতে লইয়া যান ও ফিরিবার পথে মেছুয়াবাজারে আসেন। এইরূপে ফিটন-গাড়ীতে বেড়াইতে বাহির হইয়া ঠাকুরকে তিনি কেল্লা, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর ইত্যাদি দেখাইয়াছিলেন।

বিবাহ

ঠাকুর পূজার কাজ আর করিতে পারিতেছেন না বায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়া, এই সংবাদ যখন কামারপুকুরে গিয়া পৌঁছিল, তাঁহার মা চন্দ্রাদেবীর ও ভাই রামেশ্বরের দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না। জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমার এই সেদিন, দুই বৎসরও হয় নাই, দেহরক্ষা করিয়াছে অকালে, বিদেশে থাকিয়া; এখন আবার কনিষ্ঠপুত্র গদাধরও পাগল হইল! নিয়তির এই উপর্যুপরি আঘাত জননী আর সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। অধীরা হইয়া পুত্রকে তিনি গৃহে ফিরাইয়া আনিলেন এবং তাহাকে নিরাময় করিবার জন্য ঔষধব্যবহার ও শান্তিস্বস্ত্যয়ন, ঝাড়ফুঁক প্রভৃতি দৈবক্রিয়াসকল করাইয়া যাইতে লাগিলেন।

গৃহে ফিরিয়া অনেক সময়ে পূর্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ থাকিলেও, ঠাকুর মাঝে মাঝে মা, মা, বলিয়া ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতেন, কখন বা ভাবাবেশে বাহ্যহারা হইতেন। লোকে দেখিল, তাঁহার স্বভাবে সরলতা সত্যনিষ্ঠা দেবভক্তি মাতৃভক্তি বয়স্যপ্রীতি প্রভৃতি গুণগুলি আগেকার মতই রহিয়াছে, আর সাংসারিক সকল বিষয়ে উদাসীনতা, ঘৃণালজ্জাভয়রহিত হইয়া সাধারণ মানুষের অজানা বস্তুবিশেষ পাইবার জন্য কান্নাকাটি, এই সব নূতন উপসর্গের সংযোগ ঘটিয়াছে। তাহাদের ধারণা হইল, তিনি উপদেবতাবিষ্ট হইয়াছেন।

সকলের পরামর্শে, ওঝা আনাইয়া উপদেবতার আবেশ দূর করার ব্যবস্থাও হইল। ঠাকুর বলিয়াছেন: একদিন একজন ওঝা এসে একটা মন্ত্রপূত পলতে পুড়িয়ে শুঁকতে দিল; বল্লে, যদি ভূত হয় তো পালিয়ে যাবে। কিন্তু কিছুই হল না। পরে কয়েকজন প্রধান ওঝা পূজাদি করে একদিন রাত্রে চণ্ড নামাল। চণ্ড পূজা-বলি পেয়ে প্রসন্ন হয়ে তাদিকে বল্লে, 'ওকে ভূতে পায় নাই, ওর কোন ব্যাধিও হয় নাই।' তারপরে সবার সুমুখে আমাকে ডেকে বল্লে, 'গদাই, তুমি সাধু হতে চাও, তবে অত সুপুরি খাও কেন? বেশী সুপুরি খেলে কাম বাড়ে।' আগে আমি সত্যই

সুপুরি খেতে বড় ভালবাসতুম আর যখন তখন খেতুম, চণ্ডের কথায় সেইদিন থেকে তা ত্যাগ করলুম।

দেশে কয়েক মাস থাকিয়া ঠাকুর অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। জগন্মাতার দর্শনাদি পুনঃপুনঃ লাভ করিয়াই তিনি শান্ত হইয়া থাকিবেন। কামারপুকুরের দুইদিকে অবস্থিত শ্মশান দুইটিতে তিনি দিবা ও রাত্রির অনেক সময় একাকী কাটাইতেন, এবং নূতন হাঁড়িতে করিয়া মিষ্টান্নাদি খাদ্যদ্রব্য লইয়া গিয়া শিবা ও উপদেবতাদিগকে মধ্যে মধ্যে বলি প্রদান করিতেন। দলে দলে শিবাসমূহ আসিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত বলি খাইয়া ফেলিত এবং উপদেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত বলির হাঁড়িসমূহ ঊর্ধ্বে উঠিয়া শূন্যে বিলীন হইয়া যাইত। উপদেবতাদিগকে তিনি দেখিতে পাইতেন। একএক দিন রাত্রি দুই প্রহর গত হইলেও তিনি ফিরিতেন না, রামেশ্বর শ্মশানের কাছে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেন আর তিনিও উচ্চকণ্ঠে বলিতেন: যাচ্চি গো দাদা, তুমি এদিকে আর এগিয়ো না, তা হলে এরা তোমার অপকার করবে। নিজের হাতে তিনি একটি বেলগাছ পুঁতিয়াছিলেন ভূতির খালের শ্মশানে ; ওখানকার প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষের তলে বসিয়া অনেক সময় জপধ্যান করিতেন।

একদিন শ্রীপ্রভুর কি হইল মন।
ভাবেতে বিভোর, গোটা দিন অনশন ॥

... ...

ভাগ্যবতী ভিক্ষামাতা ধনী কামারিণী।
প্রভুর ভাবের ভাব বুঝিতেন তিনি ॥
সম্বোধিয়া সকলেরে কহিল তখন।
গদায়ে খাওয়াতে কিবা কার আছে মন ॥
সত্বর আনহ হেথা সংগ্রহ করিয়ে।
যা যার মনের সাধ লহ মিটাইয়ে ॥
এত শুনি গৃহমুখে চলিল সকল।
কেহ মিষ্টি কেহ দুধ কেহ আনে ফল ॥

... ...

মুখে তুলে দেয় দ্রব্য মনোমত যার।
ভাবাবেশে প্রভুদেব করেন আহার॥
কতই খাইলা প্রভু নাহি বাহ্যোদয়।
এখনও কে আছে বাকি ভিক্ষামাতা কয়॥
যে হও সে হও নাহি ভয় নাহি মানা।
আনিয়ে মিটায়ে লহ মনের বাসনা॥
একজন ছিল ডোম ভাবিয়া না পায়।
কি দ্রব্য আনিয়ে দিবে প্রভুর সেবায়॥

... ...

একমাত্র কুঁড়ে ঘর সম্পত্তির সার।
কাঁঠালের গাছ আছে নিকটে তাহার॥
এতই ঘরের কাছে চালে ঠেকে ডাল।
দেখিল তাহাতে এক সুপক্ক কাঁঠাল॥
আনন্দের সীমা নাই মাথায় করিয়ে।
প্রভুকে খাইতে দিল কাঁঠাল আনিয়ে॥

... ...

দীনভক্ত-দত্ত ফল করিলে ভক্ষণ।
তবে না আসিল অঙ্গে বাহ্যিক চেতন॥

ঠাকুর এখন আর পূর্বের মত ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করেন না, যথাসময়ে স্নানাহার করেন, এবং প্রায় সকল বিষয়েই সাধারণ মানুষের মত আচরণ করেন দেখিয়া তাঁহার মাতা প্রভৃতির ধারণা হইল তাঁহার বায়ুরোগ প্রায় সারিয়া গিয়াছে। ঠাকুরদেবতা নিয়া থাকা, শ্মশানে বিচরণ করা বা কখন কখন দিগম্বর হইয়া ধ্যান করা—এই কাজগুলি অনন্যসাধারণ হইলেও তিনি বরাবর করিতেন। তবে তাঁহার সাংসারিক সকল বিষয়ে উদাসীনতা ও উন্মনাভাবটি এখন দূর করা আবশ্যক; যতদিন উহা না হইবে, তাঁহার বায়ুরোগে পুনরাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনাও থাকিয়া যাইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার মাতা ও মধ্যমাগ্রজ এখন তাঁহার বিবাহ দেওয়া সঙ্গত মনে করিলেন। পাত্রীর অনুসন্ধান চলিতে লাগিল গোপনে, ঠাকুরকে না

জানাইয়া; কিন্তু চতুরশিরোমণির তাহা জানিতে বিলম্ব হয় নাই একদিনও। বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, বাড়ীতে কোন আনন্দের অনুষ্ঠান হইবে শুনিলে বালক-বালিকারা যেমন খুশী হয়, বিবাহের কথায় তিনিও সেইরূপ খুশী হইয়াছিলেন।

হইলে বিয়ার কথা প্রভু অতি খুসি।
কথার উত্তর দেন মৃদুমন্দ হাসি ॥
মনমত ঘটে কন্যা, মিটে মনসাধ।
হয় যেন গাছ্‌তলা কর আশীর্বাদ ॥

বহু অনুসন্ধানেও কিন্তু মনোমত পাত্রী পাওয়া যাইতেছিল না। চলনসই দুইএকটি পাওয়া গেলেও তাহাদের অভিভাবক এত বেশী পণ দাবি করিয়াছিল যে, সেই পণ দিবার সামর্থ্য এই গরীব পরিবারের ছিল না। তাঁহার বিবাহের জন্য সকলেই চিন্তাকুল হইয়াছে দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন ভাবাবিষ্ট হইয়াঃ 'জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্যের মেয়েটি কুটো বেঁধে রাখা আছে, দেখ্‌গে যা!'

জয়রামবাটী গ্রামখানি কামারপুকুরের উত্তরপশ্চিমে মাত্র দেড়ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন পুরুষানুক্রমে জয়রামবাটী গ্রামের বাসিন্দা। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরীর পিত্রালয় শিহড় গ্রামে ছিল বলিয়া ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়রামকে তিনি পূর্ব হইতেই জানিতেন। বিবাহের ঘটকালি করিতে হৃদয় জয়রামবাটীতে প্রেরিত হইল ও বাক্‌চাতুর্যে সকলকে মোহিত করিয়া একদিনেই সে রামচন্দ্রের প্রথমজাতা কন্যা শ্রীমতী সারদার সহিত তাহার কনিষ্ঠ মাতুলের বিবাহের কথা পাকা করিয়া আসিল। শুভদিনে শুভক্ষণে রামেশ্বর তাঁহার ভ্রাতাকে জয়রামবাটীতে লইয়া গিয়া তাঁহার শুভ পরিণয়ক্রিয়া সুসম্পন্ন করাইলেন। তখন ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসের শেষভাগ এবং ঠাকুর তখন চতুর্বিংশ বর্ষে ও শ্রীমতী সারদা ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। বিবাহে কন্যাপক্ষকে তিনশত টাকা পণ দিতে হইয়াছিল।

জ্বালিয়া সাতাশ কাঠি বিবাহের কালে।
ঘুরে ঘরে বরে ঘেরে রমণীসকলে॥
জ্বালা কাঠি লাগিয়া কি হৈল শুন কথা।
পুড়ে গেল শ্রীপ্রভুর মাঙ্গলিক সূতা॥
হরিদ্রা-মাখান সূতা ছিল বাঁধা হাতে।

... ...

চিরশক্তি আপনার করিয়া গ্রহণ।
ছলে পুড়াইয়া দিলা অবিদ্যা-বন্ধন॥

বিবাহের পরদিন বর-বধূ কামারপুকুরে নিজগৃহে শুভাগমন করিলে ক্ষুদ্র এই সংসারটি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই আনন্দের বার্তা বহন করিয়া সমবেত রমণীগণের উচ্চ উলুধ্বনি ও শঙ্খারাব দিকে দিকে প্রসৃত হইয়াছিল। এই কামারপুকুরে, গদাধরের বাল্যে ও কৈশোরে, যাঁহারা তাঁহার সহিত স্নেহে প্রেমে সম্বদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহারা, এবং উপস্থিত সকলেই, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগলমিলন সন্দর্শন করিয়া নিজেদের জন্ম-জীবন সার্থক করিয়াছিলেন।

সংসারের কাজ করিতে করিতে চন্দ্রাদেবীর মাতৃহৃদয় এক মৌনবেদনায় গুমরিয়া মরিতেছিল। বৈবাহিকের মনস্তুষ্টি ও বাহিরের সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য জমিদার লাহাবাবুদের বাড়ী হইতে কয়েকখানি অলঙ্কার চাহিয়া আনিয়া নববধূকে সাজাইতে হইয়াছিল, সেই অলঙ্কারগুলি এখন ফিরাইয়া দিতে হইবে। কন্যাপ্রতিমা বালিকার অঙ্গ হইতে কোন্ প্রাণে তিনি সে অলঙ্কার উন্মোচন করিবেন? মায়ের মনোবেদনা হৃদয়ঙ্গম করিতে মাতৃভক্ত পুত্রের বিলম্ব হয় নাই; নিদ্রিতা বধূর অঙ্গ হইতে এমন সন্তর্পণে অলঙ্কারগুলি তিনি খুলিয়া নিয়াছিলেন যে, বধূ তাহা জানিতেও পারেন নাই। বুদ্ধিমতী বালিকা কিন্তু জাগরিতা হইবার পর বলিয়াছিলেন, আমার গায়ে যে এমন সব গয়না ছিল সেগুলি কোথায় গেল? তাঁহাকে কোলে টানিয়া লইয়া সাশ্রুনেত্রে চন্দ্রা বলিয়াছিলেন, মা, গদাই তোমাকে এর চেয়েও ভাল গয়না পরে কত দিবে। ইহার

পরদিনই কামারপুকুরে আসিয়া কন্যার খুল্লতাত সেকথা শুনিতে পাইলেন ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়া ভাইঝিকে নিয়া জয়রামবাটীতে প্রস্থান করিলেন। মাকে প্রবোধ দিবার জন্য পরিহাসচ্ছলে ঠাকুর তখন বলিয়াছিলেন, ওরা এখন যাই বলুক আর যাই করুক না, বিয়ে তো আর ফিরবে না?

বিবাহের পরেও ঠাকুর প্রায় এক বৎসর সাত মাস কামারপুকুরে ছিলেন। কুলাচার মানিয়া, বধূর সপ্তম বর্ষ পূর্ণ হওয়ার মুখে, ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তিনি শ্বশুরঘরে যান ও সেখানে কয়েকদিন বাস করিয়া পত্নীর সহিত 'জোড়ে' কামারপুকুরে পুনরাগমন করেন। ঠাকুর জয়রামবাটীতে গেলে বধূ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার পদপ্রক্ষালন ও অঙ্গে বাতাস করিয়াছিলেন, আর এই দৃশ্য দেখিয়া অন্যান্য মেয়েরা মুচকি হাসি হাসিয়াছিল। পালকিতে চাপিয়া কামারপুকুরে আসিবার পথে বালিকা পত্নীকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন: কেউ যদি তোমায় জিজ্ঞাসা করে, ক'বছর বয়সে তোমার বিয়ে হয়েছিল, তুমি পাঁচ বছর বলবে, সাত বছর বোলো নি।

সংসারের অসচ্ছল অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া, জোড়ে আসিবার অনতিকাল পরেই, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করেন ও পূর্ববৎ মন্দিরের সেবাকার্যে ব্রতী হন। কিন্তু দিন কয়েক পূজা করিতে না করিতেই তিনি ঐ কার্যে এমন তন্ময় হইয়া পড়িলেন যে, মা-ভাই-স্ত্রী-সংসার প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় মনের এক কোণে চাপা পড়িয়া গেল এবং জগন্মাতাকে সকল সময়ে সকলের মধ্যে দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা উদগ্র হইয়া উঠিল। দিবারাত্র স্মরণ-মনন-জপধ্যানে তাঁহার বক্ষ পুনরায় আরক্তিম ভাব ধারণ করিল, বিষয়প্রসঙ্গ বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল, বিষম গাত্রদাহ আবার দেখা দিল ও নয়নকোণ হইতে নিদ্রা দূরে অপসৃত হইল। তবে শরীরমনের ঐপ্রকার অবস্থা আগে একবার অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া এবার তিনি একেবারে আত্মহারা হইয়া যান নাই।

মথুরবাবুর নির্দেশে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন ঠাকুরের চিকিৎসা করিতে থাকেন। চিকিৎসায় ফল না পাইলেও হৃদয়

ঠাকুরকে নিয়া কবিরাজের কুমারটুলিস্থ ভবনে মাঝে মাঝে যাইত। সেখানে একদিন রোগের লক্ষণসকল শুনিতে শুনিতে গঙ্গাপ্রসাদের ভাই কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ বলিয়াছিলেন: এঁর দেবোন্মাদ অবস্থা বলে বোধ হচ্ছে, এটি যোগজ ব্যাধি—ঔষধে সারবার নয়। কিন্তু তাঁহার কথা কেহই তখন বিশ্বাস করে নাই।

সংবাদ ক্রমে কামারপুকুরে পৌঁছিল। পুত্রের আরোগ্য-কামনায় চন্দ্রাদেবী কামারপুকুরের বুড়োশিবের নিকট হত্যা দিয়া প্রত্যাদেশ পাইলেন—মুকুন্দপুরের শিবের নিকট হত্যা দিলে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। ইতঃপূর্বে মুকুন্দপুরের শিবের মন্দিরে কেহ হত্যা দিত না। সেখানে দুইতিন দিন প্রয়োপবেশন করিয়া পড়িয়া থাকিবার পর চন্দ্রা স্বপ্নে দেখিলেন: "জ্বলজ্জটাসুশোভিত বাঘাম্বরপরিহিত রজতদলিতকান্তি মহাদেব সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাদানপূর্বক বলিতেছেন—ভয় নাই, তোমাব পুত্র পাগল হয় নাই, ঐশ্বরিক আবেশে তাহার ঐরূপ অবস্থা হইযাছে!"

ঠাকুর তাঁহার এই কালের দিব্যোন্মাদ অবস্থার কথায় বলিয়াছিলেন: দিবারাত্রির বেশীর ভাগ মার কোন না কোনরূপ দর্শনাদি পেয়ে ভুলে থাকতুম তাই রক্ষা, নতুবা (নিজ শরীর দেখাইয়া) এ খোলটা থাকত না। এখন থেকে সুরু হয়ে ছয় বছরের মধ্যে তিলমাত্র ঘুম হয় নি! চোখে পলক ছিল না—চেষ্টা করেও পলক ফেলতে পারতুম না! সময়ের খেয়াল থাকত না, শরীর বাঁচিয়ে চলতে হবে একথা প্রায় ভুলে গেছিলুম। শরীরের দিকে যখন একটু আধটু দৃষ্টি পড়ত তখন তার অবস্থা দেখে বিষম ভয় হত, ভাবতুম, পাগল হতে বসেচি নাকি? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখতুম পলক পড়ে কি-না। তাতেও চোখে পলক পড়ে না দেখে ভয়ে কেঁদে ফেলতুম আর মাকে বলতুম,—মা, তোকে ডাকার, তোর উপর একান্ত বিশ্বাস নির্ভর করার কি এই ফল হল? শরীরে বিষম ব্যাধি দিলি? আবার পরক্ষণেই বলতুম,—তা যা হবার হোক গে, শরীর যায় যাক, তুই কিন্তু আমায় ছাড়িস নি; আমায় দেখা দে, কৃপা

কর্, আমি যে মা তোর পাদপদ্মে একান্ত শরণ নিয়েচি, তুই ছাড়া আমার যে আর অন্য গতি একেবারেই নাই! কাঁদতে কাঁদতে মন আবার উৎসাহে উত্তেজিত হয়ে উঠত, শরীরটাকে অতি তুচ্ছ হেয় বলে মনে হত, আর মার দর্শন পেয়ে, অভয়বাণী শুনে আশ্বস্ত হতুম!

এই সময়কার একদিনের ঘটনা। সর্বদাই আপন ভাবে বিভোর ঠাকুর তাঁহার ঘরের উত্তরপূর্ব কোণের লম্বা বারান্দায় গোঁ-ভরে পাদচারণ করিতেছিলেন ও কুঠি-বাড়ীর একটি ঘরে বসিয়া মথুরবাবু তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। সহসা মথুরবাবু ব্যস্তসমস্ত হইয়া দৌড়াইয়া আসিলেন ও ঠাকুরের পা-দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর বলিলেন: তুমি এ কী করচ? তুমি বাবু, রাণীর জামাই, লোকে তোমায় এমন করতে দেখলে কী বলবে? স্থির হও, উঠ। মথুর কিছুতেই আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না, অনেক আয়াসে কিছুটা সামলাইয়া নিয়া বলিতে লাগিলেন: বাবা, তুমি বেড়াচ্চ আর আমি দেখলুম, যখন এদিকে এগিয়ে আসচ, তুমি নও, আমার ঐ মন্দিরের মা! যাই পেছন ফিরে ওদিকে যাচ্চ, সাক্ষাৎ মহাদেব! তোমাকে শিব-কালীরূপে দেখলুম। চোখের ভ্রম মনে করে, চোখ ভাল করে রগড়ে নিয়েও তাই দেখলুম। যতবার তাকালুম, সেই একই দেখলুম! 'আমি তো কই কিছু জানি নি বাবু!' এই বলিয়া ও অনেক করিয়া বুঝাইয়া ঠাকুর সেদিন তাঁহাকে শান্ত করিয়াছিলেন।

তিনি বলিতেন: "মথুর কি সাধে এতটা করত—ভালবাসত? মা তাকে অনেক সময় অনেক রকম দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়েছিল। মথুরের ঠিকুজিতে কিন্তু লেখা ছিল, তার ইষ্টের তার উপর এতটা কৃপাদৃষ্টি থাকবে যে, শরীর ধারণ করে তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে, রক্ষা করবে!"

এখন হইতে ঠাকুরের উপর মথুরের বিশ্বাস অনেকটা পাকা হইল, ঠাকুরের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা বাড়িল।

ভৈরবী ব্রাহ্মণীর আগমনেঃ ঠাকুর কে?

১২৬৭ সালের ৯ই ফাল্গুন রাণী রাসমণি দেহরক্ষা করেন। সহসা পড়িয়া গিয়া তাঁহার অঙ্গে ব্যথা ও জ্বর হয়, শেষকালে তিনি গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। রাণীর কন্যাচতুষ্টয়ের মধ্যে মধ্যমা শ্রীমতী কুমারী ও তৃতীয়া শ্রীমতী করুণাময়ীর ঠাকুরবাটী-প্রতিষ্ঠার পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী পদ্মমণি ও কনিষ্ঠা শ্রীমতী জগদম্বা মৃত্যুশয্যায় তাঁহার পার্শ্বে ছিলেন। ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠা করিয়াই উহার ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য দুইলক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকায় তিনি দিনাজপুর জেলায় তিন লাট জমিদারি ক্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু দানপত্র করিয়া এযাবৎ উহা দেবোত্তর সম্পত্তিতে পরিণত করেন নাই। মৃত্যুর পূর্বে তিনি দানপত্রটি প্রস্তুত করাইলেন এবং ঐ দানপত্রে যে জীবিত কন্যাদ্বয়ের সম্মতি আছে তাহা উল্লেখ করিয়া লিখিত ভিন্ন এক অঙ্গীকারপত্রে তাঁহাদিগকে সহি করিতে বলিলেন। জগদম্বা সহি করিলেন, কিন্তু শত অনুরোধেও পদ্মমণি করিলেন না। ৺জগদম্বার ইচ্ছায় যাহা হইবার হইবে ভাবিয়া রাণী ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী দেবোত্তর দানপত্রে সহি করেন ও ইহার পরদিনই সজ্ঞানে দেবীলোকে চলিয়া যান।

তিনি ঐসময়ে কালীঘাটে আদিগঙ্গার তীরস্থ বাটীতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহাকে গঙ্গাগর্ভে লইয়া যাওয়া হইলে সম্মুখে অনেকগুলি আলো জ্বলিতেছে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেনঃ "সরিয়ে দে, সরিয়ে দে, ওসব রোশনাই আর ভাল লাগচে না, এখন আমার মা আসচেন, তাঁর শ্রীঅঙ্গের প্রভায় চারদিক আলোকময় হয়ে উঠেচে! (কিছুক্ষণ থামিয়া) মা এলে! পদ্ম যে সহি দিলে না, কী হবে মা?" তাঁহার জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়াই যেন শিবাকুল সব দিক হইতে উচ্চরবে ডাকিয়া উঠিল। তখন মহানিশা।

রাণী রাসমণির কনিষ্ঠ জামাতা মথুরামোহন যাবতীয় কাজে তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং দক্ষতার সহিত জমিদারি

পরিচালনা করিয়া তাঁহার বিষয়-আশয় অনেক বাড়াইয়াও দিয়াছিলেন। রাণীর মৃত্যুর পর ঠাকুরবাটীর পরিচালনায় তিনি একাধিপত্য লাভ করেন। ঐ একাধিপত্য হেতু তিনি ঠাকুরকে তাঁহার প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে, বিশেষতঃ তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী তান্ত্রিক সাধনায় নানাভাবে সাহায্য করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন, এবং এখন হইতে দীর্ঘ এগার বৎসর নিষ্ঠার সহিত তাঁহার সেবা করিয়া জীবন ধন্য করেন। ঠাকুরের সংসর্গে তাঁহার দেবভক্তি বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল এবং দেবতাজ্ঞানে ঠাকুরকে সেবা করাই তাঁহার প্রধান করণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ঠাকুরবাটীর পশ্চিমভাগে গঙ্গাতীরে পোস্তার উপর সুবিস্তৃত পুষ্পোদ্যান। পোস্তার উত্তরে বকুলতলার ঘাট নামে পরিচিত ছোট একটি বাঁধানো ঘাট ও নহবতখানা। স্বয়ং পূজা না করিলেও, ঠাকুর প্রতিদিন ঐ উদ্যানে পুষ্পচয়ন করিতেন ও স্বহস্তে মালা গাঁথিয়া মা-কালীকে সাজাইতেন। একদিন সকালে যখন তিনি পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন এমন সময়ে একখানি নৌকা আসিয়া বকুলতলার ঘাটে লাগিল ও সেই নৌকা হইতে গৈরিকবসনা এক ভৈরবী অবতরণ করিয়া দক্ষিণমুখে চাঁদনীর দিকে অগ্রসর হইলেন। ভৈরবী আলুলায়িত-দীর্ঘকেশা, সুন্দরী, এবং প্রৌঢ়া হইলেও—তাঁহার বয়স তখন প্রায় চল্লিশ বৎসর হইবে—যৌবনশ্রীসম্পন্না। নিকট আত্মীয়কে দেখিলে লোকে যেমন আকর্ষণ অনুভব করে ভৈরবীকে দেখিয়া ঠাকুরও সেইরূপ অনুভব করিলেন ও চাঁদনী হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য হৃদয়কে পাঠাইলেন।

ঠাকুরকে দেখিয়াই ভৈরবী বিস্মিতা ও আনন্দে অভিভূতা হইয়া বলিয়া উঠিলেন: বাবা, তুমি এখানে! তুমি গঙ্গাতীরে আছ জেনে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, এতদিনে দেখা পেলাম। 'আমার কথা কেমন করে জানতে পারলে মা?' ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন। ভৈরবী বলিলেন: তোমাদের তিন জনের সঙ্গে দেখা করতে হবে, জগদম্বার কৃপায় পূর্বে জানতে পেরেছিলাম, দুজনের দেখা পূর্বদেশে পেয়েছি, আজ এখানে তোমার দেখা পেলাম।

ঠাকুর তখন ভৈরবীর কাছে বসিয়া ছেলে যেমন মার কাছে মনের সব কথা খুলিয়া বলে সেইরূপ ভাবে নিজের অলৌকিক দর্শন ও অনুভূতি, এবং বাহ্যজ্ঞান হারানো, গাত্রদাহ, অনিদ্রা প্রভৃতি দৈহিক বিকার একে একে বিবৃত করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন: হ্যাঁগা, আমার এসকল কী হয়? আমি কি সত্যি পাগল হলুম? জগদম্বাকে মনেপ্রাণে ডেকে আমার কি কঠিন ব্যাধি হল? ঠাকুরের বিবৃতি শুনিতে শুনিতে ভৈরবী কখন উত্তেজিতা, কখন বা উল্লসিতা হইয়া উঠিতেছিলেন; শেষে কহিলেন: তোমায় কে পাগল বলে বাবা? তোমার এসব পাগলামি নয়। তোমার মহাভাব হয়েচে, সেইজন্যই ঐসকল বিকার হয়েচে, হচ্চে। তোমার অবস্থা কি কারো চিনবার শক্তি আছে? চিনতে পারে না বলেই তারা যা তা বলে। ঐপ্রকার অবস্থা হয়েছিল শ্রীমতী রাধারাণীর, ঐপ্রকার অবস্থা হয়েছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর! একথা ভক্তিশাস্ত্রে আছে। আমার কাছে যেসব পুঁথি আছে সেইসব পুঁথি পড়ে শুনিয়ে আমি দেখাব, ঈশ্বরকে যাঁরাই এক মনে ডেকেচেন তাঁদের সকলেরই ঐপ্রকার অবস্থা হয়েচে।

কথায় কথায় বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া ঠাকুর দেবীর প্রসাদী ফলমূল মাখন-মিছরি ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে খাইতে দিলেন। মাতৃভাবে ভাবিতা ব্রাহ্মণী উহার কিয়দংশ ঠাকুরকে আগে খাওয়াইয়া পরে নিজে গ্রহণ করিলেন। তারপরে ঠাকুরবাটীর ভাণ্ডার হইতে সিধা লইয়া পঞ্চবটীতে গিয়া ভোগ রান্না করিতে বসিলেন। রন্ধন সমাপ্ত হইলে ৺রঘুবীরের সম্মুখে ভোজ্যদ্রব্য রক্ষা করিয়া—ঐ রঘুবীরশিলা তাঁহার কণ্ঠে থাকিতেন—ইষ্টদেবকে চিন্তা করিতে করিতে তিনি ধ্যানমগ্না হইলেন। অভূতপূর্ব দর্শন-লাভে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল ও দুই চোখে প্রেমাশ্রুধারা বহিতে লাগিল। প্রাণে প্রাণে আকৃষ্ট হইয়া ঠাকুর সহসা সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন ও ভাবাবেশে ব্রাহ্মণী-নিবেদিত ভোজ্য খাইতে আরম্ভ করিলেন। ধ্যান-ভঙ্গে এই দৃশ্য দেখিয়া ব্রাহ্মণী রোমাঞ্চিতকলেবরা হইলেন, এবং ঠাকুরও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইয়া বলিতে লাগিলেন: কে জানে বাপু, আত্মহারা হয়ে কেন এমন সব কাজ করে বসি! ব্রাহ্মণী কহিলেন: বেশ

করেচ বাবা, একাজ তুমি কর নাই, তোমার ভিতর যিনি আছেন তিনিই করেচেন। ধ্যান করতে করতে আমি যা দেখেচি তাতেই বুঝেচি কে এই কাজ করেচে আর কেনই বা করেচে ; বুঝেচি আর আমার বাহ্যপূজার আবশ্যকতা নাই, এতদিনে আমার পূজা সারা হয়েচে। এই বলিয়া ব্রাহ্মণী দেবতার প্রসাদ-জ্ঞানে ভোজনাবশেষ গ্রহণ করিলেন, এবং প্রেমে বাষ্পমোচন করিতে করিতে বহুকালের পূজিত রঘুবীরশিলাটি গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন করিলেন।

ছয়সাত দিন ঠাকুরবাটীতে কাটাইয়া, ঠাকুরের পরামর্শে ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বর দেবমণ্ডলের ঘাটে চলিয়া যান ও প্রতিদিন সেখান হইতে আসিয়া ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হইতে থাকেন। মণ্ডলদের বাড়ীর ৺নবীন নিয়োগীর ধর্মপরায়ণা পত্নী তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ঘাটের চাঁদনীতে যতকাল ইচ্ছা থাকিবার অনুমতি দিয়া একখানি তক্তাপোশ এবং চাল-ডাল-ঘি ইত্যাদি ভোজনসামগ্রী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। গ্রামস্থ নারীদের সহিত আলাপ করিয়া তিনি স্বল্পকালেই তাহাদের শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়া উঠেন।

ব্রাহ্মণীর নাম ছিল যোগেশ্বরী। পূর্ববঙ্গের কোন স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে বড় ঘরের মেয়ে, তাহা তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যাইত। তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া ও স্বাধীনভাবে তিনি যত্রতত্র বিচরণ করেন শুনিয়া তাঁহার চরিত্রে মথুরবাবুর সন্দেহ হয়। একদিন মন্দিরে দর্শনাদি করিয়া ব্রাহ্মণী যখন বাহিরে আসিতেছিলেন, হঠাৎ মথুর বিদ্রূপের সহিত প্রশ্ন করিলেন : ভৈরবী, তোমার ভৈরব কোথায় ? কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ বা অপ্রতিভ না হইয়া ব্রাহ্মণী স্থিরদৃষ্টিতে মথুরের দিকে তাকাইলেন ও মা-কালীর পদতলে শবরূপে পতিত মহাদেবকে অঙ্গুলিনির্দেশে দেখাইয়া দিলেন। 'ও ভৈরব তো অচল!' মথুর কহিলেন। ধীরগম্ভীর স্বরে ব্রাহ্মণী বলিলেন : যদি অচলকে সচল করতেই না পারব তবে আর ভৈরবী হয়েচি কেন ? মথুর লজ্জিত ও নিরুত্তর হইলেন।

ঠাকুরের মুখে তাঁহার দর্শনাদির কথা শুনিয়া শুনিয়া, দিনের পর দিন তাঁহার দেহের বিকারসমূহ লক্ষ্য করিয়া এবং ভগবৎপ্রসঙ্গে তাঁহার মুহুর্মুহু সমাধি ও কীর্তনে পরবশ হইতে দেখিয়া ব্রাহ্মণীর প্রতীতি

জন্মিল যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে পুনরাগমন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে, স্বীয় পার্ষদদিগকে তিনি আরও দুইবার আসিবেন বলিয়াছিলেন। তাঁহার এই ধারণার অনুকূলে শীঘ্রই ব্রাহ্মণী এক বিশিষ্ট প্রমাণও পাইলেন।

ব্রাহ্মণীর আগমনের কিছুকাল পূর্ব হইতে ঠাকুর গাত্রদাহে বিষম কষ্ট পাইতেছিলেন, সূর্যোদয়ে সুরু হইয়া বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের জ্বালাও বাড়িতে থাকিত; দ্বিপ্রহরে উহা এতই অসহনীয় হইয়া উঠিত যে, গঙ্গার জলে শরীর ডুবাইয়া ও মাথায় একখানি ভিজা গামছা চাপা দিয়া তিনি দুইতিন ঘণ্টা বসিয়া থাকিতেন; তারপরে জল হইতে উঠিয়া, কুঠি-ঘরের মর্মরবাঁধানো মেজে ভিজা কাপড়ে মুছিয়া ও ঘরের সব দ্বার রুদ্ধ করিয়া, সেই মেজেতে গড়াগড়ি দিতেন! কথিত আছে, ভগবদ্‌বিরহে শ্রীচৈতন্যের অঙ্গেও এইরূপ জ্বালা দেখা দিত ও সুগন্ধি স্রক্‌চন্দন ব্যবহারে উহার উপশম হইত। ব্রাহ্মণীর ব্যবস্থানুযায়ী ঠাকুরের শরীর চন্দনলেপ ও সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হইল এবং তিনদিন এইরূপ করিবার পরেই দেখা গেল তাঁহার সে গাত্রদাহ একেবারে তিরোহিত হইয়াছে।

ঠাকুরের জীবনের অন্য একটি অতীত ঘটনার মধ্যেও ব্রাহ্মণী নিজের মতের সমর্থন দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইতঃপূর্বে ঠাকুর যখন দেশে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে একদিন শিবিকারোহণ করিয়া কামারপুকুর হইতে শিহড়ে হৃদয়ের বাটীতে যাইবার পথে উহা হইয়াছিল। বিশ্বপ্রকৃতির নয়নাভিরাম দৃশ্যসমূহ উপভোগ করিয়া যাইতে যাইতে ঠাকুর দেখিয়াছিলেন: তাঁহার দেহমধ্য হইতে সুন্দর দুইটি কিশোর সহসা বাহিরে আসিয়া ছুটাছুটি করিতে আরম্ভ করিয়াছে; কখন বনপুষ্পাদির অন্বেষণে দূরপ্রান্তরে চলিয়া যাইতেছে, কখন বা নিকটে আসিয়া হাস্য-পরিহাস-কথোপকথন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। অনেকক্ষণ এইরূপ আনন্দবিহার করিয়া তাহারা পুনরায় তাঁহার দেহমধ্যে প্রবেশ করিল।

ব্রাহ্মণী ঠাকুরের এই দর্শনবিবরণ শুনিয়া বলিয়াছিলেন: বাবা, তুমি ঠিক দেখেচ; এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব—শ্রীনিত্যানন্দ

ও শ্রীচৈতন্য এবার একসঙ্গে একাধারে এসে তোমার ভিতরে রয়েচেন। সেইজন্যই তোমার ঐ দর্শন হয়েছিল।

ঠাকুরের নিত্যসঙ্গী হৃদয়ের মুখে তাঁহার পার্ষদ ভক্তেরা এইসকল কথা শুনিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন : ঐরূপ দেখেছিলুম সত্যি, ব্রাহ্মণী তা শুনে যে ওকথা বলেছিল তাও সত্যি, কিন্তু তার অর্থ যে কী, তা কেমন করে বলি বল ?

লীলাপ্রসঙ্গকার লিখিয়াছেন : "ঐসকল দর্শনের কথা শুনিয়া মনে হয়, তিনি এই সময় হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন, বহু প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীতে সুপরিচিত কোন আত্মা তাঁহার শরীরমনে আমিত্বাভিমান লইয়া প্রয়োজনবিশেষ সিদ্ধির জন্য অবস্থান করিতেছেন। ঐরূপে নিজ ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে যে অলৌকিক আভাস তিনি এখন পাইতেছিলেন, তাহাই কালে সুস্পষ্ট হইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল—যিনি পূর্ব পূর্ব যুগে ধর্মসংস্থাপনের জন্য অযোধ্যা ও শ্রীবৃন্দাবনে জানকীবল্লভ শ্রীরামচন্দ্র ও রাধাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই এখন পুনরায় ভারত ও জগৎকে নবীন ধর্মাদর্শদানের জন্য নূতন শরীর পরিগ্রহপূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

উদাসিনী ব্রাহ্মণী কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা করিতেন না, মনে-প্রাণে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। ঠাকুরের সম্বন্ধে যেসকল কথা তিনি বলিয়া আসিতেছিলেন কিছুদিন ধরিয়া, তাহা কালীবাটীতে আলোড়ন সৃষ্টি করিল। এক মথুরবাবু ব্যতীত অপর সকলেই যাঁহাকে উন্মাদ সাব্যস্ত করিয়াছে তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া নির্দেশ করায় ব্রাহ্মণীর সম্বন্ধেও যে বিষয়িসুলভ বিবিধ জল্পনা মুখর হইয়া উঠিতেছিল, ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

ঠাকুরের উপর মা-কালীর কৃপা হইয়াছে, মথুরবাবু বলিতেন ও বিশ্বাস করিতেন। অবতার-সম্পর্কিত পুরাণশাস্ত্রের সকল কথাই তিনি জানিতেন না; কেবল শুনিয়াছিলেন যে, শাস্ত্রে দশ অবতারের কথা আছে, দশটির বেশী অবতার নাই। এই বিষয় নিয়া ব্রাহ্মণীর সহিত একদিন তাঁহার

বাক্যবিনিময়ও হইয়াছিল। 'অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ' শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই অভিমত উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্মণী বলিয়াছিলেন: বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থে মহাপ্রভুর পুনরাগমনের কথা আছে, মহাপ্রভুর সহিত ঠাকুরের শরীরমনে প্রকাশিত লক্ষণসমূহের বিশেষ মিল আছে, সুপণ্ডিত বৈষ্ণবাচার্যগণের নিকট নিজের বক্তব্য তিনি প্রমাণ করিতে পারিবেন, করিতে প্রস্তুতও আছেন

সাক্ষিস্বরূপ হইয়া ঠাকুর তাঁহাদের ঐসকল কথাবার্তা শুনিতেছিলেন, ব্রাহ্মণীর সিদ্ধান্ত শুনিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষেরা কিরূপ মতামত প্রদান করেন তাহা জানিতে তিনি বালকবৎ আগ্রহান্বিত হইলেন ও ঐ বিষয়ের একটা বন্দোবস্ত করিবার জন্য মথুরবাবুকে ধরিয়া বসিলেন। কতক কৌতূহলে, কতক ঠাকুরের প্রতি ভালবাসায় মথুরও তাহাতে সম্মত হইয়া গেলেন।

কলিকাতার বৈষ্ণবসমাজে তখন উৎসবানন্দ গোস্বামীর পুত্র বৈষ্ণবচরণের খুবই খ্যাতি-প্রতিপত্তি; ভক্তিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সাধকাগ্রণী বৈষ্ণবচরণ তাৎকালিক বৈষ্ণবসমাজের একজন মুখপাত্র ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে আসিবার জন্য মথুরবাবু তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলেন।

বৈষ্ণবচরণের সহিত ঠাকুরের পূর্বেও একবার দেখা হইয়াছিল, ১২৬৫ সালের জ্যৈষ্ঠ-শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে, পানিহাটির মহোৎসবক্ষেত্রে। সেখানে মণি সেনের ঠাকুরবাড়ীতে এই মিলন সংঘটিত হয়, বৈষ্ণবচরণ ঠাকুরকে দেখিয়াই অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বলিয়া চিনিতে পারেন এবং নিজ ব্যয়ে মালসাভোগ দিয়া তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করেন। কলিকাতায় ফিরিবার পথে তাঁহাকে পুনরায় দর্শন করিবার জন্য বৈষ্ণবচরণ রাণী রাসমণির কালীবাটীতে নামিয়াছিলেন, কিন্তু ঠাকুর তখনও উৎসব-ক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসেন নাই জানিয়া ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া যান।

আমন্ত্রণ পাইয়া নির্ধারিত দিনে বৈষ্ণবচরণ দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন কতকগুলি সাধক পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়া। সপার্ষদ বৈষ্ণবচরণ, ভৈরবী ব্রাহ্মণী, মথুরবাবু ও তাঁহার দলবল, ইঁহারা সকলে একত্র উপবেশন করায় একটি ছোটখাট অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ ধর্মসভার অধিবেশনের মত হইল। সেই সভায় নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত করিয়া ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবচরণকে

সম্বোধন করিয়া কহিলেন : আপনি যদি এবিষয়ে অন্যরূপ বিবেচনা করেন তা হলে কেন তা করচেন আমাকে বুঝিয়ে দিন। ঠাকুরের শ্রীমুখের উক্তি হইতে জানা যায়, বৈষ্ণবচরণ ব্রাহ্মণীর সকল কথাই সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি বলিয়াছিলেন : যে প্রধান প্রধান উনিশ প্রকার ভাবের সমষ্টিকে ভক্তিশাস্ত্র মহাভাব নামে নির্দেশ করে, যে মহাভাব কেবলমাত্র ভাবময়ী শ্রীরাধা আর শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনেই লক্ষিত হয়েচে, কী আশ্চর্য, সেই মহাভাবের সব লক্ষণগুলিই (ঠাকুরকে দেখাইয়া) এঁতে প্রকাশিত বোধ হচ্চে। জীবের ভাগ্যে যদি কখন জীবনে মহাভাবের আভাস উপস্থিত হয়, তবে ঐ উনিশ প্রকারের ভাব বা অবস্থার মধ্যে দুইচারিটি মাত্র প্রকাশ পায়। জীবের শরীর ঐ উনিশ প্রকার ভাবের উদ্দাম বেগ কখনই ধারণ করতে পারে নাই, আর শাস্ত্র বলেন, কস্মিন্‌কালেও পারবে না।

ঠাকুর এতক্ষণ ঐ সভার মধ্যে আলুথালু ভাবে বসিয়া, আপনাতে আপনি মগ্ন থাকিয়া, আনন্দানুভব ও মৃদুহাস্য করিতেছিলেন; কখন বা মশলার বেটুয়া হইতে দুটি মউরি বা কাবাবচিনি মুখে দিয়া এমনভাবে সব কথাবার্তা শুনিতেছিলেন যেন ঐসব কথা অপর কাহারও সম্বন্ধে হইতেছিল; আবার কখন বা নিজের অবস্থার বিষয়ে কোন কথা 'ওগো, এই রকমটা হয়' বলিয়া বৈষ্ণবচরণের অঙ্গস্পর্শ করিতেছিলেন।

বৈষ্ণবচরণের সিদ্ধান্ত শুনিয়া মথুরবাবু-প্রমুখ উপস্থিত সকলেই অবাক হইলেন। ঠাকুরও বালকের মত বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া মথুরকে বলিলেন : ওগো, বলে কী ? যা হোক বাপু, রোগ নয় শুনে মনটায় আনন্দ হচ্চে !

এখন হইতে বৈষ্ণবচরণ ঠাকুরের দিব্যসঙ্গ লাভ করিবার জন্য মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন, কখন একাকী, কখন বা সহচর সাধকগণকে সঙ্গে নিয়া। নিজেদের রহস্যসাধনসমূহের কথা ঠাকুরকে বলিয়া ইঁহারা তাঁহার মতামত গ্রহণ করিতেন। কয়েকবার ইঁহারা ঠাকুরকে নিজেদের সাধনস্থানেও লইয়া গিয়াছিলেন।

তান্ত্রিক সাধনা

ঠাকুরকে যে সাধনায় সহায়তা করিতে হইবে, ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহার সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্বেই যোগবলে ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিকটসম্বন্ধে আসিয়া তিনি দেখিলেন, ইনি সাধারণ সাধক নহেন, জগদ্‌গুরু স্বয়ং নরশরীর ধরিয়া সাধকভাবে ভাবিত হইয়া আছেন ও নরবৎ সকল কার্য করিতেছেন জগৎকল্যাণে। দেখিলেন, সাধনার সমূহ সিদ্ধি পূর্বেই তাঁহার অধিগত হইয়াছে, তথাপি সত্যই ঐরূপ হইয়াছে কি-না, সেই বিষয়ে একটা সন্দেহও যেন তাঁহার থাকিয়া গিয়াছে। উদ্দাম ব্যাকুলতা-সহায়ে যে বস্তু বা যে অবস্থা তিনি লাভ করিয়াছেন, শাস্ত্রনির্দিষ্ট অনুষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে সেই একই বস্তু, সেই একই অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেই সে পীড়াদায়ক সন্দেহ তাঁহার আর থাকিবে না, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ঠাকুরকে ব্রাহ্মণী তন্ত্রসাধন করিতে বলিলেন। স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণীর আগ্রহ ও উত্তেজনাতেই তিনি তান্ত্রিক সাধনায় প্রবৃত্ত হন নাই, জগন্মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ বিষয়ে তাঁহার অনুমতিলাভ করিয়াছিলেন। প্রাণে প্রাণে তিনি বুঝিয়াছিলেন, শাস্ত্রীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া জগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে।

ঠাকুর এখন সর্বস্ব ভুলিয়া সাধনায় মগ্ন হইলেন, তন্ত্রশাস্ত্রে অভিজ্ঞা ও কর্মকুশলা ব্রাহ্মণী তান্ত্রিক ক্রিয়ার উপযোগী পদার্থসকল সংগ্রহ করিয়া ও উহাদের প্রয়োগ শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। মনুষ্যাদি পঞ্চ প্রাণীর মাথার কঙ্কাল গঙ্গাহীন প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হইল, এবং পঞ্চবটীতে ও ঠাকুরবাটীর উত্তর সীমান্তে বেলতলায় দুইটি সাধনার উপযোগী বেদিকা নির্মাণ করা হইল। বেলতলার বেদিকার নীচে তিনটি নরমুণ্ড ও পঞ্চবটীর বেদিকার নীচে পাঁচপ্রকার জীবের—শিবা, সর্প, সারমেয়, বৃষভ ও মনুষ্যের—পাঁচটি মুণ্ড প্রোথিত করা হইয়াছিল। প্রয়োজনমত ঐ দুই মুণ্ডাসনের একটির উপর বসিয়া জপ-পুরশ্চরণ-ধ্যানাদি

করিয়া ঠাকুরের কাল কাটিতে লাগিল। দিবারাত্র কোথা দিয়া আসিতেছে ও যাইতেছে সে হুঁশই তাঁহার রহিল না। বলিয়াছিলেন ঠাকুর :

বামনী দিনের বেলায় দূরে দূরে নানা জায়গায় ঘুরে দুষ্প্রাপ্য সব বস্তু যোগাড় করত। রাত্রে বেলতলায় বা পঞ্চবটীতলায় সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন করে আমাকে ডাকত, আর ঐসব বস্তু দিয়ে মার পূজা করিয়ে জপধ্যানে ডুবে যেতে বলত। কিন্তু পূজার পর জপ প্রায়ই করতে পারতুম না, মন এত তন্ময় হয়ে পড়ত যে মালা ফিরাতে গিয়ে সমাধিস্থ হতুম আর ঐ ক্রিয়ার ফল শাস্ত্রে যেমন আছে প্রত্যক্ষ করতুম। এই রকম করে দর্শনের পর দর্শন, অনুভবের পর অনুভব—অদ্ভুত অদ্ভুত সব—কতই যে এই কালে করেচি, তার ইয়ত্তা নাই। বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত চৌষট্টিখানা তন্ত্রে যা কিছু সাধনের কথা আছে, সবগুলিই বামনী একে একে করিয়েছিল। কঠিন কঠিন সব সাধন, যা করতে গিয়ে বেশীর ভাগ সাধকই পড়ে যায়, মার কৃপায় সে সবেও পার হয়েছি।

একদিন রাত্রে দেখি, বামনী কোথা থেকে সুন্দরী এক যুবতী মেয়েকে ডেকে এনেচে, আর পূজার আয়োজন করে, দেবীর আসনে তাকে উলঙ্গ করে বসিয়ে আমাকে বলচে 'বাবা, একে দেবীবুদ্ধিতে পূজা কর।' পূজা সাঙ্গ হতে বল্লে, 'বাবা, সাক্ষাৎ জগজ্জননী জ্ঞান করে এর কোলে বসে তন্ময় হয়ে জপ কর।' তখন ভয়ে কেঁদে মাকে বল্লুম, 'মা, তোর শরণাগতকে একী আদেশ করচিস? দুর্বল সন্তানের অমন দুঃসাহসের শক্তি কোথায়?' একথা বলতেই দিব্যশক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হল, আর আবিষ্টের মত হয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে মেয়েটির কোলে বসেই সমাধিস্থ হয়ে পড়লুম। তারপর যখন হুঁশ হল তখন বামনী বল্লে, 'ক্রিয়া পূর্ণ হয়েচে বাবা, অন্য লোকে কষ্টে ধৈর্য ধরে ঐ অবস্থায় কিছুকাল কেবল জপ করেই ক্ষান্ত হয়, তুমি দেহ ভুলে গিয়ে একেবারে সমাধিস্থ হয়ে পড়েচ!' শুনে আশ্বস্ত হলুম, আর পরীক্ষায় পার করার জন্যে মাকে বারবার প্রণাম করতে লাগলুম।

আর একদিন দেখি, বামনী শবের খর্পরে মাছ রেঁধে মার তর্পণ করল,

আর আমাকে দিয়েও তর্পণ করিয়ে তা খেতে বল্লে। তার কথামত কাজ করলুম মনে কোনরূপ ঘৃণা হল না।

কিন্তু যেদিন সে গলা কাঁচা মহামাংস নিয়ে এসে, তর্পণ করে জিভ দিয়ে স্পর্শ করতে বল্লে, সেদিন ঘৃণাভরে বলে উঠলুম, 'তা কি কখন করা যায়?' সে বল্লে, 'সে কী বাবা, এই দেখ আমি করচি!' নিজের মুখে একটু দিয়ে, 'ঘৃণা করতে নাই' বলে, আবার তার একটুখানি আমার সুমুখে ধরে রইল। আমার তখন প্রচণ্ড চণ্ডিকামূর্তির উদ্দীপন হয়ে গেল, আর মা, মা, বলতে বলতে ভাবস্থ হয়ে পড়লুম। তখন বামনী তা আমার মুখে দিলেও আর ঘৃণার উদয় হল না।

এমনি করে, পূর্ণাভিষেকের পর থেকে, বামনী কত রকমের ক্রিয়া যে করিয়েছিল তার ইয়ত্তা নাই। সকল কথা সকল সময়ে এখন স্মরণে আসে না। তবে মনে আছে, যেদিন স্ত্রী-পুরুষের সম্ভোগ দেখে শিব-শক্তির লীলাবিলাস জ্ঞান করে সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলুম সেদিন বাইরের হুঁশ হতে বামনী বলেছিল, 'বাবা, তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধ হয়ে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে, এই মতের (বীরভাবের) এটি শেষ সাধন।' তার কিছুকাল পরে, একজন ভৈরবীকে পাঁচসিকা দক্ষিণা দিয়ে খুশী করে, তার সাহায্যে মা-কালীর নাটমন্দিরে দিনের বেলায় সবার সুমুখে কুলাগার-পূজা করেছিলুম। তন্ত্রমতের সাধনার সময় নারীমাত্রে আমার মাতৃভাব অটুট ছিল, কখন বিন্দুমাত্র কারণ খেতে পারি নি! কারণের নামে বা গন্ধমাত্রে জগৎ-কারণের উদ্দীপন হয়ে আত্মহারা হতুম, 'যোনি' শব্দ শুনলেই জগদ্-যোনির উদ্দীপন হয়ে সমাধি হয়ে যেত!

একাদিক্রমে প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া ঠাকুর তন্ত্রোক্ত রহস্যসাধনসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐসকল সাধনের এক একটিতে সিদ্ধিলাভ করিতে, উহার ফল প্রত্যক্ষ করিতে, তাঁহার তিনদিনের অধিক সময় লাগে নাই তিনি বলিয়াছেন।

তন্ত্রসাধনার সময়ে তাঁহার পূর্বস্বভাব একেবারে পরিবর্তিত হইয়াছিল। জগন্মাতা সময়ে সময়ে শিবারূপ-ধারণ করেন শুনিয়া, এবং কুকুরকে

ভৈরবের বাহন জানিয়া, তাহাদের উচ্ছিষ্ট খাদ্য তিনি পবিত্র বোধে গ্রহণ করিতেন। ইহাতে তাঁহার মনে কোনরূপ দ্বিধা হইত না।

বিভীষিকা তন্ত্রব্রত শুনে ভয় পায়।
চিতাধূম-পানে কভু মত্ত প্রভুরায়॥
ছুটিতেন চারিদিকে ধূমের লাগিয়ে।
চিতাধূম লক্ষ্য করি মুখ ব্যাদানিয়ে॥
একদিন প্রভুদেব পঞ্চবটমূলে॥
গঙ্গায় জোয়ার দেখিছেন বসে বসে।
পচা মরা গরু এক ভেসে ভেসে আসে॥
সন্নিকটে কূলে লাগে তরঙ্গ-আঘাতে।
আইল কুকুর এক লাগিল খাইতে॥
বুঝি না কি ভাবে মগ্ন হৈলা নারায়ণ।
কুকুরের এক সঙ্গে আস্বাদনে মন॥
আরোপ করিলা নিজে তাহার শরীরে।
যতক্ষণ আস্বাদন-বাসনা না পূরে॥

জগন্মাতাকে দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া নিজেকে তিনি ঐসময়ে জ্ঞানাগ্নিপরিব্যাপ্ত দেখিয়াছিলেন অন্তরে-বাহিরে!

কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া মূলাধার হইতে সহস্রার পদ্মে উঠিতেছেন, নিম্নমুখ পদ্মগুলি ঊর্ধ্বমুখ ও পূর্ণপ্রস্ফুটিত হইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব সব অনুভূতিও হইতেছে, তিনি এইকালে প্রত্যক্ষ করেন। এক জ্যোতির্ময় দিব্য পুরুষ জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করিয়া পদ্মগুলি প্রস্ফুটিত করাইতেছেন, তিনি দেখিয়াছিলেন।

বেলতলায় সাধনকালে তিনি ব্রহ্মযোনি দর্শন করেন—সুবৃহৎ বিচিত্র জীবন্ত জ্যোতির্ময় একটি ত্রিকোণ, যাহা প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিতেছে। কুলাগারে বা স্ত্রীযোনির মধ্যে জগন্মাতা অধিষ্ঠিতা আছেন, তিনি এইকালে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ধ্বনির সমষ্টিস্বরূপ এক বিরাট অনাহতধ্বনি বা প্রণব-ধ্বনি স্বতই সর্বত্র সর্বদা উদিত হইতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিবার ফলে তিনি এইকালে মনুষ্যেতর প্রাণিগণের ধ্বনিসমূহের অর্থবোধ করিতে পারিতেন।

জগন্মাতার মোহিনী মায়া দেখিবার ইচ্ছা মনে উদিত হওয়ায় ঠাকুর এই

কালে একদিন দেখিয়াছিলেন : এক পরমাসুন্দরী রমণী গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠিয়া ধীরপদে পঞ্চবটীতে আসিলেন, রমণী পূর্ণগর্ভা ; রমণী তাঁহার সম্মুখেই সুন্দর কুমার প্রসব করিয়া অতি স্নেহে স্তন্যদান করিতে লাগিলেন ; রমণী পরক্ষণেই করালবদনা হইয়া শিশুকে গ্রাস করিয়া গঙ্গাগর্ভে অন্তর্হিতা হইলেন !

এইকালে তিনি দশভুজা হইতে দ্বিভুজা পর্যন্ত অসংখ্য দেবীমূর্তি দর্শন করেন। কোন কোন দেবী তাঁহাকে নানা উপদেশও দিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই অপূর্ব-সুরূপা, কিন্তু ষোড়শী বা রাজরাজেশ্বরীর সৌন্দর্যের সহিত কাহারও রূপের তুলনা হয় না। ষোড়শীর অঙ্গ হইতে রূপসৌন্দর্য গলিত হইয়া চারিদিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে, তিনি দেখিয়াছিলেন। ভৈরবাদি নানা দেবমূর্তিসকলের দর্শনও তিনি এইকালে পাইয়াছিলেন।

"অলৌকিক দর্শন ও অনুভবসকল ঠাকুরের জীবনে তন্ত্রসাধনকাল হইতে নিত্য এতই উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাহাদের সম্যক উল্লেখ করা মনুষ্যশক্তির সাধ্যাতীত বলিয়া আমাদিগের প্রতীতি হইয়াছে।" স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন।

খুব সম্ভবতঃ এই তন্ত্রসাধনকালের মধ্যেই কোন সময়ে ঠাকুরের একটা উৎকট ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন : যতই কেন খাই না, পেট কিছুতেই যেন ভরত না। এই খেয়ে উঠলুম, আবার তখনি যেন কিছু খাই নাই—সমান খাবার ইচ্ছা ! দিনরাত্রি কেবলই খাই-খাই, তার আর বিরাম নাই। ভাবলুম, এ আবার কী ব্যারাম হল ? বামনীকে বল্লুম, সে বল্লে,—বাবা, ভয় নাই ; ঈশ্বরপথের পথিকদের ওরকম অবস্থা কখন কখন হয়ে থাকে, শাস্ত্রে একথা আছে ; আমি তোমার ওটা ভাল করে দিচ্চি। মথুরকে বলে ঘরের ভিতর চিড়ামুড়কি থেকে সন্দেশ, রসগোল্লা, লুচি অবধি যত রকম খাবার আছে, সব থরে থরে সাজিয়ে রাখলে আর বল্লে,—বাবা, তুমি এই ঘরে দিনরাত্রি থাক আর যখন যা ইচ্ছা হবে তখনি তা খাও। সেই ঘরে থাকি, বেড়াই ; সেইসব খাবার দেখি, নাড়িচাড়ি ; কখন এটা থেকে কিছু খাই, কখন ওটা থেকে কিছু খাই—এভাবে তিনদিন কেটে যাবার পর সে বিপরীত ক্ষুধা চলে গেল, তবে বাঁচি।

তান্ত্রিক সাধনার শেষে ঠাকুর তাঁহার মধ্যে অণিমাদি বিভূতি আবির্ভূত হইয়াছে, অনুভব করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বালকের অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হন; দেহবোধ না থাকায় পরিহিত বসন ও যজ্ঞসূত্র অঙ্গে ধরিয়া রাখিতে পারিতেন না চেষ্টা করিয়াও, কখন কোথায় যে উহারা পড়িয়া যাইত জানিতে পারিতেন না। এই সময়ে সকল পদার্থে তাঁহার অদ্বৈতবুদ্ধি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল; 'তুলসীপাতা আর সজনে পাতা সমান পবিত্র বোধ হত!' তিনি বলিতেন।

এই সময়ে তাঁহার অঙ্গকান্তিও খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। নিজমুখে বলিয়াছেন ঠাকুর : তখন তখন এমন রূপ হয়েছিল যে, লোকে চেয়ে থাকত; বুক মুখ সব সময় লাল হয়ে থাকত আর গা দিয়ে যেন একটা জ্যোতি বেরুত! লোকে চেয়ে থাকত বলে সর্বক্ষণ একখানা মোটা চাদর মুড়ি দিয়ে থাকতুম, আর মাকে বলতুম, 'মা, তোর বাইরের রূপ তুই নে আমাকে ভিতরের রূপ দে।' গায়ে হাত বুলিয়ে চাপড়ে চাপড়ে বলতুম, 'ভিতরে ঢুকে যা, ভিতরে ঢুকে যা।' তবে কতদিন পরে উপরটা এইরকম মলিন হয়ে গেল।

জগন্মাতার প্রসাদে ঠাকুর এইকালে জানিতে পারিয়াছিলেন, উত্তর কালে বহুলোক তাঁহার কাছে ধর্মলাভ করিতে আসিবে। তাঁহার পরম অনুগত মথুরামোহন একথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, বেশ তো বাবা, সবাই মিলে তোমাকে নিয়ে আনন্দ করব।

ঠাকুরের দীর্ঘকালব্যাপী তন্ত্রসাধনের গুরু ও উত্তরসাধিকা ভৈরবী যোগেশ্বরীর অদ্ভুত শাস্ত্রজ্ঞান ও প্রয়োগকুশলতার কথা শুনিয়া অতীব বিস্ময় জন্মে। সুযোগ্য শিষ্য লাভ করিয়া, নিজের আজীবন স্বাধ্যায় ও তপস্যার ফল স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁহাকে অনুভব করাইতে তিনি ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী যোগমায়ার অংশসম্ভূতা ছিলেন, ঠাকুর বলিয়াছেন।

সাধনায় সিদ্ধ হইবার কিছুকাল পরেই ঠাকুর মুণ্ডকঙ্কালগুলি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া আসন দুইটি ভাঙ্গিয়া দেন।

বাৎসল্যভাবের সাধনা

১২৭০ সালে মথুরামোহন অন্নমেরুব্রতের অনুষ্ঠান করেন দক্ষিণেশ্বরে। এই ব্রতে স্বর্ণরৌপ্যাদি দক্ষিণার সহিত সহস্র মন চাউল ও সহস্র মন তিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে দান করা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে আয়োজিত কীর্তন, চণ্ডীর গান, যাত্রা প্রভৃতিতে কালীবাটী কয়েকদিনের জন্য উৎসব-ক্ষেত্রে পরিণত হয়; ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত-শ্রবণে ঠাকুরের ঘন ঘন ভাব-সমাধি হইতে দেখিয়া, তাঁহার পরিতৃপ্তিকেই গুণবত্তার পরিমাপক ধরিয়া, মথুর গায়কগায়িকাগণকে শাল, রেশমী কাপড় ও প্রচুর টাকা পারিতোষিক দিয়াছিলেন।

ঐ ব্রতানুষ্ঠানের স্বল্পকাল পূর্বে ঠাকুর কয়েকবার বর্ধমানরাজের প্রধান সভাপণ্ডিত পদ্মলোচন তর্কালঙ্কারকে দেখিতে গিয়াছিলেন আড়িয়াদহে, গঙ্গাতীরবর্তী এক উদ্যানবাটীতে। পদ্মলোচনের শরীর দীর্ঘকাল অসুস্থ থাকায় তাঁহাকে ঐ উদ্যানে আনিয়া রাখা হইয়াছিল। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ও ঈশ্বরভক্তির কথা শুনিয়া ঠাকুর তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

হৃদয়ের উক্তি হইতে জানা যায়, প্রথম দিনের মিলনেই ঠাকুর ও পণ্ডিতজী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। ঠাকুরের মধুরকণ্ঠে মায়ের নামগান শুনিয়া পদ্মলোচন অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই, এবং সমাধিতে তাঁহাকে বাহ্যজ্ঞানহারা হইতে দেখিয়া ও সেই অবস্থায় তাঁহার কিরূপ উপলব্ধি-সমূহ হয় শুনিয়া তিনি অবাক হইয়া গিয়াছিলেন।

পদ্মলোচন বেদান্তোক্ত জ্ঞানবিচারের সহিত তন্ত্রোক্ত সাধনপ্রণালীর অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার কাছে সর্বদাই একটি জলপূর্ণ গাড়ু ও একখানি গামছা থাকিত; প্রশ্নবিশেষ মীমাংসা করিবার বা বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে গাড়ু-গামছা-হাতে কয়েক পা হাঁটিয়া তিনি ঐ গাড়ুর জলে মুখ ধুইয়া গামছায় মুছিয়া নিতেন। ইহার ফলে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও প্রত্যুৎপন্নমতি প্রবুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অন্যের অজেয় করিয়া তুলিত। তাঁহার ইষ্টদেবীর

নির্দেশেই যে তিনি ঐরূপ করিতেন, একথা কখনও কাহারও কাছে প্রকাশ করেন নাই। পদ্মলোচনের অজ্ঞাতসারে ঠাকুর একদিন তাঁহার গাড়ু-গামছা লুকাইয়া রাখেন। গাড়ু-গামছা দেখিতে না পাইয়া, এবং ঠাকুরই উহা সরাইয়া রাখিয়াছেন জানিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তারপরে যখন তিনি বুঝিলেন যে, সকল কথা জানিয়াই ঠাকুর ঐ কাজটি করিয়াছেন, তখন সাক্ষাৎ ইষ্টদেবী জ্ঞান করিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে ঠাকুরকে তিনি স্তবস্তুতি করিয়াছিলেন।

ঠাকুর বলিতেন: পদ্মলোচন অতবড় পণ্ডিত হয়েও এখানে এতটা বিশ্বাসভক্তি করত। বলেছিল, 'আমি সেরে উঠে সব পণ্ডিতদের ডাকিয়ে সভা করে সকলকে বলব, তুমি ঈশ্বরাবতার; আমার কথা কে কাটে পারে দেখব।' মথুর (অন্নমেরু-ব্রতানুষ্ঠানে) যত পণ্ডিতদের ডাকি দক্ষিণেশ্বরে এক সভার যোগাড় করেছিল। পদ্মলোচন নির্লোভ নিষ্ঠা ব্রাহ্মণ, সভায় আসবে না ভেবে আসবার জন্যে অনুরোধ করতে বলে মথুরের কথায় তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'হাঁগা, তুমি দক্ষিণেশ্বরে না?' সে বলেছিল, 'তোমার সঙ্গে হাড়ীর বাড়ীতে গিয়ে খেয়ে আসতে পারি, কৈবর্তের বাড়ীতে সভায় যাব, এ আর কি বড় কথা?'

মথুরবাবুর আহূত সভায় পদ্মলোচন যাইতে পারেন নাই। সভা আহূত হইবার পূর্বেই তাঁহার অসুখ বাড়িয়া যায়, ঠাকুরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনি ৺কাশীধামে চলিয়া যান ও কাশীতেই দেহত্যাগ করেন।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী যেমন শক্তিতন্ত্রোক্ত ক্রিয়াপ্রধান বীরভাবের সাধিকা ছিলেন, তেমনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ভাবপ্রধান সাধনপ্রণালী অনুসরণ করিয়া বাৎসল্যাদি ভাবের রসও নিজ জীবনে কিছু কিছু আস্বাদন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ঠাকুরের প্রতি তিনি যে বাৎসল্যরতিসম্পন্না ছিলেন একথা আগেই বলা হইয়াছে। দেবমণ্ডলের ঘাটে ননী হাতে নিয়া নয়নজলে বসন সিক্ত করিতে করিতে 'গোপাল, গোপাল,' বলিয়া তিনি ডাকিতে থাকিতেন, আর এদিকে কালীবাটীতে থাকিয়া ঠাকুর সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিতেন ও একছুটে ব্রাহ্মণীর নিকটে উপস্থিত হইয়া সেই ননী ভোজন

করিতেন। কখন কখন লাল চেলী ও অলঙ্কার পরিয়া, নানাপ্রকার ভোজ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ থালা হাতে ধরিয়া—সঙ্গে পাড়ার স্ত্রীলোকেরাও আছেন—গান গাহিতে গাহিতে তিনি কালীবাটীতে আসিতেন ও গোপাল-ভাবে আবিষ্ট ঠাকুরকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া যাইতেন। সেই সময়ে তাঁহার আলুলায়িত কেশজাল ও ভাববিহ্বল অবস্থা দেখিয়া লোকের তাঁহাকে সাক্ষাৎ নন্দরাণী যশোদা বলিয়াই মনে হইত। একদিন—

পরা বারাণসী শাড়ী গায়ে অলঙ্কার॥
হাতে থাল-পরিপূর্ণ ছানা ননী ক্ষীর।
শ্রীপ্রভুর দরশনে হইল বাহির॥
গায় কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের প্রভাসের গান।
ভাবেতে ব্রাহ্মণী নন্দরাণীর সমান॥
পাগলিনী-সম গায় ভাসে আঁখি জলে।
যে শুনে সে কাঁদে আর সঙ্গে এসে মিলে॥
পুরীর ফটক-দ্বারে যবে উপনীতা।
চারিধারে বামাদলে ব্রাহ্মণী বেষ্টিতা॥
যেই দেখে শুনে হয় সেই বিমোহিত।
গাইতে লাগিল নিম্নলিখিত সঙ্গীত॥
দ্বারে দাঁড়ায়ে আছে তোর মা নন্দরাণী।
তোরে নিতে আসি নাই, দেখে যাব চাঁদবদনখানি।
আয়রে কোলে দিব তুলে বদনে সর ননী॥
... ...
ফটক হইতে প্রায় দশ বিঘা দূর।
যেখানে একত্রে প্রভু, হৃদয়, মথুর॥
হৃদয়-মথুর স্বর শুনিবার আগে।
ব্রাহ্মণীর প্রেমমাখা গীত গিয়া লাগে॥
মহাবেগে বাণসম প্রভুর শ্রবণে।
বাহ্য গেল সমাধিস্থ হৈলা সেইক্ষণে॥
পশ্চাৎ মথুর শুনি কহিল হৃদয়ে।
কেবা গায় মিষ্টগীত দেখ না এগিয়ে॥

হৃদয় একত্রে দেখে নারী কয়জনা।
তার মধ্যে ব্রাহ্মণীরে নাহি যায় চেনা॥
আভরণে রঙীন বসনে সজ্জা করা।
লুকায়েছে তার মধ্যে তাঁহার চেহারা॥
ব্রাহ্মণী নিকটে আসি করে নিরীক্ষণ।
সমাধিস্থ প্রভুদেব নাহিক চেতন॥
ব্রাহ্মণীও অচেতন-প্রায় ভূমে পড়ে।
থাল-সহ হৃদয় যাইয়া তায় ধরে॥
কিছুপরে ব্রাহ্মণী সম্বিৎ পেয়ে উঠে।
বিভোর শ্রীপ্রভুদেব নেশা নাহি ছুটে॥
শ্রীপ্রভুর সন্নিকটে বসিল ব্রাহ্মণী।
অবিরল ঢালে জল নয়ন দুখানি॥
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু ভাবের বিহ্বলে।
শিশুসম বসিলেন ব্রাহ্মণীর কোলে॥
থালা থেকে লয়ে ননী হৃদয় আপনে।
টুকু টুকু তুলে দেয় প্রভুর বদনে॥
... ...
ব্রাহ্মণীর কোলে কিবা দৃশ্য করে খেলা।
ধরিয়াছে ধরাতল বৈকুণ্ঠের মেলা॥

"ঠাকুরের ভিতর আজীবন পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়বিধ প্রকৃতির অদৃষ্ট-পূর্ব সম্মিলন দেখা যাইত। উহাদিগের একের প্রভাবে তিনি সিংহপ্রতিম নির্ভীক-বিক্রমশালী, সর্ববিষয়ের কারণান্বেষী, কঠোর পুরুষপ্রবররূপে প্রতিভাত হইতেন; এবং অন্যের প্রকাশে ললনাজনসুলভ কোমলকঠোর-স্বভাববিশিষ্ট হইয়া হৃদয় দিয়া জগতের যাবতীয় বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিতেছেন ও পরিমাণ করিতেছেন, এইরূপ দেখা যাইত। শেষোক্ত প্রকৃতির বশে তাঁহাতে কতকগুলি বিষয়ে তীব্র অনুরাগ ও অন্য কতকগুলিতে ঐরূপ বিরাগ স্বভাবতঃ উপস্থিত হইত এবং ভাবাবেশে অশেষ ক্লেশ হাস্যমুখে বহন করিতে পারিলেও ভাববিহীন হইয়া ইতরসাধারণের ন্যায় কোন কার্য করিতে সমর্থ হইতেন না।"

তান্ত্রিক সাধনা সম্পূর্ণ হইয়া যাইবার পরে ঠাকুরের স্ত্রী-প্রকৃতিটিই যেন স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ দেখা যায়, এই সময়ে তিনি নিজেকে জগন্মাতার সখী বা দাসী ভাবনা করিয়া, স্ত্রীবেশে সজ্জিতা হইয়া, কখন তাঁহাকে চামর-বীজন করিতেছেন, কখন বা নৃত্যগীত করিয়া তাঁহার আনন্দ বিধান করিতেছেন। শারদীয়া-মহাপূজা উপলক্ষে মথুরবাবু তাঁহাকে জানবাজারে নিজবাটীতে লইয়া গিয়াছেন, সেখানে অন্দরমহলে মেয়েদের মধ্যেই তিনি অনেককাল অতিবাহিত করিতেছেন, অথচ মেয়েরা তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া যেন ভাবিতেই পারিতেছে না, আর পারিলেও, তাঁহার নিকটে কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করিতেছে না! মথুরবাবু ও তাঁহার পত্নী জগদম্বা দাসী তাঁহাকে নিয়া একত্র আহারাদি করিতেছেন, এমনকি তাঁহাকে নিয়া এক শয্যায় শয়নও করিতেছেন বিনা লজ্জায়, বিনা সঙ্কোচে। বাপ-মার পাশে ছোট শিশুটির মত তিনি শুইয়া থাকেন! তিনি যে এখন জগন্মাতার সখী—তাঁহার যাবতীয় লীলাবিলাসের, সে লীলাবিলাস যেমন ভাবেরই হউক না কেন, নীরব সাক্ষী—নির্লিপ্ত উদাসীন দ্রষ্টা। জগদম্বা একদিন প্রশ্ন করিলেন, বাবা, তুমি কি আমাদের কথাবার্তা শুনতে পাও? ঠাকুর বলিলেন, পাই।

মথুরবাবুর পরিবারের কোন যুবতীর স্বামী আসিয়াছে, ঠাকুর তাঁহাকে সাজাইয়া গুজাইয়া, দেবীপ্রতিমাকে যেমন লোকে সাজায়, কিভাবে স্বামীর সহিত কথা কহিতে হয় তাহা কানে কানে শিখাইতে শিখাইতে শয়নঘরে স্বামীর পাশে বসাইয়া দিয়া আসিলেন!

পূজামণ্ডপে মা-দুর্গার রাত্রিকালীন আরাত্রিক হইবে। ঠাকুর মথুরবাবুর দেওয়া গরদের চেলী স্ত্রীলোকদের কাপড় পরার মত করিয়া পরিয়াছেন ও আপনাতে আপনি মগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল এক অপার্থিব ভাবে সমুজ্জ্বল, তাঁহার রক্তিম অধরে মৃদুমধুর হাসি, তাঁহার চোখের চাহনি, অঙ্গভঙ্গী সমস্তই স্ত্রীলোকের মত। মথুর-পত্নী আরতি দর্শন করিতে যাইবেন, কিন্তু ঠাকুরকে একাকী রাখিয়া যাইতে সাহস পাইতেছিলেন না। অথচ এই ভাবাবেশের অবস্থায় কেমন করিয়া যে

তাঁহাকে সাথে লইয়া যাইবেন, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। সহসা তাঁহার মনে একটা উপায় আসিয়া জুটিল, নিজের বহুমূল্য গহনাগুলি বাহির করিয়া ঠাকুরকে পরাইতে পরাইতে বারবার তাঁহার কানের গোড়ায় বলিতে লাগিলেন, বাবা, চল ; মার আরতি হবে, মাকে চামর করবে না? ভাবের অনুকূল কথা কানে যাইতে ঠাকুর অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। ঠাকুরদালানের একদিকে পুরুষেরা ও অন্যদিকে স্ত্রীলোকেরা দাঁড়াইয়া থাকিয়া আরতি দর্শন করিতেছিলেন, সহসা মথুরবাবু দেখিলেন, তাঁহার পত্নীর পাশে দাঁড়াইয়া বিচিত্র বসনভূষণা দ্যুতিমতী এক অপরিচিতা মাকে চামর করিতেছেন। বারবার দেখিয়াও ঐ অপরিচিতা যে কে হইতে পারেন তাহা ঠিক অনুমান করিতেও পারিলেন না!

ঠাকুরের শিক্ষায় মথুরবাবু সাধুভক্তগণকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, এবং তাঁহারই ইচ্ছানুসারে তাঁহাদিগকে বস্ত্র, কম্বল, কমণ্ডলু প্রভৃতি তাঁহাদের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসমূহ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে আবার, বিশেষ বিশেষ সাধু ও সাধকেরা তাঁহাদের সাধনার অনুকূল সিদ্ধি, গাঁজা, কারণ ইত্যাদি দ্রব্যগুলি যাহাতে পান তাহারও বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, ঠাকুরের অভিপ্রায় জানিয়া। ইহার ফলে রাণী রাসমণির ঠাকুরবাটীর অদ্ভুত আতিথেয়তার কথা সাধুসমাজে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ; সর্বসম্প্রদায়ভুক্ত তীর্থপর্যটনশীল সাধুরা এখানে আসিয়া কয়েকদিন বিশ্রাম করিতেন, কচিৎ কেহ কিছুকাল থাকিয়াও যাইতেন। এইরূপে আসিয়া সম্ভবতঃ ১২৭০ সালে, জটাধারী নামে এক রামাইত সাধু এখানে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন।

জটাধারী বাৎসল্যভাবে শ্রীরামচন্দ্রের ধাতুময় এক বালবিগ্রহের বা রামলালার সেবা করিয়া আসিতেছিলেন ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত, বহুকাল ধরিয়া। সেবা করিতে করিতে তাঁহার মন রামলালায় তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিয়া তাঁহার সপ্রেম বিগ্রহসেবা লক্ষ্য করিতে করিতে ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, রামলালা সত্যসত্যই খায়, এটা

সেটা খাইতে চায়, আবদার করে, সঙ্গে বেড়াইতে যায়! আর বাবাজী চব্বিশ ঘণ্টাই রামলালাকে লইয়া 'মস্ত' বা আনন্দে বিভোর। ঠাকুর এই সময়ে প্রকৃতিভাবে ভাবিত ছিলেন, সহজেই রামলালার উপরে তাঁহারও বাৎসল্যপ্রীতির উদয় হইল! ঐভাব সাধনা করিবার জন্য তিনি বাবাজীর নিকট রামমন্ত্র গ্রহণ করিলেন।

রামলালার প্রীতিও ক্রমে ক্রমে বাবাজীকে ছাড়াইয়া ঠাকুরের উপরেই অধিক হইতে লাগিল। যতক্ষণ ঠাকুর বাবাজীর কাছে থাকেন, সে বেশ থাকে, খেলাধূলা করে; আর যেই তিনি নিজের ঘরে চলিয়া আসেন, সেও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসে—নিষেধ করিলেও শুনে না। বাবাজী অভিমানভরে নানাকথা বলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় না। এইভাবে কিছুদিন যায়। একদিন বাবাজী হঠাৎ আসিয়া অশ্রুসিক্তচক্ষে ঠাকুরকে কহিলেন: রামলালা আমাকে প্রাণের পিপাসা মিটাইয়া দেখা দিয়াছে ও বলিয়াছে, তোমার নিকট হইতে যাইবে না। এখন আমার অবস্থা এমন হইয়াছে যে, রামলালার যাহাতে সুখ, আমারও তাহাতেই সুখ। তোমার কাছে সে সুখে আছে ভাবিয়া, সেই ধ্যান করিয়াই, আমার আনন্দ হইবে।

জটাধারী ঠাকুরকে রামলালা-বিগ্রহ দিয়া চলিয়া গেলেন। রামলালাকে নিয়া ঠাকুরের বাৎসল্যরসের আস্বাদন বিরামহীন বৈচিত্র্যে উচ্ছল হইয়া উঠিল।

ভক্তদের কাছে বলিয়াছেন ঠাকুর:

আমি দেখতুম, সত্যি সত্যি দেখতুম—এই যেমন তোমাদের দেখচি সেইরকম দেখতুম—রামলালা সঙ্গে সঙ্গে কখন আগে কখন পেছনে নাচতে নাচতে যাচ্চে। কখন বা কোলে উঠবার জন্যে আবদার করচে। আবার কখন বা কোলে করে রয়েচি. কিছুতেই কোলে থাকবে না; কোল থেকে নেমে রোদে দৌড়াদৌড়ি করতে যাবে, কাঁটাবনে গিয়ে ফুল তুলবে, বা গঙ্গার জলে নেমে ঝাঁপাই পাড়বে! যত বারণ করি, ওরে, অমন করিস নি, গরমে পায়ে ফোস্কা পড়বে—ওরে, অত জল ঘাটিস নি, ঠাণ্ডা

লেগে সর্দি হবে, জ্বর হবে, সে কি তা শুনে? যেন কে কাকে বলচে! হয়তো সেই পদ্মপলাশের মত সুন্দর চোখ দুটি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসতে লাগল, আর আরো দুরন্তপনা করতে লাগল, বা ঠোঁট দুখানি ফুলিয়ে মুখভঙ্গী করে ভ্যাংচাতে লাগল। তখন সত্যি সত্যি রেগে বলতুম, তবে রে পাজী, রোস, আজ তোকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব!—বলে রোদ থেকে বা জল থেকে জোর করে টেনে নিয়ে আসি, আর এ জিনিসটা ও জিনিসটা দিয়ে ভুলিয়ে, ঘরের ভিতর খেলতে বলি। আবার কখন বা কিছুতেই তার দুষ্টুমি থামচে না দেখে চড়টা চাপড়টা বসিয়েই দিতুম। মার খেয়ে সুন্দর ঠোঁট দুখানি ফুলিয়ে জলভরা চোখে আমার দিকে তাকাত। তখন আবার মনে কষ্ট হত, কোলে নিয়ে কত আদর করে তাকে ভুলাতুম! এরকম সব ঠিক ঠিক দেখতুম, করতুম।

একদিন নাইতে যাচ্চি, বায়না ধরলে সেও যাবে। কী করি, নিয়ে গেলুম। তারপর জল থেকে আর কিছুতেই উঠবে না, যত বলি কিছুই শুনে না। শেষে রাগ করে জলে চুবিয়ে ধরে বল্লুম, তবে নে, কত জল ঘাঁটতে চাস ঘাট্; আর সত্যি সত্যি দেখলুম সে জলের ভিতর হাঁপিয়ে শিউরে উঠল। তখন আবার তার কষ্ট দেখে কী করলুম বলে কোলে করে জল থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসি!

আর একদিন তার জন্মে মনে যে কষ্ট হয়েছিল, কত যে কেঁদেছিলুম তা বলবার নয়। সেদিন রামলালা বায়না করচে দেখে ভুলাবার জন্মে চারটি ধানসুদ্ধ খই খেতে দিয়েছিলুম। তারপর দেখি, ঐ খই খেতে খেতে ধানের তুষ লেগে তার নরম জিভ চিরে গেছে! তখন মনে কষ্ট হল; তাকে কোলে করে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলুম আর মুখখানি ধরে বলতে লাগলুম, যে মুখে মা-কৌশল্যা লাগবে বলে ক্ষীর-সর-ননীও সন্তর্পণে তুলে দিতেন, আমি এমন হতভাগা যে, সেই মুখে এই কদর্য খাবার দিতে মনে একটুও সঙ্কোচ হল না!

শেষোক্ত কথাগুলি বলিতে বলিতে ঠাকুরের পূর্বশোক আবার উথলিয়া উঠিয়াছিল, এবং অধীর হইয়া তিনি এমন ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, ভক্তদের চোখেও জল দেখা দিয়াছিল।

রামচন্দ্রের বালগোপাল-মূর্তির অবিচ্ছিন্ন দিব্যদর্শন-লাভে সমর্থ হইয়া ঠাকুর অচিরে প্রত্যক্ষ করিলেন:

যো রাম দশরথ কা বেটা,
ওহি রাম ঘট্‌ঘট্‌মে লেটা।
ওহি রাম জগৎ পশেরা,
ওহি রাম সব্‌সে নেয়ারা॥

"শ্রীরামচন্দ্র কেবলমাত্র দশরথের পুত্র নহেন, কিন্তু প্রতি শরীর আশ্রয় করিয়া জীবভাবে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন। আবার ঐরূপে অন্তরে প্রবেশপূর্বক জগদ্‌রূপে নিত্য-প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও তিনি জগতের যাবতীয় পদার্থ হইতে পৃথক্‌, মায়ারহিত নির্গুণ স্বরূপে নিত্য-বিদ্যমান রহিয়াছেন।"

এই হিন্দী দোঁহাটি ঠাকুর অনেক সময়ে আবৃত্তি করিতেন।

শ্রীকৃষ্ণের বালগোপাল-মূর্তিতে বাৎসল্যভাব আরোপ করিয়াও ঠাকুর এইরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ভক্তগণের সাক্ষাতে একদিন মধুরকণ্ঠে হরিনাম করিতে করিতে তিনি বলিয়াছিলেন: ওমা, ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁশ করে রাখিস নি। ব্রহ্মজ্ঞান চাই না মা! আমি আনন্দ করব, বিলাস করব!···কৃষ্ণরে, তোরে বলব, খা রে—নে রে বাপ! কৃষ্ণ রে, বলব, তুই আমার জন্যে দেহ ধারণ করে এসেচিস বাপ! [কথামৃত]

মধুরভাবের সাধনা

বাৎসল্যভাবের সাধনার পরে ঠাকুর মধুরভাবের সাধনা করেন। ঐ সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াই তিনি স্ত্রীবেশে সজ্জিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া মথুরবাবু তাঁহাকে বারাণসী শাড়ী, ঘাগরা, ওড়না, কাঁচুলি, চাঁচর কেশপাশ (পরচুলা) ও এক সুট ডায়মনকাটা অলঙ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া ব্রজগোপীর ভাবে তিনি এতই তন্ময় হইয়াছিলেন যে, তাঁহার পুরুষসত্তার অনুভূতি তখনকার মত লোপ পাইয়াছিল এবং তাঁহার চলন, বলন, হাস্য, কটাক্ষ, অঙ্গভঙ্গী ও শরীরমনের সকল ক্রিয়া স্ত্রীলোকের মত হইয়া গিয়াছিল। নিরন্তর ছয়মাস তিনি এইভাবে ছিলেন।

এই সময়ে কখন কখন জানবাজারে গিয়া ঠাকুর মথুরবাবুর পরিবারস্থ মেয়েদের মধ্যেও বাস করিয়াছেন। ঐসকল মেয়েরা পূর্ব হইতেই তাঁহাকে দেবতাসদৃশ জ্ঞান করিতেন, এখন তাঁহাকে নিজেদেরই একজন মনে করিয়া তাঁহার সম্মুখে লজ্জাসঙ্কোচাদি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়াছিলেন। 'তারা তখন আমাকে তাদের সখী জ্ঞান করত।' ঠাকুর বলিতেন। রমণীগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিবার কালে মথুরবাবু একদিন হৃদয়কে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করেন, বল দেখি, ওদের মধ্যে তোমার মামা কোন্‌টি? হৃদয় সহসা নিজের মাতুলকে চিনিয়া লইতে পারে নাই। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুর প্রতিদিন প্রত্যূষে সাজি-হাতে পুষ্পচয়ন করিতেন, হৃদয় দেখিয়াছিল ঐসময়ে প্রতিবারই মেয়েদের মত তাঁহার বামপদ স্বতঃ অগ্রসর হইতেছে। ভৈরবী ব্রাহ্মণী বলিয়াছিলেন, পুষ্পচয়নকালে তাঁহাকে দেখিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার শ্রীমতী রাধারাণী বলিয়া ভ্রম হইয়াছে। স্ত্রী-ভাবের প্রাবল্যে ও সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টিতে এইকালে তাঁহার দেহ মাসে তিনদিন করিয়া পুষ্পিত হইতেও দেখা গিয়াছে।

বিবিধ পুষ্পে বিচিত্র মালা গাঁথিয়া তিনি এইকালে প্রতিদিন শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউকে সাজাইতেন, এবং কখন কখন মা-ভবতারিণীকেও

ঐরূপে সাজাইয়া তাঁহার নিকটে, ৺কাত্যায়নীর নিকটে ব্রজবালাদের মত, শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিতেন।[১]

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেমে চিরকালের জন্য আবদ্ধ। ইহা জানিয়া ব্রজগোপীর ভাবে ভাবিত ঠাকুর শ্রীমতীর স্মরণ মনন ও ধ্যানে তন্ময় হইলেন, এবং তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে কাতর প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন করিতে করিতে অচিরেই তাঁহার দর্শনলাভ করিলেন। "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্বস্বহারা, নিরুপমা, অশেষ মহিমা ও মাধুরী-মণ্ডিতা, নাগকেশরপুষ্পের কেশরসকলের ন্যায় গৌরবর্ণা" সেই মূর্তি তাঁহাকে দেখা দিয়া তাঁহার নিজাঙ্গে মিলিত হইয়া গেলেন। ইহার পর হইতে ঠাকুর নিজেকে স্বয়ং শ্রীমতী বলিয়া জ্ঞান করিতে ও তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন। আর শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ন্যায় তাঁহাতে মহাভাবের লক্ষণসমূহ প্রকট হইতে আরম্ভ করিল।

দিনের পর যতই দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, তাঁহার প্রার্থনা ততই আকুল ক্রন্দনে ও প্রতীক্ষা উন্মত্তের ন্যায় উৎকণ্ঠা ও আচরণে পরিণত হইল। আহারনিদ্রা বন্ধ হইল। হৃদয়মন-মন্থনকারী বিরহের উত্তাপ নিদারুণ দেহজ্বালারূপে দেখা দিল, আর শরীরের লোমকূপ দিয়া সময়ে সময়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত-নির্গমন হইতে লাগিল। দেহের গ্রন্থিসকল ভগ্নপ্রায় শিথিল লক্ষিত হইত, এবং দেহটি কখন কখন মৃতের ন্যায় অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকিত।[২]

---

১ শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজকুমারীগণের পূজা ও প্রার্থনার মন্ত্র:
কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধিশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥

২ লীলাপ্রসঙ্গকার শ্রীসারদানন্দ লিখিয়াছেন: "দেহের সহিত নিত্যসম্বদ্ধ মানব আমরা প্রেম বলিতে এক দেহের প্রতি অন্য দেহের আকর্ষণই বুঝিয়া থাকি। অথবা বহু চেষ্টার ফলে স্থূল দেহবুদ্ধি হইতে কিঞ্চিন্মাত্র ঊর্ধ্বে উঠিয়া যদি উহাকে দেহবিশেষাশ্রয়ে প্রকাশিত গুণসমষ্টির প্রতি আকর্ষণ বলিয়া অনুভব করি, তবে 'অতীন্দ্রিয় প্রেম' বলিয়া…উহার কত যশোগান করি। কিন্তু কবিকুলবন্দিত

শ্রীদেহের যত্ন এবে তুজনার হাতে।
ব্রাহ্মণী দিনের বেলা, হৃদয় রাত্রিতে ॥
ব্রাহ্মণী সুতীক্ষ্ণদৃষ্টি করে দরশন।
শ্রীঅঙ্গেতে পুনঃ মহাভাবের লক্ষণ ॥
নিদারুণ দেহোত্তাপে জ্বালার যন্ত্রণা।
দিবানিশি কিবা কষ্ট না যায় বর্ণনা ॥
শাস্ত্রের নির্দেশ মত ব্রাহ্মণী হেথায়।
উপশম-হেতু অঙ্গে চন্দন মাখায় ॥
উত্তাপের প্রবলতা এতই তখন।
দিবামাত্র ধূলিবৎ আলেপ্য চন্দন ॥

... ...

সঙ্কট-অবস্থাপন্ন সাধনা-সময়।
ঘন ঘন অচেতন বাহ্য নাহি রয় ॥
মথুর উৎকণ্ঠপ্রাণ তাহার কারণে।
পাছে ঘটে অমঙ্গল যতন বিহনে ॥

... ...

জানবাজারের ঘরে গেলেন লইয়া ॥

... ...

চোখে চোখে রাখে তাঁরে যত পরিবার।
একদিন শুন কিবা হইল ব্যাপার ॥
উপবিষ্ট একধারে প্রভু পরমেশ।
বিভোর বিভোর অঙ্গ, ভাবের আবেশ ॥
বাহ্যিক চেতনাহীন, কেহ নাহি জানে।
অতিশয় অনাবিষ্ট ভৃত্য একজনে ॥
অগ্নিবর্ণ গুলে ভরা কলিকা লইয়া।
যাইতে যাইতে দ্রুত সেই পথ দিয়া ॥

আমাদিগের ঐ অতীন্দ্রিয় প্রেম যে স্থূলদেহবুদ্ধি এবং সূক্ষ্মভোগলালসা-পরিশূন্য নহে, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ঠাকুরের জীবনে প্রকাশিত যথার্থ অতীন্দ্রিয় প্রেমের তুলনায় উহা কি তুচ্ছ, হেয় এবং অন্তঃসারশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়!"

ফেলে এক পোড়া গুল রক্তিমবরণ।
যেখানে প্রভুর পিঠ কাঁধে সংলগন॥

... ...

হেথা অগ্নিবর্ণ গুলে পিঠ পুড়ে যায়।
চর্ম-দগ্ধ-গন্ধ সবে আঘ্রাণেতে পায়॥

... ...

কোন মতে কেহ কিছু না পায় সন্ধান।
মথুর দেখিল বাহ্যহারা ভগবান॥

... ...

বাহ্য আনিবারে কানে দেন কৃষ্ণনাম।
কতক্ষণ পরে আসে কিঞ্চিৎ গিয়ান॥

... ...

দেহেতে নামিলে মন জড় জড় স্বরে।
বলিলেন পিঠে কেন চিন্‌চিন্ করে॥
পিঠ দেখি মথুরের পরাণ আকুল।
ভিতরে ঢুকেছে অগ্নিবর্ণ লাল গুল॥
মুখে নাহি সরে কথা দেখিয়া ব্যাপার।
অমনি টানিয়া আনে হাতে আপনার॥
বলে ভাল যত্ন হেতু আনিনু ভবনে।
কি হল কি হল কালী রক্ষা কর দীনে॥
যতদিন দগ্ধস্থান নাহি গেল সেরে।
সবে মিলে ঘেরে তাঁরে রাখিল অন্দরে॥

অবশেষে তাঁহার উৎকণ্ঠাময় দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হইল। তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন; এবং "নীলবর্ণ ঘাসফুলের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট" সেই মূর্তি তাঁহাকে দেখা দিয়া শ্রীমতী রাধারাণীর ন্যায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গে মিলিত হইলেন। এই মিলনের পর তাঁহার পৃথগস্তিত্ববোধ তিরোহিত হইল—কখন নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ, কখন বা 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ-স্ফুরণ' হইতে লাগিল। আব্রহ্মস্তম্ব সকলকে তিনি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহরূপে দর্শন করিলেন।

মধুররস আস্বাদন করিবার কালে, একদিন তিনি বিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখস্থ দালানে বসিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত-পাঠ শুনিতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় মূর্তির পাদপদ্ম হইতে দড়ার মত জ্যোতি বাহির হইয়া ভাগবত-গ্রন্থকে স্পর্শ করিল, ও তারপরে তাঁহার নিজের বক্ষঃস্থলে সংলগ্ন হইয়া তিন বস্তুকে কিছুকাল একত্র সংযুক্ত করিয়া রাখিল। তিনি বলিতেন: ভাগবত-ভক্ত-ভগবান তিন এক, এক তিন।

ঐরূপ কোন সময়ে তিনি ব্রজগোপীদেরও দর্শন পাইয়াছিলেন। একদিন কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের মুখে গোপীগণের কথা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সহাস্যে বলিয়াছিলেন: 'গোপীদের কাছে খাওয়া, খেলা, কাঁদা, আবদার করা, এসব হয়েচে।' [কথামৃত]

ভাবাবস্থায় রেলের উপর পড়িয়া গিয়া ঠাকুরের বাঁ হাতের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল (মাঘ, ১২৯০)। ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন: 'তোমাদের অতিগুহ্য কথা বলচি—কেন পূর্ণ, নরেন্দ্র, এঁদের সব এত ভালবাসি। জগন্নাথের সঙ্গে মধুরভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙ্গে গেল। জানিয়ে দিলে, 'তুমি শরীর ধারণ করেচ, এখন নররূপের সঙ্গে সখ্য, বাৎসল্য এইসব ভাব লয়ে থাক।' [কথামৃত]

অপ্রকট হওয়ার কয়েক মাস পূর্বে ঠাকুর একদিন একান্তে কথামৃতকার শ্রীমকে বলিয়াছিলেন: 'তোমায় বলচি—এসব জীবের শুনতে নাই—প্রকৃতিভাবে পুরুষকে আলিঙ্গন চুম্বন করতে ইচ্ছা হয়!'

ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা

মধুরভাবসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর ভাবসাধনার চরম ভূমিতে উপনীত হইয়াছিলেন। স্বভাবতই তাঁহার মনে এখন সর্বভাবাতীত বেদান্তপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য সাধনা করিবার প্রেরণা আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাব ও ভাবাতীত রাজ্য দুইটি পরস্পর কার্যকারণসম্বন্ধে অবস্থিত। ভাবাতীত অদ্বৈতরাজ্যের ভূমানন্দই সীমাবদ্ধ হইয়া ভাবরাজ্যের দর্শন-স্পর্শনাদি সম্ভোগানন্দরূপে প্রকাশিত হয়। তাঁহার মন এখন ভূমানন্দের দিকে ধাবিত হইল।

সন্ন্যাসপূর্বক ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা করাই বিধি। সন্ন্যাস মানে জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে জাগতিক সমুদয় এষণা বা বাসনার সম্যক্ ত্যাগ। স্বতঃসিদ্ধ অনুরাগ ও ব্যাকুলতা-সহায়ে পূর্বেই তিনি জগৎকারণকে নানাভাব দর্শন ও সম্ভোগ করিয়াছিলেন; জাগতিক সুখস্পৃহা আপনা হইতেই তাঁহার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। ইহাকে 'আন্তর সন্ন্যাস' বলা যাইতে পারে।

ঠাকুরের জননী শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার কনিষ্ঠপুত্রের কাছে থাকিয়া গঙ্গাবাস করিতেছিলেন। মথুরবাবুর অন্ন-মেরুব্রতানুষ্ঠানের সময়ে তিনি এখানে আসেন এবং জীবনের শেষদিন অবধি দ্বাদশবৎসর এখানেই অবস্থিতি করেন। মথুরবাবু তাঁহার সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

মথুরবাবুর ইচ্ছা হইয়াছিল, ঠাকুরের শারীরিক সেবার কোনরূপ ত্রুটি কোনকালে যাহাতে না হয় সেইরূপ ব্যবস্থা তিনি করিয়া রাখিবেন, কিন্তু ঠাকুরের বিষয়বিমুখতা দেখিয়া মুখ ফুটিয়া সেকথা তাঁহাকে বলিতে কখনও সাহসী হন নাই। তাঁহার মন বুঝিবার জন্য, তাঁহার শ্রুতিগোচরে মথুর একদিন হৃদয়ের সহিত 'বাবা'র নামে একখানি তালুক লেখাপড়া করিয়া দিবার পরামর্শ করিতেছিলেন। ঠাকুর শুনিতে পাইয়াই উন্মত্তপ্রায় হইয়া 'শালা, তুই আমাকে বিষয়ী করতে চাস?' বলিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে ছুটিয়াছিলেন। চন্দ্রাদেবীর আগমনে নিজের ঐ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার একটি

সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া মথুর তাঁহাকে 'ঠাকুরমা' সম্বোধনে আপ্যায়িত করিলেন, এবং প্রতিদিন তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত নানা প্রসঙ্গ করিতে করিতে তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। তারপর একদিন সুযোগ বুঝিয়া বলিলেন: ঠাকুরমা, তুমি তো আমার নিকট থেকে কখন কিছু সেবা নিলে না। তুমি যদি সত্যি আমাকে আপনার বলে ভাব, তাহলে আমার নিকট থেকে তোমার যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। সরলপ্রাণা বৃদ্ধা মথুরের কথায় নিজেকে বিপন্না বোধ করিলেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন বস্তুর অভাবই তিনি দেখিতে পাইলেন না। 'বাবা, তোমার কল্যাণে আমার তো এখন কোন অভাব নাই, যখন কোন জিনিসের দরকার হবে তখন চেয়ে লেব।' এই কথা বলিয়া, নিজের পেটরা খুলিয়া দেখাইয়া তিনি বলিতে লাগলেন: এই দেখ, আমার এত পরবার কাপড় আছে, আর তোমার কল্যাণে এখানে খাবার তো কোন কষ্টই নাই, সব বন্দোবস্তই তো তুমি করে দিয়েচ, তবে আর কী চাই বল? মথুর সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি বারবার বলিতে লাগিলেন, যা ইচ্ছা কিছু চেয়ে নাও। ঠাকুরের জননীর একটি অভাবের কথা তখন মনে পড়িল ও হাসিতে হাসিতে তিনি কহিলেন, আমার মুখে দিবার গুল ফুরিয়ে গেছে, এক আনার দোক্তা তামাক কিনে দাও। বিষয়ী মথুরের চক্ষে জল আসিল; 'এমন মা না হলে কি অমন ছেলে হয়!' বলিয়া বৃদ্ধাকে তিনি প্রণাম করিলেন।

দশনামী নাগা-সন্ন্যাসী শ্রীমৎ তোতাপুরী যদৃচ্ছাক্রমে তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে, মধ্যভারত হইতে পুরী ও গঙ্গাসাগরসঙ্গম হইয়া, দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন। নর্মদাতীরে দীর্ঘকাল একান্তবাস ও কঠোর ধ্যান-তপস্যা করিয়া তিনি নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়াছিলেন। নির্বিকল্প সমাধি ব্যতীত আত্মজ্ঞান বা নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় না। ঠাকুরকে দেখিয়াই—তিনি তখন চাঁদনীর একপাশে আনমনে বসিয়াছিলেন—তোতা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনার উত্তম অধিকারী বিবেচনা করিয়া ঐ সাধনা করিবার ইচ্ছা তাঁহার আছে কি-না

জানিতে চাহিলেন। ঠাকুর উত্তর করিলেন: কী করব না করব, আমি কিছুই জানি না; আমার মা সব জানেন, তিনি আদেশ করলে করব। 'তবে যাও, তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস; আমি এখানে বেশীদিন থাকিব না।' হিন্দুস্থানী ভাষায় তোতা কহিলেন।

ঠাকুর তখন ধীরে ধীরে মা-ভবতারিণীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন ও ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার বাণী শুনিতে পাইলেন: 'যাও শিক্ষা কর, তোমাকে শিখাইবার জন্যই সন্ন্যাসীর এখানে আগমন হইয়াছে।'

তোতাপুরীর কাছে ফিরিয়া আসিয়া ঠাকুর তাঁহাকে মায়ের প্রত্যাদেশ জ্ঞাপন করিলেন। মন্দিরের দেবীকেই ঠাকুর মাতৃজ্ঞান করেন বুঝিতে পারিয়া তোতা তাঁহার বালকবৎ ব্যবহারে মুগ্ধ হইলেও তাঁহার ঐকাজ কুসংস্কারনিবন্ধন বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু ঐবিষয়ে এখন কোন কথা না বলিয়া, জ্ঞানপথের সাধনায় কুসংস্কারগুলি আপনা হইতে চলিয়া যাইবে ভাবিয়া, তোতা অন্যকথার অবতারণা করিলেন ও বলিলেন, সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে শিখাসূত্র পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে। সন্ন্যাসের কথায় কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া ঠাকুর কহিলেন, গোপনে করিলে যদি হয় তাহা হইলে সন্ন্যাস-গ্রহণে তাঁহার কিছুমাত্র আপত্তি নাই; প্রকাশ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাঁহার জননীর প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিবে, মাকে কষ্ট দিতে তিনি পারিবেন না। তোতা বলিলেন, উত্তম কথা, গোপনেই তোমাকে দীক্ষিত করিব। তিনি পঞ্চবটীতে গিয়া আসন বিছাইলেন।

বিধিপূর্বক সন্ন্যাসে, পূর্বকৃত্যরূপে, মস্তকমুণ্ডনপূর্বক পিতৃপুরুষগণের ও নিজাত্মার তৃপ্তির জন্য পিণ্ডদান করিতে হয়। শাস্ত্রমতে সন্ন্যাস-গ্রহণের পর সন্ন্যাসীর শ্রাদ্ধাদি কর্মে আর অধিকার থাকে না। সর্ববন্ধনমুক্ত হইবার জন্য স্বেচ্ছায় তিনি যাবতীয় বৈধকর্মের অধিকার বর্জন করেন। তিনি যেন সংসারের বাহির হইয়া যান, আর সেইজন্যই মৃত্যুর পরে সন্ন্যাসীকে কেহ পিণ্ডদান করে না।

শ্রাদ্ধকার্য করিতে হয় দিবাভাগে, সাধারণতঃ তৃতীয় প্রহরে। অনন্তর

নিশাশেষে, শুভ ব্রাহ্মমুহূর্তের উদয় হইলে, আচার্যসন্নিধানে বসিয়া বিরজা-হোম নামক বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হয়। লীলাপ্রসঙ্গে লিখিত আছে, গুরুর নির্দেশে ঠাকুর যথাবিধি যাবতীয় কর্মেরই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বৈধকর্মের প্রতীকস্বরূপ তাঁহার শিখাসূত্র চিরতরে হোমাগ্নিতে আহুত হইল, এবং ব্রহ্মজ্যোতির প্রতীকস্বরূপ গৈরিকবসনে মণ্ডিত হইয়া তাঁহার উজ্জ্বল দেবতনু অপূর্ব শোভা ধারণ করিল।

অতঃপর ব্রহ্মজ্ঞানী তোতা—ঠাকুর তাঁহাকে 'ন্যাংটা' নামে নির্দেশ করিতেন—শিষ্যকে ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন করাইবার জন্য বলিতে লাগিলেন:

"নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, দেশকালাদি দ্বারা সর্বদা অপরিচ্ছিন্ন একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই নিত্য সত্য। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া নিজপ্রভাবে তাঁহাকে নামরূপের দ্বারা খণ্ডিতবৎ প্রতীত করাইলেও তিনি কখনও বাস্তবিক ঐরূপ নহেন। কারণ সমাধিকালে মায়াজনিত দেশকাল বা নামরূপের বিন্দুমাত্র উপলব্ধি হয় না। অতএব নামরূপের সীমার মধ্যে যাহা কিছু অবস্থিত তাহা কখনও নিত্যবস্তু হইতে পারে না, তাহাকেই দূরপরিহার কর। নামরূপের দৃঢ়পিঞ্জর সিংহবিক্রমে ভেদ করিয়া নির্গত হও। আপনাতে অবস্থিত আত্মতত্ত্বের অন্বেষণে ডুবিয়া যাও। সমাধিসহায়ে তাঁহাতে অবস্থান কর; দেখিবে, নামরূপাত্মক জগৎ তখন কোথায় লুপ্ত হইবে, ক্ষুদ্র আমিজ্ঞান বিরাটে লীন ও স্তব্ধীভূত হইবে, এবং অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে নিজ স্বরূপ বলিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবে।"

ঠাকুর বলিতেন: দীক্ষা দিয়ে ন্যাংটা নানা সিদ্ধান্তবাক্যের উপদেশ করতে লাগল, মনকে নির্বিকল্প করে আত্মার ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতে বল্লে। আমার কিন্তু এমনি হল যে, ধ্যান করতে বসে চেষ্টা করেও মনকে নির্বিকল্প করতে, বা নামরূপের গণ্ডী ছাড়াতে, পারলুম না। মন কুড়িয়ে এক করে যাই এনেচি, অমনি মার মূর্তি এসে সুমুখে দাঁড়াল। তখন আর তাঁকে ত্যাগ করে তার পারে যেতে ইচ্ছা হয় না। যতবার মন থেকে সব জিনিস তাড়িয়ে নিরালম্ব হয়ে থাকতে চেষ্টা করি ততবারই ঐরূপ হয়।

একপ্রকার নিরাশ হয়ে, চোখ চেয়ে তখন ন্যাংটাকে বল্লুম, হল না—মনকে নির্বিকল্প করে আত্মার ধ্যানে ডুবে যেতে পারলুম না। ন্যাংটা তখন বিষম উত্তেজিত হয়ে বল্লে, 'কেঁও হোগা নেহি?' সে একটি কাচের টুকরো কুড়িয়ে এনে তার ছুঁচালো দিকটা দুই ভুরুর মাঝখানে জোরে বসিয়ে দিয়ে বল্লে, এই বিন্দুতে মনকে গুটিয়ে আন। তখন রোখ করে আবার ধ্যানে বসলুম, আর মার মূর্তি আগের মত মনে উঠতেই জ্ঞানকে অসি কল্পনা করে তার দ্বারা সেই মূর্তিকে মনে মনে দ্বিখণ্ড করে ফেল্লুম। তখন মন একেবারে নিরালম্ব হয়ে পড়ল, হুহু করে নামরূপের গণ্ডী পার হয়ে গেল—সমাধিস্থ হলুম।

ঠাকুর সমাধিস্থ হইলে তোতা অনেকক্ষণ তাঁহার নিকটে বসিয়া রহিলেন। তারপরে নিঃশব্দে সাধনকুটীরের বাহিরে আসিয়া—ঐ কুটীরেই হোমাদি সন্ন্যাসকর্ম হইয়াছিল—দরজা তালাবদ্ধ করিলেন। দিন গিয়া রাত্রি আসিল ও এইরূপে দিবসত্রয় একে একে অতিক্রান্ত হইল। তথাপি দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য প্রত্যাশিত আহ্বান তোতা শুনিতে পাইলেন না। তখন দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তিনি দেখিলেন, যেমন রাখিয়া গিয়াছিলেন শিষ্য সেইভাবেই বসিয়া আছেন, দেহে প্রাণের চিহ্নমাত্র নাই, কিন্তু মুখখানি প্রশান্ত-গম্ভীর, জ্যোতিঃপূর্ণ! স্তম্ভিত হইয়া তোতা ভাবিতে লাগিলেন, যাহা দেখিতেছি তাহা কি সত্য? চল্লিশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় যাহা উপলব্ধি করিয়াছি তাহা কি এই মহাপুরুষ একদিনেই আয়ত্ত করিলেন? সন্দেহবশে তিনি শিষ্যদেহে প্রকাশিত লক্ষণগুলি তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেন—হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতেছে কি-না, নাসাদ্বারে বায়ুনির্গমন হইতেছে কি-না। কাষ্ঠখণ্ডের মত অচলভাবে অবস্থিত শিষ্য-শরীর বারবার স্পর্শ করিলেন। তারপরে বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'য়হ ক্যা দৈবী মায়া!'

অতঃপর সমাধি হইতে শিষ্যকে ব্যুত্থিত করিবার জন্য তোতা প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। 'হরি ওঁ' মন্ত্রের পূত গম্ভীর আরাবে পঞ্চবটীর আকাশ বাতাস পূর্ণ হইল, ঠাকুরের দেহে বাহ্য চেতনার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে

লাগিল, ধীরে ধীরে সমাধির তুঙ্গশিখর হইতে তিনি অপেক্ষাকৃত নিম্ন ভূমিতে অবরোহণ করিলেন।

বেদান্ত-সাধনায় সিদ্ধ হইলে যে অবস্থাপ্রাপ্তি ঘটে তাহাকে পরমহংস-অবস্থা বলে। এখন হইতে তোতাপুরী তাঁহার সুমহান শিষ্যকে সসম্ভ্রমে 'পরমহংসজী' বলিয়া সম্বোধন করিতে থাকেন ও এইরূপে ঠাকুরের 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নাম প্রচারিত হইয়া পড়ে। তোতা স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ নাম না দিয়া থাকিলেও এক হিসাবে দিয়াছিলেনও বলা যায়। ভারতের সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই ত্যাগী সাধুদের নূতন নামকরণের নিয়ম আছে। সাধুরা সাধারণতঃ জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নামের পরিবর্তে গুরুদত্ত অন্য নামে অভিহিত হন। ঠাকুরের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নাম গদাধর ছিল জানিয়া, এবং রামকৃষ্ণ-নামটি, যেমন করিয়াই হউক, প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে শুনিয়া, তোতা শেষোক্ত নামটিই সমর্থন করিয়া থাকিবেন।[১]

ঠাকুরের এমনই মোহিনী শক্তি ছিল যে, তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া মায়ারহিত সন্ন্যাসী তোতাপুরী, যিনি তিনদিনের বেশী এক জায়গায়

১ ঠাকুরকে তন্ত্রসাধনায় প্রবৃত্ত করাইবার পূর্বে ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহাকে পূর্ণাভিষিক্ত করিয়াছিলেন। পূর্ণাভিষেকে পিণ্ডদানাদি শ্রাদ্ধক্রিয়া বিহিত আছে, পূর্ণাভিষিক্ত সাধকেরা গুরুদত্ত নূতন নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। সেইজন্য কেহ কেহ ঠাকুরের শ্রীরামকৃষ্ণ-নামটি ব্রাহ্মণী-প্রদত্ত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ঠাকুরকে ব্রাহ্মণী 'চৈতন্যের অবতার নিত্যানন্দের খোলে' বলিতেন, তাঁহার পক্ষে ঠাকুরের রামকৃষ্ণ-নাম রাখা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ব্রাহ্মণীর দক্ষিণেশ্বরে আসার কিছুদিন আগে রাণী রাসমণি যে দেবোত্তর দলিল করিয়াছিলেন তাহাতে 'রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য' নাম উল্লিখিত থাকায় এই অনুমান দাঁড়াইতে পারিতেছে না। ঠাকুর যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বংশের সকলের নামের সঙ্গেই 'রাম' শব্দটি যুক্ত আছে, সেইজন্য রামকৃষ্ণ-নামটি ঠাকুরের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত দ্বিতীয় একটি নাম যাহা প্রথমাবস্থায় অপ্রচলিত ছিল, এমন কথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাও কল্পনামাত্র। ঠাকুরের এক খুড়তুতো ভাইয়ের নাম ছিল কালিদাস, যিনি রামতারক বা হলধারীর কনিষ্ঠ সহোদর। তাহা ছাড়া, ঠাকুরের রাশ্যাশ্রিত নাম শম্ভুরাম; সেই নামের মধ্যেই 'রাম' থাকায়, আর একটি 'রাম'-যুক্ত নামের পরিকল্পনা খুব সঙ্গতও নয়।

থাকিতেন না, একাদিক্রমে এগার মাস দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া যান। এক-এক দিন বিদায় লইতে গিয়াও যাওয়ার কথা মুখ ফুটিয়া ঠাকুরকে তিনি বলিতে পারেন নাই!

তোতা হৃষ্টপুষ্ট দীর্ঘাকৃতি পুরুষ ছিলেন, বালকের ন্যায় উলঙ্গ থাকিতেন ও একখানি মোটা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখিতেন। তিনি নাগাদের নির্বাণী-আখড়াভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন, কখনও ঘরের ভিতরে থাকিতেন না, আর সর্বদা অগ্নিসেবা করিতেন। নাগারা অগ্নিকে মহাপবিত্র জ্ঞান করে; যেখানেই থাকুক না কেন, পাশে ধুনি জ্বালাইয়া রাখে; সেই ধুনিকে সকালসন্ধ্যা আরতি করে, আহার্যবস্তু ধুনিরূপী অগ্নিকে নিবেদন করিয়া তবে খায়। রৌদ্রে ও বর্ষায় ন্যাংটার ধুনি সমভাবে জ্বলিত, আহার ও নিদ্রা তিনি ঐ ধুনির ধারেই করিতেন, এবং গভীর নিশীথে ধুনি আরও উজ্জ্বল করিয়া 'নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্' নিজের মনকে তিনি আত্মসমাহিত করিতেন।

তোতা নিজের নিকটে একটি লোটা, একটি সুদীর্ঘ চিমটা ও একখানি চর্মাসন মাত্র রাখিতেন। লোটা ও চিমটাটি নিত্য মাজিয়া ঝকঝকে করিতেন। ঠাকুর একদিন তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন: তোমার তো ব্রহ্মলাভ হয়েচে, সিদ্ধ হয়েচ, তবে কেন রোজ অত ধ্যান কর? তোতা লোটাটি দেখাইয়া বলিলেন: কেমন উজ্জ্বল দেখচ? যদি রোজ না মাজি, মলিন হয়ে যাবে না? 'কিন্তু যদি সোনার লোটা হয় তা হলে তো আর রোজ না মাজলেও ময়লা ধরে না!' 'হাঁ, তা বটে।' তোতা হাসিয়া স্বীকার করিলেন। ক্রমশঃ তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ঠাকুরের মন সত্যই সোনার ঘটীর মত সমুজ্জ্বল।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ অভী হইয়া থাকেন! একদিন গভীর রাত্রে ধুনি উজ্জ্বল করিয়া তোতা যখন ধ্যানে বসিবেন, সেই সময়ে পঞ্চবটীর বৃক্ষশাখাসমূহ সহসা আলোড়িত হইয়া উঠিল ও দীর্ঘাকার মানবাকৃতি এক পুরুষ নীচে নামিয়া আসিয়া ধুনির পাশে উপবেশন করিলেন। তোতা নিজেরই মত উলঙ্গ সেই পুরুষকে দেখিয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, কে তুমি? পুরুষ

বলিলেন, আমি দেবযোনি ভৈরব, এই দেবস্থান রক্ষা করি। 'উত্তম কথা। তুমি যা, আমিও তাই—তুমিও ব্রহ্মের এক প্রকাশ, আমিও তাই। এস, বস, ধ্যান কর।' তোতা কহিলেন। পুরুষ হাসিয়া যেন হাওয়ায় মিলাইয়া গেলেন। তোতার মুখে এই ঘটনা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন : হাঁ, উনি ওখানে থাকেন বটে, আমিও ওঁর দেখা অনেকবার পেয়েচি। কোম্পানি বারুদখানার জন্যে পঞ্চবটীর সমস্ত জমিটি একবার নেবার চেষ্টা করে। আমার তাই শুনে বিষম ভাবনা হয়েছিল। সংসারের কোলাহল থেকে দূরে নির্জন স্থানটিতে বসে মাকে ডাকি, তা আর হবে না—সেইজন্যে। মথুর তো রাণী রাসমণির তরফ থেকে কোম্পানির সঙ্গে খুব মামলা লাগিয়ে দিলে। সেই সময় একদিন ঐ ভৈরব গাছে বসে আছেন দেখতে পাই! আমাকে সঙ্কেতে বলেছিলেন, কোম্পানি জায়গা নিতে পারবে না, মামলায় হেরে যাবে।

জ্ঞানপন্থী সন্ন্যাসী তোতা কর্মফলদাতা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহাকে ভক্তি ও উপাসনা করার আবশ্যকতা মানিতেন না। ত্রিগুণময়ী ব্রহ্মশক্তি মায়াকে তিনি ভ্রমমাত্র বলিয়া জানিতেন। তাঁহার মতে অজ্ঞান হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য সাধকের কেবলমাত্র পুরুষকার অবলম্বনীয়, ঈশ্বরের বা শক্তিসংযুক্ত ব্রহ্মের কৃপা-ভিক্ষা করার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ঐরূপ কৃপাভিক্ষা করাকে তিনি কুসংস্কার মনে করিতেন।

এইরূপ ধারণার বশে তোতা ভক্তের ভাববিহ্বল চেষ্টাদি দেখিলে সময়ে সময়ে বিদ্রূপ করিয়া বসিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাসমাগমে ঠাকুর করতালি দিয়া 'হরিবোল হরিবোল', 'হরিগুরু গুরুহরি', 'হরি প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন' ইত্যাদি বলিতে বলিতে শ্রীভগবানের স্মরণমনন করিতেন, নির্বিকল্প সমাধি-লাভের পরেও করিতেন। একদিন তোতার ধুনির পাশে বসিয়া ঠাকুর ঐরূপ করিতে থাকিলে তোতা কৌতুকমিশ্র স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'আরে, কেঁও রোটি ঠোকতে হো?' ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, দূর শালা! আমি ঈশ্বরের নাম করচি, আর তুমি কিনা বলচ আমি রুটি ঠুকচি! তোতাও

হাসিলেন ঠাকুরের বালকের স্থায় কথা শুনিয়া, এবং হয়তো তাঁহার ঐরূপ আচরণের মধ্যে কোনও রহস্য নিহিত আছে ভাবিয়া।

আর একদিন সন্ধ্যার পর তাঁহারা উভয়ে ধুনির পাশে বসিয়া ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময় বাগানের চাকরদের কেহ কলকেতে তামাক সাজিয়া অগ্নির জন্য সেখানে আসিল ও ধুনির কাঠ টানিয়া নিয়া তাহা হইতে জ্বলন্ত কয়লা তুলিয়া নিতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ সেদিকে দৃষ্টি পড়ায় বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া তোতা তাহাকে গালিগালাজ করিলেন, চিমটা দিয়া দুইএক ঘা দিবার মত ভয়ও দেখাইলেন। ঠাকুর তখন অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া, হাসিয়া গড়াগড়ি দিতে দিতে কেবলই বলিতে লাগিলেন, 'দূর শালা, দূর শালা!' তোতা তাহাতে বিস্মিত হইয়া কহিলেন, তুমি অমন করিতেছ কেন? লোকটির কী অন্যায় দেখ দেখি। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন: তা তো বটে, সেই সঙ্গে তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের দৌড়টাও দেখছি। এই মুখে বলছিলে, ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় সত্তাই নাই, সকল বস্তু, সকল ব্যক্তি তাঁরই প্রকাশ, আর পরক্ষণেই সব কথা ভুলে মানুষকে মারতে উঠেচ, তাই হাসচি যে, মায়ার কী প্রভাব! তোতা গম্ভীর হইয়া গেলেন ও কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন: ঠিক বলিয়াছ। ক্রোধে সকল কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। ক্রোধ বড় পাজী জিনিস, আজ হইতে আর ক্রোধ করিব না, ক্রোধ পরিত্যাগ করিলাম।

সত্যসংকল্প মহাপুরুষকে পরে আর কখনও ক্রুদ্ধ হইতে দেখা যায় নাই।

প্রায় দশমাস দক্ষিণেশ্বরে বাস করিবার পরে তোতার বলিষ্ঠ শরীরে রোগের সঞ্চার হইল, রক্তামাশয় হইয়া ক্রমে ক্রমে উহা কঠিনাকার ধারণ করিল। ঠাকুর মথুরবাবুকে বলিয়া ঔষধপথ্যের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, কিন্তু রোগের প্রকোপ দিন দিন বাড়িয়াই যাইতে লাগিল। মনকে সমাধিমগ্ন করিয়া তোতা দেহের যন্ত্রণা ভুলিতে আরম্ভ করিলেন। শেষে একদিন যন্ত্রণা এতই বাড়িয়া গেল যে, শুইয়া বা বসিয়া কোন অবস্থায়ই সোয়াস্তি পান না। মনকে শরীর হইতে টানিয়া লইয়া সমাহিত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পেটের যন্ত্রণায় মন সেইদিকেই ছুটিল, সমাধিভূমিতে

উঠিতে না উঠিতে নামিয়া পড়িতে লাগিল। তোতা শরীরের উপর ভীষণ চটিয়া গেলেন, এবং হাড়মাসের খাঁচাটাকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়া চিরতরে সকল যন্ত্রণার অবসান করিবেন বলিয়া সংকল্প করিলেন। বিশেষ আয়াসে মনকে ব্রহ্মচিন্তায় স্থির রাখিয়া তিনি জলে নামিলেন, কিন্তু কী আশ্চর্য, হাঁটিয়া প্রায় অপরপারে চলিয়া গেলেও গঙ্গায় ডুবজল পাইলেন না! তখন অবাক হইয়া ভাবিলেন, 'এ কী দৈবী মায়া! মরিবার মত জলও আজ নদীতে নাই। একী ঈশ্বরের অপূর্ব লীলা!'

"অমনি কে যেন ভিতর হইতে তাঁহার বুদ্ধির আবরণ টানিয়া লইল। তোতার মন উজ্জ্বল আলোকে ধাঁধিয়া যাইয়া দেখিল—মা, মা, মা, বিশ্বজননী মা, অচিন্ত্যশক্তিরূপিণী মা, জলে মা, স্থলে মা; শরীর মা, মন মা; যন্ত্রণা মা, সুস্থতা মা; জ্ঞান মা, অজ্ঞান মা; জীবন মা, মৃত্যু মা; যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি, কল্পনা করিতেছি—সব মা! তিনি হয়কে নয় করিতেছেন, নয়কে হয় করিতেছেন! শরীরের ভিতর যতক্ষণ ততক্ষণ তিনি না ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে কাহারও সাধ্য নাই—মরিবারও কাহারও সামর্থ্য নাই। আবার শরীর-মন-বুদ্ধির পারেও সেই মা—তুরীয়া, নির্গুণা মা!—এতদিন যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া তোতা প্রাণের ভক্তি-ভালবাসা দিয়া আসিয়াছেন, সেই মা! শিবশক্তি একাধারে হরগৌরী-মূর্তিতে অবস্থিত—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ!"

জগদম্বার অচিন্ত্য বিরাট রূপ দেখিতে দেখিতে তোতা গম্ভীর অম্বারবে দিক মুখরিত করিয়া তুলিলেন। তৎপদে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বলি দিয়া সমস্ত রাত্রি মার নামে ও ধ্যানে কাটাইলেন। তাঁহার প্রাণ তখন সমাধি-স্মৃতির অপূর্ব আনন্দে উল্লসিত।

প্রভাতে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হইলে তোতা রাত্রির ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিলেন: "রোগই আমার বন্ধুর কাজ করিয়াছে—কাল জগদম্বার দর্শন পাইয়াছি এবং তাঁহার কৃপায় রোগমুক্ত হইয়াছি! এতদিন আমি কী অজ্ঞই ছিলাম!...তোমার মাকে এখন বলিয়া কহিয়া আমাকে এস্থান হইতে যাইতে বিদায় দাও। আমি এখন বুঝিয়াছি, তিনিই

আমাকে এই শিক্ষা দিবার জন্য এতদিন···এখানে আবদ্ধ রাখিয়াছেন··· ।" ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন : "মাকে যে আগে মানতে না, আমার সঙ্গে যে শক্তি মিথ্যা 'ঝুট্' বলে তর্ক করতে! এখন দেখলে, চক্ষু কর্ণের বিবাদ ঘুচে গেল! আমাকে তিনি পূর্বে বুঝিয়েচেন, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ —অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি যেমন পৃথক্ নয় তেমনি।" অতঃপর ঠাকুরের সঙ্গে মন্দিরে গিয়া তোতা মা-ভবতারিণীকে ভক্তিভবে প্রণাম করিলেন।

একদিন বীণাকণ্ঠ প্রভু গুণধর।
শ্যামাগুণ-গীত গান তোতার গোচর ॥
ভাবেতে বিভোর তোতাপুরী যোগিবর।
গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরে বক্ষের উপর ॥
কোথায় আছিল তোতা, এখন কোথায়।
ভাবরাজ্যেশ্বর প্রভু—তাঁহার কৃপায় ॥

ঠাকুরের কাছে বিদায় লইয়া তোতাপুরী উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, সম্ভবতঃ স্বজের গুরুস্থানে, চলিয়া যান। তাঁহার গুরুস্থান ছিল কুরুক্ষেত্রের উপকণ্ঠবর্তী 'লধানা' নামক গ্রামে। তাঁহার গুরুও একজন বিখ্যাত ও মহাপুরুষ ছিলেন, এবং তাঁহার নিজের বা পূর্বপুরুষদের কাহারও স্থাপিত আখড়ার মোহন্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মণ্ডলীতে থাকিয়া সাতশত সন্ন্যাসী তখন ধ্যানাদি উচ্চাঙ্গের সাধনা অভ্যাস করিতেন। আবাল্য গুরুর স্নেহচ্ছায়ায় বাস করিয়া তোতা শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন ও সাধনরহস্য অবগত হন। গুরুর দেহান্তে তিনিই ঐ আখড়ার মোহন্ত-পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

গুরুপরম্পরায় তোতাপুরী 'কিমিয়া' বিদ্যা জানিতেন ও উহার প্রভাবে তাম্রাদি ধাতুকে অনেকবার স্বর্ণে পরিণত করিয়াছিলেন। ঠাকুরকে তিনি একথা বলিয়াছেন। উহার সাহায্যে নিজের স্বার্থসাধন করা চলিত না, তাহাতে গুরুর অভিসম্পাত ছিল। মণ্ডলীতে অনেক সাধু থাকে, তাহাদিগকে সঙ্গে নিয়া মণ্ডলীশ্বরকে কখন কখন তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে যাইতে হয় ও তাহাদের আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে হয়। সেই সময়ে অর্থাভাব হইলে ঐ বিদ্যা প্রয়োগ করা চলিবে, গুরুর এইরূপ নির্দেশ ছিল।

প্রত্যাদেশ-প্রাপ্তি—'ভাবমুখে থাক্'

শ্রীমৎ তোতাপুরী যখন দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন, ঠাকুরের খুল্লতাতপুত্র হলধারী তখন রাণী রাসমণির দেবালয়ে শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে একত্র বসিয়া তোতাপুরীর সহিত শাস্ত্রচর্চা করিতেন। একদিন তাঁহারা যখন ঐরূপে অধ্যাত্মরামায়ণ-প্রসঙ্গ করিতেছিলেন সেই সময়ে ঠাকুর জনকনন্দিনী সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দিব্যদর্শন লাভ করেন। ঐ ঘটনার কয়েক মাস পরে, ১২৭২ সালে, হলধারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয় তাঁহার স্থলে পূজক নিযুক্ত হন। হলধারী প্রায় আট বৎসর দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন।

হলধারীর সহিত ঠাকুরের আচরণে একটা মধুর রহস্যের ভাব ছিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া দেখিয়াও ঠাকুরের সম্বন্ধে তিনি একটা স্থির ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ভাবাবেশে ঠাকুর কখন কখন কাপড়-পৈতা ফেলিয়া দেন দেখিয়া নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হলধারী ভাগিনেয়-হৃদয়কে বলিতেন: 'হৃদু, উনি কাপড় ফেলে দেন, পৈতা ফেলে দেন, এটা বড় দোষের কথা। কত জন্মের পুণ্যে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম হয়, উনি কিনা সেই ব্রাহ্মণত্বকে সামান্য জ্ঞান করে ব্রাহ্মণাভিমান ত্যাগ করতে চান। এমন কী উচ্চাবস্থা হয়েচে যাতে উনি তা করতে পারেন? হৃদু, উনি তোমারই কথা একটু শুনেন, তোমার উচিত যাতে উনি তা না করতে পারেন সেই দিকে লক্ষ্য রাখা; এমনকি বেঁধে রেখেও ওঁকে যদি তুমি ঐ কাজ থেকে নিরস্ত করতে পার, তাও করা উচিত।' আবার, পূজা করিতে করিতে ঠাকুরের প্রেমাশ্রুবর্ষণ, ঈশ্বরলাভের জন্য তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব ব্যাকুলতা প্রভৃতি দেখিয়া, মোহিত হইয়া তিনি বলিতেন: 'হৃদু, তুমি নিশ্চয় ওঁর ভিতরে কোনরূপ আশ্চর্য দর্শন পেয়েচ, নতুবা এত করে কখন ওঁর সেবা করতে না!'

ঠাকুর বলিতেন :

আমার পূজা দেখে মোহিত হয়ে হলধারী কতদিন বলেচে, রামকৃষ্ণ, এবার আমি তোকে চিনেচি। তাতে কখন কখন আমি রহস্য করে বলতুম, দেখো আবার যেন গোলমাল হয়ে যায় না। সে বলত, এবার আর তোর ফাঁকি দিবার জো নাই, তোতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের আবেশ আছে, এবার একেবারে ঠিকঠাক বুঝেচি। শুনে বলতুম, আচ্ছা দেখা যাবে।

তারপরে মন্দিরের দেবসেবা সেরে, এক টিপ নস্যি নিয়ে, হলধারী যখন ভাগবত, গীতা বা অধ্যাত্ম রামায়ণ নিয়ে বিচার করতে বসত তখন অভিমানে ফুলে উঠে একেবারে অন্য লোক হয়ে যেত। আমি তখন গিয়ে বলতুম, তুমি শাস্ত্রে যা যা পড়চ সে সব অবস্থা আমার হয়েচে, আমি ওসব কথা বুঝতে পারি। শুনেই সে বলে উঠত, হাঁ, তুই গণ্ডমূর্খ, তুই আবার এসব কথা বুঝবি! আমি বলতুম, সত্যি বলচি, এর ভিতরে যে আছে সে সকল কথা বুঝিয়ে দেয়; এই যে তুমি কিছুক্ষণ আগে বল্লে, এর ভিতর ঈশ্বরের আবেশ আছে, সে-ই সকল কথা বুঝিয়ে দেয়। হলধারী শুনে গরম হয়ে বলত, যা যা মূর্খ কোথাকার, কলিতে কল্কি ছাড়া আর ঈশ্বরের অবতার হবার কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে? তুই উন্মাদ হয়েচিস বলে অমন ভাবিস। হেসে বলতুম, এই যে বলেছিলে আর গোল হবে না! কিন্তু সেকথা তখন শুনে কে। এমন এক আধ দিন নয়, অনেকদিন হয়েছিল! পরে একদিন সে দেখতে পেলে, ভাবে কাপড় ছেড়ে গাছের উপর বসে আছি, আর সেই অবস্থায় বালকের মত পেচ্ছাব করচি; সেদিন থেকে সে একেবারে পাকা করলে, আমাকে ব্রহ্মদৈত্যে পেয়েচে!

কাঙ্গালীদিগকে নারায়ণ জ্ঞান করিয়া ঠাকুর এক সময়ে প্রসাদ-বুদ্ধিতে তাহাদের ভোজনাবশেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া হলধারী বিরক্তির সহিত বলেন, তোর ছেলেমেয়ের কেমন করে বিয়ে হয় তা দেখব। ঠাকুর তাহাতে উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন : তবে রে শালা, শাস্ত্রব্যাখ্যা করবার সময় তুই না বলিস—জগৎ মিথ্যা, সর্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি করতে হয়?

তুই বুঝি ভাবিস আমি তোর মত জগৎ মিথ্যা বলব অথচ ছেলেমেয়ের বাপ হব! ধিক্ তোর শাস্ত্রজ্ঞানে!

মধুরভাব সাধন করিবার কালে ঠাকুরকে স্ত্রীবেশ ধারণ করিতে দেখিয়া হলধারী তাঁহাকে আত্মজ্ঞানবিহীন বলিয়াছিলেন।

হলধারীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ শাস্ত্রব্যাখ্যা কখন কখন বালকস্বভাব ঠাকুরের মনে বিভ্রান্তি জন্মাইত। ভাবাবেশে ঠাকুরের যেসব ঈশ্বরীয় দর্শনাদি হয় সেগুলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া, এবং ঈশ্বরকে ভাবাভাবের অতীত বলিয়া নির্দেশ করিয়া, হলধারী একদিন ঠাকুরের মনে বিষম সন্দেহের উদয় করিয়াছিলেন। অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীপ্রেমানন্দকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন: ভাবলুম, তবে তো ভাবাবেশে যত কিছু ঈশ্বরীয় রূপ দেখেছি, আদেশ পেয়েছি, সে সবই ভুল; মা তো তবে আমায় ফাঁকি দিয়েচে! মন বড়ই ব্যাকুল হল, অভিমানে কাঁদতে কাঁদতে মাকে বলতে লাগলুম—মা, নিরক্ষর মূখ্খু বলে আমাকে কি এমনি করে ফাঁকি দিতে হয়? সে কান্নার তোড় আর থামে না। কুঠির ঘরে বসে কাঁদছিলুম। কিছুক্ষণ পরে দেখি কী, সহসা মেজে থেকে কুয়াসার মত ধোঁয়া উঠে সুমুখের কতকটা জায়গা পূর্ণ হয়ে গেল। তারপর দেখি, তার ভিতরে লম্বাদাড়িওয়ালা একখানি গৌরবর্ণ জীবন্ত সৌম্য মুখ! ঐ মূর্তি আমাকে একদৃষ্টে দেখতে দেখতে গম্ভীরস্বরে বল্লেন, 'ওরে, তুই ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে থাক্।' তিনবার ঐকথাটি বলেই সে মূর্তি ধীরে ধীরে আবার ঐ কুয়াসায় গলে গেল। ঐ দেখে সেবার শান্ত হলুম। হলধারীর কথায় ঐরূপ সন্দেহ আর একবার মনে উঠেছিল। সেবার পূজা করতে করতে মাকে ঐ বিষয়ের মীমাংসার জন্যে কেঁদে ধরেছিলুম। মা তখন 'রতির মা' নামে একটি স্ত্রীলোকের রূপ ধরে ঘটের পাশ থেকে বলেছিলেন, 'তুই ভাবমুখে থাক্।'

তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া যাওয়ার অব্যবহিত পরেই ঠাকুর সংকল্প করিলেন এখন হইতে নিরন্তর নির্বিকল্প অদ্বৈতভূমিতে অবস্থান করিবেন। তিনি বলিয়াছেন: যেখানে গেলে সাধারণ জীব আর ফিরতে

পারে না, একুশ দিন মাত্র থেকে শরীরটা শুকনো পাতার মত ঝরে পড়ে যায়, সেখানে ছয়মাস ছিলুম !··· মরা মানুষের নাকে মুখে যেমন মাছি ঢুকে, তেমনি ঢুকত, কিন্তু সাড় হত না। চুলগুলো ধূলোয় ধূলোয় জটা পাকিয়ে গিয়েছিল! হয়তো অসাড়ে শৌচাদি হয়ে গেছে, তারও হুঁশ হয় নাই! শরীরটা কি আর থাকত ?—এই সময়েই যেত। তবে এই সময়ে একজন সাধু এসেছিল, তার হাতে রুলের মত একগাছা লাঠি ছিল, সে অবস্থা দেখেই চিনেছিল, আর বুঝেছিল এই শরীর দিয়ে মার অনেক কাজ হবে, এটাকে রাখতে পারলে অনেক লোকের কল্যাণ হবে। তাই খাবার সময় খাবার এনে মেরে মেরে হুঁশ আনবার চেষ্টা করত। একটু হুঁশ হচ্চে দেখেই মুখে খাবার গুঁজে দিত। কোনদিন একটু আধটু পেটে যেত, কোনদিন যেত না। এইভাবে ছয় মাস গেছে! তারপর, এই অবস্থার কতদিন পরে, শুনতে পেলুম মার কথা—'ভাবমুখে থাক্, লোকশিক্ষার জন্যে ভাবমুখে থাক্।'

ঠাকুর এইবার জগদম্বার অশরীরী বাণী প্রাণে প্রাণে শুনিতে পাইয়াছিলেন, লীলাপ্রসঙ্গকার বলিয়াছেন। ভাবমুখ ও ভাবমুখে থাকার স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন: "তখন [দীর্ঘ সমাধিস্থিতির পর] ঠাকুরের কখন 'আমি'-জ্ঞানের লোপ এবং কখন উহার ঈষৎ প্রকাশ হইতেছিল। যখন আমি-বোধটার ঐরূপ ঈষৎ প্রকাশ হইতেছিল তখনও ঠাকুরের নিকট জগৎটা আমরা যেমন দেখি তেমন দেখাইতেছিল না। দেখাইতেছিল যেন একটা বিরাট মনে নানা ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে, ভাসিতেছে, ক্রীড়া করিতেছে, আবার লয় হইতেছে ! অপর সকলের তো কথাই নাই, ঠাকুরের নিজের শরীরটা, মনটা ও আমিত্ব-বোধটাও ঐ বিরাট মনের ভিতরের একটা তরঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছিল ! পাশ্চাত্ত্য জড়বাদী পণ্ডিতমূর্খের দল যে জগচ্চৈতন্য ও শক্তিকে বুদ্ধি ও বুদ্ধিপ্রসূত যন্ত্রাদি-সহায়ে মাপিতে যাইয়া বলিয়া বসে, 'ওটা এক হলেও জড়', ঠাকুর এই অবস্থায় পৌঁছিয়া তাঁহারই সাক্ষাৎ স্বরূপ দর্শন বা অনুভব করিলেন—জীবন্ত, জাগ্রত, একমেবাদ্বিতীয়ম্, ইচ্ছা ও

ক্রিয়ামাত্রেরই প্রসূতি অনন্তকৃপাময়ী জগজ্জননী! আর দেখিলেন—সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ নির্গুণ ও সগুণ ভাবে আপনাতে আপনি বিভক্ত থাকায় ইহাকেই শাস্ত্রে স্বগতভেদ বলিয়াছে—তাঁহাতে একটা আব্রহ্মস্তম্বব্যাপী বিরাট আমিত্ব বিকশিত রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সেই বিরাট আমিটা থাকাতেই বিরাট মনে অনন্ত ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে, আর সেই ভাবতরঙ্গই স্বল্পাধিক পরিমাণে খণ্ডখণ্ডভাবে দেখিতে পাইয়া মানবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমিগুলো উহাকেই বাহিরের জগৎ ও বহির্জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া ধরিতেছে ও বলা-কহা ইত্যাদি করিতেছে। ঠাকুর দেখিলেন, বড় আমিটার শক্তিতেই মানবের ছোট আমিগুলো রহিয়াছে ও স্ব-স্ব কার্য করিতেছে, এবং বড় আমিটাকে দেখিতে ধরিতে পাইতেছে না বলিয়াই ছোট আমিগুলো ভ্রমে পড়িয়া আপনাদিগকে স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তিমান মনে করিতেছে। এই দৃষ্টিহীনতাকেই শাস্ত্র অবিদ্যা ও অজ্ঞান বলেন।

"নির্গুণ ও সগুণের মধ্যস্থলে এইরূপ যে বিরাট আমিত্বটা বর্তমান উহাই ভাবমুখ, কারণ উহা থাকাতেই বিরাট মনে অনন্ত ভাবের স্ফুরণ হইতেছে। এই বিরাট আমিই জগজ্জননীর আমিত্ব বা ঈশ্বরের আমিত্ব। এই বিরাট আমিত্বের স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ বলিয়াছেন—অচিন্ত্যভেদাভেদস্বরূপ জ্যোতির্ঘনমূর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ঠাকুরের আমিত্ব-জ্ঞানের যখন একেবারে লোপ হইতেছিল তখন তিনি এই বিরাট আমিত্বের গণ্ডির পারে অবস্থিত জগদম্বার নির্গুণভাবে অবস্থান করিতেছিলেন—তখন ঐ বিরাট আমি ও তাহার অনন্তভাবতরঙ্গ, যাহাকে আমরা জগৎ বলিতেছি, তাহার কিছুরই অস্তিত্ব অনুভব হইতেছিল না; আর যখন ঠাকুরের আমি-জ্ঞানের ঈষৎ উন্মেষ হইতেছিল তখন তিনি দেখিতেছিলেন শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণ ভাবের সহিত সংযুক্ত এই সগুণ বিরাট আমি ও তদন্তর্গত ভাবতরঙ্গসমূহ। অথবা নির্গুণ ভাবে উঠিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের অনুভবে ঐ একমেবাদ্বিতীয়মের ভিতর স্বগতভেদের অস্তিত্বও লোপ হইতেছিল; আর ঐ সগুণ বিরাট আমিত্বের

যখন বোধ করিতেছিলেন তখন দেখিতেছিলেন—যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি, যে নির্গুণ সেই সগুণ, যে পুরুষ সেই প্রকৃতি, যে সাপ স্থির ছিল সেই এখন চলিতেছে; অথবা যিনিই স্বরূপে নির্গুণ তিনিই আবার লীলায় সগুণ! শ্রীশ্রীজগদম্বার এই নির্গুণ-সগুণ উভয় ভাবে জড়িত স্বরূপের পূর্ণ দর্শন পাইবার পর ঠাকুর আদেশ পাইলেন, 'ভাবমুখে থাক্'—অর্থাৎ আমিত্বের একেবারে লোপ করিয়া নির্গুণ ভাবে অবস্থান করিও না; কিন্তু যাহা হইতে যত প্রকার বিশ্বভাবের উৎপত্তি হইতেছে সেই বিরাট আমিই তুমি, তাঁহার ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা, তাঁহার কার্যই তোমার কার্য—এই ভাবটি ঠিক ঠিক সর্বদা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া জীবনযাপন কর ও লোককল্যাণ সাধন কর। অতএব ভাবমুখে থাকার অর্থই হইতেছে, মনে সর্বতোভাবে সকল সময় সকল অবস্থায় দেখা, ধারণা বা বোধ করা যে, আমি সেই বড় আমি বা পাকা আমি।"

সাধন-সমাপ্তি—'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে'

ঠাকুরের রসদ্দার-সেবক মথুরামোহন দরিদ্র ঘরের সন্তান ছিলেন। সুপুরুষ দেখিয়াই রাণী রাসমণি তাঁহার সহিত নিজের তৃতীয়া কন্যা করুণাময়ীর ও করুণাময়ীর মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বার বিবাহ দিয়াছিলেন। রাণীর সেজ কন্যাকে বিবাহ করার পর হইতে মথুরামোহন সেজবাবু নামে পরিচিত হন। বুদ্ধিবলে ও কর্মকুশলতায় সেজবাবু ক্রমশঃ রাণীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠেন এবং রাণীর মৃত্যুর পরে তাঁহার পরিত্যক্ত বিষয়সম্পত্তির পরিচালনায় একরূপ একাধিপত্য লাভ করেন।

মথুরের দ্বিতীয়া পত্নী জগদম্বা গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হন। সম্ভাব্য সকলপ্রকার সুচিকিৎসা সত্ত্বেও দিনে দিনে তাঁহার দেহের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠে। জগদম্বা নিরাময় হইয়া না উঠিলে মথুরবাবু কেবল যে নিজের প্রিয়তমা পত্নীকেই হারাইবেন তাহা নহে, সেই সঙ্গে শাশুড়ীর সম্পত্তির উপর সকল কর্তৃত্বও চিরদিনের মত তাঁহাকে হারাইতে হইবে। তাঁহার তৎকালীন মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। ডাক্তার-বৈদ্যেরা যখন জবাব দিয়া গেল মথুর তখন দক্ষিণেশ্বরে ছুটিয়া আসিলেন ও ঠাকুরের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া—ঠাকুর তখন পঞ্চবটীতে আপন মনে বসিয়া ছিলেন—দীনহীনভাবে, অশ্রুমোচন করিতে করিতে বারবার বলিতে লাগিলেন: আমার যা হবার তা তো হতে চল্ল, বাবা, তোমার সেবার অধিকার থেকেও এবার বঞ্চিত হলুম—তোমার সেবা আর করতে পাব না! মথুরের দৈন্য দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইল, তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, ভয় নাই, তোমার স্ত্রী ভাল হয়ে যাবে। ঠাকুর বলিতেন: সেইদিন থেকে জগদম্বা দাসী সেরে উঠতে লাগল, আর তার ঐ রোগটার ভোগ এই শরীরের উপর দিয়ে হতে থাকল। তাকে ভাল করে ছয়মাস পেটের পীড়ায়, আরো অনেক যন্ত্রণায়, ভুগতে হয়েছিল!

ছয়মাস নির্বিকল্প ভূমিতে অবস্থানের অব্যবহিত পরেই ছয়মাসব্যাপী এই রোগভোগ ঠাকুরের সমাধিনিষ্ঠ মনকে দেহবোধের সীমার মধ্যে

নামাইয়া আনিতে কিছুটা সাহায্য করিয়া থাকিবে। তিনি কঠিন আমাশয়রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ভাগিনেয় হৃদয় তখন নিরন্তর সেবায় নিযুক্ত থাকিত এবং মথুরবাবু কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

বিশেষ বিশেষ ভাবের সাধনায় সিদ্ধিলাভের পরে ঠাকুর সেই সেই ভাবের আবেশে বা আস্বাদনে কিছুকাল কাটাইতেন। সেই সময়ে ঐসকল ভাবের প্রকৃত সাধকেরা তাঁহার কাছে আসিয়া নিজেদের গন্তব্য পথে নূতন আলোক প্রাপ্ত হইতেন, বিশেষ প্রেরণা লাভ ও বিশেষ শক্তিসঞ্চার অনুভব করিতেন। ক্বচিৎ ভাগ্যবান কেহ বা তাঁহার আজীবন সাধনার সমূহ সিদ্ধি করামলকবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইতেন।

ঠাকুর বলিয়াছেন :

একএক সময়ে একএক রকমের সাধুর ভিড় লেগে যেত। এক সময়ে সন্ন্যাসী পরমহংসই যত আসতে লাগল। পেট-বৈরাগীর দল নয়, সব ভাল ভাল লোক। ঘরে দিনরাত্রি তাদের ভিড় লেগেই থাকত, দিনরাত্রি ব্রহ্মের স্বরূপ, মায়ার স্বরূপ, অস্তি-ভাতি-প্রিয়—এই সব বেদান্তের কথাই চলত।... যে ব্রহ্মবস্তু থেকে এই জগতের প্রত্যেক বস্তুর, প্রত্যেক ব্যক্তির উদয় হয়েচে, তাঁর স্বরূপই হচ্চে অস্তি-ভাতি-প্রিয় বা সৎ-চিৎ-আনন্দ। সেইজন্যেই উত্তরগীতায় বলেচে—জ্ঞান হলে বোঝা যায়, যেখানে যেখানে মন যায়, যে বস্তু বা যে ব্যক্তি তোমার মনকে টানচে, সেই বস্তুর সেই ব্যক্তির ভিতর পরমাত্মা রয়েচেন। 'যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র পরং পদম্।' রূপ-রসেও তাঁর অংশ রয়েচে বলে লোকের মন সেদিকে ছুটে, একথা বেদেও আছে।

ঐসব কথা নিয়ে তাদের ভিতর ধূম তর্কবিচার লেগে যেত। তখন খুব পেটের অসুখ, আমাশয়। হাতের জল শুকাত না। ঘরের কোণে হুদু সরা পেতে রাখত। সেই পেটের অসুখে ভুগচি, আর তাদের ঐসব জ্ঞানবিচার শুনচি। যে কথাটায় তারা কোন মীমাংসা করে উঠতে পারচে

না, ভিতর থেকে সহজ কথায় তার একটা মীমাংসা মা দেখিয়ে দিচ্চেন, সেইটি তাদের বলচি আর তাদের সব ঝগড়া-বিবাদ মিটে যাচ্চে!

একবার এক সাধু এল, তার মুখখানিতে বেশ একটি সুন্দর জ্যোতি রয়েচে। সে কেবল বসে থাকে আর ফিক ফিক করে হাসে! সকাল সন্ধ্যা একবার করে ঘরের বাইরে এসে সে গাছপালা, আকাশ, গঙ্গা সব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত, আর আনন্দে বিভোর হয়ে দুহাত তুলে নাচত। কখন বা হেসে গড়াগড়ি দিত আর বলত, 'বাঃ বাঃ, ক্যায়া মায়া—ক্যায়সা প্রপঞ্চ বনায়া!'··· তার ঐ ছিল উপাসনা, তার আনন্দলাভ হয়েছিল।

আর একবার এক সাধু আসে, সে জ্ঞানোন্মাদ। দেখতে যেন পিশাচের মত—উলঙ্গ, গায়ে মাথায় ধুলো, বড় বড় নখ চুল, গায়ে মরার কাঁথার মত একখানা কাঁথা! কালীঘরের সুমুখে দাঁড়িয়ে দর্শন করতে করতে এমন স্তব পড়লে যে, মন্দিরটা যেন কাঁপতে লাগল, আর মা যেন প্রসন্ন হয়ে হাসতে লাগলেন, তারপর কাঙ্গালীরা যেখানে বসে প্রসাদ পায় সেখানে তাদের সঙ্গে প্রসাদ পাবে বলে বসতে গেল। কিন্তু তার ঐরকম চেহারা দেখে তারাও তাকে কাছে বসতে দিলে না। তারপর দেখি, প্রসাদ পেয়ে সকলে যেখানে উচ্ছিষ্ট পাতাগুলো ফেলেচে সেখানে বসে কুকুরদের সঙ্গে এঁটো ভাতগুলো খাচ্চে! একটা কুকুরের ঘাড়ে হাত দিয়ে রয়েচে, আর একই পাতে ঐ কুকুরটাও খাচ্চে, সেও খাচ্চে! অচেনা লোক ঘাড় ধরেচে, তাতে কুকুরটা কিছু বলচে না বা পালাতেও চেষ্টা করচে না! তাকে দেখে মনে ভয় হল যে, শেষে আমারও ঐরকম অবস্থা হয়ে ঐরকম থাকতে বেড়াতে হবে নাকি!

দেখে এসেই হৃদেকে বল্লুম, হৃদু, এ যে-সে উন্মাদ নয়—জ্ঞানোন্মাদ। হৃদে তাকে দেখতে ছুটল। তখন সে বাগানের বাইরে চলে যাচ্চে। হৃদে অনেক দূর তার সঙ্গে যেতে যেতে বলতে লাগল, 'মহারাজ, ভগবানকে কেমন করে পাব, কিছু উপদেশ দিন।' প্রথম কিছুই বল্লে না। তারপর যখন হৃদে কিছুতেই ছাড়লে না, তখন পথের ধারের নর্দমার জল দেখিয়ে বল্লে, 'এই নর্দমার জল আর ঐ গঙ্গার জল যখন এক বোধ হবে, সমান পবিত্র জ্ঞান হবে,

তখন পাবি।' আর কিছুই বল্লে না।···অমন সব সাধু লোকে বিরক্ত করবে বলে ঐরকম বেশে থাকে। ঐ সাধুটির ঠিকঠিক পরমহংস অবস্থা হয়েছিল।

নির্বিকল্প তুরীয় ভূমি হইতে অবরোহণ করিয়া ভাবমুখে অবস্থান করিবার ফলে ঠাকুর হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, অদ্বৈতজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই সকলপ্রকার সাধনার চরম উদ্দেশ্য। শান্তদাস্যাদি[১] সকল ভাবে সাধন করিয়া তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উহারা প্রত্যেকেই সাধককে অদ্বৈতজ্ঞানের অভিমুখে লইয়া যায়; একমাত্র অদ্বৈতজ্ঞানে বা অদ্বৈত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই সাধক 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ' বলিয়া যে অবস্থার কথা বেদে বর্ণিত আছে সেই অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। অদ্বৈতজ্ঞান সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছেন: উহা শেষ কথা। ঈশ্বরপ্রেমের চরম পরিণতিতে সর্বশেষে উহা সাধকজীবনে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়। সকল মতেরই উহা শেষ কথা, এবং যত মত, তত পথ।

'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।' ইহা ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত মহাবাক্য। 'আঁচলে বাঁধা' কথাটার অর্থই হইল, হারাইয়া না যায় এমনভাবে চিরকালের জন্য নিজাঙ্গের ভূষণ করিয়া রাখা। এই অদ্বৈতজ্ঞান তাঁহার এমনই আঁচলে বাঁধা হইয়া গিয়াছিল যে, দ্বৈতভূমির যে কোন বিষয়, যে কোন ঘটনা তাঁহার অদ্বৈতস্মৃতি সহসা উদ্বুদ্ধ করিত।

একদিন ঠাকুর দেখিলেন, একটি উড়ন্ত পতঙ্গের দেহের পশ্চাদ্‌ভাগে একটি লম্বা কাঠি বিদ্ধ হইয়া আছে। উহা কোন দুষ্টু ছেলের কাজ ভাবিয়া প্রথমটায় তিনি ব্যথিত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবাবিষ্ট হইয়া 'হে রাম, তুমি নিজের দুর্দশা নিজেই করেচ!' বলিয়া হাসিতে ফাটিয়া পড়িলেন।

নবীন দূর্বাদলে সমাচ্ছন্ন হইয়া উদ্যানভূমির কিয়দংশ রমণীয়দর্শন হইয়াছিল। উহা দেখিতে দেখিতে ঠাকুর এতই তন্ময় হইয়া গেলেন যে,

---

১ লীলাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের শান্তভাবের ও সখ্যভাবের সাধনার উল্লেখমাত্র আছে, বিশেষ বর্ণনা নাই। গায়ত্রী-উপাসনাকে তাঁহার শান্তভাবের সাধনা বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনাকেও তাহাই বলা যায়। গায়ত্রী-উপাসনার লক্ষ্যও ব্রহ্মজ্ঞান। কামারপুকুরের সখাসখীদিগকে নিয়া সখ্যরসের সম্ভোগ তাঁহার কৈশোরেই হইয়াছিল।

স্থানটিকে নিজেরই অঙ্গ বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে একটি লোক ঐ তৃণভূমিকে পদদলিত করিয়া যাইতে থাকিলে তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। বলিয়াছিলেন: বুকের উপর দিয়ে কেউ চলে গেলে যেমন কষ্ট হয়, আমার তখন তেমনি কষ্ট হয়েছিল। এরূপ অবস্থা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক, আমার ছয় ঘণ্টা মাত্র ছিল, তাতেই অস্থির হয়ে পড়েছিলুম।

একদিন তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া গঙ্গাদর্শন করিতেছিলেন, এমন সময় ঘাটে বাঁধা দুইখানি নৌকার দুই মাঝি পরস্পর ঝগড়া করিয়া একজন অপরের পিঠে প্রচণ্ড এক থাপ্পড় মারে। ঠাকুর চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন ও সেই কান্না কালীঘর হইতে শুনিতে পাইয়া হৃদয় ছুটিয়া আসিয়া দেখিল তাঁহার পিঠ ফুলিয়া উঠিয়াছে ও লাল হইয়া গিয়াছে। ক্রোধে অধীর হইয়া সে বারবার বলিতে লাগিল, মামা, কে তোমায় মেরেচে দেখিয়ে দাও, আমি তার মাথাটা ছিঁড়ে লেব। পরে সকল কথা শুনিয়া, মাঝির অঙ্গের আঘাত তাঁহার অঙ্গে লাগিয়াছে জানিয়া, সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এই ঘটনাটি ঠাকুর বলিয়াছিলেন তাঁহার প্রিয়ভক্ত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষকে।

অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া ঠাকুরের মন অসীম উদারতা লাভ করিয়াছিল। ঈশ্বর-লাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া যাহারা শিক্ষা দেয় এরূপ সকল সম্প্রদায়ের প্রতিই—তাহাদের সাধনমার্গে যতই আবিলতা থাকুক না কেন—উহা সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কখনও কর্তাভজা-মতে সাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া কিছু শুনা যায় না, কিন্তু পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ-প্রমুখ ঐ মতের সাধকেরা সময়ে সময়ে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিতেন বলিয়া তিনি উঁহাদের গুহ্য সাধনপ্রণালীর খুঁটিনাটি সম্বন্ধেও ওয়াকিফহাল ছিলেন। একদিন তাঁহার মুখে উঁহাদের বিবিধ অনুষ্ঠান ও সেই সব অনুষ্ঠানের দ্যোতক রহস্যময় অথচ হৃদয়গ্রাহী প্রবচনসমূহ শুনিতে শুনিতে গিরিশবাবু বলিয়া উঠিয়াছিলেন, ওদের কথা নিয়ে আমি একখানা নাটক লিখব। ঠাকুর অমনি গম্ভীর হইয়া

গেলেন ও গিরিশকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ওদের মতে সাধন করেও অনেকে সিদ্ধ হয়েচে, তা জান ?

'আমার ধর্মই ঠিক, আর সকলের ভুল' এরূপ ধারণাকে ঠাকুর 'মতুয়ার-বুদ্ধি' বলিতেন। এই মতুয়ার-বুদ্ধি, এই একদেশী ভাব তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না, এবং কাহারও মধ্যে উহা দেখিতে পাইলেই দূর করিতে সচেষ্ট হইতেন। ধর্মজগতে এতখানি উদারতা অভূতপূর্ব ও সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই নিজস্ব সম্পত্তি। এই নিজস্ব সম্পত্তি তিনি অকাতরে অকৃপণহস্তে বিতরণ করিয়া গিয়াছেন যুগধর্ম সংস্থাপন করিবার জন্য—সর্বধর্মের সমন্বয়সূত্রে সমগ্র মানবজাতিকে একত্র সংগ্রথিত করিবার জন্য।

অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া ঠাকুরের মন কতখানি উদার যে হইয়াছিল ইহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার মুসলমান ধর্মমতের সাধনায় রুচি ও প্রবৃত্তি দেখিয়া। ইসলামের সুফী-সম্প্রদায়ভুক্ত দরবেশ গোবিন্দ রায় ১২৭৩ সালের কোন সময়ে রাণী রাসমণির বাগানে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং সাধনানুকূল স্থান বুঝিয়া পঞ্চবটীতে আসন লাগাইয়া কিছুকাল অবস্থান করেন। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন ও সম্ভবতঃ আরবী ও ফার্সী ভাষা জানিতেন। কালীবাটীতে তখন মুসলমান ফকীরদেরও সমাদর ছিল। সুফী সম্প্রদায়ের অন্যান্য সাধকদের মত গোবিন্দও প্রেমিক পুরুষ ছিলেন, এবং আল্লা-মন্ত্র জপ ও কোরাণপাঠ করিতেন। প্রেমিক গোবিন্দকে দেখিয়া এবং তাঁহার সহিত আলাপে মুগ্ধ হইয়া ঠাকুর ইসলামের রহস্য জানিতে আগ্রহান্বিত হন ও গোবিন্দের নিকট হইতে আল্লা-মন্ত্র গ্রহণ করেন।

ঠাকুর বলিতেন : ঐ সময়ে আল্লা-মন্ত্র জপ করতুম, মুসলমানদের মত কাছা খুলে কাপড় পরতুম, ত্রিসন্ধ্যা নমাজ পড়তুম ; হিন্দুভাব মন থেকে একেবারে চলে গিয়েছিল, হিন্দুদেবীকে প্রণাম করা দূরে থাক্, দর্শন করতেও ইচ্ছা হত না ; এভাবে তিনদিন কেটে যাবার পর ঐ মতের সাধনফল হাতে আসে।

ঠাকুর প্রথমে দীর্ঘশ্মশ্রু সুগম্ভীর এক জ্যোতির্ময় পুরুষের[১] দেখা পাইয়াছিলেন; তারপরে বিরাট সগুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া তাঁহার মন তুরীয় নির্গুণ ব্রহ্মে লীন হইয়াছিল।

হৃদয়ের উক্তি হইতে জানা যায়: ইসলাম-সাধনের সময় ঠাকুর নিকটবর্তী মসজিদে একদিন নমাজ পড়িয়াছিলেন এবং মুসলমানদের প্রিয় খাদ্যসকল খাইতে চাহিয়াছিলেন। মথুরবাবুর একান্ত অনুরোধে গোমাংস খাওয়ার ইচ্ছাটা কেবল পরিত্যাগ করেন।[২]

ঠাকুর যখন যে ধর্মের, যে ভাবের সাধনা করিতেন তখন সেই ধর্মের, সেই ভাবের সাধনায় বিহিত যাবতীয় আচারও পালন করিতেন। ইসলাম-সাধনার কালে, বালকভাবের প্রাবল্যে, ইহার কিছুটা বাড়াবাড়ি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

যবন-রন্ধন ঘ্রাণ-আস্বাদনে সাধ।
মথুর দেখিল একি হৈল পরমাদ॥
নানামতে প্রভুরে বুঝান সংগোপনে।
যবনের রান্না বাবা খাইবে কেমনে॥
শ্রীপ্রভু বলেন খানা রাঁধিবে যবন।
সানকি বদনা লয়ে করিব ভক্ষণ॥
পিয়াজ-রসুন-গন্ধ ছাড়িবে খানায়।
পাইলে এমন তবে তৃপ্তি হবে তায়॥
পুনরপি প্রভুদেবে বুঝাইয়া কন।
ব্রাহ্মণে যদ্যপি করে সেরূপ রন্ধন॥
তাহাতে না হবে কোন ক্ষতি আপনার।
ভাল বলি প্রভুদেব করিলা স্বীকার॥

---

১ এই দীর্ঘশ্মশ্রু জ্যোতির্ময় পুরুষ কি মহম্মদ? শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল তৎকৃত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, অন্যান্য অবতারের মত তাঁহার শ্রীঅঙ্গে লীন না হওয়ায় ঠাকুর মহম্মদকে অবতার বলেন নাই, ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন।

২ গোমাংসভক্ষণ মুসলমানদের পক্ষে আবশ্যিক নহে; কোরাণে বা হদিসে ইহার উল্লেখ নাই।

তখনি আনায় এক পাচক ব্রাহ্মণ।
যাবনিক সূপকর্মে বিজ্ঞ বিলক্ষণ॥
তফাতে দেখেন রান্না প্রভু ভগবান।
হিন্দুমতে পাচকের ধুতি পরিধান॥
মথুরে ডাকায়ে প্রভু কন অন্তরালে।
ব্রাহ্মণে বলহ যেন রাঁধে কাছা খুলে॥

ইসলাম-সাধনার প্রায় সতর বৎসর পরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন: আমি একদিন দেখলুম এক চৈতন্য—অভেদ। প্রথমে দেখালে, অনেক মানুষ জীবজন্তু রয়েচে; তার ভিতর বাবুরা আছে, ইংরেজ, মুসলমান, আমি নিজে, মুদ্দফরাস, কুকুর: আবার একজন দেড়ে মুসলমান, হাতে এক সানকি, তাতে ভাত রয়েচে। সেই সানকির ভাত সবাইয়ের মুখে একটু একটু দিয়ে গেল। আমি একটু আস্বাদ করলুম! [কথামৃত]

পরবর্তী কালে ঠাকুর বলিতেন, হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে যেন একটা পর্বত ব্যবধান। "ঐ পাহাড় যে একদিন অন্তর্হিত হইবে এবং উভয়ে প্রেমে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবে, যুগাবতার ঠাকুরের মুসলমান-ধর্মসাধন কি তাহারই সূচনা করিয়া যাইল?"

শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ একসময়ে মুসলমানশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন, সম্ভবতঃ হিন্দু ও মুসলমানের মিলনসূত্রগুলি আবিষ্কার করিতে অভিলাষী হইয়া। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, এখনো অনেক দেরী, পর্বত ব্যবধান—পরে হবে।

মুসলমানদের মধ্যে প্রধান সম্প্রদায় তিনটি—শিয়া, সুন্নী, সুফী। তিনটি সম্প্রদায়ের লোকই ভারতবর্ষে আছে, সুন্নীরা সংখ্যায় সর্বাধিক। ঠাকুর গুরু করিয়াছিলেন সুফী সম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসীকে। যেসব যথার্থ ফকীর-দরবেশ এদেশে আছেন বা ছিলেন তাঁহারা সকলেই সুফী-মতাবলম্বী। ইঁহারা ঈশ্বরলাভার্থে চিরকৌমার্য ও সন্ন্যাস মানেন, পুনর্জন্মবাদ ও গুরুবাদ—গুরুপরম্পরায় আধ্যাত্মিক শক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত হয়, এই মতবাদ স্বীকার করেন। অন্যান্য মুসলমানরা মানেন না, স্বীকার করেন

না। প্রধান মতবাদগুলির দিক দিয়া দেখিলে সুফীরা হিন্দুদের খুবই কাছাকাছি আছেন বলা যায়। ইঁহারা প্রেমিক মানুষ, কাফের-হিংসাও করেন না।

মন্মথনাথ ঘোষ নামে এক ব্যক্তি মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেন দক্ষিণেশ্বরে। তিনি বলিয়াছেন: একদিন সন্ধ্যার মুখে দেখি, গেঁড়াতলা মসজিদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে একটি মুসলমান ফকীর চীৎকার করচে, 'প্যারে আও।' চোখ দিয়ে জল পড়চে, প্রেমের স্বরে আর্তভাবে ডাকচে, 'প্যারে আজাও আজাও।' আমি শুনে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় দেখি ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব একটি ভাড়াটে গাড়ী থেকে নেমেই ছুটে চল্লেন সেই মুসলমান ফকীরের দিকে। দুই জনই প্রেমে আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। ভাড়াটে গাড়ীতে আর দুজন লোক ছিল—একজন ঠাকুরের ভাইপো রামলাল। ঠাকুর কালীঘাটে কালীমাতাকে দর্শন করে ফিরছিলেন, পথে এই অপূর্ব দৃশ্য।

দেশে গমন

ঠাকুরের শরীর এখন ব্যাধিমুক্ত হইয়াছে, এবং মনও তাঁহার কথিত বিজ্ঞানীর 'সহজ' অবস্থায় থাকিতে অনেকটা অভ্যস্ত হইয়াছে। বর্ষাকালে গঙ্গার জলে লবণাধিক্য ঘটে, সেই জল পান করিয়া তাঁহার পেটের পীড়া আবার হইতে পারে ভাবিয়া মথুরবাবু-প্রমুখ হিতৈষীরা তাঁহাকে কয়েকমাসের জন্য কামারপুকুরে পাঠাইবার উদ্যোগ করিলেন। ১২৭৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে, মন্দির-প্রতিষ্ঠার বার্ষিক মহোৎসবের পরে, ভাগিনেয় হৃদয় ও ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে সঙ্গে নিয়া ঠাকুর কামারপুকুর যাত্রা করিলেন। তাঁহার বৃদ্ধা জননী গঙ্গাবাস ত্যাগ করিয়া যাইতে অনিচ্ছুক হওয়ায় দক্ষিণেশ্বরে রহিয়া গেলেন।

কামারপুকুরের সংসারটি ছিল যেন শিবের সংসার, সঞ্চয় বলিয়া কিছু সেখানে ছিল না। পল্লীগ্রামে কোন জিনিসের অভাবে কোনরূপ অসুবিধা যাহাতে না ঘটে সেইজন্য মথুরবাবু ও তাঁহার ভক্তিমতী গৃহিণী প্রয়োজনীয় তাবৎ দ্রব্য তাঁহার সঙ্গে দিয়াছিলেন।

প্রায় সাত বৎসর পরে ঠাকুর ফিরিয়াছেন কামারপুকুরে, সংবাদ পাইয়া তাঁহার আত্মীয়বর্গ, তাঁহার যত প্রিয় পরিজন—আর দেশে তাঁহাদের সংখ্যাও তো বড় কম ছিল না!—ছুটিয়া আসিয়াছেন তাঁহাকে দেখিতে। রাতদিন তাঁহাদের ভিড় লাগিয়াই আছে। তাঁহার ভিক্ষামাতা ধনী, তাঁহাতে বাৎসল্যযুক্তা প্রসন্নময়ী ও অন্যান্য মাতৃস্থানীয়ারা, তাঁহার সেঙ্গাত গঙ্গাবিষ্ণু ও আর আর খেলার সাথীরা, ভক্তসখা চিনু শাঁখারী, পাইনদের বাড়ীর বাল্যসখীরা—কাহাকে রাখিয়া কাহার নাম করিব?—সকলেই আজ তাঁহাদের স্নেহের পাত্র, প্রীতির আস্পদ গদাধরকে দেখিতে, খাওয়াইতে, যতক্ষণ সম্ভব তাঁহার কাছে বসিয়া তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাক্যসুধা পান করিতে উদ্‌গ্রীব। লোকের মুখে কত রকমের কত কথাই না তাঁহারা শুনিয়া আসিতেছিলেন দীর্ঘ এই সাত বৎসর ধরিয়া। শুনিয়াছিলেন, আবার তিনি পাগল হইয়াছেন—কখনও মা মা করেন, কখনও স্ত্রীবেশ ধরিয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলেন, কখনও সন্ন্যাসী সাজেন, কখনও বা মুসলমানদের

মত নমাজ পড়েন! এখন তাঁহাদের চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটিল; তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহাদের গদাই-ঠাকুর আগেকার সেই সরল সুন্দর সহজ মানুষটিই আছেন, স্বভাবে আজও তিনি সেই সদানন্দময় বালক, সেই ক্রীড়াকৌতুকপরায়ণ চিরকিশোর! তাঁহার ভগবন্নিষ্ঠা, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে উল্লাস, তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতের ভুবনভুলানো মাধুরী মায়া, সবই আগেব মত রহিয়াছে; কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। তবে ইহাও তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন যে, মাঝে মাঝে আপনাতে আপনি মগ্ন হইয়া তিনি যেন কোন এক্ সুদূরের রাজ্যে গভীরঘন ধ্যানলোকে চলিয়া যান, যাহার খবব তাঁহারা বিশেষ জানেন না। কিন্তু তাহাতেই বা কী আসে যায়? অতি আপন বলিয়া একদিন যিনি ধরা দিয়াছিলেন, আজও তো তিনি তাঁহাদের সেই আপনই আছেন, তাঁহাব সহিত তাঁহাদের প্রাণের যোগ, হৃদয়ের সম্বন্ধ অচ্ছিন্ন অব্যাহত রহিয়াছে! প্রাণে প্রাণে ইহা বুঝিতে পারিয়াই তাঁহারা আজ সুখী। যে 'কবিতাময বিশ্বাসে' তাঁহাকে তাঁহারা একদিন এত কাছে পাইয়াছিলেন্ সেই বিশ্বাস কিছুতেই আর টলিবে না, গন্তময় বিচারবিতণ্ডার কোলাহলে কোনদিনই হারাইয়া যাইবে না।

বহুকাল পবে আনন্দবিগ্রহ ঠাকুরকে পাইয়া কামারপুকুরের ক্ষুদ্র সংসারে আনন্দের মেলা বসিল। নববধূকে আনাইয়া সেই আনন্দের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্য জয়রামবাটী গ্রামে ঠাকুরের শ্বশুরালয়ে লোক প্রেরিত হইল। জানিতে পারিয়াও ঠাকুর তাহাতে আপত্তি করিলেন না। আট বৎসর পূর্বে সকলে মিলিয়া যখন তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করে তখনও তিনি তাহাতে অমত-প্রকাশ করেন নাই, বরং ভাবাবিষ্ট হইয়া নিজেই পাত্রীর সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন। ভাবমুখে থাকিয়া ভবিতব্য প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন বলিয়াই কি তাঁহার এই পরোক্ষ সম্মতি? ভক্তদের কাছে শ্রীশ্রীসারদামাতা কিন্তু বলিয়াছিলেন, ঠাকুরই বলিয়া পাঠান, 'ব্রাহ্মণী এসেচেন, তুমি এস।' তাঁহার এই আহ্বান মা কি প্রাণে প্রাণে শুনিতে পাইয়াছিলেন? কখন কখন এমনও হয় যে, কানে শুনায় ও প্রাণে শুনায়

কোনই ভেদ থাকে না; কানে শুনায় ভুল হইলেও হইতে পারে, প্রাণে শুনায় হয় না।

মাতাঠাকুরাণী আসিলেন, সহজভাবে অবস্থিত ঠাকুরও সহজ ভাবেই তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরকে বিবাহিত জানিয়া তাঁহার গুরু শ্রীমৎ তোতাপুরী একসময়ে বলিয়াছিলেন: "স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইয়াছে; স্ত্রীপুরুষে ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন অপর সকলে সাধক হইলেও ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে বহুদূরে রহিয়াছে।" তোতার এই কথাগুলি মনে রাখিয়া ও স্বকীয় আত্মবিজ্ঞানের যাথার্থ্য পরীক্ষা করিতে চাহিয়া, ঠাকুর পতির মুখাপেক্ষিণী, পতির উপর একান্তভাবে নির্ভরশালিনী বালিকাবধূর জীবনগঠনে তৎপর হইলেন।

শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন: শ্বশুরবাড়ীতে বাসকালে রামলালের পিতাঠাকুর আমাকে শুতে যেতে বলতেন, আর উনি কেবল হাসতেন। সেই সময় একসঙ্গে শুতুম আর সারারাত গল্পেই কেটে যেত।

কী-সব গল্প ঠাকুর তাঁহার সঙ্গে করিতেন জানিবার উপায় নাই। তবে ইহা অনুমান করিতে কোনই বাধা নাই যে, শিষ্যদের বেলায় তিনি যেমন করিতেন, প্রথমতঃ ভালবাসিয়া তাহাদিগকে আপনার করিয়া লইতেন, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তারপরে নিজের ত্যাগোদ্দীপ্ত জীবন সম্মুখে রাখিয়া, সংসারে করণীয় ও প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি ছোটবড় কাজই তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন। শিখাইয়াছিলেন —কিরূপে পান সাজিতে হইবে, প্রদীপের সলিতাটি কিভাবে রাখিতে হইবে, বাড়ীর প্রত্যেকে কে কেমন লোক ও কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অপরের বাড়ীতে যাইয়াই বা কিরূপ আচরণ করিতে হইবে, গাড়ীতে বা নৌকায় যাইবার সময় কিরূপ সতর্কতা

অবলম্বন করিতে হইবে, কিরূপে দেবতা-গুরু-অতিথির সেবায় টাকার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। বলিয়াছিলেন: দেখ গো, চাঁদামামা যেমন সকলের মামা, তেমনি ঈশ্বরও সকলের আপনার। যে তাঁকে ডাকে সে-ই তাঁর দেখা পায়. তুমি যদি ডাক তুমিও পাবে।

পতির কামগন্ধহীন দিব্য সঙ্গ ও সপ্রেম শিক্ষায় সর্বতোভাবে পরিতৃপ্তা বালিকা আপনাকে তখন কিরূপ কৃতার্থ বোধ করিতেন তাহা পরবর্তী কালে এইরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন: "হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, ঐকাল হইতে সর্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম। সেই ধীরস্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।"

পত্নীর সহিত ঠাকুরের মেলামেশা ভৈরবী ব্রাহ্মণীর ভাল লাগে নাই। ঠাকুরকে তিনি ঐকার্য হইতে নিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন, ঠাকুর তাঁহার কথা শুনেন নাই। জ্ঞানপন্থী সন্ন্যাসী তোতাপুরী যখন দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন, ব্রাহ্মণী তখন ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন: বাবা, ওর কাছে বেশী যাওয়া-আসা কোরো না, বেশী মেশামেশি কোরো না, ওদের শুষ্ক পথ; ওর সঙ্গে মিশলে তোমার ভাবভক্তি সব নষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুর তখনও ব্রাহ্মণীর কথা শুনেন নাই, এবং নিজের সন্ন্যাস-গ্রহণের বিষয় তিনি যেমন গর্ভধারিণীর কাছে তেমনি ব্রাহ্মণীর কাছেও গোপন রাখিয়াছিলেন।

ঠাকুর কাহারও সহিত বেশী মেলামেশা করিলে, বা অন্য কোন ঈশ্বরভক্ত সাধককে অধিক সম্মান প্রদর্শন করিলে, ব্রাহ্মণী সহ্য করিতে পারিতেন না, তাঁহার মনে ঈর্ষার উদয় হইত। পত্নীর সহিত ঠাকুরের মেলামেশাও ব্রাহ্মণীর মনোভাবে, ঐরূপ বিকার আনয়ন করিয়াছিল। ঠাকুর কিন্তু তাঁহার তন্ত্রসাধনার গুরু ব্রাহ্মণীকে, তাঁহার দোষ দুর্বলতা জানিয়াও, বরাবরই মাতৃবৎ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন; একদিনের জন্যও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তাঁহার শিক্ষায় মাতাঠাকুরাণীও ব্রাহ্মণীকে শ্বশ্রূবৎ সেবা করিয়াছেন, কখনও অশ্রদ্ধা

করেন নাই। ঠাকুর যাহাকে যাহা দিয়াছিলেন চিরকালের জন্যই দিয়াছিলেন; তাঁহার ভালবাসা মায়িক ভালবাসার মত 'এই আছে এই নাই' গোছের ছিল না, মায়িক ভালবাসার মত তাহাতে জোয়ার-ভাঁটা খেলিত না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দীর্ঘ ছয় বৎসর তাঁহার সংস্রবে থাকিয়াও, এবং খাইতে শুইতে বসিতে সকল অবস্থায় সকল সময়ে তাঁহাকে দেখিয়াও, ব্রাহ্মণী ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই! লীলা-প্রসঙ্গকার সখেদে মন্তব্য করিয়াছেন:

"হায় মায়িক ভালবাসা ও স্ত্রীলোকের মন, তোমরা সর্বদাই ভালবাসার পাত্রকে চিরকালের মত বাঁধিয়া নিজস্ব করিয়া রাখিতে চাও, এতটুকু স্বাধীনতা তাহাকে দিতে চাও না। মনে কর, স্বাধীনতা পাইলেই তোমাদের ভালবাসার পাত্র আর তোমাদের থাকিবে না, অপর কাহাকেও তোমাদের অপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়া ফেলিবে। তোমরা বুঝ না যে, তোমাদের অন্তরের দুর্বলতাই তোমাদিগকে ঐরূপ করিতে শিখাইয়া দেয়। তোমরা বুঝ না যে, যে ভালবাসা ভালবাসার পাত্রকে স্বাধীনতা দেয় না, যাহা আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া সে যাহা চাহে তাহাতে আনন্দানুভব করিতে জানে না বা শিখে না, তাহা প্রায়ই স্বল্পকালে বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব যদি যথার্থই কাহাকেও প্রাণের ভালবাসা দিয়া থাক, তবে নিশ্চিন্ত থাকিও তোমার ভালবাসার পাত্র তোমারই থাকিবে এবং ঐ শুদ্ধ স্বার্থ-সম্পর্কশূন্য ভালবাসা শুধু তোমাকে নহে, তাহাকেও চরমে ঈশ্বরদর্শন ও সর্ববন্ধনবিমুক্তি পর্যন্ত আনিয়া দিবে।"

ব্রাহ্মণীর মনোবিকার ক্রমে চরমে উঠিয়া কিছুকালের জন্য তাঁহাকে ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাহীনা করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার অভিমান প্রতিহত হইয়া অহঙ্কারে পরিণত হইয়াছিল। ধর্ম সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া যদি কেহ বলিত, ঐ বিষয়ে সে ঠাকুরের মতামত গ্রহণ করিবে, ব্রাহ্মণী তাহাতে রুষ্টা হইয়া বলিতেন, সে আবার বলবে কী? তার চক্ষুদান তো আমিই করেচি! সামান্য কারণে বা অকারণে অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে তিরস্কার করিয়া বসিতেন। বালিকা মাতা তাঁহার

কাছে আসিতে ভীতা সঙ্কুচিতা হইতেন। শান্তির সংসারে অশান্তির ছায়াপাত হইতে লাগিল, ঠাকুর কিন্তু নির্বিকার!

পরমভক্ত চিনু শাঁখারী একদিন এখানে ৺রঘুবীরের প্রসাদ পাইয়াছিলেন। আহারান্তে সামাজিক আচার মানিয়া তিনি নিজের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে গেলে ব্রাহ্মণী বাধা দিয়া বলেন, থাক্, আমরাই নেব এখন। তিনি বারবার এইকথা বলিতে থাকিলে চিনু নিরস্ত হইয়া চলিয়া যান। গ্রামীণ সমাজে তুচ্ছ কারণে বিষম গণ্ডগোল ও দলাদলির সৃষ্টি হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণী উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে গেলে প্রথমেই উপস্থিত ব্রাহ্মণকন্যারা তাহাতে আপত্তি করিলেন, তারপরে ঐবিষয় নিয়া হৃদয়ের সহিত তাঁহার তুমুল ঝগড়া বাঁধিয়া গেল। 'উচ্ছিষ্ট নিলে তোমাকে ঘরে থাকতে দিব না।' হৃদয় কহিল। 'না দিলে ক্ষতি কী? শীতলার ঘরে মনসা শোবে এখন!' ব্রাহ্মণী প্রত্যুত্তর করিলেন। 'দেখি কেমন শীতলার ঘরে মনসা শোয়!' বলিয়া হৃদয় কী-একটা ছুঁড়িয়া মারিল ও তাহা ব্রাহ্মণীর কানে লাগিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর কহিলেন: ওরে হৃদু, তুই কেন এমন করলি? এ সৎলোক, ভক্তিমতী। এমন হলে যে সব লোক জড় হবে, কেলেঙ্কারি হবে। এই দুঃখজনক ঘটনার প্রতিক্রিয়া সাধিকা ব্রাহ্মণীকে প্রকৃতিস্থা হইতে সাহায্য করিল। জৈব অহং প্রবুদ্ধ হইয়া, ক্রোধ, সম্মোহ ও স্মৃতি-বিভ্রম ঘটাইয়া, তাঁহার বুদ্ধিনাশ করিতে যাইতেছিল; তিনি লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়া পাইলেন। একদিন যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া দৃপ্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি আজ নিজের ভাবনার বৈপরীত্য দেখিয়া নিজেই চমকিয়া উঠিলেন, এবং তপস্যাময় প্রায়শ্চিত্ত কবিয়া চিরতরে এই আধির উপশম করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

অনন্তর একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ-জ্ঞানে ঠাকুরকে স্বহস্তরচিত ফুলের মালায় ভূষিত করিয়া ব্রাহ্মণী কৃতাপরাধের জন্য সর্বান্তঃকরণে ক্ষমাভিক্ষা করিলেন, এবং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া, কাহাকেও কিছু জানিতে না দিয়া, পশ্চিমাঞ্চলে যাইবার পথে পা বাড়াইলেন। ব্রাহ্মণী তন্ত্রোক্ত বীরভাবের

সাধিকাগ্রণী ছিলেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিতা হইতে পারেন নাই। ঠাকুরের দিব্যজীবনের সংস্পর্শে আসার ফলেই পরিশেষে তিনি ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণী চলিয়া গেলেন, কিন্তু ঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া যে আনন্দের মেলা বসিয়াছিল তাহাতে স্ত্রীপুরুষদের ভিড় বাড়িল বই কমিল না। প্রত্যূষেই পাড়ার মেয়েদের একটি দল স্নান করিতে বাহির হইয়া, কলসীগুলি হালদারপুকুরের পাড়ে রাখিয়া একবার চাটুজ্যে-বাড়ীতে আসিতেন এবং বাড়ীর মেয়েদের ও ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্তায় কিছুকাল কাটাইয়া তারপরে স্নান কবিতে যাইতেন। রাত্রে তাঁহাদের কাহারও বাড়ীতে মিষ্টান্ন-পিষ্টকাদি খাবার প্রস্তুত হইয়া থাকিলে উহার অগ্রভাগ ঠাকুরের জন্য তুলিয়া রাখিতেন ও এই ফাঁকে তাঁহাকে দিয়া যাইতেন। রঙ্গরসপ্রিয় ঠাকুর কখন কখন বলিতেন: বৃন্দাবনে নানা ভাবে নানা সময়ে কৃষ্ণের সাথে গোপীদের মিলন হত—পুলিনে জল আনতে গিয়ে গোষ্ঠমিলন, তারপর সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর যখন গরু চরিয়ে ফিরতেন তখন গোধূলিমিলন, রাত্রে রাসে মিলন, এইরকম এইরকম সব আছে। তা হাঁগা, এটা কি তোদের স্নানের সময়ের মিলন নাকি? ঠাকুরের কথা শুনিয়া তাঁহারা হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেন। মেয়েরা চলিয়া যাইবার পর পুরুষেরা আসিতেন ও ঠাকুরের কাছে বসিয়া যাহার যতক্ষণ ইচ্ছা কথা কহিতেন। অপরাহ্ণে গৃহকর্ম সারিয়া মেয়েরা আবার আসিতেন ও সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠাকুরের ঘরে বসিয়া তাঁহার শ্রীমূর্তি-দর্শনে ও শ্রীমুখনিঃসৃত কথামৃতপানে মগ্ন রহিতেন। রাত্রেও পুরুষেরা কেহ কেহ আসিতেন। আর ভিন্ন গ্রাম হইতে যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা সাধারণতঃ অপরাহ্ণে আসিয়া সন্ধ্যার পূর্বে চলিয়া যাইতেন। কর্তাভজাদি সম্প্রদায়ের লোকেরাও এখানে আসিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন বলিয়া শুনা গিয়াছে।

ছোট-বড়-নির্বিশেষে মধুর সম্ভাষ।
কে কোথায় কে কেমন কুশল-উল্লাস॥
দুখে সুখে পূর্ববৎ সহ-অনুভূতি।
পুরাণের মত কথা পুরাণ ভারতী॥

উভয় পক্ষের স্মৃতি দেয় জাগাইয়ে।
আনন্দের নাহি ওর বলিয়ে শুনিয়ে ॥
অতীত কালের যত কাহিনী-লহর।
অধিক করিল ঘন প্রেম পরস্পর ॥
মধুর সম্বন্ধ কিবা প্রভুর এখানে।
সমাকৃষ্ট পরস্পর মধুর বন্ধনে ॥
সাংসারিক প্রসঙ্গেও নানা উপদেশ।
যাহাতে তাদের হয় মঙ্গল অশেষ ॥
ভক্তিমতীদের মধ্যে অনেক উন্নতা।
বুঝিতে সক্ষম আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা ॥
অবসর মত আসে কুলবতীগণে।
সঙ্গে কিছু ভোজ্যদ্রব্য গোপন বসনে ॥

… …

পল্লীগ্রামে সমাজের নিগূঢ় বন্ধন।
বদ্ধ যাহে কোমলাঙ্গী কুলবতীগণ ॥
তৃণের মতন তাহা ছেদিয়ে ছিঁড়িয়ে।
প্রভু-দরশনে আসে সংসার ফেলিয়ে ॥

… …

দিনে রেতে অবিরত দ্বার থাকে খোলা।
দরিদ্র ব্রাহ্মণাবাসে সদানন্দ-মেলা ॥

ঠাকুরের কাছে যেসব ভক্তিমতী নারীরা আসিতেন, ধর্মজীবনে তাঁহাদের কেহ কেহ আশাতীত উন্নতি করিয়াছিলেন। প্রায় সারাদিন গৃহকর্মে লিপ্ত থাকিয়াও, যথাশক্তি ভগবদনুচিন্তন ও প্রগাঢ় ভক্তিবিশ্বাসের বলে তাঁহারা এমন সুন্দর অবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। একদিন আহারান্তে ঠাকুর যখন বিশ্রাম করিতেছিলেন সেই সময়ে কয়েকজন প্রতিবাসিনী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন ; তাঁহাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন ও তাঁহার অনুভূতি হইতে থাকে যে, তিনি যেন মীনরূপে সচ্চিদানন্দ-সাগরে ভাসিয়া ডুবিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহাকে ভাবাবিষ্ট দেখিয়া মেয়েরা উপস্থিত বিষয়ে নিজ

নিজ মতামত প্রকাশ করিতে থাকিলে তাঁহাদেরই একজন বাধা দিয়া কহিলেন: উনি এখন মীন হয়ে সচ্চিদানন্দ-সাগরে সাঁতার দিচ্ছেন, গোলমাল করলে ওঁর আনন্দের ব্যাঘাত হবে। ভাবভঙ্গে সেকথা শুনিতে পাইয়া ঠাকুর বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন: সত্যিই তো বলেচে। কেমন করে জানলে!

মাতাঠাকুরাণী বলিয়াছেন:

আমি তখন ছেলেমানুষ বৌটি। ঠাকুর একটু রাত থাকতেই উঠে আমাকে বলতেন, কাল এই সব রান্না কোরো গো। আমরা তাই রান্না কত্তুম। একদিন পাঁচফোড়ন ছিল না, দিদি (মেজ-জা) বল্লে, তা অমনিই হোক, নাই তার কী হবে। ঠাকুর শুনতে পেয়ে ডেকে বলচেন: সে কী গো, পাঁচফোড়ন নাই, তা এক পয়সার আনিয়ে নাও না; যাতে যা লাগে তা বাদ দিলে হবে না। তোমাদের এই ফোড়নের গন্ধের বেন্নুন খেতে দক্ষিণেশ্বরের মাছের মুড়ো, পায়েসের বাটি ফেলে এলুম, আর তাই তোমরা বাদ দিতে চাও? দিদি তখন লজ্জা পেয়ে আনতে দিলে।

একদিন খেতে বসেচেন ঠাকুর আর হৃদয়। লক্ষ্মীর মা (মেজ-জা) ভাল রান্তে পাত্ত। সে যেটা রেঁধেচে, খেয়ে বল্লেন, ও হৃদু, এটা যে রেঁধেচে সে রামদাস বদ্যি। আমি যেটা রেঁধেচি খেয়ে বল্লেন, আর এই ছিনাথ সেন। শ্রীনাথ সেন হাতুড়ে। শুনে হৃদয় বলচে, তা বটে, তবে তোমার হাতুড়ে বদ্যি তুমি সব সময় পাবে, গা টিপতে পা টিপতে পর্যন্ত, ডাকলেই হল। রামদাস বদ্যি, তার ষোল টাকা ভিজিট, তাকে তো আর সব সময় পাবে না। আর লোকে আগে হাতুড়েকে ডাকে, সে তোমার সব সময় বান্ধব। ঠাকুর বল্লেন, তা বটে, তা বটে, এ সব সময় আছে।

ঠাকুর যখন মেয়েদের উপদেশ দিতেন, শুনতে শুনতে আমি মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়তুম। অন্য মেয়েরা ঠেলে তুলে দেবার চেষ্টা কত্ত আর বলত, এমন কথাগুলো শুনলে নি, ঘুমিয়ে পড়লে। ঠাকুর বলতেন,

নাগো, ওকে তুল নি। ও কি সাধে ঘুমিয়েচে? এসব শুনলে ও এখানে থাকবে নি, চোঁচা দৌড় মারবে!

শ্রীশ্রীমার মনের স্বাভাবিক উর্ধ্বগতি ও তৎকালীন অন্তর্মুখ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর ঐ মন্তব্য করিয়া থাকিবেন।

জন্মভূমি কামারপুকুরে বাল্যকাল হইতে অভ্যস্ত আহারবিহারে থাকিয়া ঠাকুরের শরীর পূর্বাপেক্ষা সুস্থসবল হইয়া উঠিল।

চাঁদের কিরণ যেন মেঘ হলে দূর।
ব্যাধি-অন্তে কান্তি তেন উঠিল প্রভুর॥

হৃদয়ের ইচ্ছা, এখন তাঁহাকে শিহড়ে নিজের ঘরে লইয়া গিয়া কিছুদিন রাখিবে। ঠাকুর সানন্দে সম্মতি দিলেন। শিহড়ে যাইবার পথে জয়রামবাটী পড়ে, জয়রামবাটী ও শিহড়ের ব্যবধান আধক্রোশ মাত্র। জয়রামবাটীতে যাইবার জন্যও শ্বশুরবাড়ী হইতে আহ্বান আসিয়াছিল।

বালকস্বভাব প্রভু সহজ অন্তর।
দেখেন সকলে যায় শ্বশুরের ঘর॥
নানাবিধ বেশভূষা, আনন্দ অপার
খুসির বিষয় ইহা, নহে কিছু আর॥

... ..

বহুবিধ মূল্যবান বসন প্রচুর।
বস্তা বেঁধে দিয়াছেন ভকত মথুর॥
লাল বারাণসী স্বর্ণজরি পাড তায়।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে হৃদু যতনে পরায়॥
সমান উড়না তাঁর স্কন্ধদেশে ঝুলে।
নাগরিয়া লাল জুতা চরণযুগলে॥
ঝলমল অঙ্গকান্তি এমন রকম।
স্বচ্ছ কাচে প্রতিবিম্ব চাঁদের কিরণ।

যাত্রা করিয়া বাটীর বাহিরে আসিতেই ঠাকুর দেখিলেন, রাস্তার দুইধারে স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া বহু লোক কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, উৎসুক নয়নে চাহিয়া। 'হৃদু, এত ভিড় কিসের রে?' ঠাকুর জিজ্ঞাসা

করিলেন। 'কিসের আর? তুমি আজ জয়রামবাটী যাবে, কিছুদিন তোমাকে দেখতে পাবে না, তাই সব দেখতে এসেচে।' হৃদয় কহিল। 'আমাকে তো রোজ দেখে, আজ আবার কি নূতন দেখবে?' 'এই চেলি পরে সাজলে গুজলে, পান খেয়ে তোমার ঠোঁট দুখানি লাল টুকটুকে হলে খুব সুন্দর দেখায়; তাই সব দেখবে আর কি।' 'কী? একটা মানুষকে দেখবার জন্যে মানুষ এত ভিড় করবে? যাঃ, আমি কোথাও যাব না; যেখানে যাব সেখানেই তো লোকে এইরকম ভিড় করবে!' এই বলিয়া ঠাকুর বাটীর ভিতরে নিজের ঘরে ফিরিয়া গেলেন এবং কাপড় চোপড় খুলিয়া ফেলিয়া মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিলেন। সকলে অনেক বুঝাইল কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না।

পরদিন চুপে চুপে অতি প্রাতে উঠি।
প্রভুরে লইয়া যায় জয়রামবাটী॥

মুখুজ্যেদের 'ক্ষেপা জামাই' আসিতেছেন শুনিয়া গ্রামবাসীরা তাঁহাকে দেখিতে সমুৎসুক হইল। নারীগণ আগাইয়া গেলেন এবং পথে পথে জলধারা দিয়া ও শঙ্খধ্বনি করিয়া তাঁহাকে ঘরে লইয়া আসিলেন।

জামাই আনিতে নাই দেশে হেন রীতি।
জলধারা শঙ্খধ্বনি অদ্ভুত ভারতী॥

তাঁহাদের এই মঙ্গলাচারের উদ্দেশ্য ক্ষেপা জামাইয়ের ক্ষেপামির উপশম করা। যেমন ভাব তেমন লাভ। কামারপুকুরের ভক্তমানুষেরা ঠাকুরকে দেখিয়াছিল ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণরূপে, সেইরূপেই তাঁহাকে পাইয়াছিল। জয়রামবাটীর বিষয়ী লোকেরা দেখিল ক্ষেপা জামাইরূপে, ক্ষেপা জামাইরূপেই তাঁহাকে লাভ করিল।

নারীগণে দরশনে রস ভাবে তাঁয়।
প্রভু নাহি দেন কান কোনই কথায়॥
মুখে শ্যামাগুণগান তালি দেয় কর।
নৃত্য করে পদদ্বয় বড়ই সুন্দর॥
বদনমণ্ডলে শোভা অপরূপ খেলে।
বুক বেয়ে কোঁচার কাপড় কাঁধে ঝুলে॥

দেখিয়া সকলে ভুলে কাছে যতক্ষণ।
অন্তরালে গেলে বলে পাগল-লক্ষণ॥
... ...
সংসার-সম্বন্ধে আছে যেরূপ ব্যাভার।
ভিন্ন ভিন্ন জনে যেন বিভিন্ন আচার॥
সে সব না ছিল কিছু শ্রীপ্রভুর ঠাঁই।
সর্বস্থানে সমরূপ লজ্জা ভয় নাই॥

মুখুজ্যেদের ছোট বাড়ীখানির উঠানের একপাশে একটি সজিনার গাছ ছিল ও সেই গাছের ডালগুলি তখন ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সজিনা গাছের তলায় পা মেলিয়া বসিয়া ক্ষেপা জামাই গান ধরিলেন:

যার নাকেতে নাকফুল, দুহাত-মাপা চুল,
তার সঙ্গে পাতাব আমি সজনা ফুল।
বড় সাধ আছে মনে—
সজনা ফুল পাতাব শাউড়ী তোর সনে॥

শাশুড়ী শুনিতে পাইয়া বলিলেন, ছি ছি, আমি শাশুড়ী! 'শাশুড়ী কি পাছায় লেখা আছে?' ক্ষেপা জামাই উত্তর দিলেন। শাশুড়ী ছুটিয়া পালাইলেন কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া।

শ্বশুরঘরে একদিন অনেকগুলি মেয়েকে একত্র দেখিয়া ঠাকুরের ৺শ্যামামাতার উদ্দীপন হইল। তিনি ফুলচন্দন হাতে নিয়া তাঁহাদের চরণে অর্পণ করিলেন।

নারীগণ ত্রস্তমন শশব্যস্ত-প্রায়।
পলায়ন করে মুখ ঢাকিয়া লজ্জায়॥

অন্যদিন মনসাপূজার আয়োজন হইতেছিল ও মেয়েরা থালায় নৈবেদ্য সাজাইয়া রাখিতেছিলেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

দেখিয়া নৈবেদ্য থালে প্রভুদেব কন।
নৈবেদ্য খাইতে কেন হইতেছে মন॥
খাও তবে নারীগণে কহিল তাঁহায়।
অমনি বসিলা প্রভু নৈবেদ্য-সেবায়॥

ভাবাবেশে খাইতে লাগিলা গুণমণি।
অনিমিখ-আঁখি দেখে পাড়ার রমণী॥

ঘরে খাবার জায়গা হইয়াছে ও ঠাকুরকে কেহ ডাকিয়া লইয়া আসিয়াছে।

শালী-সম্পর্কীয় এক হেঁসেলেতে যায়।
অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজ্য সাজাতে থালায়॥
ইতিমধ্যে শ্রীঅঙ্গেতে দিগম্বরাবেশ।
উলঙ্গ ঘরের এক কোণে পরমেশ॥
অদূরে পড়েছে খসি কটীর বসন।
দাঁড়ায়ে আছেন নাহি বাহ্যিক চেতন॥
হেনকালে হাতে থালা শালী ঘরে যায়।
ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে ছুটিয়া পালায়॥

... ...

লোকে জনে তত্ত্ব তাঁর কিছু বুঝে নাই।
একবাক্যে কয় সবে উন্মত্ত জামাই॥

জয়রামবাটীতে ভক্তলোক কেহই যে তখন ছিলেন না এমন নহে। ঠাকুরের শ্বশুর রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরম রামভক্ত, সরল ও পরোপকারী ছিলেন। শাশুড়ী শ্যামাসুন্দরীও ছিলেন সর্বগুণে স্বামীর অনুরূপা। ভাগবতী লীলার রসপুষ্টি ও বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতে তৎকালের জন্ম তাঁহাদের চোখে যেন একটি মায়ার ছানি পড়িয়াছিল। জয়রামবাটীর একটি বিধবা সদ্‌গোপকন্যা প্রথম দর্শনের দিন হইতেই ঠাকুরের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন:

আমার ঠাকুরের উপর প্রবল অনুরাগ ছিল। ঠাকুর যখন জয়রামবাটী আসতেন, তাঁকে দেখবার জন্যে ছুটে ছুটে যেতুম। তাঁকে দেখতে পাড়ার যত মেয়েরাও এসে জড় হত; মেয়েদের দেখে ঠাকুর এমন সব কথা কইতেন যে হেসে হেসে তাদের পেট ছিঁড়ে যেত আর লজ্জায় পালাত। তখন ঠাকুর বলতেন, 'দেখলে গা, আগড়াগুলো সব উ-উড়ে গেল! এবার তোমরা বস, কথা হবে।'

তখন কম বয়েস, মুখুজ্যেদের পাগলা জামাইয়ের কাছে যেতে আমার বড় ভাই গৌরদাদা নিষেধ কত্ত। কখন কখন ঠাকুর 'ঐ গৌরদাদা এল' বলে ভয় দেখাতেন আর আমি জড়সড় হতুম। আমাকে জড়সড় দেখে ঠাকুর বলতেন, 'লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়।'

তাঁর কাছে আসি বলে আমাকে অনেক সইতে হয় জেনে ঠাকুর বলেছিলেন, 'যখন গৌরদাদা তোকে শাসাতে আসবে তখন তুই দুহাত তুলে হাততালি দিয়ে নাচবি আর বলবি, ভজ মন গৌরনিতাই। তাহলে তোকে পাগল মনে করে সে আর কিছু বলবে না।' ঠাকুরের কথাই সত্যি হয়েছিল।

একদিন ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, 'তোমার নাম কী?' আমি বল্লুম, 'মানগরবিণী।' 'এ তোমার কে হয়?—কী বলে ডাকে?' 'এ কে?' 'সারদা'। 'পিসী'। 'তবে আজ থেকে তোমার নাম হল ভানুপিসী।' এই বলে ঠাকুর গান ধরলেন, 'গরবিণী নাম ঘুচেছে।'

ঠাকুরের শাশুড়ী আগে বলতেন, 'ক্ষেপা জামাই গো ক্ষেপা জামাই! —আমার সারদার কত কষ্ট হবে।' পরে তাঁকে ঠাকুরের পট পূজো কত্তে দেখে বলতুম, 'এখন কেন গো, আগে যে ক্ষেপা জামাই বলতে?'

ঠাকুর মেয়েদের বলতেন, 'পাঁকের পদ্ম।'

জয়রামবাটী হইতে ঠাকুর হৃদয়ের সঙ্গে আসিলেন শিহড়ে। এখানে—

> পরম যতনে হৃদু প্রভুদেবে রাখে।
> খেতে শুতে পথে সদা প্রভু-সঙ্গে থাকে॥
> হরিভক্ত তথা যথা এখানে সেখানে।
> আনিয়া করিত মেলা প্রভু-সন্নিধানে॥

আর তাহার ছোট ভাই রাজারাম—

> প্রভুর যা প্রিয় খাদ্য জুটায় যতনে।
> যতই না হোক কষ্ট কিছু নাহি মানে॥
> সাধনান্তে বলহীন পেটের পীড়ায়।
> পুষ্টিকর যাহা বুঝে ত্রিসন্ধ্যা জোগায়॥
> জীবিত মাছের ঝোল প্রভুরে খাওয়াতে।
> ধরিত মাগুর কই নিদ্রা নাই রেতে॥

গ্রামের দক্ষিণ সীমায় হৃদয়দের বাড়ী, বাড়ীর দক্ষিণে বিস্তৃত মাঠ ও মাঠের মাঝে মাঝে ছোট বড় অনেক পুকুর। একদিন বেলা-অবসানে ঠাকুর এক পুকুরের পাড়ে শৌচে গিয়াছেন, আর রাজারাম তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছে কিছু তফাতে থাকিয়া। নালা দিয়া বর্ষার জল কলকল-শব্দে পুকুরে পড়িতেছিল ও সেই প্রপাত-মুখে পুকুরের যাবতীয় মাছ আসিয়া জড় হইয়াছিল। তিনি ধীরে ধীরে মাছগুলির খুব কাছে চলিয়া গেলেন, কিন্তু মাছেরা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াও পলায়ন করিল না। তিনি তখন মনে করিলেন যে, ইসারা করিয়া রাজারামকে ডাকিবেন, এখানে অল্প জলে অনায়াসে সে অনেক মাছ ধরিতে পারিবে। যেই একথা তাঁহার মনে উদয় হইল অমনি মোটাসোটা সর্দার মাছটি জোরে লাফ দিয়া ডাঙ্গার উপরে তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া উলট পালট খাইতে লাগিল।

বিপদনিবারী প্রভু দয়ার সাগর।
দেখিয়া সর্দার মাছ অত্যন্ত কাতর॥
শ্রীহস্ত বুলায়ে গায়ে কহেন গোসাঁই।
ঘরে যাও আর তোর কোন ভয় নাই॥
এত বলি আশ্বাসিয়া দিলেন ফেলিয়ে।
ছানাপোনা যেথা জলে বেড়ায় খেলিয়ে॥

অনুরূপ অন্য একটি মাছের ঘটনা হইয়াছিল ঠাকুর-কামারপুকুরে থাকিতে। ঠাকুর ভূতির খালের দিক হইতে আসিতেছিলেন, বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে তখন। একটি বড় মাগুর মাছ পুকুর হইতে রাস্তায় উঠিয়াছিল, তাঁহার পায়ে ঠেকিয়া যায়। পায়ে ঠেলিয়া আনিয়া মাছটিকে পুকুরে ছাড়িয়া দিতে দিতে তিনি বলিয়াছিলেন, পালা পালা, হৃদু দেখতে পেলে এখুনি তোকে মেরে ফেলবে।

ছয়সাত মাস দেশে অতিবাহিত করিয়া ঠাকুর সম্ভবতঃ অগ্রহায়ণ মাসে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করেন। ফিরিবার কালে পথের দুইটি ছোট ঘটনা উল্লেখযোগ্য। পুঁথির বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, বর্ধমান পর্যন্ত গোযানে আসিয়া তিনি সেখানে রেলগাড়ী ধরিয়াছিলেন।

ষ্টেশনের কিছু ব্যবধানে এক চটিতে পৌঁছিয়া ও স্নানান্তে ঠাকুরকে জলযোগ করাইয়া হৃদয় রন্ধনকার্যে ব্যাপৃত হইল।

সামান্য সে চটি ভাল দ্রব্য নাহি জুটে।
ভাল যা পাইল তাই আনিল আকুটে॥
ভাত ডাল তরকারি হইল সকল।
সর্বশেষে রাঁধে চুনা মাছের অম্বল॥
প্রস্তুত করিয়া অন্ন হৃদু ডাকে তাঁরে।
নাচিতে নাচিতে যান ভাত খাইবারে॥
... ...
অম্বলেতে চুনা মাছ করি দরশন।
বলিলেন আর মম হবে না ভোজন॥
পনা মাছ বিনা আজ ভাত নাহি খাব।
বরঞ্চ আগোটা দিন উপবাস রব॥

হৃদয় তাঁহাকে নানা কথা বলিয়া বুঝাইল, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। তিনি ঘরের খুঁটি ধরিয়া ছোট ছেলেটির মত ঘুরিতে লাগিলেন।

ঘুরিতে ঘুরিতে মাঝে মাঝে হয় নাচ।
সেই এক বোল মুখে খাব পনামাছ॥
খেয়াল না যাবে হৃদু বুঝিয়া আপনে।
বাহির হইল পনামাছ-অন্বেষণে॥
সেবক হৃদুর মত খুঁজিয়া না পাই।
এত আবদার যারে করেন গোসাঁই॥

মাছের সন্ধানে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া হৃদয় শেষে এক বিবাহ-বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া ভাগ্যবান গৃহস্বামী একটি গোটা মাছই দান করিলেন। মনোমত রন্ধন করিয়া হৃদয় মামাকে তাড়াতাড়ি খাইয়া নিতে বলিল। কারণ, তাহা না হইলে গাড়ী ধরিতে পারা যাইবে না, আর সেই গাড়ীখানিই ছিল কলিকাতায় যাওয়ার শেষ গাড়ী। ঠাকুর আপন মনে অতি ধীরে ধীরে খাইতে লাগিলেন, হৃদয়ের কথা তাঁহার কানে গেল না। কোনরূপে ভোজন যদি বা শেষ হইল,

ষ্টেশনে যাওয়ার পথে একপ্রকার কণ্টক দেখিতে পাইয়া—সেই কণ্টক দিয়া পূজা করিলে নাকি মহাদেব পরিতুষ্ট হন—তিনি পূজা করিতে বসিলেন, ভাবে মগ্ন হইয়া। ইতোমধ্যে গাড়ীখানাও উহার নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়া ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ষ্টেশনের এক কর্মচারীর সঙ্গে কথা কহিয়া হৃদয় জানিতে পারিল, রেল-কোম্পানীর এক বড় কর্তাকে নিয়া একখানা স্বতন্ত্রগাড়ী কাশী হইতে আসিতেছে, কলিকাতায় যাইবে। সেই গাড়ীতে অন্য যাত্রী নেবার কথা নহে। সদাশয় কর্মচারীটি বলিলেন যে, ঠাকুরকে তিনি সেই গাড়ীতে তুলিয়া দিতে চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না। তাঁহার চেষ্টা সফল হইল।

ইচ্ছাময় প্রভুদেব ইচ্ছায় তাঁহার।
কোথা হতে কিবা হয় কে বুঝে ব্যাপার॥

একটা রাজারাজড়া মনে করিত। এই তীর্থভ্রমণে তিনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

মাধুকরী দিবার দিনে ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ, এমনকি মারামারি পর্যন্ত করিতেছেন। মথুরবাবুর সঙ্গে একদিন রাজাবাবুদের বৈঠকখানায় গিয়া শুনিয়াছিলেন টাকা, জমি ইত্যাদি যত সব বিষয়ের কথা। ইহাতে তাঁহার মনে একপ্রকার হতাশ ভাব আসিয়াছিল ও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন, 'মা, তুই আমাকে এখানে কেন আনলি? এর চেয়ে দক্ষিণেশ্বরে যে আমি ছিলুম ভাল!' পরবর্তী কালে ভক্তদিগকে তিনি বলিয়াছেন: মথুরের সঙ্গে পশ্চিমে গিয়ে দেখি, এখানেও যা সেখানেও তাই; এখানকার আমগাছ তেঁতুলগাছ বাঁশঝাড়টি যেমন, সেখানকার সেগুলিও তেমনি! তাই দেখে হৃদুকে বলেছিলুম, 'ওরে হৃদু, এখানে তবে কী দেখতে এলুম রে? সেখানেও যা এখানেও তাই! কেবল তফাৎ এই, এখানকার লোকের ভূষির মত বাহ্যে।' আরও বলিয়াছেন: ভেবেছিলুম, কাশীতে সবাই চব্বিশ ঘণ্টা শিবের ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছে দেখতে পাব; বৃন্দাবনে সবাই গোবিন্দকে নিয়ে ভাবে প্রেমে বিভোর হয়ে রয়েচে দেখব। গিয়ে দেখি সবই বিপরীত!

"এইরূপে সাধারণের ভিতর বিষয়ানুরাগ প্রবল দেখিয়া ব্যথিত হইলেও এখানে অদ্ভুত দর্শনাদি হইয়া ঠাকুরের শিবমহিমা এবং কাশীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দৃঢ়ধারণা হইয়াছিল।...ঠাকুর ভাব-নয়নে দেখিতে থাকেন শিবপুরী বাস্তবিকই স্বর্ণ নির্মিত—বাস্তবিকই ইহাতে মৃত্তিকা-প্রস্তরাদির একান্ত অভাব—বাস্তবিকই যুগযুগান্তর ধরিয়া সাধু-ভক্তগণের কাঞ্চনতুল্য সমুজ্জ্বল, অমূল্য হৃদয়ের ভাবরাশি স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত ও ঘনীভূত হইয়া ইহার বর্তমান আকারে প্রকাশ! সেই জ্যোতির্ময় ভাবঘন মূর্তিই ইহার নিত্যসত্য রূপ; আর বাহিরে যাহা দেখা যায় সেটা তাহারই ছায়ামাত্র।"

স্বর্ণময়ী কাশী দেখিতে পাইয়া, ঠাকুর কেমন করিয়া যে এখানে শৌচাদি করিবেন ইহা ভাবিয়া আকুল হইয়াছিলেন। পালকিতে করিয়া কাশীক্ষেত্রের বাহিরে অসীর ওপারে যাইয়া তিনি শৌচাদি সারিয়া

আসিতেন। পরে ঐ দর্শনের বিরাম ঘটিলে ঐজন্য তিনি আর অত দূরে যাইতেন না।

মণিকর্ণিকা-তীর্থের পাশে কাশীর প্রধান শ্মশান। নৌকাযোগে মথুরবাবুরা যখন সেই ঘাটে স্নানাদি করিতে যাইতেছিলেন তখন দেখা গেল, শ্মশানভূমি চিতাধূমে ব্যাপ্ত হইয়াছে, শবদেহসমূহ দাহ হইতেছে। দেখিয়াই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ঠাকুর সহসা নৌকার বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন ও একেবারে নৌকার কিনারায় দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। এক অদ্ভুত জ্যোতি ও দিব্য হাস্যে তাঁহার মুখমণ্ডল সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি দেখিয়াছিলেন: "পিঙ্গলবর্ণ জটাধারী দীর্ঘাকার এক শ্বেতকায় পুরুষ গম্ভীর পাদবিক্ষেপে শ্মশানে প্রত্যেক চিতার পার্শ্বে আগমন করিতেছেন এবং প্রত্যেক দেহীকে সযত্নে উত্তোলন করিয়া তাহার কর্ণে তারক-ব্রহ্মমন্ত্র প্রদান করিতেছেন। সর্বশক্তিময়ী শ্রীশ্রীজগদম্বাও স্বয়ং মহাকালীরূপে জীবের অপর পার্শ্বে সেই চিতার উপর বসিয়া তাহার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ প্রভৃতি সকলপ্রকার সংস্কারবন্ধন খুলিয়া দিতেছেন এবং নির্বাণের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া স্বহস্তে তাহাকে অখণ্ডের ঘরে প্রেরণ করিতেছেন। এইরূপে বহুকল্পের যোগতপস্যায় যে অদ্বৈতানুভবের ভূমানন্দ জীবের আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা তাহাকে শ্রীবিশ্বনাথ সদ্য সদ্য প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিতেছেন।"

পুরাণে (কাশীখণ্ডে) আছে, কাশীতে মৃত্যু হইলে ৺বিশ্বনাথ জীবকে নির্বাণমুক্তি দান করেন। মণিকর্ণিকায় ঠাকুরের দিব্যদর্শন সেই নির্বাণ-দানের প্রক্রিয়াটি জানাইয়া দিয়া পুরাণকারের বর্ণনারই পূর্ণতাসাধন করিয়াছে।

কাশীতে ঠাকুর প্রায় প্রত্যহ পালকিতে করিয়া ৺বিশ্বনাথ-দর্শনে যাইতেন, যাইতে যাইতেই পথিমধ্যে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। হৃদয় সঙ্গে থাকিত। ৺কেদারনাথের মন্দিরে তাঁহার সমধিক ভাবাবেশ হইত।

এখানে তিনি পরমহংসাগ্রণী শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গস্বামীকে দর্শন করিতে যান। ত্রৈলঙ্গস্বামী তখন মৌনাবলম্বী হইয়া মণিকর্ণিকা-ঘাটে অবস্থান করিতেন।

প্রথম দর্শনের দিনই ঠাকুরের সম্মুখে নিজের নস্যদানি ধরিয়া ঠাকুরকে তিনি অভ্যর্থনা ও সম্মান-প্রদর্শন করেন। ঠাকুর তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন দেখাইয়া হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, এঁর দেহে যথার্থ পরমহংসের সকল লক্ষণই বর্তমান, ইনি সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর। ইসারা করিয়া ঠাকুর তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ঈশ্বর এক, না অনেক? ইসারা করিয়াই তিনি বুঝাইয়াছিলেন, সমাধিস্থ হইয়া দেখিলে এক, নতুবা অনেক। স্বামীজী তখন মণিকর্ণিকার পাশে একটি ঘাট বাঁধাইয়া দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, ঠাকুরের কথায় হৃদয় সেইস্থানে কয়েক কোদাল মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিয়াছিল। নিজের হাতে ঠাকুর একদিন তাঁহাকে পায়সান্ন খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন।

পাঁচসাত দিন কাশীতে থাকিবার পর ঠাকুর মথুরবাবুদের সহিত প্রয়াগে যাইয়া গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে স্নান ও ত্রিরাত্রি বাস করেন। সেখানে সকলেই মস্তক মুণ্ডন করিলেও ঠাকুর করেন নাই; বলিয়াছিলেন, 'আমার করবার আবশ্যক নাই।' প্রয়াগ হইতে কাশীতে ফিরিয়া ও একপক্ষ তথায় বাস করিয়া তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন।

কাশীতে ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরীর সহিত ঠাকুরের পুনরায় মিলন ঘটে। ব্রাহ্মণী সেখানে মোক্ষদা নামে একটি ভক্তিমতী রমণীর সহিত চৌষট্টি-যোগিনী পল্লীতে বাস করিতেছিলেন। কয়েকবার ব্রাহ্মণীর আবাসে গমন করিয়া ঠাকুর তাঁহার সকল মনোবেদনা দূর করেন ও সঙ্গে করিয়া তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনে লইয়া যান। ব্রাহ্মণীকে তিনি বৃন্দাবনেই থাকিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। সেখান হইতে তাঁহার প্রত্যাবর্তনের স্বল্পকাল পরেই ব্রাহ্মণী বৃন্দাবনের রজঃপ্রাপ্ত হন। ভক্তপ্রাণের কোন্ নিগূঢ় বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য ঠাকুর তাঁহাকে বিশ্বনাথের নির্বাণভূমি হইতে সরাইয়া শ্রীভগবানের লীলাভূমিতে লইয়া গিয়াছিলেন, কে বলিবে!

শ্রীভগবানের রাসলীলাস্থলী বলিয়া মথুরামণ্ডলের অন্তর্গত শ্রীবৃন্দাবনের মাহাত্ম্য সমধিক। বৃন্দাবনে আসিবার পথে মথুরায় নামিয়া ঠাকুর প্রথমে ধ্রুবঘাট প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন। ধ্রুবঘাটে তিনি ভাবচক্ষে

দেখিয়াছিলেন, বসুদেব যমুনা পার হইয়া যাইতেছেন কৃষ্ণকে কোলে করিয়া। বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর মন্দিরের নিকটে একটি বাড়ীতে—'চৈতন্য-ফৌজদার কুঞ্জে' ছিলেন।

বৃন্দাবনে তাঁহার ভাবাবেশ ও আচরণ সম্বন্ধে কতিপয় ঘটনা হৃদয়ের নিকট হইতে জানিয়া লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ জানাইয়া দিয়াছিলেন তৎকালে বৃন্দাবনবাসী তাঁহার প্রিয় গুরুভ্রাতা শ্রীপ্রেমানন্দকে, পত্র লিখিয়া (পৌষ, ১৩০২)। সেই পত্রের কিয়দংশ এইরূপ :

বৃন্দাবনে তিনি [ঠাকুর] সর্বদাই ভাবাবেশে থাকিতেন। এক পা-ও হাঁটিতে পারিতেন না, পাল্কী করিয়া লইয়া যাইতে হইত। পাল্কীর দ্বার খোলা থাকিত, তিনি দর্শন করিতে করিতে যাইতেন। যখন ভাবে অধীর হইয়া পাল্কী হইতে লাফাইয়া পড়িতে চাহিতেন তখন হৃদয় নিবারণ করিত। হৃদয় পাল্কীর বাড় ধরিয়া যাইত। তিনি ঐরূপ হৃদয়ের সহিত শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড দর্শনে যান।...পথে যাইতে যাইতে শ্বেত ময়ূরের পাল তিনি অগ্রে দর্শন করেন ও হৃদয়কে দেখান এবং ভাবে অধীর হইয়া পাল্কী হইতে লাফাইয়া পড়িতে চান। পরে হরিণের দল দেখিয়া তাঁহার খুব ভাবোদয় হয়। তিনি শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ড দর্শন করত তাহাদের সমীপবর্তী সমুদয় দেবালয়গুলি দর্শন করেন। মথুর প্রায় ১৫০ টাকার সিকি ও দুআনি বিতরণের জন্য হৃদয়ের হস্তে দিয়াছিল, তিনি সাধুবৈষ্ণব দেখিলেই হৃদয়কে কিছু কিছু দিতে বলিতেন। পরে গোবর্ধন দর্শনে যান। তথায় উলঙ্গ হইয়া একেবারে গিরিরাজের উপর উঠিয়া পড়েন। পাণ্ডারা ধরিয়া নামাইয়া আনে। তৎপরে নিধুবনে গঙ্গামাতার নিকট যান।...তাঁহার নিকট প্রায় ৬।৭ দিন ছিলেন।...

"শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ রাধাকুণ্ডের নিকটবর্তী চতুরাপাণ্ডা নামে একজনের নিকট ভেকগ্রহণ করিয়াছিলেন। [এই বৈষ্ণবীয় ভেক তিনি তিনদিন রক্ষা করেন।] বৃন্দাবন দর্শনের সময় তাঁহার হাতে সর্বদাই একটি কাঁচা কঞ্চির ছড়ি থাকিত। তাহা যদি হৃদয় কখন কখন কাড়িয়া লইত তিনি তাহাতে অতিশয় কাতর হইতেন এবং যতক্ষণ না ফিরিয়া পাইতেন ততক্ষণ

স্থির হইতেন না। এক পা-ও হাঁটিতে পারিতেন না—এমনকি পাল্কীর ভিতর বসিয়া যমুনায় স্নান করিতেন।”

বৃন্দাবনে কালীয়দমন ঘাট দেখিবামাত্র তাঁহার উদ্দীপন হইত, তিনি ভাবে বিহ্বল হইয়া যাইতেন। সেই ঘাটে হৃদয় তাঁহাকে ছোট ছেলেটির মত স্নান করাইত। বঙ্কুবিহারী-মূর্তি দর্শন করিয়া তাঁহার অদ্ভুত ভাবাবেশ হইয়াছিল ও আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন। সায়ংকালে রাখাল বালকেরা গরুর পাল লইয়া গোষ্ঠ হইতে ফিরিতেছে যমুনা পার হইয়া—এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তাহাদের ভিতর শিখিপুচ্ছ-ধারী গোপালকৃষ্ণের দর্শনলাভ করিয়া তিনি প্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন।

“ব্রজের প্রাকৃতিক শোভা, ফলফুলে শোভিত ক্ষুদ্র গিরি গোবর্ধন, মৃগ ও শিখিকুলের বনমধ্যে যথা তথা নিঃশঙ্ক বিচরণ, সাধু-তপস্বীদের নিরন্তর ঈশ্বরের চিন্তায় দিনযাপন এবং সরল ব্রজবাসীদের কপটতাশূন্য সশ্রদ্ধ ব্যবহার ঠাকুরের চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাহার উপর নিধুবনে সিদ্ধপ্রেমিকা বর্ষীয়সী তপস্বিনী গঙ্গামাতার দর্শন ও মধুর সঙ্গ লাভ করিয়া ঠাকুর এতই মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার মনে হইয়াছিল ব্রজ ছাড়িয়া তিনি আর কোথাও যাইবেন না; এখানেই জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়া দিবেন।”

গঙ্গামায়ী নিধুবনে, শ্রীশ্রীরাধারমণজীউর মন্দিরের নিকটে, এক কুটীরে থাকিতেন। লোকে তাঁহাকে শ্রীরাধার প্রধানা সঙ্গিনী ললিতাসখী মনে করিয়া শ্রদ্ধাভক্তি করিত। তাঁহার ভাব হইত ও বহুলোক তাহা দেখিতে আসিত। ভাবেতে একদিন তিনি হৃদয়ের কাঁধে চড়িয়া বসিয়াছিলেন।

ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে তিনি মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধার দর্শন পাইয়াছিলেন। শ্রীরাধাই শ্রীরামকৃষ্ণদেহে আসিয়াছেন জানিয়া গঙ্গামায়ী প্রথম দর্শনের সময় হইতেই তাঁহাকে ‘দুলালী’ বলিয়া সম্বোধন করিতে থাকেন। বহু তপস্যার ধন দুলালীকে পাইয়া কৃতকৃতার্থা গঙ্গামায়ী স্থির করিলেন, বাকি জীবন তাঁহারই সেবা করিয়া কাটাইয়া দিবেন, তাঁহাকে আর ছাড়িয়া দিবেন না।

সহাস্ত বদনে প্রভু গঙ্গামায়ে কন।
আতপ তণ্ডুল তুমি করহ ভোজন॥
সিদ্ধান্ন ভোজন মম মাছ তাহে খাই।
মাছ ছাড়া সব দিব কহে গঙ্গামাই॥
পেটের ব্যারাম বড় মাঝে মাঝে হয়।
কে বল করিবে মুক্ত, কহিল হৃদয়॥
গঙ্গামাতা বলে আমি নিকাইব হাতে।
দুলালীর জন্যে প্রাণ পারি ছেড়ে দিতে॥

গঙ্গামায়ীকে পাইলে ঠাকুরের খাওয়াদাওয়া, বাসায় ফিরা, সব ভুল হইয়া যাইত। হৃদয় একএক দিন বাসা হইতে খাবার আনিয়া খাওয়াইত, গঙ্গামায়ীও খাওয়াইতেন স্বহস্তে খাবার প্রস্তুত করিয়া। গঙ্গামায়ীকে ছাড়িয়া ঠাকুরও আর দেশে ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন না। সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া মথুরবাবু প্রমাদ গণিলেন।

বিপদে পড়িল বড় মথুর বিশ্বাস।
প্রভুর দেখিয়া ভাব পাইল তরাস॥

... ...

নাড়ী ছাড়া কায়া যেন করে হায় হায়।
কেন এনু তীর্থবাসে নারীর কথায়॥
স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী শাস্ত্রে কথা রটে।
বুঝিতে নারিনু এত বুদ্ধিবল ঘটে॥
তীর্থবাসে যার আশে আসে লোকজন।
ভবনে আছিল রেতে দিনে সেইধন॥
কুমতি হইল তাঁর তীর্থবাসে এনে।
বৃন্দাবনধন বুঝি যায় বৃন্দাবনে॥

... ...

হৃদয়েরে বলিলেন কহিবারে তাঁয়।
কেন অনর্থক দুঃখ দিবে বৃদ্ধা মায়॥
কত কাঁদিবেন তিনি শুনিলে বারতা।
কি কারণ ফিরিয়া না যাবে কলিকাতা।

যথাবৎ হৃদয় করিল নিবেদন।
শিহরিলা প্রভু শুনি মায়ের রোদন॥
শশব্যস্তে বলিলেন চল তবে যাব।
মার কাছে কলিকাতা হেথা নাহি রব॥

... ...

গঙ্গামাতা দেখিলেন প্রভু যান চলি।
কাঁদিতে লাগিলা বলি দুলালী দুলালী॥

... ...

কাঁদিতে কাঁদিতে মাই ধরিলেন হাতে।
প্রভু না পারেন আর এক পদ যেতে॥
যাত্রাকাল গত হবে এই অনুমানে।
অন্যহাতে ধরিয়া ভাগিনা হৃদু টানে॥
বিষম বিভ্রাটে প্রভু হারা-বুদ্ধিবল।
বালক-স্বভাব যেন রোদন সম্বল॥
পরাণ-দুলালী কাঁদে দেখি গঙ্গামাতা।
অন্তরে লাগিল তাঁর নিদারুণ ব্যথা।
অমনি ছাড়িয়া দিল ধরা হাত তাঁর।
হৃদয় লইয়া তাঁয়ে হৈল আগুসার।
তাড়াতাড়ি শ্রীমথুর লয়ে ভগবান।
পুনরায় কাশীধামে করিল পয়ান॥

ঠাকুর অন্যূন এক পক্ষ কাল শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন। একদিন তিনি শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মথুরবাবু এখানেও মুক্তহস্তে দান করিতেন; সপত্নীক দেবদর্শন করিতে গিয়া প্রত্যেক মন্দিরে কয়েকখানি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা প্রণামী দিয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে থাকিতে ঠাকুরের বীণা শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে কোন বীণ্‌কারের সন্ধান মিলে নাই। কাশীতে ফিরিয়া পুনরায় তাঁহার মনে ঐ ইচ্ছা জাগে ও হৃদয়ের সহিত মদনপুরা-পল্লীতে মহেশচন্দ্র সরকার নামে এক বীণ্‌কারের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বীণা শুনাইতে অনুরোধ করেন। বিকাল পাঁচটা হইতে তিন ঘণ্টা ধরিয়া মহেশ তাঁহাকে বীণা বাজাইয়া শুনাইয়াছিলেন। বীণার ঝঙ্কার শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন ও জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করেন, 'মা, আমাকে

হুঁশ দাও, আমি ভাল করে বীণা শুনব।' অতঃপর তিনি বাহ্যভূমিতে অবস্থান করিতে সমর্থ হন ও মহানন্দে বীণা শুনিতে শুনিতে একএক বার উহার সুরের সহিত নিজের স্বর মিলাইয়া গাহিতে থাকেন। মহেশবাবু তদবধি প্রত্যহ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিতেন। বীণা বাজাইতে বাজাইতে তিনি একেবারে মাতিয়া উঠিতেন, ঠাকুর বলিয়াছেন। যেমন দক্ষিণেশ্বরে, তেমনি কাশীতেও যে নানাভাবের সাধকেরা ঠাকুরের কাছে আসিতেন নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে তাহা জানা যায়। তান্ত্রিক সাধকেরা আমন্ত্রণ করিয়া একদিন তাঁহাকে নিজেদের চক্রানুষ্ঠানে লইয়া গিয়াছিল। সাধনায় তাহাদের আন্তরিকতা দেখিতে না পাইলে ঠাকুর অবশ্যই তাহাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন না, তথাপি তাহাদের কোন কোন কাজ তিনি সমর্থন করিতে পারেন নাই। ঠাকুরকে তাহারা চক্রেশ্বর করিয়া বসায় ও কারণ পান করিতে বলে। তিনি কারণ পান করিতে পারেন না শুনিয়া ভৈরব-ভৈরবীরা নিজেরা পান করে। কিন্তু পানান্তে জপধ্যানে না বসিয়া নৃত্য করিতে থাকে। ঠাকুরের ভয় হইতেছিল তাহারা গঙ্গায় না পড়িয়া যায়, কারণ চক্রটি হইয়াছিল গঙ্গার ধারে।

কাশীতে সোনার অন্নপূর্ণা-প্রতিমা দর্শন করিবার পরে, ১২৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করেন। মথুরবাবুর ইচ্ছা ছিল গয়াধামেও যাইবেন, কিন্তু ঠাকুর যাইতে পারিবেন না শুনিয়া তিনি সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। গয়ায় গেলে তাঁহার শরীর থাকিবে না, ঠাকুর বলিয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে ঠাকুর রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের পুণ্যরজ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন ; উহার কিয়দংশ পঞ্চবটীর চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়া ও অবশিষ্টাংশ নিজ সাধনকুটীর-মধ্যে স্বহস্তে প্রোথিত করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আজ থেকে এই স্থান বৃন্দাবনতুল্য মহাতীর্থ হল।' তারপরে মথুরবাবুর দ্বারা নানা স্থানের বৈষ্ণব গোস্বামী ও ভক্তগণকে নিমন্ত্রণ করাইয়া আনিয়া ঠাকুর পঞ্চবটীতে মহোৎসব করেন। মথুরবাবু গোস্বামিগণের প্রত্যেককে ষোল টাকা এবং ভক্তগণের প্রত্যেককে এক টাকা করিয়া দক্ষিণা দিয়াছিলেন।

হৃদয় ও অক্ষয়ের কথা ঃ ঠাকুরের নৌকাভ্রমণ

তীর্থ হইতে ফিরিবার স্বল্পকাল পরেই হৃদয়ের স্ত্রীবিয়োগ হয় ও উহাতে তাহার মনে একটা আপাত বৈরাগ্যের উদয় হয়। সমধিক নিষ্ঠার সহিত সে মা-কালীর পূজায় মনোনিবেশ করে এবং ঠাকুরের অনুকরণে কখন কখন কাপড় ও পৈতা খুলিয়া রাখিয়া ধ্যান করিতে থাকে। ঠাকুরকে সে ধরিয়া বসিল, তাঁহার ন্যায় আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সকল যাহাতে তাহারও হয় তাহা করিয়া দিতে হইবে। মামাকে সে ভালবাসিত, মামার আপ্রাণ সেবা সে করিয়াছে বছরের পর বছর ধরিয়া। সে বিশ্বাস করিত, মামা দিতে পারেন এমন বস্তু চাহিবামাত্র সে পাইবে; আর সে মনে করিল, এখনই তাহার সে চাহিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

নানা কথা বলিয়া বুঝাইয়া ঠাকুর তাহাকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইলেন। বলিলেন, তাহার অত সাধনভজন বা কঠোরতা করার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, তাঁহার সেবা করিলেই সকল অভিলষিত বস্তু—সেরা আধ্যাত্মিক অনুভূতি সময়ে সে লাভ করিবে, দুইজনেই ঈশ্বরীয় ভাবে বিভোর হইয়া থাকিলে কে কাহাকে দেখিবে, ইত্যাদি কথা। কিন্তু হৃদয় তাঁহার কোন কথায়ই কর্ণপাত করিল না। অগত্যা ঠাকুরকে বলিতে হইল, 'মার যা ইচ্ছা তাই হোক, আমার ইচ্ছায় কি কিছু হয় রে? মার ইচ্ছাতেই অদ্ভুত সব দর্শন, অদ্ভুত সব উপলব্ধি আমার হয়েচে; মার ইচ্ছা হয় যদি, তোরও হবে।'

ইহার কয়েকদিন পরেই হৃদয়ের জ্যোতির্ময় দেবমূর্তিসকলের দর্শন ও ভাব হইতে আরম্ভ করিল পূজা ও ধ্যান করিতে বসিয়া। 'হৃদুর আবার এ কী অবস্থা হল বাবা?' ঠাকুরকে মথুরবাবু প্রশ্ন করিলেন, হৃদয়কে একদিন ভাবাবিষ্ট হইতে দেখিয়া। 'হৃদু ঢং করে অমন করচে না, একটু আধটু দর্শনের জন্যে সে মাকে ব্যাকুল হয়ে ধরেছিল, তাই অমন হচ্চে। কিছুকাল পরে মা আবার তাকে ঠাণ্ডা করে দেবেন।' ঠাকুর কহিলেন। 'বাবা, এসব তোমারই খেলা, তুমিই হৃদুর ঐ অবস্থা

করেচ, তুমিই এখন তার মন ঠাণ্ডা করে দাও। আমরা দুজনে নন্দী ভৃঙ্গীর মত তোমার কাছে থাকব, সেবা করব, আমাদের ওসব অবস্থা কেন?'

একদিন রাত্রে ঠাকুর পঞ্চবটীর দিকে যাইতেছিলেন, আর হৃদয় তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছিল গাড়ু ও গামছা লইয়া। সহসা সে দেখিতে পাইল, ঠাকুর স্থূলদেহধারী মনুষ্য নহেন, পরন্তু জ্যোতির্ময় এক দেবতা; তাঁহার শ্রীঅঙ্গের স্নিগ্ধ দ্যুতি পঞ্চবটী আলোকিত করিয়াছে ও তাঁহার পা-দুইখানি মৃত্তিকা স্পর্শ না করিয়াই শূন্যে শূন্যে তাঁহাকে বহন করিতেছে। বারবার চক্ষু মার্জন করিয়াও সে উহাই দেখিল, অথচ বৃক্ষ, লতা, কুটির, গঙ্গা প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু সে আগের মতই দেখিতে পাইতেছিল। 'আমার নিজের মধ্যেই কোন পরিবর্তন ঘটে নাই তো?' নিজের মনে নিজেকেই সে প্রশ্ন করিল, আর নিজের দিকে চাহিতেই দেখিল, সেও জ্যোতির্ময়দেহী দেবানুচর! তাহার মনে হইল, সাক্ষাৎ দেবতার সঙ্গে থাকিয়া চিরকাল সে তাঁহার সেবা করিতেছে, সে ঐ দেবতারই অঙ্গের অংশবিশেষ, এবং তাঁহার সেবা করিবার জন্যই ভিন্ন শরীর ধারণ করিয়াছে। ঐরূপ দেখিয়া, ভাবিয়া ও বুঝিয়া সে আনন্দের প্লাবনে একেবারে আত্মহারা হইয়া গেল ও উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বারবার বলিতে লাগিল: 'ও রামকৃষ্ণ, ও রামকৃষ্ণ, আমরা তো মানুষ নই, আমরা এখানে কেন? চল দেশে দেশে যাই, জীব উদ্ধার করি। তুমি যা আমিও তাই!'

ঠাকুর বলিয়াছেন: তার চীৎকার শুনে বল্লুম, ওরে থাম্ থাম্, অমন বলচিস কেন? কী একটা হয়েচে ভেবে এখনি যে লোকজন সব ছুটে আসবে। কিন্তু সে কি তা শুনে! তখন তাড়াতাড়ি তার কাছে এসে তার বুকে হাত দিয়ে বল্লুম, দে মা শালাকে জড় করে দে।

ঠাকুর ঐকথা বলিতেই হৃদয়ের পূর্বোক্ত দর্শন ও তজ্জনিত আনন্দ অন্তর্হিত হইল। আত্মদর্শনের অনুরূপ অপার্থিব আনন্দ হইতে সহসা বিচ্যুত হইয়া তাহার মন বিষাদে ভরিয়া গেল ও সে কাঁদিতে কাঁদিতে

কহিল, মামা, তুমি কেন অমন করলে, কেন জড় হতে বল্লে? অমন দর্শন, অমন আনন্দ আমার আর হবে না!' ঠাকুর বলিলেন: আমি কি তোকে একেবারে জড় হতে বলেচি? তুই এখন স্থির হয়ে থাক্—এই কথা বলেচি। সামান্য দর্শন পেয়ে তুই যে গোল করলি, তাতেই তো আমাকে ও কথা বলতে হল। আমি যে চব্বিশ ঘণ্টা কত কী দেখি, আমি কি অমন গোল করি? তোর এখনো ওসব দর্শন করবার সময় হয় নি, এখন স্থির হয়ে থাক্, সময় হলে আবার কত কী দেখবি।

ঠাকুরের কথায় নীরব হইলেও হৃদয় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইল ও অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া সংকল্প করিল, যেমন করিয়াই হউক সে পূর্বোক্তরূপ দর্শন পুনরায় লাভ করিবে। একদিন গভীর রাত্রে পঞ্চবটীতে গিয়া সে ঠাকুরের আসনে ধ্যান করিতে বসিল। সেই সময়ে পঞ্চবটীর দিকে যাইতে যাইতে ঠাকুর শুনিতে পাইলেন, হৃদয় কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, 'মামা গো, পুড়ে মলুম, পুড়ে মলুম!' দ্রুতপদে তাহার নিকটবর্তী হইয়া ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, কী রে, কী হয়েচে? সে কহিল, মামা, এখানে ধ্যান করতে বসতেই কে যেন এক মালসা আগুন গায়ে ঢেলে দিলে, অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা হচ্চে। 'যা, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে; তুই কেন অমন করিস বল্ দেখি, তোকে বলেচি আমার সেবা করলেই তোর সব হবে।' এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর তাহার অঙ্গে শীতল করপদ্ম বুলাইয়া দিলেন ও তখনই তাহার দাহযন্ত্রণার উপশম হইল। তাহার বিশ্বাস হইল, ঠাকুরের কথা অমান্য করিলে তাহার ভাল হইবে না।

ঠাকুরের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া হৃদয় অনেকটা শান্তিলাভ করিল বটে, কিন্তু মন্দিরের নিত্যকর্মে তাহার মন বসিতেছিল না। সে নিজ বাটীতে ৺দুর্গাপূজা করিতে মনস্থ করিল। ঠাকুর তাহাতে সম্মতি দিলেন; মথুরবাবুও অর্থসাহায্য করিলেন, কিন্তু ঠাকুরকে তিনি ঐ সময়ে ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন না। প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময়ে ঠাকুরকে তিনি কলিকাতায় নিজবাটীতে লইয়া যাইতেন। হৃদয়কে ক্ষুণ্ণ হইতে দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন: তুই দুঃখ করচিস কেন? আমি নিত্য-সূক্ষ্মশরীরে

তোর পূজা দেখতে যাব; আমাকে আর কেউ দেখতে পাবে না, কিন্তু তুই পাবি। একজন ব্রাহ্মণকে তন্ত্রধারক রেখে তুই নিজের ভাবে পূজা করিস, আর নির্জলা উপোস না করে মধ্যাহ্নে দুধ, গঙ্গাজল, মিছরির পানা খাস। এভাবে পূজা করলে মা তোর পূজা নিশ্চয় গ্রহণ করবেন।

কাহার দ্বারা প্রতিমা গড়াইতে হইবে, কাহাকে তন্ত্রধারক করিতে হইবে, কিভাবে অন্যান্য কাজগুলি করিতে হইবে, সকল কথাই তন্ন তন্ন করিয়া ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন; বাটীতে আসিয়া হৃদয়ও তাঁহার কথামত কার্য করিয়াছিল। পূজার তিনদিন রাত্রে নীরাজন করিবার কালে, এবং সন্ধিপূজার সময়ে, সে দেখিয়াছিল, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া জ্যোতির্ময়দেহে দেবীপ্রতিমার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন! পরে হৃদয়ের মুখে সেকথা শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন: আরতির আর সন্ধিপূজার সময় তোর পূজা দেখবার জন্যে প্রাণ ব্যাকুল হত, তখন অনুভব করতুম যেন জ্যোতির শরীরে জ্যোতির পথ দিয়ে তোর চণ্ডীমণ্ডপে চলে গিয়েচি।

ঠাকুরের কথামত হৃদয় ১২৭৫ সাল হইতে পরপর তিন বৎসর নিজ বাটীতে দুর্গাপূজা-মহোৎসব করিয়াছিল। প্রথমবারের পূজার কিছুকাল পরেই সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করে, এবং দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া মা-কালীর পূজায় ও ঠাকুরের সেবায় ব্রতী হয়।

ঠাকুর তাঁহার মাতৃহীন ভাইপো অক্ষয়কে তাহার তিনচারি বৎসর বয়স পর্যন্ত কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। পিতা রামকুমার কখনও তাহাকে কোলে করেন নাই; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, মায়া বাড়িয়ে কাজ নাই, এ ছেলে বাঁচবে না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে অক্ষয় অত্যন্ত প্রিয়দর্শন হইয়া উঠে। তাহার দেহের বর্ণ যেমন উজ্জ্বল ছিল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ছিল তেমনি সুঠাম ও সুললিত; দেখিলে জীবন্ত শিবমূর্তি বলিয়া মনে হইত।

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অক্ষয়ের বিশেষ অনুরাগ ছিল, উপনয়নের পর হইতেই কুলদেবতা ৺রঘুবীরের সেবায় সে অনেক কাল কাটাইত। সতর বৎসর বয়সে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া সে শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউর সেবায় ব্রতী হয়। পূজা করিতে বসিয়া সে ধ্যানে এমনই তন্ময় হইয়া যাইত যে,

দুইঘণ্টা কাল তাহার বাহিরের হুঁশ থাকিত না। মন্দিরের নিত্যপূজা সারিয়া পঞ্চবটীতে আসিয়া সে অনেকক্ষণ ধরিয়া শিবপূজা করিত। তারপরে স্বপাকে আহার করিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত-পাঠে নিবিষ্ট হইত। নবানুরাগের প্রেরণায় সে এত বেশী প্রাণায়াম করিত যে, তাহার কণ্ঠতালু-দেশ স্ফীত হইয়া কখন কখন রুধির নির্গত হইত। স্বভাবমাধুর্যে সে ঠাকুরের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

অক্ষয়ের বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিয়া খুল্লতাত রামেশ্বর দক্ষিণেশ্বর হইতে তাহাকে বাড়ীতে লইয়া যান ও ১২৭৬ সালের বৈশাখ মাসে তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের কয়েক মাস পরে শ্বশুরঘরে গিয়া সে কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছে শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, হৃদু, লক্ষণ বড় খারাপ, এক রাক্ষসগণ মেয়ের সাথে বিয়ে হয়েচে, ছোঁড়া মারা যাবে দেখচি। চিকিৎসা দ্বারা নিরাময় করাইয়া রামেশ্বর ভাইপোকে দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া দিলেন। এখানে আসিয়া তাহার চেহারা ফিরিল, স্বাস্থ্যেরও বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইল, এমন সময়ে সহসা একদিন তাহার জ্বর হইল।

তিনচারি দিনেও জ্বরের বিরাম না হওয়ায় ঠাকুর বলিলেন, হৃদু, ডাক্তাররা বুঝতে পারচে না, অক্ষয়ের বিকার হয়েচে, ভাল বৈদ্যি আনিয়ে আশ মিটিয়ে চিকিৎসা কর্, ছোঁড়া কিন্তু বাঁচবে না। 'ছি ছি মামা, তোমার মুখ দিয়ে অমন কথা কেন বেরুল?' হৃদয় কহিল। 'আমি কি ইচ্ছা করে ওকথা বলেচি? মা যেমন জানান, ইচ্ছা না থাকলেও আমাকে তেমনি বলতে হয়; আমার কি ইচ্ছা অক্ষয় মারা পড়ে?' ঠাকুরের কথায় হৃদয় বিশেষ উদ্বিগ্ন হইল। সুচিকিৎসা সত্ত্বেও রোগীর অবস্থা দিন-দিন খারাপ হইতে লাগিল। এইরূপে প্রায় একমাস গত হইলে, অক্ষয়ের অন্তিম কাল আসন্ন দেখিয়া ঠাকুর তাহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বলিলেন : অক্ষয়, বল—'গঙ্গা নারায়ণ ওঁ রাম!' তিনবার ঠাকুরের শ্রীমুখোচ্চারিত ঐ মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া সে দেহত্যাগ করিল। অক্ষয়ের মৃত্যু হইলে হৃদয় যত কাঁদিতে লাগিল, ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর তত হাসিতে লাগিলেন!

জনৈক প্রবীণ ভক্তের পুত্রশোক-প্রসঙ্গে ঠাকুর পরবর্তী কালে বলিয়াছিলেন ঃ অক্ষয় ম'ল—তখন কিছু হল না। কেমন করে মানুষ মরে, বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। দেখলুম—যেন খাপের ভিতর তলোয়ারখানা ছিল, সেটাকে খাপ থেকে বার করে নিলে। তলোয়ারের কিছু হল না, যেমন তেমনি থাকল, খাপটা পড়ে রইল! দেখে খুব আনন্দ হল—খুব হাসলুম, গান করলুম, নাচলুম! তার শরীরটাকে তো পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে এল। তার পরদিন (ঘরের পূবদিকে, কালীবাড়ীর উঠানের সম্মুখের বারান্দা দেখাইয়া) ঐখানে দাঁড়িয়ে আছি, আর দেখচি কী, যেন প্রাণের ভিতরটায় গামছা যেমন নিংড়ায় তেমনি নিংড়াচ্ছে, অক্ষয়ের জন্যে প্রাণটা এমনি কচ্চে! ভাবলুম, মা, এখানে পরণের কাপড়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ নাই, তা ভাইপোর সঙ্গে তো কতই ছিল! এখানেই যখন এরকম হচ্চে তখন গৃহীদের শোকে কী না হয়, তাই দেখাচ্চিস বটে!

পুত্রসদৃশ অক্ষয়ের মৃত্যুতে ঠাকুর প্রাণে বিষম আঘাত পাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। যে ঘরে অক্ষয়ের মৃত্যু হয় কুঠিবাড়ীর সেই ঘরে তিনি পরে আর যাইতেন না।[১]

অক্ষয়ের মৃত্যুর সাত বছর পরেও, তাহার জন্য ঠাকুরকে কাঁদিতে দেখিয়াছিলেন তাঁহার ভাইঝি লক্ষ্মী কামারপুকুরে। তিনি বলিয়াছেন ঃ ঠাকুর অক্ষয়ের জন্যে হুহু করে কাঁদতেন; অক্ষয়ের মা (ভিক্ষে-মা) আসচে শুনে মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতেন, পাছে তাকে দেখে আবার কেঁদে ফেলেন!

অক্ষয়ের মৃত্যুর পরে ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ রামেশ্বর বিষ্ণুঘরে পূজকের পদ গ্রহণ করেন। সংসারের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য মাঝে মাঝে তাঁহাকে

---

১ দক্ষিণেশ্বরবাসের প্রথমদিকে ঠাকুর কুঠিবাড়ীতে থাকিতেন। জমির সহিত ঐ বাড়ী হেষ্টি নামক এক ইংরাজ এটর্ণীর নিকট হইতে ক্রয় করা হইয়াছিল। কিছুকাল পরে বাড়ীটি চুনকাম করার প্রয়োজন হইলে ঠাকুর কালীবাটীর উত্তর-পশ্চিমের ঘরে চলিয়া আসেন। ঘরটি তখন বিষ্ণুমন্দিরের ভাঁড়াররূপে ব্যবহৃত হইত। তিনি ঐ ঘরে বরাবর থাকিতে ইচ্ছা করিলে মথুরবাবু ভাঁড়ার স্থানান্তরিত করেন।

কামারপুকুরে যাইতে হইত, সেই সময়ে তাঁহার খুড়তুতো ভাই কালিদাসের পুত্র দীননাথ তাঁহার স্থলবর্তী হইয়া পূজাদি করিত।

ঠাকুরের মন হইতে অক্ষয়ের বিয়োগজনিত অভাববোধ অপসারিত করিবার জন্যই বোধ হয় তাঁহাকে সঙ্গে নিয়া মথুরবাবু নৌকাভ্রমণে বহির্গত হন। ঠাকুরকে তিনি রানাঘাটের নিকটবর্তী নিজের জমিদারি-মহলে, সোনাবেড়ে নামক গ্রামে নিজের পৈত্রিক ভিটায় এবং তালামাগ্‌রো গ্রামে নিজ গুরুগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। গুরুবংশীয়দের মধ্যে তখন বিবাদ চলিতেছিল ও সেই বিবাদ মিটাইবার জন্য মথুরবাবু আহূত হইয়াছিলেন।

তাঁহারা যখন চূর্ণীর খালে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন সেই সময়ে কলাইঘাট নামক স্থানের অধিবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা দেখিয়া ঠাকুর ব্যথিত হন। গ্রামটি মথুরবাবুর জমিদারিভুক্ত ছিল, ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মথুর তাহাদের প্রত্যেককে একমাথা তেল, একখানি নূতন কাপড় ও একদিনের পূরা ভোজন দান করেন।

সোনাবেড়ে হইতে তালামাগ্‌রো যাইতে পালকি ও হাতীর ব্যবস্থা করা হয়। বন্ধুর পথে হস্তিপৃষ্ঠে গমন সুখকর হইবে না বলিয়া ঠাকুরকে মথুর পালকিতে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন ও গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার পরে, কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য, কখন কখন তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়াছিলেন। মথুরের গুরুপুত্রগণের সযত্ন সেবায় কয়েক সপ্তাহ কাটাইয়া ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসেন।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার কয়েকদিন পরেই হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া ঠাকুর কলিকাতাস্থ কলুটোলার হরিসভায় গমন করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত-পাঠ শুনিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উদ্দেশে রচিত আসনের পাশে বসিয়া পাঠক ভক্তিভাবে পাঠ করিতেছিলেন, তাঁহাকেই শুনাইতেছেন মনে করিয়া; শ্রোতারাও সেই পাঠ শুনিতেছিলেন তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া। শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন ও সহসা ছুটিয়া গিয়া চৈতন্যাসনের উপর দাঁড়াইয়াই গভীর সমাধিতে ডুবিয়া

গেলেন। তাঁহার জ্যোতির্ময় মুখে তখন এক অদৃষ্টপূর্ব প্রেমপূর্ণ হাসি, আর ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হস্তে অঙ্গুলিনির্দেশ—যেমন শ্রীগৌরাঙ্গের পটে দেখা যায়।

পাঠক পাঠ ভুলিয়া গেলেন। বিশিষ্ট ভক্তেরা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকেই দর্শন করিতেছি ভাবিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন, আর সাধারণ লোকেরা বিশেষ কিছু বুঝিতে না পারিলেও এক অব্যক্ত ভয়বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। ঠাকুরের ভাবতরঙ্গের অভিঘাতে তাঁহাদের সকলেরই মন তখন ঊর্ধ্বমুখী হইয়াছে ও সেই মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। উহারই প্রেরণায় উচ্চরবে হরিধ্বনি করিয়া সকলে মিলিয়া নামকীর্তন করিতে লাগিলেন। নাম শুনিতে শুনিতে ঠাকুরের অর্ধবাহ্যদশা উপস্থিত হইল; তিনি কীর্তনের দলে মিশিয়া উদ্দাম নৃত্য করিতে লাগিলেন। কীর্তনীয়াদের উৎসাহ ও মত্ততা তাহাতে শতগুণ বাড়িয়া গেল। ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই সেই আনন্দ উপভোগ করিলেন—বুঝি বা গোলোকের ছবি ধরায় প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলেন।

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসিলেন। যে দিব্য ভাবপ্রবাহ সকলের মনকে উচ্চে তুলিয়া ধরিয়াছিল, ক্রমে তাহাতে ভাটা পড়িল। স্বভাবনিয়মে উত্তেজনার পরেই আসিল অবসাদ। সেই অবসাদের মুহূর্তে হরিসভার সভ্যেরা ঠাকুরের চৈতন্যাসন অধিকার করা উচিত হইয়াছে কি-না, বিচার করিতে বসিলেন। অনেক বাদানুবাদে ও কোন মীমাংসাই হইল না—একদল তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন, অন্যদল করিলেন না। কথা কানে হাটে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সর্বত্র উহা প্রচারিত হইয়া পড়িল, কালনার ভগবানদাস বাবাজীও শুনিলেন। শুনিয়া তিনি ক্রোধান্ধ হইলেন, অজ্ঞাতপরিচয় ঠাকুরের উদ্দেশে নানা কটুকথা কহিলেন, এমনকি তাঁহাকে ভণ্ড বলিয়াও নির্দেশ করিলেন।

এই ঘটনার অনতিকাল পরে ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন করিতে অভিলাষী হন ও মথুরবাবু তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া, কালনা হইয়া, নবদ্বীপ গমন করেন। প্রত্যূষে নৌকা কালনার ঘাটে আসিয়া লাগিতেই মথুর

বাসস্থান ও আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে ব্যস্ত হইলেন, আর হৃদয়কে সঙ্গে করিয়া ঠাকুর শহর দেখিতে বাহির হইলেন। ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রমের নিকটে আসিয়া ঠাকুর হৃদয়কে কহিলেন, তুই আগে আগে যা। তারপরে নিজের আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকিয়া তিনি হৃদয়ের পেছনে পেছনে যাইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

বাবাজীর আসরে সেই সময়ে কোন বৈষ্ণব সাধুর গর্হিত আচরণের কথা হইতেছিল, আর বাবাজী তাহার কণ্ঠী কাড়িয়া লইয়া তাহাকে সম্প্রদায় হইতে তাড়াইয়া দিবেন বলিতেছিলেন। সেকথা শুনিতে শুনিতে আসিয়া বাবাজীকে প্রণাম করিয়া ঠাকুর দীনহীনভাবে একপাশে বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় প্রণাম করিয়া বলিল : আমার মামা ঈশ্বরের নামে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েন—অনেকদিন থেকেই এই অবস্থা—আপনাকে দর্শন করতে এসেচেন। এই কথাগুলি বলিবার পূর্বেই বাবাজীর সাধনসম্ভূত একটি শক্তির পরিচয় হৃদয় পাইয়াছিল ; সে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছিল : আশ্রমে যেন কোন মহাপুরুষের আগমন হয়েচে বোধ হচ্চে।

কথার ফাঁকে বাবাজীকে মালা ফিরাইতে দেখিয়া হৃদয় প্রশ্ন করিল : আপনি তো সিদ্ধ হয়েচেন, আপনি এখনো মালা রেখেচেন কেন ? উত্তরে বাবাজী প্রথমে দীনতা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাহার পরেই কহিলেন : নিজের প্রয়োজন না থাকলেও লোকশিক্ষার জন্যে এসব রাখা দরকার, নতুবা আমার দেখাদেখি লোক ভ্রষ্টাচার হবে।

ভগবানদাসের মুখে বারবার অহঙ্কারসূচক কথা শুনিয়া সরলস্বভাব ঠাকুর মনের বিরক্তি আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাবাজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন : কী ? তুমি এখনো এত অহঙ্কার রাখ ? তুমি লোকশিক্ষা দিবে ? তুমি তাড়াবে ? তুমি লোকশিক্ষা দিবার কে ? যাঁর জগৎ তিনি না শিখালে তুমি শিখাবে ? বলিতে বলিতে ঠাকুর একেবারে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। সেই আপাদমস্তক আবরণ তখন আর নাই, কটির বসনও খসিয়া পড়িয়াছে।

তিনি একেবারে দিগম্বর, আর তাঁহার মুখমণ্ডল এক অপূর্ব দিব্য তেজে ভাস্বর।

সেই ভাবোজ্জ্বল দিব্য দেহে সিদ্ধ বাবাজী কী দেখিতে পাইলেন কে জানে! ঠাকুরের শক্তিপূর্ণ কথায় তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি আরও খুলিয়া গেল, তিনি বিনীত ও নম্র হইলেন। তারপরে বাবাজী যখন শুনিলেন, ইনিই দক্ষিণেশ্বরের সেই পরমহংস যিনি কলুটোলার হরিসভায় চৈতন্যাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ক্ষোভ ও পরিতাপের সীমা রহিল না। অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তিনি পুনঃপুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

মথুরবাবুর কাছে ফিরিয়া ঠাকুর বাবাজীর উচ্চাবস্থার অনেক প্রশংসা করিলেন। মথুরও বাবাজীকে দর্শন করিতে গেলেন, এবং আশ্রমস্থ বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউর সেবা ও একদিনের মহোৎসবের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

ঠাকুরের ভক্তগণের মধ্যে এমন কেহ কেহ ছিলেন যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্বে সন্দেহ করিতেন। তাঁহাদের সন্দেহের কথা শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন:

আমারও তখন তখন ঐরকম মনে হত রে, ভাবতুম পুরাণ ভাগবত কোথাও কোন নামগন্ধ নাই—চৈতন্য আবার অবতার! নেড়ানেড়ীরা টেনেবুনে একটা বানিয়েচে আর কী! কিছুতেই ওকথা বিশ্বাস হত না। মথুরের সঙ্গে নবদ্বীপ গেলুম। ভাবলুম, যদি অবতারই হয় তো সেখানে কিছু না কিছু প্রকাশ থাকবে, দেখলে বুঝতে পারব। একটু প্রকাশ দেখবার জন্যে এখানে ওখানে, বড় গোসাঁইয়ের বাড়ী ছোট গোসাঁইয়ের বাড়ী ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখে বেড়ালুম—কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। সব জায়গাতেই একএক কাঠের মরদ হাত তুলে খাড়া হয়ে রয়েচে দেখলুম। দেখে প্রাণটা খারাপ হয়ে গেল, ভাবলুম কেনই বা এখানে এলুম। তারপর ফিরে আসব বলে নৌকায় উঠচি এমন সময় দেখতে পেলুম। অদ্ভুত দর্শন! দুটি সুন্দর ছেলে—এমন রূপ কখন দেখিনি, তপ্ত

কাঞ্চনের মত রং, কিশোর বয়স, মাথায় একটা করে জ্যোতির মণ্ডল—হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে আকাশপথ দিয়ে ছুটে আসচে। অমনি 'ঐ এলো রে, এলো রে' বলে চেঁচিয়ে উঠলুম। ঐ কথাগুলি বলতে না বলতে তারা নিকটে এসে (নিজের শরীর দেখাইয়া) এর ভিতর ঢুকে গেল, আর বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলুম। জলেই পড়তুম, হৃদু নিকটে ছিল, ধরে ফেল্লে। এই রকম এই রকম ঢের সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে—বাস্তবিকই অবতার—ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ।

বদ্ধ জীবের মুক্তির উপায় করিবার জন্য জীবের অপূর্ণতা নিজেতে আরোপ করিয়া অবতারপুরুষ যেমন সাধনভজন করেন, তেমনি সন্দেহাকুল জীবের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য সেই সন্দেহ নিজেতে আরোপ করিয়া তিনি পুনরায় উহার নিরসন করেন। 'জৈব ভাবে আচরণ জীবের উদ্ধারে।'

গঙ্গাগর্ভে পূর্বোক্তরূপ দিব্যদর্শনের কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাস্থল পুরাতন নবদ্বীপ গঙ্গাগর্ভে লীন হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বরূপ-কথনে গৌরীকান্ত ও বৈষ্ণবচরণ

শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহারা উহা জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন ঠাকুর তাঁহাদিগকে দেখিতে চাহিতেন ও সম্ভব হইলে নিজেই গিয়া দেখিয়া আসিতেন। বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতী ইন্দাসের ভট্টাচার্য গৌরীকান্ত তর্কভূষণের পাণ্ডিত্য ও সাধনলব্ধ শক্তির কথা তিনি শুনিয়াছিলেন। মথুরবাবুর নিমন্ত্রণপত্র লইয়া হৃদয়ের মধ্যমাগ্রজ রামরতন ইন্দাসে যান ও খুব সম্ভবতঃ ১২৭৭ সালের শেষাশেষি গৌরী পণ্ডিত দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন করেন।

শাস্ত্রীয় বিচারে আহূত হইয়া যে বাটীতে গৌরী যাইতেন সেই বাটীতে, ও যে সভায় বিচার হইবে সেই সভায়, প্রবেশ করিবার কালে গম্ভীরস্বরে উচ্চরবে কয়েকবার 'হা রে রে রে নিরালম্ব-লম্বোদর-জননি কং যামি শরণম্' দেবীস্তোত্রের ঐ একপাদ উচ্চারণ করিতেন। ঐ শব্দে তাঁহার ভিতরের শক্তি সম্যক্ জাগরিত হইত, আর একটা অব্যক্ত ভয়ে ভীত হইয়া প্রতিপক্ষ বলহীন হইয়া পড়িত। তারপরে পালোয়ানদের মত বাহুতে তাল ঠুকিতে ঠুকিতে সভাস্থলে প্রবেশ করিয়া ও বজ্রাসনে বসিয়া তিনি তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। কেহই তখন তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিত না।

গৌরী পণ্ডিতের ঐ বিশেষ শক্তির কথা ঠাকুর আগে জানিতেন না। কিন্তু কালীবাটীর ফটকে আসিয়া গৌরী যেই 'হা রে রে রে' শব্দ করিলেন অমনি ঠাকুরের ভিতর কে যেন ঠেলিয়া উঠিয়া তাঁহাকে উচ্চতর রবে ঐ শব্দ করাইতে লাগিল। দুইজনের এই চীৎকার-প্রতিযোগিতা কিছুক্ষণ ধরিয়া চলিল। ঠাকুরের অপেক্ষা উচ্চতর চীৎকার করিতে না পারিয়া গৌরী নিরস্ত হইলেন ও যেন একটু বিষাদিতমনে ধীরপদে বাটীতে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুর বলিতেন: তারপরে মা জানিয়ে দিলেন, গৌরীর আর ঐ সিদ্ধাই থাকল না; মা তার কল্যাণের জন্যে তার শক্তিটা (নিজেকে দেখাইয়া) এর ভিতর টেনে নিলেন।

বারবার দুই পক্ষের 'হা রে রে রে' রবে ডাকাত পড়ার মত ভীষণ আওয়াজ হইতে থাকায় সকলেই ভয়ে অস্থির হইয়াছিল। দারোয়ানরা লাঠিসোঁটা নিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ঠাকুর ও নবাগত পণ্ডিতজীই ঐ কাণ্ড করিতেছিলেন জানিয়া হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

গৌরী পণ্ডিতের দক্ষিণেশ্বরে আসার কয়েকদিন পরেই মথুরবাবু আবার একটি ধর্মসভার আয়োজন করেন। উহার উদ্দেশ্য, ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অবস্থাটি নবাগত পণ্ডিতজীর সঙ্গে আলোচনা ও শাস্ত্রপ্রমাণে নির্ধারণ করা; সভা আহূত হইয়াছিল মা-ভবতারিণীর নাটমন্দিরে, প্রাতঃকালে। কলিকাতা হইতে বৈষ্ণবচরণের আসিবার কথা, তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ঠাকুর গৌরীকে সঙ্গে নিয়া আগেই জগন্মাতার মন্দিরে আসিলেন। মাকে দর্শনপ্রণামাদি করিয়া ভাবে টলমল করিতে করিতে তিনি মন্দির হইতে বাহির হইলেন, এবং সম্মুখে বৈষ্ণবচরণ ভূলুণ্ঠিত হইয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন দেখিয়াই তাঁহার স্কন্ধদেশে বসিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। দিব্যস্পর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, তখনি সংস্কৃত ভাষায় শ্লোকাবলী রচনা করিয়া বৈষ্ণবচরণ উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে ঠাকুরকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে ঠাকুরের সমাধি-ভঙ্গ হইল ও সকলে ধীরে ধীরে তাঁহার সহিত সভাস্থলে গিয়া বসিলেন।

গৌরী প্রথমেই বলিয়া উঠিলেন: (ঠাকুরকে দেখাইয়া) উনি যখন পণ্ডিতজীকে এরূপ কৃপা করলেন, তখন আজ আর আমি ওঁর (বৈষ্ণবচরণের) সঙ্গে তর্ক-বিচার করব না; করলেও আমাকে নিশ্চয় পরাজিত হতে হবে, কারণ উনি আজ দৈববলে বলীয়ান। তা ছাড়া, উনি তো দেখচি আমারই মতের লোক—ঠাকুরের সম্বন্ধে ওঁর যা ধারণা, আমারও তাই; এস্থলে তর্ক নিষ্প্রয়োজন।

অতঃপর শাস্ত্রীয় সদালাপে কিছুক্ষণ কাটাইয়া সভাভঙ্গ হইল।

গৌরীর মন পরীক্ষা করিবার জন্য ঠাকুর একদিন তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন: আচ্ছা, বৈষ্ণবচরণ (নিজের শরীর দেখাইয়া) একে অবতার বলে, এটা কি হতে পারে? তোমার কী বোধ হয়? গৌরী

গম্ভীরভাবে উত্তর দেন : বৈষ্ণবচরণ আপনাকে অবতার বলে ? তবে তো ছোটকথা বলে। আমার ধারণা, যাঁর অংশে অবতাররা অবতীর্ণ হন যুগে যুগে, লোককল্যাণ করবার জন্তে, আর যাঁর শক্তিতে তাঁরা কাজ করেন, আপনি সেই! 'ও বাবা! তুমি যে তাকেও ছাড়িয়ে যাও! কেন বল দেখি ? আমাতে কী দেখেচ, বল দেখি ?' 'শাস্ত্রপ্রমাণে আর নিজের প্রাণের অনুভব থেকে বলচি। এ বিষয়ে যদি কেউ বিরুদ্ধপক্ষ নিয়ে আমার সাথে বিচার করতে আসে, তা হলে আমি আমার ধারণা প্রমাণ করতেও প্রস্তুত আছি।' 'তোমরা সব এত কথা বল, কিন্তু কে জানে বাবু, আমি তো কিছু জানি না!' 'ঠিক কথা। শাস্ত্র বলেন, আপনিও আপনাকে জানেন না। অন্তে আর কী করে আপনাকে জানবে বলুন ? কৃপা করে যদি কাউকে জানান তবেই সে জানতে পারে।'

গৌরী চলিয়া গেলেন ইন্দাসে, নিজের ঘরে ; কিন্তু ঘর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। ঠাকুরের দিব্য সঙ্গের সুখস্মৃতি অহরহ চিত্তে জাগরূক থাকিয়া অগৌণে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিল দক্ষিণেশ্বরে।

"দিনদিন গৌরী ঠাকুরের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনের ফল এতদিনে ঠাকুরের দিব্যসঙ্গে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া সংসারে তীব্র বৈরাগ্যরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। দিনদিন তাঁহার মন পাণ্ডিত্য, লোকমান্য, সিদ্ধাই প্রভৃতি সকল বস্তুর প্রতি বীতরাগ হইয়া ঈশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে গুটাইয়া আসিতে লাগিল। এখন আর গৌরীর সে পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার নাই, সে দাম্ভিকতা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, সে তর্কপ্রিয়তা এককালে নীরব হইয়াছে।"

ঠাকুরের সুখসঙ্গে ও সাধনায় দক্ষিণেশ্বরে গৌরীর দিনগুলি ভরিয়া উঠিতেছিল এক অপার্থিব শান্তির অনুভবে। কিন্তু স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গ তাঁহার সে শান্তি বিঘ্নিত করিতে লাগিল উপর্যুপরি পত্র লিখিয়া। অনেকদিন তিনি বাটী হইতে অন্তরে আছেন। আবার এক উন্মত্ত সাধুর পাল্লায় পড়িয়া কেমন নাকি হইয়া গিয়াছেন, লোকমুখে তাহারা শুনিয়াছিল। শীঘ্রই তাহারা দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসিবে হয়তো, তাঁহাকে সংসারে

ফিরাইয়া নিবার সংকল্প করিয়া। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি আত্মরক্ষার উপায় স্থির করিলেন ও এক শুভ মুহূর্তে ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রণত হইয়া সাশ্রুনয়নে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। 'সে কী গৌরী, সহসা বিদায় কেন? কোথায় যাবে?' ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন। 'আশীর্বাদ করুন যেন অভীষ্ট সিদ্ধ হয়; ঈশ্বরবস্তু লাভ না করে আর সংসারে ফিরব না।' করজোড়ে গৌরী নিবেদন করিলেন। তদবধি আত্মীয়দের কেহই আর গৌরী পণ্ডিতের দেখা পায় নাই, বহু অনুসন্ধান করিয়াও।

লীলাপ্রসঙ্গকার গৌরী পণ্ডিতের সাধকজীবনের নিম্নোক্ত ঘটনা দুইটি ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন।

প্রতিবৎসর ৺দুর্গাপূজার সময় গৌরী দেবীপূজার সমুদয় আয়োজন করিতেন ও নববস্ত্রপরিহিতা সালঙ্কারা নিজের গৃহিণীকে আলপনা-দেওয়া পিঁড়িতে বসাইয়া, তাঁহাকেই সাক্ষাৎ ভগবতী জ্ঞান করিয়া ভক্তিভাবে তিন দিন পূজা করিতেন।

নিত্যপূজান্তে গৌরী মাঝে মাঝে হোম করিতেন। বাঁ হাত শূন্যে প্রসারিত করিয়া তিনি ঐ হাতের উপরেই একসঙ্গে একমণ কাঠ সাজাইতেন ও অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ডান হাতে সেই অগ্নিতে আহুতি দিতেন। ঠাকুর তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়াছিলেন, ইহাও তাঁহার একটি সিদ্ধাই ছিল।

বৈষ্ণবচরণ ও গৌরী পণ্ডিতের কোন কোন বিশেষ কথা ঠাকুর মনে রাখিয়াছিলেন, এবং সেই কথাগুলি কাহাকেও বলিবার সময় তাঁহাদের নামও উল্লেখ করিতেন। যেমন:

মানুষে ইষ্টবুদ্ধি ঠিক ঠিক হলে তবে ভগবান লাভ হয়। বৈষ্ণবচরণ বলত, 'নরলীলায় বিশ্বাস হলে তবে পূর্ণ জ্ঞান হয়।' 'শেষে নরলীলাতেই মনটি কুড়িয়ে আসে।'

গৌরী বলত, 'কালী আর গৌরাঙ্গ এক বোধ হলে তবে বুঝব যে ঠিক জ্ঞান হল।'

ঠাকুর ও মথুরামোহন

সাধনকালের প্রথমদিকে ঠাকুর একসময়ে প্রার্থনা করিয়াছিলেন: মা, আমাকে শুঁটকো সাধু করিস নি, রসে বশে রাখিস। জগন্মাতা তখন তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার দেহরক্ষাদি প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য চারিজন রসদ্দার প্রেরিত হইয়াছে ও সেই রসদ্দারগণের মধ্যে মথুরামোহনই প্রথম ও অগ্রণী। ঠাকুরের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ দৈব-নির্দিষ্ট ছিল বলিয়াই প্রথম দর্শনের দিনে মথুর ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন বিশেষভাবে, আর তাঁহার সেবাও করিতে পারিয়াছিলেন দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া। যেরূপ যোগ্যতার সহিত তিনি এই বহুমুখ সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন তাহার তুলনা বিরল।

আজীবন-বালকভাবাপন্ন ঠাকুরকে নিজের সন্তানের মত দেখিয়া, ও জাগতিক সকল বিষয়ে তাঁহাকে অনভিজ্ঞ জানিয়া, মথুরামোহন সর্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, কখন তাঁহার কী প্রয়োজন হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন, আর তাঁহার যখন যাহা ইচ্ছা হইত নির্বিচারে তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিতেন। আবার মানুষের আয়ত্তির অতীত যা-কিছু ব্যাপার তাহার জন্য স্বয়ং 'বাবা'র মুখাপেক্ষী হইতেন, ঐকান্তিক বিশ্বাসে বাবার দৈবশক্তির উপর নির্ভর করিতেন।

ঠাকুর একদিন মুখখানি ভার করিয়া আসিয়া বলিলেন: এ কী ব্যারাম হল, বল দেখি? দেখলুম পেচ্ছাবের দ্বার দিয়ে যেন একটা পোকা বেরিয়ে গেল। শরীরের ভিতর কারু তো পোকা থাকে না, আমার এ কী হল? মথুর শুনিয়াই বলিলেন: ওতো ভালই হয়েচে বাবা! সকলের অঙ্গেই কামকীট আছে, সেই কামকীটই তাদের মনে নানা কুভাবের উদয় করে, কুকাজ করায়। মার কৃপায় তোমার অঙ্গ থেকে সেই কামকীট বেরিয়ে গেল। ঠাকুর আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন: ঠিক বলেচ; ভাগ্যিস তোমায় একথা জিজ্ঞাসা করলুম!

আর একদিন ঠাকুর বলিলেন: দেখ, মা আমায় দেখিয়েচেন, এখানকার অনেক অন্তরঙ্গ আছে, তারা সব আসবে; এখান থেকে ঈশ্বরীয় বিষয় জানবে, শুনবে, প্রত্যক্ষ করবে; প্রেমভক্তি লাভ করবে; (নিজের শরীর দেখাইয়া) এ খোলটা দিয়ে মা অনেক খেলা খেলবে, অনেকের উপকার করবে, তাই এ খোলটা এখনো রেখেচে। তুমি কী বল? এসব কি মাথার ভুল, না ঠিক দেখেচি? মথুর বলিলেন: মাথার ভুল কেন হবে বাবা? মা যখন তোমায় এপর্যন্ত কোনটাই ভুল দেখান নি, তখন এটাই বা কেন ভুল হবে? এটাও ঠিক হবে। এখনো তারা দেরী করচে কেন? শীগগির শীগগির আসুক না, তাদের নিয়ে আনন্দ করি। 'কী জানি বাবু, কবে তারা আসবে। মা বলেচেন, দেখিয়েচেন, মার ইচ্ছায় যা হয় হবে।' ঠাকুর প্রত্যুত্তর করিলেন।

পরে অন্য একদিন মথুর ভক্তদের আগমন সম্বন্ধে কথা পাড়িয়া ও উহার ফলে ঠাকুরকে বিষণ্ণ হইতে দেখিয়া তাঁহার সান্ত্বনার জন্য বলিয়াছিলেন: তারা আসুখ আর নাই আসুখ বাবা, আমি তো তোমার চিরানুগত ভক্ত রয়েচি। তবে আর তোমার দর্শন সত্যি হল না কিরূপে? আমি একাই একশ, তাই মা বলেছিলেন অনেক ভক্ত আসবে। 'কে জানে বাবু, তুমি যা বলচ তাই বা হবে।' ঠাকুর কহিলেন। মথুর অন্য কথা পাড়িয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া দিলেন।

ঠাকুর পানিহাটির উৎসব দেখিতে যাইবেন, মথুর সব বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন; আর যাহাতে তিনি কোনরূপ অসুবিধায় না পড়েন, ভিড়েভাড়ে কষ্ট না পান, তাহা দেখিবার জন্য গুপ্তভাবে তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন, দারোয়ান সঙ্গে নিয়া।

ঠাকুরের একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, ভাল জরির পোষাক পরিয়া রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাইবেন, মথুর তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করেন কালবিলম্ব না করিয়া। হাজার টাকায় একজোড়া বেনারেসী শাল কিনিয়া মথুর নিজের হাতে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে জড়াইয়া দেন। শাল গায়ে দিয়া ঠাকুর মহাখুশী হইলেন ও এদিক-ওদিক করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; সকলকে ডাকিয়া

শালখানি দেখাইতে, আর কত টাকায় মথুর উহা কিনিয়া দিয়াছেন তাহাও বলিতে লাগিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার ভাবান্তর হইল। ভাবিলেন—এতে আছে কী? কতকগুলো ভেড়ার লোম বই তো নয়? যে পঞ্চভূতের বিকারে সব জিনিস, সেই পঞ্চভূতে এটিও তৈরি। আর শীতনিবারণ লেপকম্বলে যেমন হয় এতেও তেমনি। এতে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না, বরং গায়ে দিলে মনে হয় আমি সকলের চেয়ে বড়, আর অভিমান অহঙ্কার বেড়ে মানুষের মন ঈশ্বর থেকে দূরে সরে যায়। এতে এত দোষ! এইরূপ বিচার করিয়া বিতৃষ্ণার সহিত শালখানি তিনি দেহ হইতে খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন, 'এতে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না, থু থু!' বলিয়া উহাতে থুথু দিতে লাগিলেন, এবং আগুন জ্বালিয়া উহা পুড়াইবার উপক্রম করিলেন। কেহ দেখিতে পাইয়া শালখানি তাঁহার হাত হইতে উদ্ধার করিল, আর মথুরবাবু উহার দুর্দশার কথা শুনিয়া, কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া বলিলেন, বাবা বেশ করেচেন!

ঠাকুরকে মথুর যাত্রার আসরে বসাইয়া দিয়াছেন উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া আর তাঁহার সম্মুখে দশ দশ টাকার থাক করিয়া একশত টাকা রাখিয়া দিয়াছেন তাঁহার ইচ্ছামত পেলা দিবেন বলিয়া। কোন হৃদয়স্পর্শী গানে বা কথায় ঠাকুর যেমন মুগ্ধ হইলেন অমনি হয়তো সব টাকাগুলিই এক-সঙ্গে গায়কের দিকে ঠেলিয়া দিলেন। মথুরের তাহাতে বিরক্তি নাই, বাবার যেমন উঁচু মেজাজ তেমনি পেলা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন ও পুনরায় ঐরূপে টাকা সাজাইয়া দিলেন। সেই টাকাগুলিরও ঐ একই গতি হইল। ইহার পরে কাছে আর টাকা নাই দেখিয়া ঠাকুর হয়তো নিজের পরিহিত বস্ত্রাদি দান করিয়া ভাবাম্বর হইয়া বসিলেন, আর মথুর আনন্দে বিভোর হইয়া বাবাকে বীজন করিতে লাগিলেন!

অন্য জমিদারের সহিত বিবাদে হঠকারী মথুরামোহনের হুকুমে লাঠা-লাঠি ও মানুষ খুন হইয়া গিয়াছে। বিপন্ন মথুর ঠাকুরের কাছে আসিয়া ও অকপটে নিজের দোষ স্বীকার করিয়া বলিলেন, বাবা, রক্ষা কর। ঠাকুর তাহাতে চটিয়া গেলেন ও ভৎসনা করিয়া কহিলেন: তুই শালা রোজ

একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে এসে বলবি, 'রক্ষা কর'—আমি কী করতে পারি? যা, নিজে বুঝগে যা—আমি কী জানি? তারপরে মথুরের কাতরতা দেখিয়া বলিলেন, যা, মার ইচ্ছায় যা হয় হবে। সেই বিপদ কাটিয়া গেল; খুনের মামলার আসামী প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে বিশেষ সম্মান লাভ করিল!

শারদীয়া মহাপূজা জানবাজারে, মথুরামোহনের ঘরে। ঠাকুর আছেন সেখানে। প্রতিমায় মহাদেবীর আবির্ভাব আর ঠাকুরের দেহমনে দিব্য ভাবাবেশ মিলিত হইয়া পূজাস্থানের বায়ুমণ্ডল এক অপূর্ব সাত্ত্বিক ভাবে পূর্ণ করিয়াছে। মহানন্দে পূজার তিনদিন কাটিয়া গেল।

বিজয়া দশমীর পূর্বাহ্নে সংক্ষিপ্ত পূজা সমাপন করিয়া পুরোহিত বলিয়া পাঠাইলেন, এবার মার বিসর্জন হইবে, বাবু যেন নীচে আসিয়া মাকে প্রণাম-বন্দনাদি করিয়া যান। কথাটা মথুর প্রথমে বুঝিতেই পারিলেন না, এক দিব্য আনন্দের নেশায় ভরপূর ছিলেন তিনি। তারপরে যখন বিজয়া দশমীর খেয়াল হইল, তিনি দুঃখিতচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন: আজ মাকে বিসর্জন দিতে হবে—কেন? মার কৃপায় আমার তো কিছুরই অভাব নাই। আনন্দের যেটুকু অভাব ছিল তা তো বাড়ীতে মার শুভাগমনে পূর্ণ হয়েচে। তবে আর কেন মাকে বিসর্জন দিয়ে বিষাদ ডেকে আনি? না, এ আনন্দের হাট আমি ভাঙ্গতে পারব না। মার বিসর্জন! মনে হলেও যেন প্রাণ কেমন করে উঠে!

সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া পুরোহিত লোকের উপর লোক পাঠাইতে লাগিলেন। বিষম বিরক্ত হইয়া মথুর বলিয়া উঠিলেন: আমি মাকে বিসর্জন দিতে দিব না, আমি মার নিত্যপূজা করব। আমার অনভিমতে যদি কেউ বিসর্জন দেয় তো মহা বিভ্রাট হবে, খুনোখুনি পর্যন্ত হতে পারে। বলিয়াই তিনি গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। ক্রুদ্ধ হইলে যে বাবুর দিগ্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না একথা বাটীর সকলেই জানিত, তাহারা আতঙ্কিত হইল। গৃহিণী উপায়ান্তর না দেখিয়া বাবার শরণাপন্ন হইলেন।

ঠাকুর যাইয়া দেখেন, মথুরের মুখ ও চক্ষু দুইটি রক্তাভ হইয়াছে ও কেমন যেন উন্মনা হইয়া তিনি ঘরের ভিতর পায়চারি করিতেছেন।

ঠাকুরকে দেখিয়াই মথুর তাঁহার কাছে আসিয়া বলিতে লাগিলেন : বাবা, যে যাই বলুক, আমি মাকে প্রাণ থাকতে বিসর্জন দিতে পারব না। বলে দিয়েচি নিত্যপূজা করব। মাকে ছেড়ে কেমন করে থাকব ?

ঠাকুর তাঁহার বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন : ও, এই তোমার ভয় ? তা মাকে ছেড়ে তোমায় থাকতে হবে কে বল্লে ? বিসর্জন দিলেই বা তিনি যাবেন কোথায় ? মা কি কখন ছেলেকে ছেড়ে থাকতে পারে ? এ তিনদিন বাইরে দালানে বসে তোমার পূজা নিয়েচেন, আজ থেকে তোমার হৃদয়ে বসে তোমার পূজা নেবেন।

মথুরের হৃদয়মন্দির সহসা মায়ের রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন।

ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া ও ভাবসমাধিতে তিনি অসীম আনন্দ উপভোগ করেন দেখিয়া বিষয়ী মথুরের এক সময়ে ইচ্ছা হইল, ব্যাপারটা কী একবার দেখিয়া নিবেন। আর তখনই ঠাকুরের কাছে গিয়া বলিলেন, বাবা, আমার যাতে ভাবসমাধি হয় তাই করে দাও। ঠাকুর কহিলেন : কেন, তুই তো বেশ আছিস, এদিক-ওদিক দুদিক চলচে। ওসব হলে এদিক থেকে মন উঠে যাবে, তখন তোর বিষয়-আশয় রক্ষা করবে কে ? বার ভূতে সব যে লুটে খাবে, তখন কী করবি ?

ঠাকুরের এইসব হিতকথা সেদিন মথুরের কানে গেল না; ভাবসমাধি তাঁহার চাইই চাই, বাবাকে তাহা করিয়া দিতেই হইবে। অগত্যা ঠাকুর বলিলেন, মাকে বলব, তিনি যা হয় করবেন। ইহার কয়েকদিন পরেই মথুরের ভাবসমাধি হইল।

ঠাকুর বলিতেন : আমাকে ডেকে পাঠিয়েচে। গিয়ে দেখি, যেন সে-মানুষই নয়। চক্ষু লাল, বুক থর থর করে কাঁপচে, ঈশ্বরীয় কথা কইতে কইতে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্চে ! আমাকে দেখে পা জড়িয়ে ধরে বল্লে, 'বাবা, ঘাট হয়েচে ! আজ তিনদিন ধরে এইরকম, বিষয়কর্মে কিছুতেই মন যায় না, সবখানে খারাপ হয়ে গেল ! তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও।'...আমি হাসি আর বলি, 'তোকে তো একথা

আগেই বলেচি।' সে বল্লে, 'হাঁ বাবা, কিন্তু তখন কি অত জানি যে, ভূতের মত এসে ঘাড়ে চাপবে, ইচ্ছা করলেও কিছু করতে পারব না?' তখন তার বুকে হাত বুলিয়ে দি।

এক সময়ে দেহের কোন সন্ধিস্থলে ফোড়া হইয়া মথুরামোহন শয্যাশায়ী হন ও ঠাকুরকে দর্শন করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। হৃদয়ের মুখে একথা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, আমি গিয়ে কী করব, তার ফোড়া আরাম করতে পারব কি? মথুরের লোক বারবার আসিয়া ঠাকুরকে তাঁহার কাতর প্রার্থনা জানাইয়া যাইতে লাগিল।

অবশেষে ঠাকুর একদিন তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। অনেক কষ্টে শয্যা হইতে উঠিয়া ও তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া মথুর বলিলেন, বাবা, একটু পায়ের ধূলো দাও। 'আমার পায়ের ধূলো দিয়ে কী হবে, ওতে কি তোমার ফোড়া সারবে?' ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন। 'বাবা, আমি কি এমনি, তোমার পায়ের ধূলো কি ফোড়া আরাম করবার জন্যে চাইচি? তার জন্যে তো ডাক্তার আছে। আমি ভবসাগর পার হবার জন্যে তোমার শ্রীচরণের ধূলো চাইচি।' একথা শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন, মথুরও তাঁহার পাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। মথুরের চক্ষু দিয়া তখন আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল।

১২৭৮ সালের আষাঢ় মাসে মথুর জ্বরে আক্রান্ত হন। ক্রমশঃ সেই জ্বর বাড়িয়া বিকারে পরিণত হইল ও মথুরের বাগ্‌রোধ হইল। ১লা শ্রাবণ তাঁহাকে কালীঘাটে আনয়ন করা হইল অন্তিম কাল আসন্ন দেখিয়া। তাঁহাকে দেখিয়া আসিবার জন্য ঠাকুর প্রতিদিন হৃদয়কে পাঠাইতেন, কিন্তু নিজে যাইতেন না। সেদিন তিনি হৃদয়কেও পাঠাইলেন না, কিন্তু অপরাহ্নে দুইতিন ঘণ্টা গভীর ভাবে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন এবং দিব্যশরীরে জ্যোতির্ময় বর্ত্মে ভক্তের পাশে উপনীত হইয়া স্বয়ং তাঁহাকে বহুপুণ্যার্জিত লোকে আরূঢ় করাইলেন। পাঁচটার সময় তাঁহার ভাবভঙ্গ হইল ও হৃদয়কে নিকটে ডাকিয়া তিনি কহিলেন: মার সখীরা মথুরকে আদর করে রথে তুলে নিলেন; মথুরের তেজ দেবীলোকে গেল।

শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে আগমন : ঠাকুরের ষোড়শীপূজা

১২৭৪ সালে ঠাকুর যখন কামারপুকুরে আগমন করেন শ্রীশ্রীসারদামাতা তখন বয়সে চতুর্দশবর্ষীয়া কিশোরী ও স্বভাবে বালিকামাত্র ছিলেন। ঠাকুরের কামগন্ধহীন দিব্য সঙ্গ ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা তাঁহাকে এক অপার্থিব আনন্দসম্পদের অধিকারিণী করিয়াছিল। ঐ আনন্দ তাঁহার কাছে একটি মানস অনুভূতিমাত্র ছিল না, পরন্তু তাঁহার অভীষ্ট দেবতারূপে মূর্ত হইয়া তাঁহার হৃদয়মন্দিরে সংস্থাপিত হইয়াছিল। "উহা তাঁহাকে চপলা না করিয়া শান্তস্বভাবা করিয়াছিল, প্রগল্‌ভা না করিয়া চিন্তাশীলা করিয়াছিল, স্বার্থদৃষ্টিনিবদ্ধা না করিয়া নিঃস্বার্থ-প্রেমিকা করিয়াছিল, এবং অন্তর হইতে সর্বপ্রকার অভাবরোধ তিরোহিত করিয়া মানবসাধারণের দুঃখকষ্টের সহিত অনন্তসমবেদনাসম্পন্না করিয়া ক্রমে তাঁহাকে করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিণত করিয়াছিল। মানসিক উল্লাস-প্রভাবে অশেষ শারীরিক কষ্টকে তাঁহার এখন হইতে কষ্ট বলিয়া মনে হইত না, এবং আত্মীয়বর্গের নিকট হইতে আদরযত্নের প্রতিদান না পাইলে মনে দুঃখ উপস্থিত হইত না। ঐরূপে সকল বিষয়ে সামান্যে সন্তুষ্ট থাকিয়া বালিকা আপনাতে আপনি ডুবিয়া তখন পিত্রালয়ে কাল কাটাইতে লাগিলেন।" তাঁহার দেহখানি জয়রামবাটীতে পড়িয়া থাকিলেও, এবং সংসারের যাবতীয় কাজ পূর্ববৎ করিয়া যাইতে থাকিলেও তাঁহার প্রাণ চলিয়া গিয়াছিল দক্ষিণেশ্বরে, প্রাণদেবতার পদানুসরণ করিয়া।

প্রেম সেবানিষ্ঠ। প্রেমের স্বভাবই এইরূপ যে, প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যে থাকিয়া সে তাঁহার সেবায় চরিতার্থ হইতে চাহে। কেবলমাত্র প্রেমাস্পদের মানসরূপটি লইয়া, মানসে তাঁহার ধ্যান ও সেবার অভিনয় করিয়াই সে থাকিতে পারে না, বিশেষতঃ প্রেমাস্পদ যেখানে বিগ্রহধারী হইয়া আছেন। শ্রীশ্রীমাও তাই আপনাতে আপনি মগ্ন হইয়া থাকিতে পারিলেন না চিরদিন ধরিয়া। সান্নিধ্যবশতঃ যে রামকৃষ্ণচাঁদ নিয়ত তাঁহার মনোজলে প্রতিবিম্বিত হইতেন, নয়নপথের বহির্ভূত হওয়ার ফলে

তাঁহার প্রতিবিম্বরূপটিও হয়তো বা সকল সময়েই আর তেমন জীবন্তভাবে প্রতিভাত হইতেছিল না। অন্তরে বাহিরে সমভাবে যাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, স্বহস্তে যাঁহাকে সেবা করিয়াছেন, স্বকর্ণে যাঁহার কথামৃত পান করিয়াছেন, তাঁহার বিরহ তাই আজ মায়ের পক্ষে বড়ই দুঃসহ হইয়া উঠিল। দয়িতের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার বাসনায় তিনি ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তাঁহার ভাব চাপিবার অসাধারণ শক্তি ছিল বলিয়া বাহিরের জগৎ উহার কিছুই জানিতে পারিল না।

প্রথম দর্শনে যিনি তাঁহাকে এত ভালবাসিয়াছেন, এত আপনার করিয়া নিয়াছেন, সেই প্রেমময় সময়ে নিশ্চয়ই তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া নিবেন—এই আশা বুকে নিয়া শ্রীশ্রীমা একটি একটি করিয়া দিন গণিতে লাগিলেন। দিন গণিতে হয় মাস, মাস গণিতে হয় বৎসর, এইরূপে বৎসরের পর বৎসর গত হইয়া যাইতে লাগিল, কৈশোর অতিক্রম করিয়া তিনি যৌবনে পদার্পণ করিলেন, তথাপি বাহ্যতঃ কোন আহ্বানই আসিল না। তাঁহার সীমাহীন ধৈর্যের বাঁধও যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। এমন সময়ে ঈশ্বরেচ্ছায় একটি সুযোগ উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভীষ্ট-পূরণের সকল বাধা অপসারিত করিয়া দিল।

১২৭৮ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমায়—প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথিতে গঙ্গাস্নান করিবার জন্য কয়েকজন দূরসম্পর্কের আত্মীয়া কলিকাতা যাইবেন জানিয়া শ্রীশ্রীমা তাঁহাদের কাছে গঙ্গাস্নানের অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। সেকথা শুনিয়া ও কন্যার অভিপ্রায় অনুমানে বুঝিয়া লইয়া পিতা রামচন্দ্র স্বয়ং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন স্থির করিলেন। সকলে মিলিয়া পদব্রজে রওনা হইলেন।

প্রায় বিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে হইবে, পায়ে হাঁটিয়া। শ্রীশ্রীমার সুকোমল পদযুগল বারবার অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। দুইতিন দিন পথ চলিবার পরেই তিনি জ্বরে আক্রান্ত হইলেন ও পিতা তাঁহাকে নিয়া চটিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চটিমধ্যে রাত্রে তাঁহার

এক দিব্যদর্শন উপস্থিত হইল। সেই দর্শনের কথা শ্রীশ্রীমা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন ঃ

"জ্বরে যখন একেবারে বেহুঁশ, লজ্জা-সরম-রহিত হইয়া পড়িয়া আছি তখন দেখিলাম, পার্শ্বে একজন রমণী আসিয়া বসিল। মেয়েটির রং কাল, কিন্তু এমন সুন্দর রূপ কখনও দেখি নাই! বসিয়া আমার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল—এমন নরম ঠাণ্ডা হাত, গায়ের জ্বালা জুড়াইয়া যাইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কোথা থেকে আসচ গা?' রমণী বলিল, 'আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসচি।' শুনিয়া অবাক হইয়া বলিলাম, 'দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করেছিলুম দক্ষিণেশ্বরে যাব, তাঁকে দেখব, তাঁর সেবা করব; কিন্তু পথে জ্বর হওয়ায় আমার ভাগ্যে ঐসব আর হল না।' রমণী বলিল, 'সে কী! তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বইকি। ভাল হয়ে—সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যই ত তাঁকে সেখানে আটকে রেখেচি।' আমি বলিলাম, 'বটে? তুমি আমাদের কে হও গা?' মেয়েটি বলিল, 'আমি তোমার বোন হই।' আমি বলিলাম, 'বটে? তাই তুমি এসেচ!' ঐরূপ কথাবার্তার পরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।"

প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখা গেল জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীমার শরীর দুর্বল হইয়া পড়িলেও মনটি ছিল দর্শনজনিত উৎসাহে পরিপূর্ণ; পিতার সঙ্গে কথা কহিয়া তিনি ধীরে ধীরে পথ চলিতে লাগিলেন। অল্পদূর যাইতেই একখানি শিবিকা জুটিল ও সেই শিবিকায় তাঁহাকে তুলিয়া দেওয়া হইল। সেদিন আবার জ্বর আসিলেও পূর্বদিনের মত প্রবল হইল না, মাও সেই জ্বরের কথা কাহাকেও জানিতে দিলেন না। দিনের সঙ্গে হাঁটাপথের শেষ হইল, খুব সম্ভবতঃ বৈদ্যবাটীতে আসিয়া। সেখান হইতে নৌকাযোগে যখন তাঁহারা দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিলেন তখন রাত্রি একপ্রহর গত হইয়াছে। ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য মা এতই ব্যাকুলা হইয়াছিলেন যে, কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই প্রাণের টানে সরাসরি চলিয়া গিয়াছিলেন ঠাকুরের ঘরে!

"ঠাকুর তাঁহাকে সহসা ঐরূপ রোগাক্রান্তা হইয়া আসিতে দেখিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর বাড়িবে বলিয়া নিজগৃহে ভিন্ন শয্যায় তাঁহার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং দুঃখ করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, 'তুমি এত দিনে এলে? আর কি আমার সেজবাবু (মথুরবাবু) আছে যে তোমার যত্ন হবে?' ঔষধ-পথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্তে তিনচারি দিনেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী আরোগ্য লাভ করিলেন। ঐ তিনচারি দিন ঠাকুর তাঁহাকে দিবারাত্র নিজগৃহে রাখিয়া ঔষধপথ্যাদি সকল বিষয়ের স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিলেন। পরে নহবত ঘরে নিজ জননীর নিকটে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।...প্রাণের উল্লাসে তিনি নহবতে থাকিয়া দেবতার ও দেবজননীর সেবায় নিযুক্তা হইলেন; এবং তাঁহার পিতা কন্যার আনন্দে আনন্দিত হইয়া কয়েকদিন ঐস্থানে অবস্থান পূর্বক হৃষ্টচিত্তে নিজগ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।"

দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাগমন-কালের দুইটি ঘটনা শ্রীশ্রীমা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন: প্রথমবার যখন নৌকো থেকে দক্ষিণেশ্বরে নামচি, শুনতে পেলুম ঠাকুর হৃদয়কে বলচেন, 'ও হৃদু, বারবেলা (কালরাত্রি) নাই তো? প্রথমবার আসচে!' আমি মনে মনে জানি, আমি গঙ্গার উপরেই নৌকোতে বারবেলা কাটিয়ে এসেচি।[১]

যখন আমি প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যাই, ঠাকুর একাইক আমাকে প্রশ্ন কল্লেন, 'কিগো, তুমি কি আমাকে সংসারপথে টেনে নিতে এসেচ?' আমি বল্লুম, 'না! আমি তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব, তোমার ইষ্টপথেই সাহায্য কত্তে এসেচি!'

মরমী স্বামীর সমগ্র দরদ দিয়াই ঠাকুর তাঁহার সহধর্মিণীকে গ্রহণ

---

১ ১২৭৮ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমা ১৩ই চৈত্র সোমবারে পড়িয়াছে। শনিবারের রাত্রির প্রথম যামার্ধ কালরাত্রি। পূর্ণিমা উপলক্ষে স্নান করিতে আসার ও কালরাত্রির প্রসঙ্গ থাকায় শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে আগমনের তারিখ ১১ই চৈত্র শনিবার নির্ণীত হয়। শনিবার মধুবার, ঠাকুর বলিতেন। মধুমাসে মধুবারে মা ঠাকুরের কাছে আসিয়াছিলেন, যাহার ফলে তাঁহার জীবন মধুময় হইয়াছিল।

করিয়াছিলেন, এবং সংসারের খুঁটিনাটি ব্যাপার হইতে আরম্ভ করিয়া ভজন, কীর্তন, ধ্যান, সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্যন্ত সকল বিষয় তাঁহাকে শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই শিক্ষাদানের কাজটি তিনি কামারপুকুরে থাকিতে সুরু করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করিয়া আসিতে পারেন নাই; মাও তখন জীবনের সকল দায়িত্ব বুঝিবার মত বয়ঃপ্রাপ্তা হন নাই।

ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে শ্রীশ্রীমা ঐ সময়ে তাঁহাব সহিত এক শয্যায শয়ন করিতেন। প্রায় সমস্ত রাত ঠাকুরের মন উচ্চ ভাবভূমিতে অবস্থান করিত; আর যদি কখনও নীচে নামিত, তাহাতে সাধারণ-মানব-সুলভ দেহবুদ্ধির উদয় হইত না। স্ত্রীভক্তদিগকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন: সে যে কী অপূর্ব দিব্যভাবে থাকতেন তা বলে বুঝাবার নয়! ভাবের ঘোরে কত কী কথা, কখন হাসি, কখন কান্না, কখন সমাধিতে একেবারে স্থির হয়ে যাওয়া—এইরকম সমস্ত রাত! সে কী-এক আবির্ভাব আবেশ, দেখে ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঁপত, আব ভাবতুম কখন রাতটা পোহাবে! ভাবসমাধির কথা তখন তো কিছু বুঝি না, একদিন তাঁর সমাধি ভাঙ্গে না দেখে ভয়ে কেঁদে হৃদয়কে ডেকে পাঠাই। সে এসে কানে নাম শুনাতে থাকলে তবে কতক্ষণ পরে তাঁর চৈতন্য হয়! আমি ভয়ে কষ্ট পাই দেখে তিনি শিখিয়ে দিলেন—এইরকম ভাব দেখলে এই নাম শুনাবে, এইরকম ভাব দেখলে এই বীজ শুনাবে। তখন আর তত ভয় হত না, ঐসব শুনালেই তাঁর আবার হুঁশ হত। অনেকদিন এভাবে কাটে। তারপরে, কখন তাঁর কী ভাবসমাধি হবে বলে সারা রাত জেগে থাকি, ঘুমতে পারি না—একথা একদিন জানতে পেরে আমাকে নহবতে শুতে বলেন।

একাদিক্রমে আট মাস শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের সহিত একশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে কোন একদিন মাকে পাশে নিদ্রিতা দেখিয়া ঠাকুর নিজের মনকে সম্বোধন করিয়া বলিতে থাকেন: মন, এরই নাম স্ত্রীশরীর, লোকে এটিকে পরম উপাদেয় ভোগ্যবস্তু বলে জানে, আর ভোগ করবার জন্যে সর্বক্ষণ লালায়িত হয়। কিন্তু তা করতে গেলে দেহেই আবদ্ধ থাকতে হয়, সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। ভাবের ঘরে চুরি

কোরো না, পেটে একখানা মুখে একখানা রেখো না, সত্যি বল তুমি এটি চাও অথবা ঈশ্বরকে চাও? যদি এটি চাও তো এই তোমার কাছেই রয়েচে গ্রহণ কর। ঐরূপ বিচার করিয়া ঠাকুর যেমন মাতাঠাকুরাণীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন অমনি তাঁহার মন কুণ্ঠিত হইয়া সমাধিতে এমনই লীন হইয়া গেল যে, সে রাত্রে আর সাধারণ ভাবভূমিতে নামিয়া আসিল না!

তখনকার কথা স্মরণ করিয়া ঠাকুর পরবর্তী কালে তাঁহার ভক্তদিগকে বলিয়াছেন: ও (শ্রীশ্রীমা) যদি এত ভাল না হত, আত্মহারা হয়ে আমাকে আক্রমণ করত, তা হলে সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে দেহবুদ্ধি আসত কি-না, কে বলতে পারে?

মাতাঠাকুরাণী ঐসময়ে একদিন ঘর ঝাঁট দিতে দিতে ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন, আমি তোমার কে? ঠাকুর উত্তর দেন, তুমি আমার মা-আনন্দময়ী! 'ও কথা বলতে নাই।' প্রত্যুত্তরে মা কহিয়াছিলেন।

১২৮০ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ফলহারিণী কালী-পূজার দিন। অন্তরের এক অপূর্ব প্রেরণায় চালিত হইয়া ঠাকুর সেদিন নিজের ঘরে জগন্মাতার বিশেষ পূজা করিতে সংকল্প করিলেন। ভাগিনেয় হৃদয় ও ভাইপো দীনুর সাহায্যে দেবীর রহস্যপূজার সাবিক আয়োজন করিতে রাত্রি নয়টা হইয়া গেল। শ্রীশ্রীমাকে পূজাকালে উপস্থিত থাকিতে ঠাকুর আগেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইতেই ঠাকুর পূজায় বসিলেন।

পূজার পূর্বকৃত্যসকল দেখিতে দেখিতে মা অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন, এবং ঠাকুরের ইঙ্গিতে, পূর্বমুখে উপবিষ্ট পূজকের ডানদিকে, আলপনা-দেওয়া পিঁড়িতে উত্তরমুখী হইয়া বসিলেন। "সম্মুখস্থ কলসের মন্ত্রপূত বারি দ্বারা ঠাকুর বারংবার শ্রীশ্রীমাকে যথাবিধানে অভিষিক্তা করিলেন। অনন্তর মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া তিনি এখন প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন: 'হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরি মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর; ইহার শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।'

"অতঃপর শ্রীশ্রীমার অঙ্গে মন্ত্রসকলের যথাবিধানে ন্যাসপূর্বক ঠাকুর সাক্ষাৎ ৺দেবীজ্ঞানে তাঁহাকে পূজা করিলেন এবং ভোগ নিবেদন করিয়া নিবেদিত বস্তুসকলের কিয়দংশ স্বহস্তে তাঁহার মুখে প্রদান করিলেন। বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া শ্রীশ্রীমা সমাধিস্থা হইলেন। ঠাকুরও অর্ধবাহ্য-দশায় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে সম্পূর্ণ সমাধিমগ্ন হইলেন। সমাধিস্থ পূজক সমাধিস্থা দেবীর সহিত আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হইলেন।"

এইভাবে বহুক্ষণ অতীত হইল। নিশার তৃতীয় যামে অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর দেবীকে আত্মনিবেদন করিলেন। বিল্বপত্রে নিজের নাম লিখিয়া, সেই বিল্বপত্র-সহযোগে নিজের সাধনকালে ব্যবহৃত আভরণ ও রুদ্রাক্ষের মালাদি সমুদয় দ্রব্য, সমগ্র সাধনার ফল এবং নিজেকে দেবী-পাদপদ্মে সমর্পণ করিলেন।

এ পূজা পূজার ইতি· আর দেবদেবীমূর্তি কভু না পূজিলা পরমেশ।
যেন পূজা শ্রীশ্রীমার পরম চরম সার পরিণাম সকলের শেষ॥

পূজা সম্পূর্ণ হইতে মাতাঠাকুরাণীর সমাধি ভঙ্গ হইল; মনে মনে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তিনি নহবত ঘরে চলিয়া গেলেন।

শ্রীসারদানন্দ বলিয়াছেন: ষোড়শীপূজা-কালে মা এতই আবিষ্ট হয়েছিলেন যে, কী যে হচ্ছে, তাঁর একেবারেই হুঁশ ছিল না। ঠাকুর তাঁকে কাপড় ছাড়িয়ে নূতন কাপড় পরিয়ে দিলেন, প্রণাম করে তাঁর পায়ে মালা রাখলেন, মা কিছুই জানতে পারেন নাই।···এইদিন মা প্রসাদী মাংস পর্যন্ত খেয়েছিলেন অথচ কখনো তিনি মাংস খেতেন না!

এক বৎসর সাত মাস দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে থাকিয়া শ্রীশ্রীমা সম্ভবতঃ ১২৮০ সালের কার্তিকমাসে কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করেন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে ঠাকুরের অনুভূতি, অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে ধারণা

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর দক্ষিণপাশে যদুনাথ মল্লিকের বাগানবাড়ী। সেই বাগানবাড়ীর দক্ষিণে স্বল্প ব্যবধানে শম্ভুচরণ মল্লিকের বাগানবাড়ী। তাঁহারা উভয়েই বিত্তশালী ভক্তলোক ছিলেন, শম্ভুবাবু তাঁহার অজস্রদানের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

মথুরবাবুর মৃত্যুর পর পানিহাটির মণিমোহন সেন ঠাকুরের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ জোগাইতেন। ঠাকুরের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাবান ছিলেন ও মাঝে মাঝে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন। তারপরে ঠাকুরের সহিত শম্ভুবাবুর মিলন সংঘটিত হয় ও শম্ভুবাবু তাঁহার সেবাভার গ্রহণ করেন। শম্ভুকে ঠাকুর তাঁহার দ্বিতীয় রসদ্দার বলিতেন, ঠাকুরকে তিনি কিছুদিন বাইবেল পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন।

যদুবাবু ও তাঁহার মাসীমা ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করিতেন, ঠাকুরও কখন কখন যদুর বাগানে বেড়াইতে যাইতেন। ঐ বাগানবাড়ীর বৈঠক-খানার দেওয়ালে অনেকগুলি উত্তম চিত্র লম্বিত ছিল, তন্মধ্যে মাতৃক্রোড়ে অবস্থিত ভগবান ঈশার চিত্রও ছিল একখানি। একদিন ঠাকুর তন্ময় হইয়া ঐ ছবিখানি দেখিতে দেখিতে ঈশার অদ্ভুত জীবনকথা চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন ছবিখানি যেন জীবন্ত জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিয়াছে এবং ঐ দেবশিশু ও দেবজননীর অঙ্গ হইতে নিঃসৃত হইয়া জ্যোতীরশ্মিসমূহ তাঁহার ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। ইহার ফলে জন্মগত হিন্দু সংস্কার চলিয়া গিয়া তাঁহার মনে ভিন্ন সংস্কারের উদয় হইতেছে দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইলেন, নিজেকে সামলাইয়া নিবার চেষ্টা করিলেন, এবং 'মা, আমার এ কী করচিস?' বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু কিছুতেই উহা প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। ভগবান ঈশা ও তৎপ্রবর্তিত সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মিল। মানস চক্ষে তিনি দেখিতে লাগিলেন, গির্জায় খ্রীষ্টান পাদরিরা শ্রীঈশার মূর্তির সম্মুখে ধূপদীপ দান করিতেছে, কাতর প্রার্থনায় অন্তরের আকুলতা জানাইতেছে।

নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়াও তিনি ঐসকল দেখিতে লাগিলেন, এবং তিনদিন পর্যন্ত একই ভাবে মগ্ন হইয়া রহিলেন। ঐ তিনদিন তিনি জগন্মাতার মন্দিরে যাইতেও ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তৃতীয় দিনের অবসানে পঞ্চবটীতে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি দেখিলেন, এক অদৃষ্টপূর্ব দেবমানব, সুন্দর গৌরবর্ণ, স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। দেখিয়াই বুঝিলেন, ইনি বিদেশী ও বিজাতিসম্ভূত। তাঁহার সৌম্য মুখের অপূর্ব দেবভাব দেখিয়া ঠাকুর মুগ্ধ হইলেন ও সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, কে ইনি? অমনি তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল: "ঈশামসি—দুঃখযাতনা হইতে জীবকুলকে উদ্ধারের জন্য যিনি হৃদয়ের শোণিত দান এবং মানবহস্তে অশেষ নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরাভিন্ন পরম যোগী ও প্রেমিক খ্রীষ্ট ঈশামসি!" ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিয়া ঈশা তাঁহার শরীরে লীন হইলেন, এবং বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ঠাকুরের মন সগুণ বিরাটব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া গেল। ঐরূপ দর্শন লাভ করিয়া ঠাকুর শ্রীঈশার অবতারত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। ইহা ১২৮১ সালের ঘটনা।

পরবর্তী কালে ঠাকুর তাঁহার ইংরাজী-শিক্ষিত শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন: হ্যাঁ রে, তোরা তো বাইবেল পড়েচিস, বল্ দেখি তাতে ঈশার শরীরের গড়ন সম্বন্ধে কী লেখা আছে? শরচ্চন্দ্র (সারদানন্দ) উত্তর দেন: মশায়, ওকথা বাইবেলের কোথাও পাই নি; তবে, তিনি য়াহুদি জাতিতে জন্মেছিলেন, সেজন্যে সুন্দর গৌরবর্ণ ছিলেন, তাঁর চোখ টানা আর নাক লম্বা টিকাল ছিল নিশ্চয়। 'কিন্তু আমি দেখেচি তাঁর নাক একটু চাপা। কেন অমন দেখেছিলুম কে জানে!' ঠাকুর কহিলেন। তাঁহার দেহরক্ষার কিছুকাল পরে শরচ্চন্দ্র জানিতে পারেন, ঈশার শরীরের গঠন সম্বন্ধে তিনপ্রকার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে ও একটি বিবরণে তাঁহার নাক চাপা ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে।

ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রধান অপ্রধান ধর্মমতসমূহে এবং ভারতবহির্ভূত দেশে জাত মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মে সিদ্ধিলাভ করিয়া ঠাকুর তাঁহার

সর্বধর্মের সাধনা সম্পূর্ণ করিলেন। ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের কোন সাধনা তিনি করেন নাই, বা করিতে ইচ্ছুক হন নাই। বুদ্ধের মতবাদে ও বৈদিক জ্ঞানমার্গে কোন ভেদ নাই, তিনি বলিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবকে তিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। গিরিশবাবুর 'বুদ্ধচরিত' নাটকের অভিনয় দেখিয়া বলিয়াছিলেন, বুদ্ধদেব ঈশ্বরাবতার ছিলেন নিশ্চয়। পুরীধামস্থ জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রারূপ ত্রিরত্ন-প্রতীকে শ্রীবুদ্ধাবতারের প্রকাশ অদ্যাপি বর্তমান বলিয়াও তিনি বিশ্বাস করিতেন।[১]

পুরীধামে যাইতে ঠাকুরের ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু সেখানে গেলে তাঁহার শরীর থাকিবে না জানিতে পারিয়া—পুরীতে শ্রীচৈতন্যদেব সমাধিযোগে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন—তিনি সে-ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। যোগদৃষ্টিতে পুরীর মন্দিরাদি দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, সেখানে সব বড় বড়। জগন্নাথের মহাপ্রসাদ তিনি নিজে খাইতেন, ভক্তদিগকেও খাইতে বলিতেন। বলিয়াছিলেন: 'গঙ্গাজল জলের মধ্যে নয়, বৃন্দাবনের রজ ধুলোর মধ্যে নয়, জগন্নাথের আটকে অন্নের মধ্যে নয়—এই তিন ব্রহ্মের স্বরূপ।'

খুব সম্ভবতঃ জৈনধর্মাবলম্বী মাড়োয়ারী ভক্তগণের নিকটে ঠাকুর ঐ ধর্মের প্রবর্তক তীর্থঙ্করগণের তপস্যা ও মতবাদ সম্বন্ধে নানাকথা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু উঁহাদের কাহাকেও তিনি ঈশ্বরাবতার বলেন নাই। মহাবীর-তীর্থঙ্করের একটি মর্মরমূর্তি অদ্যাপি ঠাকুরের ঘরে আছে, পাইকপাড়ার রাণী কাত্যায়নী (লালাবাবুর স্ত্রী) তাঁহাকে দিয়াছিলেন।[২]

---

১ জগন্নাথ দারুব্রহ্ম। আদিযুগে তিনি বুদ্ধরূপে উপাসিত হইতেন; মধ্যযুগে—শ্রীশঙ্করাচার্যের সময় হইতে—শিবরূপে পূজিত হইয়াছেন; পরবর্তীকালে—শ্রীরামানুজের সময় হইতে—বিষ্ণু বা তদবতাররূপে আরাধিত হইয়া আসিতেছেন। বর্তমানে শ্রীজগন্নাথের গোপালমন্ত্রে, শ্রীবলরামের বাসুদেবমন্ত্রে ও শ্রীসুভদ্রার একাক্ষর শক্তিবীজে পূজা হইয়া থাকে। আজও উড়িষ্যার অনেক লোকে দশাবতারপূজা করিতে গিয়া বুদ্ধাবতার-জ্ঞানে জগন্নাথের পূজা করেন। 'ভাবগ্রাহী জনার্দন।'

২ জৈনমতবাদে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নারীজন্মে জীবের মুক্তি স্বীকৃত হয় না। জৈনরা জীবাত্মার অস্তিত্ব, জন্মান্তর ও ভোগাপবর্গ স্বীকার করেন বলিয়া উঁহাদিগকে নাস্তিক

নানকসাহী (উদাসী) সাধু ও শিখ ভক্তগণের মুখে তিনি উহাদের মতবাদ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছিলেন। একটি নানকসাহী সাধুই ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, কলিযুগে নারদীয় ভক্তি। শিখ হাবিলদার কোয়ার সিং তাঁহাকে বলিয়াছিলেন: সমাধি থেকে ফিরে আসা লোক আর দেখি নাই, তুমিই নানক। শিখদের নানকাদি দশগুরু সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন: "উহারা সকলে জনক ঋষির অবতার—শিখদিগের নিকট শুনিয়াছি, রাজর্ষি জনকের মনে মুক্তিলাভ করিবার পূর্বে লোককল্যাণ সাধন করিবার কামনা উদয় হইয়াছিল এবং সেজন্য তিনি নানকাদি গোবিন্দ পর্যন্ত দশ গুরুরূপে দশবার জন্মগ্রহণ করিয়া শিখজাতির মধ্যে ধর্মসংস্থাপনপূর্বক পরব্রহ্মের সহিত চিরকালের নিমিত্ত মিলিত হইয়াছিলেন। শিখদিগের ঐ কথা মিথ্যা হইবার কোনও কারণ নাই।"

বলিতে পারা যায় না। উহারা জীবপ্রেমী, অহিংসায় বিশ্বাসী। জৈনমুনিরা কঠোরতপস্বী।

স্বজন-বিয়োগ ঃ ঠাকুরের মাতৃভক্তি

শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বর হইতে কামারপুকুরে ফিরিয়া আসার স্বল্পকাল পরেই ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ রামেশ্বর জ্বরাতিসার রোগে দেহরক্ষা করেন (২৭শে অগ্রহায়ণ, ১২৮০)। তাঁহার বয়স তখন মাত্র আটচল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। রামেশ্বরের উদার প্রকৃতির কথা ঠাকুরের বাল্যলীলাপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহাব সামান্য দখল ছিল।

রামেশ্বর যখন দক্ষিণেশ্বর হইতে কামারপুকুর যাত্রা করেন তখন ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন: বাড়ী যাচ্চ যাও, কিন্তু স্ত্রীর কাছে শুয়ো না; তা হলে তোমার জীবন-সংশয় হবে। কিছুকাল পরে তাঁহার পীড়ার সংবাদ আসিতেই ঠাকুর হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, সে নিষেধ মানে নাই। ইহার পাঁচসাত দিন পরেই খবর আসিল রামেশ্বর পরলোকগমন করিয়াছেন।

এই দুঃসংবাদ বৃদ্ধা জননীর প্রাণে বিষম আঘাত হানিবে ভাবিয়া ঠাকুর উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং মন্দিরে গিয়া শোকের হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য জগন্মাতার নিকটে কাতর প্রার্থনা করিলেন। তারপরে নহবতে গিয়া সাশ্রুনয়নে দাদার মৃত্যুর ঘটনাটি জননীকে জানাইলেন।

ঠাকুর বলিতেন ঃ ভেবেছিলুম, মা ঐ কথা শুনে একেবারে অচৈতন্য হবেন, কিন্তু দেখলুম, হল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। মা প্রথমটায় অল্পস্বল্প দুঃখ প্রকাশ করলেন, তারপরে 'সংসার অনিত্য, সকলকেই একদিন মরতে হবে, তার জন্যে শোক করা বৃথা'—এই সব কথা বলে আমাকেই শান্ত করতে লাগলেন। দেখলুম, তানপুরার কান টিপে সুর যেমন চড়িয়ে দেয়, জগদম্বা যেন তেমনি করে মার মনকে উচ্চগ্রামে চড়িয়ে রেখেচেন, সংসারের শোকতাপ তাঁকে আর স্পর্শ করতে পারচে না। তাই দেখে জগদম্বাকে বারবার প্রণাম করলুম আর নিশ্চিন্ত হলুম।

কয়েকদিন পূর্বেই মৃত্যুকাল জানিতে পারিয়া রামেশ্বর নিজের সংকার ও শ্রাদ্ধের সকল আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাটীর সম্মুখস্থ একটি আমগাছ কাটা হইতেছে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ভাল হল, আমার

কাজে লাগবে। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত তিনি শ্রীরাম-নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। আত্মীয়গণকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহার দেহটাকে যেন শ্মশানের পাশের রাস্তার উপরে অগ্নিসাৎ করা হয়; তাহারা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, কত সাধুলোক রাস্তার উপর দিয়ে যাবে, তাঁদের পদরজে আমার সদ্‌গতি হবে। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল গভীর রাত্রে।

কামারপুকুরের গোপাল নামক এক ব্যক্তির সহিত রামেশ্বরের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। যেদিন যে সময়ে রামেশ্বরের মৃত্যু হয় সেইদিন সেই সময়ে গোপাল শুনিতে পান তাঁহার বাটীর প্রবেশদ্বারে কেহ শব্দ করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি উত্তর পাইলেন: আমি রামেশ্বর, গঙ্গাস্নান করতে যাচ্চি; বাড়ীতে রঘুবীর রইলেন, তাঁর সেবার কোন ত্রুটি না হয় তুমি দেখো। দ্বার খুলিতে গিয়া তিনি পুনরায় শুনিতে পাইলেন: আমার শরীর নাই, দরজা খুললেও তুমি আমাকে দেখতে পাবে না।

রামেশ্বরের মৃত্যুর এক বৎসর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামলাল দক্ষিণেশ্বরে পূজকের পদ গ্রহণ করেন।

এই বৎসরেই শুভ রামনবমী তিথিতে শ্রীশ্রীমার রামভক্ত পিতা রামচন্দ্র নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া ইষ্টপদে মিলিত হন। মা তখন জয়রামবাটীতে। ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে তিনি দক্ষিণেশ্বরে পুনরাগমন করেন ও ঠাকুরের জননীর সঙ্গেই নহবত ঘরে বাস করিতে থাকেন।

ক্ষুদ্র ঘরে মাতাঠাকুরাণীর থাকিতে কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া ঠাকুরের রসদ্দার-সেবক শম্ভুচরণ মল্লিক কালীবাটীর পূর্বদিকে কিছু ব্যবধানে একখণ্ড জমি আড়াইশত টাকায় মৌরুসী করিয়া লন এবং নেপালের রাজকর্মচারী বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের দেওয়া শালকাঠের সাহায্যে—বিশ্বনাথ তখন নেপালরাজের ঘুসুড়িস্থ কাঠের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—মার বাসের জন্য তথায় একখানি সুপরিসর চালাঘর নির্মাণ করাইয়া দেন। এখানে থাকিয়া মা প্রত্যহ ঠাকুরের জন্য বিবিধ খাদ্য স্বহস্তে রন্ধন করিতেন এবং মন্দিরে লইয়া গিয়া কাছে বসিয়া তাঁহাকে পরিতোষপূর্বক ভোজন

করাইতেন। মার তত্ত্বাবধান ও মনস্তুষ্টির জন্য ঠাকুরও দিবাভাগে মাঝে মাঝে এই গৃহে আগমন করিতেন। একদিন অপরাহ্ণ হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হইতে থাকায় ঠাকুরকে এখানে রাত্রিবাস করিতে হইয়াছিল। সেই রাত্রে মা তাঁহাকে ঝোলভাত রান্না করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। হাসিতে হাসিতে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, কালীর বামুনরা রাত্রে বাড়ী যায় না?—এ যেন আমি তাই এসেচি!

বৎসরকাল ঐ চালাঘরে বাস করিবার পরে শ্রীশ্রীমা কঠিন আমাশয়-রোগে আক্রান্তা হন। শম্ভুবাবু তখন কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন। কতকটা সুস্থ হইয়া মা জলবায়ু-পরিবর্তনের জন্য জয়রামবাটী যান। কিন্তু সেখানে রোগের পুনরাক্রমণে তাঁহাকে শয্যাশায়িনী হইতে হয় এবং তাঁহার শরীররক্ষা সংশয়ের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। ঠাকুর তাঁহার ঐ নিদারুণ পীড়ার কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, তাইতো রে হৃদে, ও কেবল আসবে আর যাবে, মনুষ্যজন্মের কিছুই করা হবে না!

অতঃপর রোগশান্তি কামনা করিয়া শ্রীশ্রীমা গ্রাম্যদেবী ৺সিংহবাহিনীর মাড়োতে যাইয়া হত্যা দেন। এই হত্যাদান সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন: আমাকে পাঁচ মিনিটও পড়ে থাকতে হয় নাই; 'তুমি কেন পড়ে আছ গো?'—এই বলে সিংহবাহিনী আমাকে তুলে দিয়েছিলেন। সিংহবাহিনী-কথিত ঔষধ সেবন করিয়া মার শরীর ক্রমশঃ সুস্থসবল হইয়া উঠে।

শম্ভুবাবু এক বড় সওদাগরী আপিসের মুচ্ছুদ্দী ছিলেন; কলিকাতার সিঁদুরিয়াপটি-পল্লীতে তাঁহার বাড়ী ছিল। মাঝে মাঝে তিনি দক্ষিণেশ্বরে নিজের বাগানবাড়ীতে আসিয়া থাকিতেন ও সেইসময়ে প্রতিদিন কিছু সময় ঠাকুরের দিব্যসঙ্গে অতিবাহিত করিতেন। পূর্ব জীবনে তিনি ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন; ঠাকুরের সাহচর্যে তাঁহার ভাবের ক্রমশঃ পরিবর্তন ঘটে এবং তাঁহার ধর্মজীবনও অতি গভীর হইয়া উঠে। আর সেই সঙ্গে গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠিয়াছিল ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও ভালবাসা। ঠাকুরকে তিনি 'গুরুজী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ঠাকুর

কখন কখন বিরক্ত হইয়া বলিতেন, কে কার গুরু?—তুমি আমার গুরু। শম্ভু তাহাতে নিরস্ত না হইয়া বরাবর তাঁহাকে গুরুজীই বলিতেন। রহস্য করিয়া একদিন তিনি ঠাকুরের সম্বন্ধে এই সুন্দর উক্তিটি করিয়াছিলেন: 'ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, শান্তিরাম সিং!' অন্যদিন বলিয়াছিলেন: তাই তুমি কাপড় বগলে করে বেড়াও, একদিন দেখলাম ভারী আরাম!

মথুরবাবু যাহা পান নাই এমন এক দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন শম্ভুবাবু ও তাঁহার সহধর্মিণী। শ্রীশ্রীমাকে তাঁহারা ভক্তি ও সেবা করিতেন সাক্ষাৎ ভগবতী জ্ঞান করিয়া। মাতাঠাকুরাণী দক্ষিণেশ্বরে থাকিলে শম্ভুপত্নী তাঁহাকে প্রতি জয়মঙ্গলবারে (জ্যৈষ্ঠমাসের মঙ্গলবারে) স্বগৃহে লইয়া গিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিতেন। ভক্তির জোর না থাকিলে ইহা সম্ভব হইত না, স্বরূপগোপনশীলা মা তাঁহাদের পূজা নিতে কখনও সম্মতা হইতেন না।

চারিপাঁচ বৎসর ঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমার সেবা করিবার পরে শম্ভুবাবু বহুমূত্র রোগে দেহরক্ষা করেন। ঠাকুর একদিন দেখিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, শম্ভুর প্রদীপে তেল নাই! শম্ভু তেজস্বী ঈশ্বরভক্ত ছিলেন, পীড়িতাবস্থায় তাঁহার মনের প্রসন্নতা একদিনের জন্যও নষ্ট হয় নাই। মৃত্যুর পূর্বে একদিন তিনি হৃদয়কে বলিয়াছিলেন: মরণের জন্যে আমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই, আমি পুঁটলি পাঁটলা বেঁধে প্রস্তুত হয়ে বসে আছি!

১২৮২ সালের ১৬ই ফাল্গুন তারিখে, ঠাকুরের জন্মতিথির দিনে, তাঁহার রত্নগর্ভা জননী চন্দ্রাদেবী গঙ্গালাভ করেন। তাঁহার বয়স তখন পঁচাশী বৎসর হইয়াছিল।

ঠাকুর রোজ সকালে জননীকে প্রণাম করিতে যাইতেন এবং স্বহস্তে তাঁহার কিছু সেবাও করিতেন। তাঁহার সেবার জন্য 'কালীর মা' নামে একটি ঝি রাখা হইয়াছিল, সে দিনের বেলা প্রায় সর্বদা তাঁহার কাছে থাকিত। শেষের দিকে বৃদ্ধার ভীমরতি হইয়াছিল। কালীবাটীর অল্প ব্যবধানে আলমবাজারের পাটের কল, সেই কলের শিটিকে তিনি বৈকুণ্ঠের শঙ্খধ্বনি মনে করিতেন এবং দুপুর বেলায় যতক্ষণ না শিটি শুনিতে

পাইতেন ততক্ষণ খাইতে বসিতেন না। খাইবার জন্য কেহ অনুরোধ করিলে বলিতেন : এখনো লক্ষ্মীনারায়ণের ভোগ হয় নাই, বৈকুণ্ঠে শঙ্খ বাজে নাই, এখন কি খেতে আছে ? রবিবারে বা অন্য ছুটির দিনে শিটি শুনিতে না পাইয়া বৃদ্ধা খাইতে চাহিতেন না, তাঁহাকে খাওয়াইবার জন্য ঠাকুরকে ও হৃদয়কে সেদিন নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে হইত।

নহবতখানায় দ্বিতলের ছোট ঘরখানিতে থাকিতেন চন্দ্রাদেবী। যেদিন তিনি দেহত্যাগ করেন তাহার তিনদিন পূর্বে সন্ধ্যার পরে ঠাকুর তাঁহার কাছে গিয়া বসেন ও গল্পচ্ছলে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজের পূর্বজীবনের নানাকথা বলিয়া তাঁহার মন আনন্দে পরিপূর্ণ করেন। তারপরে অধিক রাত্রে তাঁহাকে শয়ন করাইয়া নিজের ঘরে চলিয়া আসেন। পরদিন সকালে আসিয়া কালীর-মা বৃদ্ধার কোনই সাড়া পাইল না। বেলা আটটার সময়েও তিনি দ্বার উন্মুক্ত করিলেন না দেখিয়া এবং তাঁহার গলা হইতে কেমন একটা বিকৃত শব্দ উঠিতেছে শুনিয়া সে ভয় পাইয়া ঠাকুরকে ও হৃদয়কে সেকথা জানাইল। হৃদয় কৌশলে বাহির হইতে দ্বারের অর্গল খুলিয়া দেখিল বৃদ্ধা পড়িয়া আছেন অচেতন হইয়া। সে তখন কবিরাজী ঔষধ আনিয়া তাঁহার জিহ্বায় লাগাইয়া দিতে ও বিন্দু বিন্দু দুগ্ধ ও গঙ্গাজল তাঁহাকে পান করাইতে লাগিল। তিনদিন এইভাবে কাটিয়া যাইবার পর বৃদ্ধার অন্তিম কাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে অন্তর্জলি করা হইল এবং ঠাকুর ফুল-চন্দন-তুলসী লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে অঞ্জলিদান করিলেন। ঠাকুরের নিয়োগে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল পিতামহীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও বৃষোৎসর্গপূর্বক শ্রাদ্ধক্রিয়া সুনিষ্পন্ন করিয়াছিলেন।[১]

সন্ন্যাসের মর্যাদা রক্ষা করিয়া ঠাকুর অশৌচপালনাদি কোন বৈধ কর্মই

---

১ রামলালদাদার জ্যেষ্ঠকন্যা কৃষ্ণময়ী দেবী লেখককে বলিয়াছেন : ঠাকুরের মাকে যখন অন্তর্জলি করা হইল, 'মাগো, তোমার দেহ থেকে এইটে হয়েচে, সেই দেহটি এখন ধ্বংস হল মা!' এই বলিয়া ঠাকুর তিন আঁজলা গঙ্গাজল মার পায়ে দিলেন ও সেইদিকে আর না তাকাইয়া নিজের ঘরে চলিয়া আসিলেন। অজ্ঞান হওয়ার পূর্বদিন রাত্রে ঠাকুর যেসব কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার মাকে বলিয়াছিলেন আমার বাবা কাছে বসিয়া সবই শুনিয়াছিলেন, কিন্তু এক অক্ষরও বুঝিতে পারেন নাই!

করেন নাই। মায়ের পুত্রোচিত কোন কাজই করিতে পারিলেন না ভাবিয়া একদিন তিনি তর্পণ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু ভাবাবেশে অঙ্গুলিসমূহ অসাড় ও অসংলগ্ন হইয়া সমস্ত জলই তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। বারবার চেষ্টা করিয়াও যখন তিনি তর্পণ করিতে পারিলেন না—শাস্ত্রে ইহাকে গলিতকর্মাবস্থা বলে—তখন কাঁদিয়া স্বর্গতা জননীকে নিজের অক্ষমতা নিবেদন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন শ্রীম-গৃহিণী নিকুঞ্জদেবীকে : শাশুড়ীর মৃত্যুর সময় (ঠাকুর) বলতে লাগলেন, 'মাগো, তুমি কেগো, তুমি আমায় গর্ভে ধারণ করেছিলে! মা, একরূপে এতদিন দেখলি, এখন যেন দেখিস!' শাশুড়ীর মৃত্যুর পর একদিন খাবার আগে বল্লেন, 'দাঁড়াও, আমি মার জন্যে পঞ্চবটীতে একটু কেঁদে আসি।'

ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছেন তাঁহার ভক্ত সন্তানেরা : "সংসারে বাপ-মা পরম গুরু। যতদিন বেঁচে থাকেন, যথাশক্তি তাঁদের সেবা করতে হয়, আর মরে গেলে যথাসাধ্য শ্রাদ্ধ করতে হয়। যে দরিদ্র, কিছু নাই, শ্রাদ্ধ করবার ক্ষমতা নাই, তাকেও বনে গিয়ে তাঁদের স্মরণ করে কাঁদতে হয়; তবে তাঁদের ঋণ শোধ হয়। যতক্ষণ মা আছেন, তাঁকে দেখতে হবে। যতক্ষণ নিজের শরীরের খপর আছে, মার খপরও নিতে হবে।"

ঠাকুরের মাতৃবিয়োগের সংবাদ পাইয়া শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের জন্য চিন্তিত হইয়া পড়েন ও তাড়াতাড়ি একটি ঝি ও একটি লোককে সঙ্গে নিয়া দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসেন। ঠাকুর তাঁহাকে গয়াতে গিয়া তাঁহার মায়ের নামে পিণ্ডদান করিতে বলিয়াছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া শ্রীশ্রীমা শম্ভুবাবু-নির্মিত চালাঘরে বাস করিতে থাকেন। হৃদয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীও তাঁহার সঙ্গে ঐ ঘরে থাকিতেন। এই সময়ে ঠাকুরের কঠিন আমাশয়-রোগ হয়। একজন প্রাচীন স্ত্রীলোক কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার সেবা করিতে থাকেন ও কাশীবাসিনী বলিয়া নিজের পরিচয় দেন। ঠাকুরের সেবার জন্য মাকে তিনি চালাঘর হইতে নহবতে লইয়া গিয়াছিলেন।

সাধক-ভক্ত-সমাগমে

সাধকজীবনেই ঠাকুরের মধ্যে গুরুভাবের বিশেষ প্রকাশ ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সাধনার প্রচণ্ড আবেগে তাঁহার মধ্যে যেমন মায়া-যবনিকা-ভেদকারী চৈতন্যসঞ্চারী মহাশক্তি উদ্বোধিত হইয়া সঞ্চিত হইতেছিল, তেমনি ভাগ্যবশে যেসব সাধকেরা সেই সময়ে সেই মহাশক্তির সংস্পর্শে আসিয়া পড়িতেছিলেন তাঁহারাই নিজ নিজ সাধনমার্গ নূতন আলোকে উদ্ভাসিত দেখিতে পাইয়াছিলেন, এবং গন্তব্য পথের দুর্লঙ্ঘ্য বাধাসকল অনায়াসে অতিক্রম করিয়া লক্ষ্যাভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন। ঐ মহাশক্তির সংস্পর্শ লাভ করিয়াই ঠাকুরের বিভিন্ন সাধনার গুরুগণও—যেমন, তোতাপুরী ও ভৈরবী ব্রাহ্মণী—নিজেদের অপূর্ণতা দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যখনই ঠাকুর কোন বিশেষ ভাবের সাধনা সম্পূর্ণ করিয়াছেন তখনই সেই বিশেষ ভাবের সাধকেরা স্বতঃপ্রেরিত হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা সেই সময়ে, বা উহার পরেও, নিজেরা আসিতে পারেন নাই, কিংবা যাঁহাদের তাঁহার কাছে আসার পথে অনেক বাধা, সেই সব সাধকদের খবর পাইবামাত্র তিনি তাঁহাদিগকে দেখিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছেন ও নিজেই গিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। কখনও বা মহোৎসব-ভাগবতপাঠাদিতে যোগদান করিতে গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। পণ্ডিত পদ্মলোচন-প্রমুখ ঐরূপ কতিপয় উন্নত সাধকের কথা আগেই বলা হইয়াছে, এই অধ্যায়ে আরও কয়েকজনের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে।

কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য

দক্ষিণেশ্বরের উত্তরপাশে সংলগ্ন গ্রাম আড়িয়াদহ। আড়িয়াদহের অধিবাসী কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য পরম রামভক্ত ছিলেন। ঠাকুর মধ্যে মধ্যে তাঁহার গৃহে যাইয়া তাঁহার অধ্যাত্মরামায়ণ-পাঠ শুনিতেন। ঠাকুরের তখন সাধনার অবস্থা। তাঁহাকে নিজালয়ে আগত দেখিলে কৃষ্ণকিশোর

আনন্দে নৃত্য করিতেন। কৃষ্ণকিশোরের সহধর্মিণীও বিশেষ ভক্তি করিতেন ঠাকুরকে।

কৃষ্ণকিশোরের যেমন রামনামে, তেমনি 'মরা' শব্দেও অগাধ বিশ্বাস ছিল। 'মরা' ঋষিপ্রদত্ত মন্ত্র। 'মরা, মরা' জপ করিয়াই দস্যু রত্নাকর বাল্মীকিমুনিতে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন ও তাঁহার হৃদয়ে রামলীলা স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

কৃষ্ণকিশোর বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, কূয়ার ধারে একটি লোক দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া তাহাকে জল তুলিয়া দিতে বলেন—তৃষ্ণার্ত হইয়াছেন, পান করিবেন। লোকটি বলিল যে, সে জাতিতে মুচি। 'শিব শিব বল্লেই তুই শুদ্ধ হয়ে যাবি।' কৃষ্ণকিশোর কহিলেন। শিব শিব বলিয়া সে জল তুলিয়া দিল, মহা আচারী ব্রাহ্মণ সেই জল পান করিলেন অসঙ্কোচে।

আড়িয়াদহের ঘাটে একটি সাধু আসিয়াছেন; তাঁহাকে দেখিতে যাওয়ার কথায় হলধারী মন্তব্য করেন, একটা মাটির খাঁচা দেখে কী হবে? ঠাকুরের মুখে সেকথা শুনিয়া কৃষ্ণকিশোর রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন: কী! হলধারী এমন কথা বলেচে? যে ঈশ্বরচিন্তা করে, আর সেজন্যে সর্বত্যাগ করেচে, তার দেহ মাটির খাঁচা! সে জানে না যে, ভক্তের দেহ চিন্ময়! কৃষ্ণকিশোরের এতই রাগ হইয়াছিল যে, হলধারীর সঙ্গে দেখা হইলে মুখ ফিরাইয়া নিতেন, কথা কহিবেন না। তিনি কালীবাড়ীতে ফুল তুলিতে আসিতেন।

ঠাকুরকে কৃষ্ণকিশোর প্রশ্ন করিয়াছিলেন, পৈতেটা ফেলে দিলে কেন? ঠাকুর উত্তর দেন, আমার মত অবস্থা তোমার একবার হয় তাহলে তুমি বোঝ। ঠাকুর বলিতেন: তাই হল! তার নিজেরই উন্মাদ হল। তখন সে কেবল ওঁওঁ বলত আর এক ঘরে চুপ করে বসে থাকত। সকলে মাথা গরম হয়েচে মনে করে কবিরাজ ডাকলে। নাটাগড়ের রাম কবিরাজ এল। কৃষ্ণকিশোর তাকে বল্লে. 'ওগো, আমার রোগ আরাম কোরো', কিন্তু দেখো যেন আমার ওঁকারটি আরাম কোরো না!'

কৃষ্ণকিশোরকে একদিন চিন্তান্বিত দেখিয়া ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, কী হয়েচে? কৃষ্ণকিশোর কহিলেন: টেক্সওয়ালা এসেছিল, তাই ভাবচি। বলেচে, টাকা না দিলে ঘটী-বাটি বেচে লবে। ঠাকুর বলিলেন: কী হবে ভেবে? না হয় ঘটী-বাটি লয়ে যাবে। তোমাকে তো বেঁধে লয়ে যেতে পারবে না—তুমি তো 'খ' গো। কৃষ্ণকিশোর বলিতেন, আমি আকাশবৎ। ঠাকুর মাঝে মাঝে 'তুমি খ' বলিয়া ঠাট্টা করিতেন।

কৃষ্ণকিশোর জীবনে অনেক শোকতাপও পাইয়াছিলেন। দুই উপযুক্ত পুত্রের অকাল মৃত্যুতে তিনি শোকে অধীর হইয়াছিলেন। 'পুত্রশোকের এমনি প্রভাব!' ঠাকুর বলিতেন।

নারায়ণ শাস্ত্রী

পশ্চিম ভারতের, খুব সম্ভবতঃ রাজস্থানের অধিবাসী নারায়ণ শাস্ত্রী পাঁচটি দর্শনশাস্ত্রের পাঠ সম্পূর্ণ করিয়া ন্যায়দর্শন পড়িবার জন্য বাঙ্গলায় আসেন। এখানে আসিবার পূর্বেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং জয়পুরের মহারাজা তাঁহাকে সভাপণ্ডিত করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। বাঙ্গলার মধ্যে নবদ্বীপ সেই সময়ে নব্যন্যায়াদি-সংস্কৃত-বিদ্যার পীঠভূমি। নবদ্বীপে যাইবার পথে তিনি কলিকাতায় আসেন ও দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী দেখিতে গিয়া ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন।

ঠাকুরের তখন দিব্যোন্মাদ অবস্থা। নারায়ণ শাস্ত্রী আসিয়া দেখিলেন, তিনি একটা বাঁশ কাঁধে করিয়া বেড়াইতেছেন। 'এহ্ উন্মত্ত হ্যায়!' শাস্ত্রী বলিয়াছিলেন সেই সময়ে।

সাত বৎসরে ন্যায়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়া—দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর তাঁহার শাস্ত্রপাঠেই ব্যয়িত হইয়াছিল!—তিনি আবার দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন এবং ঠাকুরের ভাবময় মূর্তি ও ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে তাঁহার সমাধি দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। ধর্মানুরাগী, উদার ও উন্নতচেতা শাস্ত্রীকে পাইয়া ঠাকুরও তাঁহার সহিত অনেক কাল কাটাইতে লাগিলেন তত্ত্বালোচনা করিয়া। শাস্ত্রী দেখিলেন, যেসকল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় তিনি পড়িয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছেন, কিন্তু ধারণায় আনিতে পারেন নাই, ঠাকুর সেই

সমুদয় করামলকবৎ আয়ত্ত করিয়া বসিয়া আছেন! তাঁহার নির্বেদ জন্মিল। জীবনের অনিত্যতার কথা চিন্তা করিয়া তিনি স্বীয় জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া ফেলিলেন, এবং মহাপুরুষ-সংশ্রয় ব্যতীত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সম্ভব নহে জানিয়া ঠাকুরের কৃপাপ্রার্থী হইবেন সংকল্প করিলেন।

এইরূপ সময়ে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত রাণী রাসমণির তরফ হইতে একটি মকদ্দমা চালাইবার ভার প্রাপ্ত হন এবং সরজমিনে তদারক করিবার জন্য রাণীর দৌহিত্র দ্বারিকবাবুর সঙ্গে কালীবাটীতে আসেন। ঠাকুর এখানে আছেন জানিতে পারিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য তিনি ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন।

মধুসূদনের সহিত আলাপ করিবার জন্য ঠাকুর প্রথমে শাস্ত্রীকে পাঠাইয়া দিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে নিজেও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কথায় কথায় শাস্ত্রী মধুসূদনকে তাঁহার ধর্মান্তর গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, পেটের দায়ে তিনি উহা করিয়াছেন। বিষম বিরক্ত হইয়া শাস্ত্রী তখন বলিয়া উঠেন: এই দুইদিনের সংসারে পেটের দায়ে স্বধর্ম ত্যাগ করা—এ কী হীনবুদ্ধি! মরিতে তো একদিন হইবেই, না হয় মরিয়াই যাইতেন। শাস্ত্রী তাঁহার সহিত আর কথা কহিলেন না।

মধুসূদন তখন ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে কিছু শুনিতে চাহিলেন। ঠাকুর বলিতেন, আমার মুখ যেন কে চেপে ধরলে, কিছু বলতে দিলে না। হৃদয়-প্রমুখ কেহ কেহ বলিয়াছেন, কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের ঐভাব চলিয়া গিয়াছিল এবং রামপ্রসাদ ও অন্যান্য সাধকগণের রচিত পদাবলী গাহিয়া তিনি মধুসূদনের মনোহরণ করিয়াছিলেন।

পেটের দায়ে স্বধর্ম ত্যাগ করা যে অতি হীনবুদ্ধির কাজ, শাস্ত্রী এই কথাটি একখণ্ড কয়লা দিয়া বড় বড় বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন ঠাকুরের ঘরের দরজার পূর্বদিকের দালানের দেওয়ালে। অনেকদিন এদেশে বাস করায় তিনি বাঙ্গলা ভাষা ভালই শিখিয়াছিলেন।

অতঃপর ঠাকুরের নিকটে সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রী তপস্যা করিবার জন্য বশিষ্ঠাশ্রমে চলিয়া গেলেন, ব্রহ্মোপলব্ধির সাধনায় প্রাণপাত

করিবেন। তাঁহার কথায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন: নারায়ণ শাস্ত্রীর খুব বৈরাগ্য হয়েছিল। অত বড় পণ্ডিত—স্ত্রী ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। 'হর, হর' বলতে বলতে তার ভাব হত, দক্ষিণেশ্বরে প্রায় এসে থাকত। বশিষ্ঠাশ্রমে যাবার ভারি ইচ্ছা, সেখানে তপস্যা করবে। আমি তাকে সেখানে যেতে বারণ করলুম। তখন বলে, 'কোন্ দিন মরে যাব—ডুব্‌কি কব্ ফাট যায়গা, সাধন কবে করব।' অনেক জেদাজেদির পর আমি যেতে বল্লুম।

অচলানন্দনাথ

ঠাকুরের তন্ত্রসাধন যখন সম্পূর্ণ হইয়াছে ও তান্ত্রিক সাধকেরা তাঁহার কাছে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই সময়ের কথায় তিনি বলিয়াছেন: তখন তান্ত্রিক সব ঢের আসত, শ্রীচক্রের অনুষ্ঠান করত। তাদের সাধনায় দরকার বলে আদা-পেঁয়াজ ছাড়িয়ে, মুড়ি-কড়াইভাজা আনিয়ে সব জোগাড় করে দিতুম; আর তারা সব ঐ নিয়ে পূজা করচে, জগদম্বাকে ডাকচে, দেখতুম। আমাকে তারা অনেক সময় চক্রে নিয়ে বসত, অনেক সময় চক্রেশ্বর করে বসাত, 'কারণ' গ্রহণ করতে বলত। কিন্তু যখন বুঝত যে ওসব খেতে পারি না, নাম করলেই নেশা হয়ে যায়, তখন আর বলত না। চক্রে বসলে কারণ গ্রহণ করতে হয় বলে কারণ নিয়ে কপালে ফোঁটা কাটতুম বা আঘ্রাণ নিতুম বা বড়জোর আঙুলে করে মুখে ছিটে দিতুম; আর তাদের পাত্রে ঢেলে ঢেলে দিতুম। দেখতুম, তাদের ভিতর কেউ কেউ কারণ গ্রহণ করেই ঈশ্বরচিন্তায় মন দেয়, বেশ তন্ময় হয়ে তাকে ডাকে; কেউ কেউ আবার লোভে পড়ে খায়, আর বেশী খেয়ে শেষটা মাতাল হয়ে পড়ে। একদিন ঐরকমে বেশী ঢলাঢলি করায় দেখে ওসব দেওয়া বন্ধ করে দিলুম। রাজকুমারকে কিন্তু বরাবর দেখেচি, গ্রহণ করেই তন্ময় হয়ে জপে বসত, কখন অন্যদিকে মন দিত না। শেষটা কিন্তু নামযশ-প্রতিষ্ঠার দিকে যেন একটু ঝোঁক হয়েছিল। হতেই পারে—ছেলে পুলে পরিবার ছিল, বাড়ীতে অভাবের দরুন টাকাকড়ি লাভের দিকে একটু আধটু মন দিতে হত। তা যাই হোক, সে কিন্তু

সাধনার সহায় বলেই কারণ গ্রহণ করত; লোভে পড়ে খেয়ে কখন ঢলাঢলি করে নি।

রাজকুমারের বাড়ী ছিল কোন্নগরের নিকটবর্তী কোতরঙে। রাজকুমার বীরভাবের সাধক ছিলেন। তাঁহার পূর্ণাভিষেক বা তান্ত্রিক সন্ন্যাসের নাম ছিল অচলানন্দনাথ। তিনি কালীঘাটে অনেক সময় থাকিতেন ও অনেকগুলি শিষ্যপ্রশিষ্য রাখিয়া গিয়াছিলেন।

চন্দ্র ও গিরিজা

চন্দ্র ও গিরিজা ভৈরবী-ব্রাহ্মণীর দুই শিষ্য, পূর্ববঙ্গের লোক। ঠাকুরের সহিত প্রথম মিলনের দিনে ব্রাহ্মণী চন্দ্র ও গিরিজার কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণীর আহ্বানে চন্দ্র আড়িয়াদহে দেবমণ্ডলের ঘাটে তাঁহার কাছে আসেন ও সেখানেই ঠাকুরের সহিত তাঁহার মিলন সংঘটিত হয়। গিরিজা সম্ভবতঃ কিছুকাল পরে আসিয়াছিলেন।

চন্দ্র ঈশ্বরপ্রেমিক ছিলেন। সাধনা করিতে করিতে তাঁহার 'গুটিকা-সিদ্ধি' লাভ হইয়াছিল। মন্ত্রপূত গুটিকা অঙ্গে ধারণ করিয়া তিনি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারিতেন, মানুষের অদৃশ্য হইয়া। ইহার ফলে তাঁহার অহঙ্কার হয় ও কামকাঞ্চনাসক্তি বাড়িয়া যায়। এক ধনী ব্যক্তির কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়া সিদ্ধাই-প্রভাবে তিনি তাঁহার গৃহে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন এবং ইহার পরিণামে সিদ্ধাইটিও খোয়াইয়া নানাভাবে লাঞ্ছিত হন।[১] সিদ্ধাই যোগভ্রষ্ট করে, ঠাকুর বলিতেন।

---

১ বহুবৎসর পরের কথা। ১৩০৬ সালে (১৮৯৯) স্বামী বিবেকানন্দ যখন দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গিয়াছেন, সেই সময়ে একদিন এক ব্যক্তি বেলুড় মঠে আসিয়া নিজেকে 'চন্দ্র' বলিয়া পরিচয় দেন। ঠাকুরঘরে গিয়া তিনি ঠাকুরকে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করেন ও ভাবে বিভোর হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে থাকেন। মঠে তিনি মাসেক কাল ছিলেন, ঠাকুরঘরে বসিয়া প্রতিদিন অতি ভক্তির সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া জপধ্যান করিতেন। তাঁহার দুই চক্ষে তখন ধারা বহিত। তিনি বলিতেন, তাঁহার সম্বন্ধে ঠাকুর যাহা যাহা বলিয়াছিলেন সবই সত্য হইয়াছে, কেবল একটি কথা ফলিতে বাকি আছে—মৃত্যুর পূর্বে ঠাকুর তাঁহাকে দেখা দিবেন বলিয়াছিলেন। ঠাকুরের

ঠাকুর একদিন ব্রাহ্মণীর অপর শিষ্য গিরিজাকে সঙ্গে করিয়া শম্ভুবাবুর বাগানে গিয়াছিলেন। ঠাকুর, শম্ভু ও গিরিজা তিনজন একত্র মিলিত হওয়ায় ভগবৎ-প্রসঙ্গে কোথা দিয়া যে কাল কাটিতে লাগিল তাহা কেহই টের পাইলেন না। ক্রমে রাত্রি একপ্রহর হইল। শম্ভুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া ঠাকুর গিরিজার সহিত রাস্তায় আসিলেন, কালীবাটী যাইবেন। কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে প্রতিপদে তাঁহার পদস্খলন ও দিগ্‌ভ্রম হইতে লাগিল। ঠাকুরের কষ্ট হইতেছে দেখিয়া গিরিজা কহিলেন, দাদা, দাঁড়াও, আমি তোমাকে আলো দেখাচ্চি। গিরিজা পেছন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিজের পৃষ্ঠদেশ হইতে দীর্ঘ এক জ্যোতির ছটা বাহির করিয়া পথ আলোকিত করিলেন। সেই ছটায় কালীবাটীর ফটক পর্যন্ত বেশ দেখা যাইতেছিল, ঠাকুর আলোয় আলোয় চলিয়া আসিলেন।

ভক্তদের কাছে ঘটনাটি বিবৃত করিয়াই ঠাকুর বলিয়াছিলেন: কিন্তু তাদের সে ক্ষমতা আর বেশীদিন রইল না, এখানকার সঙ্গে কিছুদিন থাকতে থাকতে ঐসব সিদ্ধাই চলে গেল। (নিজের শরীর দেখাইয়া) মা এর ভিতরে, তাদের কল্যাণের জন্যে, তাদের সিদ্ধাই টেনে নিলেন, আর তাদের মন আবার ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে গেল।

ঠাকুরের উক্তি হইতে মনে হয়, চন্দ্রের সিদ্ধাইও ঠাকুরই নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া নিয়াছিলেন। পুঁথিকার সেকথাটি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন।

কামতৃপ্তি-হেতু করে শক্তির চালনা।
বারে বারে প্রভু তায় করিলেন মানা॥
শ্রীআজ্ঞায় অনাবিষ্ট দেখিয়া তাহারে।
টানিয়া লইলা শক্তি নিজের শরীরে॥
চন্দ্র হৈল বিষহীন ভুজঙ্গের প্রায়।
সরোদনে শ্রীচরণে লুটালুটি খায়॥

মানসপুত্র শ্রীরাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) সেই সময়ে মঠে ছিলেন, তাঁহার সহিত একান্তে তিনি অনেক কথা কহিতেন। ঠাকুরের সম্বন্ধে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আনন্দের সহিত নিজের জানা সকল কথাই বলিতেন। শান্তপ্রকৃতি সাদাসিধা মানুষ ছিলেন তিনি। ব্রহ্মানন্দ মহারাজ তাঁহাকে মঠেই থাকিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন।

বামনদাস মুখোপাধ্যায়

নদীয়া জেলার উলা গ্রামের অধিবাসী বামনদাস মুখোপাধ্যায় একবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বিশ্বাসদের বাগানবাড়ীতে কিছুদিন বাস করেন। উলার বর্তমান নাম বীরনগর। বামনদাসবাবু জমিদার মানুষ, দাতা বলিয়াও তাঁহার নামডাক ছিল। কলিকাতার সন্নিকটে কাশীপুরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মা-কালীর বৃহৎ এক মন্দির বিদ্যমান।

ঠাকুর তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন হৃদয়কে সঙ্গে করিয়া। তাঁহার কথা বামনদাস পূর্বেই শুনিয়া থাকিবেন, রাসমণির কালীবাটী হইতে আসিয়াছেন শুনিয়া অনুমানে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন ও সমাদরে কাছে বসাইয়া সবিনয়ে কহিলেন: আজ আপনার দর্শন পেয়ে ধন্য হলাম। যদি অনুগ্রহ করে এখানে এলেন আমাদের কিছু ঈশ্বরীয় কথা বলুন। ঘোর বিষয়ী লোকের সমক্ষে ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতে ঠাকুর কুণ্ঠিত হইতেন, কতিপয় প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া বলিলেন, আগে এদের বিদায় কর, তারপর আমাদের কথা হবে। বামনদাসকে বিশেষভাবে এই কথাটি তিনি বলিয়াছিলেন: ঈশ্বরের কৃপায় ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, তিনি কৃপা করে দেখা না দিলে কেউ তাঁকে দেখতে পায় না। তাঁহার অমিয়কণ্ঠের শ্যামাসঙ্গীত শুনিয়া বামনদাস মোহিত হন। চলিয়া আসিতে আসিতে ঠাকুর শুনিতে পাইলেন, বামনদাস বলিতেছেন: বাবা, বাঘ যেমন মানুষকে ধরে তেমনি ঈশ্বরী এঁকে ধরে রয়েচেন! ঠাকুরের তখন সাধনকাল, সর্বদাই ভাবে বিভোর।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন

যেসকল সাধক পণ্ডিতকে ঠাকুর দেখিতে গিয়াছিলেন ও যাঁহাদের কথা তিনি সময়ে সময়ে উল্লেখ করিতেন, পণ্ডিত জয়নারায়ণ তাঁহাদের অন্যতম। জয়নারায়ণ সংস্কৃত কলেজে ন্যায়ের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন: জয়নারায়ণ খুব উদার ছিল। অত বড় পণ্ডিত, কিন্তু অহঙ্কার ছিল না। নিজের মৃত্যুর কথা জানতে পেরে বলেছিল, কাশী যাবে, সেখানেই দেহ রাখবে—তাই হয়েছিল।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রাহ্মসমাজনেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় বলিয়াছেন ঠাকুর :

"সেজবাবুকে (মথুরবাবুকে) বল্লুম, 'আমি শুনেচি দেবেন্দ্র ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তা করে, আমার তাকে দেখবার ইচ্ছা হয়।' সেজবাবু বল্লে, 'আচ্ছা বাবা, আমি তোমায় নিয়ে যাব ; আমরা হিন্দু কলেজে এক ক্লাসে পড়তুম, আমার সঙ্গে বেশ ভাব আছে।' সেজবাবুর সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হল।···সেজবাবু আমার কথা বল্লে, 'ইনি তোমায় দেখতে এসেচেন— ইনি ঈশ্বর ঈশ্বর করে পাগল।' আমি লক্ষণ দেখবার জন্যে দেবেন্দ্রকে বল্লুম, 'দেখি গা, তোমার গা।' দেবেন্দ্র গায়ের জামা তুল্লে দেখলুম— গৌরবর্ণ, তার উপর সিঁদূর ছড়ান।···একটু অভিমান দেখেছিলুম। তা হবে না গা ? অত ঐশ্বর্য, বিদ্যা, মানসম্ভ্রম !···

"দেবেন্দ্রের সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমার হঠাৎ সেই অবস্থাটি হল। সেই অবস্থা হলে কে কিরূপ লোক দেখতে পাই। আমার ভিতর থেকে হী হী করে একটা হাসি উঠল। যখন ঐ অবস্থা হয় তখন পণ্ডিত ফণ্ডিত তৃণ জ্ঞান হয়। যদি দেখি পণ্ডিতের বিবেকবৈরাগ্য নাই তখন খড়কুটোর মত বোধ হয়। তখন দেখি যে, শকুনি যেন খুব উঁচুতে উঠেচে কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর। দেখলুম যোগ ভোগ দুইই আছে। অনেক ছেলেপুলে, ছোট ছোট ; ডাক্তার এসেচে। তবেই হল, অত জ্ঞানী হয়ে সংসার নিয়ে সর্বদা থাকতে হয়। বল্লুম, 'তুমি কলির জনক। জনক এদিক ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি। তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরে মন রেখেচ শুনে তোমায় দেখতে এসেচি ; আমায় ঈশ্বরীয় কথা কিছু শুনাও।'

"তখন বেদ থেকে কিছু কিছু শুনালে। বল্লে, এই জগৎ যেন একটি ঝাড়ের মত, আর জীব হয়েচে একএকটি ঝাড়ের দীপ। আমি এখানে পঞ্চবটীতে যখন ধ্যান করতুম ঠিক ঐরকম দেখেছিলুম। দেবেন্দ্রের কথার সঙ্গে মিল দেখে ভাবলুম, তবে তো খুব বড়লোক। ব্যাখ্যা করতে বল্লুম, তা বল্লে, 'এ জগৎ কে জানত ? ঈশ্বর মানুষ করেচেন তাঁর মহিমা

প্রকাশ করবার জন্তে। ঝাড়ের আলো না থাকলে সব অন্ধকার, ঝাড় পর্যন্ত দেখা যায় না।'

"অনেক কথাবার্তার পর দেবেন্দ্র খুশী হয়ে বল্লে, 'আপনাকে উৎসবে আসতে হবে।' আমি বল্লুম, 'সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমার তো এই অবস্থা দেখচ—কখন কিভাবে তিনি রাখেন।' দেবেন্দ্র বল্লে, 'না, আসতে হবে; তবে ধুতি আর উড়ানি পরে এসো। তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু বল্লে আমার কষ্ট হবে।' আমি বল্লুম, 'তা পারব না, আমি বাবু হতে পারব না।' দেবেন্দ্র, সেজবাবু সব হাসতে লাগল।

"তার পরদিনই সেজবাবুর কাছে দেবেন্দ্রের চিঠি এল—আমাকে উৎসব দেখতে যেতে বারণ করেচে। বলে—অসভ্যতা হবে, গায়ে উড়ানি থাকবে না।" [কথামৃত]

বিশ্বনাথ উপাধ্যায়

নেপালের রাজপ্রতিনিধি বিশ্বনাথ উপাধ্যায় প্রথমাবস্থায় ঘুস্থড়িতে অবস্থিত নেপালীদের শালকাঠের কারখানার কর্মচারী ছিলেন। একরাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন, এক ব্যক্তি তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞান দিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ঠাকুরকে দর্শন করেন, ঠাকুরকেই তাঁহার স্বপ্ন-দৃষ্ট ব্যক্তি বলিয়া মনে হইতে থাকে, আর ঠাকুরও তাঁহাকে পরিচিত লোকের মত গ্রহণ করেন। সেইদিন হইতে উপাধ্যায় প্রতি সপ্তাহে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন ও প্রতি মাসে তাঁহাকে বাটীতে লইয়া গিয়া সস্ত্রীক তাঁহার সেবা করিতেন। ঠাকুর তাঁহাকে 'কাপ্তেন' বলিয়া ডাকিতেন।

কাপ্তেন যখন ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করিতেছিলেন সেই সময়ে তাঁহার নামে তহবিল তছরুপের অভিযোগ হয় ও তিনি নেপাল-দরবারে যাইতে আদিষ্ট হন। সর্বনাশা বিপদ সমুপস্থিত দেখিয়া কাপ্তেন ঠাকুরের শরণাপন্ন হন ও তাঁহার চরণে পতিত হইয়া রোদন করিতে থাকেন। ঠাকুর তখন করুণার্দ্র হইয়া বলিয়াছিলেন, কালীর ইচ্ছায় আবার তুমি আসবে।

নেপালে গিয়া কাপ্তেন এমনই হিসাব-নিকাশ দিয়াছিলেন যে, দরবার সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কলিকাতায় রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।[১]

কাপ্তেন দীর্ঘকাল, অন্যূন দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া ঠাকুরকে দর্শন ও সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুর একদিন (আশ্বিন, ১২৯১) তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"কলিকাতায় কাপ্তেনের বাড়ীতে গিছলুম, ফিরে আসতে অনেক রাত হয়েছিল। কাপ্তেনের কী স্বভাব, কী ভক্তি! ছোট কাপড়খানি পরে আরতি করে। একবার তিনবাতিওলা প্রদীপে আরতি করে, তারপর আবার একবাতিওলা প্রদীপে। আবার কর্পূরের আরতি। সে-সময়ে কথা কয় না, আমায় ইসারা করে আসনে বসতে বল্লে। পূজা করবার সময় চোখের ভাব—ঠিক যেন বোলতা কামড়েচে! গান গাইতে পারে না, কিন্তু সুন্দর স্তবপাঠ করে।

"তার মার কাছে নীচে বসে। মা আসনের উপর বসবে। বাপ ইংরেজের হাওয়ালদার। যুদ্ধক্ষেত্রে এক হাতে বন্দুক, আর এক হাতে শিবপূজা করে। খানসামা শিব গড়ে গড়ে দিচ্চে। শিবপূজা না করে জল খাবে না। ছয় হাজার টাকা মাহিনা বছরে। মাকে কাশীতে মাঝে মাঝে পাঠায়। সেখানে বারতের জন মার সেবায় থাকে।...

"আগে হঠযোগ করেছিল, তাই আমার সমাধি কি ভাবাবস্থা হলে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

"কাপ্তেনের পরিবার—তার আবার আলাদা ঠাকুর, গোপাল। এবার তত কৃপণ দেখলুম না। সেও গীতা-টীতা জানে। ওদের কী ভক্তি!—আমি যেখানে খাব সেইখানেই আচাব। খড়কে-কাঠিটি পর্যন্ত!

"পাঁঠার চচ্চড়ি করে। কাপ্তেন বলে, পনর দিন থাকে; কিন্তু কাপ্তেনের পরিবার বল্লে, 'নাহি নাহি, সাত রোজ।' কিন্তু বেশ লাগল। ব্যঞ্জন সব একটু একটু। আমি বেশী খাই বলে আজকাল

১ রামচন্দ্র দত্ত-প্রণীত ঠাকুরের আদি জীবনী 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' হইতে প্রাপ্ত বিবরণ।

আমায় বেশী দেয়। খাবার পর হয় কাপ্তেন, নয় তার পরিবার বাতাস করবে।...

"পশ্চিমে লোকদের সাধুভক্তি বেশী। জাঙ্ বাহাদুরের ছেলেরা আর ভাইপো কর্ণেল এখানে এসেছিল। যখন এল পেন্টুলন খুলে, যেন কত ভয়ে।

"কাপ্তেনের সঙ্গে একটি ওদের দেশের মেয়ে এসেছিল, ভারি ভক্ত।... গীতগোবিন্দ গান কণ্ঠস্থ। তার গান শুনতে দ্বারিকবাবুরা এসে বসেছিল। আমি বল্লুম, এরা শুনতে চাইচে, লোক ভাল। যখন গীতগোবিন্দ গাইলে তখন দ্বারিকবাবু রুমালে চক্ষের জল পুছতে লাগল। বিয়ে কর নাই কেন, জিজ্ঞাসা করাতে বলে, 'ঈশ্বরের দাসী, আবার কার দাসী হব?' আর সবাই তাকে দেবী বলে খুব মানে—যেমন পুঁথিতে (শাস্ত্রে) আছে।"

অন্য একদিন ঠাকুর বলিয়াছিলেন :

"কাপ্তেনের বেদ, বেদান্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, অধ্যাত্ম, এসব কণ্ঠস্থ। ...খুব ভক্তি! আমি বরাহনগরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, তা আমায় ছাতা ধরে। ওর বাড়ীতে লয়ে গিয়ে কত যত্ন—বাতাস করে, পা টিপে দেয়। ...আমি একদিন ওর বাড়ীতে পাইখানায় বেহুঁশ হয়ে গেছি। ও তো অত আচারী, পাইখানার ভিতর আমার কাছে গিয়ে পা ফাঁক করে বসিয়ে দেয়। অত আচারী, ঘৃণা করলে না।

"কাপ্তেনের অনেক খরচা, কাশীতে ভায়েরা থাকে, তাদের দিতে হয়।...

"কাপ্তেনের পরিবার আমায় বল্লে যে, সংসার ওর ভাল লাগে না। তাই মাঝে বলেছিল, সংসার ছেড়ে দেব। মাঝে মাঝে ছেড়ে দেব, ছেড়ে দেব, করত।" [কথামৃত]

কোয়ার সিং ও শিখসিপাহীরা

ঠাকুরের সময়ে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর উত্তরপাশে একটি সরকারী বারুদখানা ছিল; পাহারা দিবার জন্য একদল শিখসৈন্য সেখানে থাকিত। তাহারা মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে আসিত, নিজেদের আবাসে

তাহাকে লইয়া যাইত, কখন বা নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইত। তাহাদের হাবিলদার কোয়ার সিং ঈশ্বর-প্রসঙ্গে ঠাকুরের ভাবসমাধি হইতে দেখিয়া তাঁহাকে 'বাবা নানক' জ্ঞান করিতেন।

একদিন ঠাকুর শিখদের আবাসে গিয়াছেন নারায়ণ শাস্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া। ঠাকুরকে স্বয়মাগত দেখিয়া শিখরা উল্লসিত হইল এবং শ্রীপদে প্রণাম করিয়া তাঁহার শ্রীমুখের কথা শুনিবার জন্য তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিল। ঠাকুর ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন ও শিখরা একমনে সেই কথামৃত পান করিতেছে, এমন সময়ে, ঠাকুরের কথার ফাঁকে, শাস্ত্রীও দুইএকটি জ্ঞানের কথা তাহাদিগকে শুনাইলেন।

শুনিয়া সৈন্যের দল উন্মত্তের প্রায়।
উঠাইয়া তরবারি কাটিবারে যায়॥
সংসারীর মুখে জ্ঞানতত্ত্বের ব্যাখ্যান।
শুনাইলে শিখদলে বুঝে অপমান॥
শাস্ত্রীরে কহিল তুমি আসক্ত সংসারী।
জ্ঞানকথা-উপদেশে নহ অধিকারী॥

... ...

কোপাবিষ্ট শিখে দেখি প্রভু নারায়ণ।
মিষ্টভাষে তুষ্ট কৈলা তাহাদের মন॥

আরও আগেকার দিনের কথা। ইংরাজ সেনাপতির পরিচালনায় সামরিক পোশাকে সজ্জিত শিখসৈন্যরা দ্রুতপদে দুর্গের অভিমুখে যাইতেছিল। পথিমধ্যে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হইতেই—ফিটন গাড়ীতে করিয়া মথুরবাবুর সঙ্গে তিনি আসিতেছিলেন—সৈন্যরা হাতের বন্দুক ভূমিতে ফেলিয়া, 'জয় গুরু' বলিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। এই কাজটি সামরিক-রীতি-বিরুদ্ধ; ইহা গুরুতর অপরাধ বলিয়াও গণ্য হইতে পারে।

দেখি সেনাপতি কহে সৈনিকের দলে।
অনুমতি বিনা হেন কি হেতু করিলে॥

উত্তরে অধ্যক্ষে কহে যত সৈন্যগণে।
আমাদের এই রীতি গুরু-দরশনে॥
নাহি করি কোন গ্রাহ্য থাক্ যাক্ প্রাণ।
দেখিলে করিব আগে গুরুরে প্রণাম॥
আশিস করিলা প্রভু ডান হাত তুলে।
অস্ত্রত্যাগী ধরাশায়ী সৈনিকের দলে॥
শ্রীপ্রভুর কৃপাদৃষ্টে মহিমা অপার।
সেনাপতি পুনরুক্তি না করিল আর॥

দয়ানন্দ সরস্বতী

১২৭৯ সালের শীতকালে কলিকাতায় আসিয়া আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী সিঁতির এক বাগানে প্রায় চারিমাস ছিলেন। তখনও তিনি নিজের মত প্রচার করিবার জন্য দল গঠন করেন নাই। ঠাকুর একদিন তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়কে সাথে নিয়া। দয়ানন্দ নিরাকারবাদী ছিলেন, বেদোক্ত দেবতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিলেও ঈশ্বরের সাকার রূপ মানিতেন না। কাপ্তেনকে 'রাম রাম' জপিতে শুনিয়া বলিয়াছিলেন, তার চেয়ে 'সন্দেশ সন্দেশ' বল। ঠাকুরকে কিন্তু তাঁহার ভালই লাগিয়াছিল, ঠাকুরের সমাধি হইতে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন: শাস্ত্র মন্থন করিয়া আমাদের মত পণ্ডিতেরা খায় ঘোলটা, আর ইঁহার মত মহাপুরুষেরা খান মাখনটুকু।

তাঁহার সম্বন্ধে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন: সিঁতির বাগানে দেখতে গিয়েছিলুম। দেখলুম—একটু শক্তি হয়েচে, বুকটা সর্বদা লাল হয়ে রয়েচে; বৈখরী অবস্থা—দিনরাত কথা কইচে; ব্যাকরণ লাগিয়ে অনেক কথার মানে উল্‌টো-পাল্‌টা করতে লাগল; নিজে একটা কিছু করব, একটা মত চালাব—এ অহঙ্কার ভিতরে রয়েচে।

দয়ানন্দের কলিকাতায় আসিবার প্রায় তিনবৎসর পূর্বে কাশীতে পণ্ডিত-দের সহিত তাঁহার বিচার-বিতর্ক হইয়াছিল। বিচারে তাঁহাকে কোণঠাসা করিয়া পণ্ডিতেরা একবাক্যে উচ্চৈঃস্বরে পুনঃপুনঃ বলিয়াছিলেন, 'দয়ানন্দেন

যদুক্তং তদ্ধেয়ম্।' সিঁতির এক পণ্ডিতের মুখে ঠাকুর এই ঘটনাটি শুনিয়াছিলেন; পণ্ডিত তখন কাশীতে থাকিয়া বেদান্ত অধ্যয়ন করিতেন ও দয়ানন্দকে দেখিয়াছিলেন।[১]

১ আর্যসমাজীরা ঈশ্বরের সাকার রূপ মানেন না বলিয়াই প্রতিমার বা প্রতীকে তাঁহার পূজার বিরোধিতা করেন। তাঁহারা তীর্থমাহাত্ম্যে এবং পিণ্ডদানাদি শ্রাদ্ধ-ক্রিয়ায়ও বিশ্বাস করেন না। কাশীতে প্রাচীন সাধুদের মুখে শুনিয়াছি, শিবলিঙ্গ-প্রতীকে বিশ্বনাথের পূজা সঙ্গত কি-না, ইহাই ছিল পণ্ডিতগণের সহিত দয়ানন্দের বিচার্য বিষয়। অনেক বাদানুবাদের পরে পণ্ডিতেরা প্রশ্ন করেন: ব্রহ্ম সর্বব্যাপী কি-না; সর্বব্যাপী হইলে শিবলিঙ্গেও আছেন কি-না; আর শিবলিঙ্গেও থাকেন যদি, তাহা হইলে ঐ প্রতীকে ঈশ্বরকে পূজা কেন করা যাইবে না? দয়ানন্দ ইহার সদুত্তর দিতে পারেন নাই। আরও শুনিয়াছি, ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ ত্রৈলঙ্গস্বামী এক টুকরা কাগজে দয়ানন্দকে কিছু লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং ঐ লেখাটি পাইবার পরেই তিনি কাশী হইতে সরিয়া পড়েন। শেষের দিকে তাঁহার যে মত-পরিবর্তন হইয়াছিল উহা ত্রৈলঙ্গস্বামীর ও ঠাকুরের শুভকামনার প্রভাবেই হইয়াছিল মনে করিলে অন্যায় হইবে না। সন্ন্যাসী দয়ানন্দ পুরুষকারের প্রতিমূর্তি ছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ-ভাবাবেশে

ঠাকুরের বাসনা হইয়াছিল, শ্রীগৌরাঙ্গের নগর-সংকীর্তন দেখিবেন। দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া তিনি দেখিলেন ঃ পঞ্চবটীর দিক হইতে এক বিরাট সংকীর্তনতরঙ্গ বকুলতলার দিকে আসিতেছে, বকুলতলা হইতে বাঁকিয়া কালীবাটীর প্রধান ফটকের অভিমুখে যাইতেছে এবং বৃক্ষসমূহেব আড়ালে অন্তর্হিত হইতেছে। সেই জনতার মধ্যভাগে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে দেখা যাইতেছে। মহাপ্রভু হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া ধীরপদে চলিয়াছেন। তাঁহার আনন্দাম্বুধি বর্ধিত হইয়া চারিপাশে সকলকে আপ্লাবিত করিতেছে—উল্লাসের আধিক্যে কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ বা উদ্দাম নৃত্য করিতেছে। এত লোক হইয়াছে যে, মনে হইতেছে যেন জনসমুদ্র—লোকের আর অন্ত নাই। ঐ সংকীর্তনদলের ভিতর দুইজনের মুখ ঠাকুরের স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল এবং কয়েক বৎসর পরে তাঁহাদিগকে নিজভক্তরূপে আসিতে দেখিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, পূর্বজন্মে তাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদ ছিলেন।

শ্যামাপূজা, ফলহারিণীপূজা ও স্নানযাত্রার দিনগুলি দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে বিশেষ পূজা-মহোৎসবের দিন বলিয়া নির্ধারিত ছিল। স্নানযাত্রার পরে প্রায়ই পঞ্চমীর দিন ঠাকুর দেশে যাইতেন ; কামারপুকুরে, জয়রামবাটীতে ও শিহড়ে যাওয়া-আসা করিতেন : এবং দুর্গাপূজার পূর্বে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করিতেন—ঠাকুরের ভাইঝি লক্ষ্মীদেবী বলিয়াছেন। ১২৮৩ সাল হইতে পরপর চারি বৎসর তিনি দেশে গমন করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমিত হয়।

পূর্বোক্ত দর্শনের কিছুকাল পরে ঠাকুর দেশে গিয়াছিলেন, মাতা-ঠাকুরাণী ও হৃদয়কে সঙ্গে নিয়া। সেই সময়ে কলিকাতা হইতে ঘাটাল পর্যন্ত ষ্টীমার চলাচল করিতেছিল। তিনি ঐ ষ্টীমারে গিয়া সম্ভবতঃ বন্দর নামক স্থানে অবতরণ করেন এবং বন্দর হইতে নৌকাযোগে দারকেশ্বর

নদের ভিতর দিয়া বালি গ্রামে যান। বালি হইতে কামারপুকুরের দূরত্ব চারিক্রোশ হইবে। বালির এক ভক্তিমান মোদক নদের তীরে নূতন বাড়ী নির্মাণ করিয়াছিল এবং গৃহপ্রবেশের পূর্বে কোন সাধুসজ্জনকে তিনদিন ঐ বাড়ীতে রাখিয়া সেবা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। ঠাকুর তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন; সমাগত লোকজনও তাঁহার দর্শন ও ধর্মোপদেশ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল।

কামারপুকুর হইতে ঠাকুর শিহড়ে আসিলেন ও সেখানে পুনরায় শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন পাইলেন—নবনটবরবেশ, 'কালাপেড়ে কাপড় পরা।' ঠাকুরের সঙ্গগুণে শিহড়বাসীরা ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত ও সংকীর্তনে মত্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহার আগে তাহারা—

জানিত না গোউর নিতাই কোন্ জন।
কার ছেলে কোথা বাড়ী কোথায় জনম॥
... ...
দেখিলে চৈতন্যভক্ত উচ্চ উপহাস।
করিত সকলে তাড়া হাতে লাঠি বাঁশ॥
গোউর নিতাই বলি যেথা সংকীর্তন।
কেড়ে ভেঙ্গে দিত খোল গ্রামবাসিগণ॥

আর এখন তাহারা ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া গ্রামের পথে পথে কীর্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। গ্রামস্থ শান্তিনাথ-শিবের মন্দিরপ্রাঙ্গণে বহুক্ষণ ধরিয়া কীর্তন চলিত। একদিন সকলে মিলিয়া গান ধরিল:

সংকীর্তনে আমার গোরা নাচে।
দেখো রে বাপ নরহরি, থেকো গৌরের কাছে।
সোনার বরণ গৌর আমার ধূলায় পড়ে পাছে॥

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর মহাভাবে আবিষ্ট হইলেন ও লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সুন্দর গৌরবর্ণ দেহ উজ্জ্বলতর হইল, যেন হেমকান্তি ফাটিয়া পড়িতেছে।

বারে বারে এক ধুয়া যত ভক্ত গায়।
তাহাতে হইলা প্রভু উন্মত্তের প্রায়॥

নাহি আর বাহ্যজ্ঞান কিভাবে কে জানে।
লুটালুটি খান গোটা মন্দিরপ্রাঙ্গণে॥
পাষাণে প্রাঙ্গণ বাঁধা সুকর্কশ তায়।
সুকোমল প্রভু-অঙ্গ কত ছোড়ে যায়॥

সকলে তাঁহাকে ধরিয়া সুস্থির করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কিরূপ ভাবাবস্থায় কোন্ মন্ত্র বা নাম শুনাইলে ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইবেন, হৃদয় জানিত। সে তাঁহার কানে নাম শুনাইতে লাগিল, ধীরে ধীরে তাঁহার বাহ্যজ্ঞানও ফিরিয়া আসিল।

শিহড়ের লোকদিগকে ভক্তিপথে আনয়ন করিয়া ঠাকুর তাহাদিগকে তুলসীর মালা ধারণ করাইতে চাহিলেন এবং হৃদয়কে এক কুড়ি মালা সংগ্রহ করিতে বলিলেন। মালা সংগৃহীত হইলে সমবেত ভক্তদের কাছে অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি তুলসী-মাহাত্ম্য কীর্তন করিলেন, শ্রোতারাও তুলসীকে উদ্দেশ করিয়া নমস্কার করিল। তখন—

এক এক মালা দিয়া প্রত্যেকের করে।
নারায়ণ-শিলা আছে যাহাদের ঘরে॥
উপদেশে বলিলেন সর্বাগ্রে প্রথমে।
পরশি তুলসীমালা শিলার চরণে॥
উচ্চারিয়া মহামন্ত্র গুরুদত্ত ধন।
পশ্চাৎ করিবে সবে গলায় ধারণ॥

সকলেই তাঁহার আদেশানুযায়ী কার্য করিতে নিজ নিজ ঘরে চলিয়া গেল, কেবল একজন, নফর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থির হইয়া রহিলেন। এই সঙ্গতিপন্ন ভক্তিমান ব্রাহ্মণ ঠাকুরের শিহড়ে আগমনের দিন হইতেই তাঁহার সেবা ও সঙ্গ করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার ঘরে শ্রীধর নামে নারায়ণ-শিলা নিত্যপূজিত হইতেন, ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে তিনি শ্রীধরের রূপ দেখিতে পাইলেন ও মালাটি তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে রক্ষা করিয়া প্রণামান্তে নিজের গলায় ধারণ করিলেন। ঠাকুর তখন সমাধিস্থ।

শিহড়ের নিকটে মেমানপুর গ্রাম। প্রতি বৎসর সেখানে দ্বাদশ উৎসব হইয়া থাকে। এবারকার উৎসবে সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া গোপালের

কীর্তন হইতেছে, খবর আসিল। ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া গিয়া শিহড়বাসীরা সেই কীর্তনানন্দ উপভোগ করিতে ব্যগ্র হইল।

সুস্থির কমল প্রভু ভাবাবেশহীনে।
আন্দোলিত ভাবাবেশে যেমন পবনে॥
আন্দোলনে বহুগুণে সৌরভ বিস্তার।
তাই লোকজনে পায় আনন্দ অপার॥
... ...
সেই হেতু প্রভুদেবে শিয়ড়িয়া জনা।
যাইতে মেমানপুরে করিল প্রার্থনা॥
শুনি কথা প্রভুদেব দিলেন উত্তর।
হৃদুরে পাঠাও আগে জানিতে খবর॥

হৃদয়ের মুখে বার্তা পাইয়া গোপাল সেদিনকার মত কীর্তন সাঙ্গ করিলেন, এবং ঠাকুরকে দর্শন করিবার ও কীর্তন শুনাইবার অভিলাষে শিহড় রওনা হইলেন। আধক্রোশ দূরে থাকিতে কীর্তনীয়ারা একবার খোল ও রণশিঙ্গা বাজাইল। দূরাগত সেই শব্দ শিহড়বাসীরা শুনিতে পাইল না, কিন্তু ঠাকুর শুনিতে পাইয়া বলিলেন, গোপালকে সঙ্গে নিয়ে হৃদু আসচে। রাত যখন প্রায় ছয়দণ্ড হইয়াছে, কীর্তনীয়া গোপাল আসিয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর সমাধিস্থ।

ঠাকুরের সমাধিভঙ্গে গোপাল মধুরকণ্ঠে কীর্তন আরম্ভ করিলেন :

ভুবনসুন্দর গোউর নদেয় কে আনিল রে।
এমন রূপ বিধি বুঝি দেখে নাই,
গড়েছে বটে, কিন্তু বিধি দেখে নাই,
দেখলে ছেড়ে দিত নাই।

কীর্তন চলিয়াছে। আখর দিবার ছলে ঠাকুর গাহিলেন :

গোপাল রে, তুই কী বল্লি রে ! গোরারূপ বিধির গড়া নয়,
স্বয়ং স্বপ্রকাশ রূপ—বিধির গড়া নয়।
এইরূপে গোরারূপ আখরে আখরে।
গাইতে লাগিলা প্রভু সুমধুর স্বরে॥
... ...

নহে সায়, না ফুরায় রূপের বর্ণন।
ক্রমে রাত্তি উর্দ্ধগতি, চলিছে কীর্তন॥
... ...
দণ্ডবৎ নিপতিত শ্রীপদে গোপাল।
হৃদয় জানায় ডেকে ভোজনের কাল॥
অদ্যাপি শিয়ড়ে এই কীর্তনের কথা।
দেখা শুনা যাহাদের, মনে আছে গাঁথা॥
কি দেখেছে কি শুনেছে প্রভুর ভিতরে।
সঠিক চেহারা কেহ দিতে নাহি পারে॥
স্মরণে অপার সুখ, সমস্বরে কয়—।
আমরি! আমরি! কথা কহিবার নয়॥

শ্যামবাজার ও বেলডিহা (বেলটে) গ্রাম-দুইখানি পাশাপাশি সংলগ্ন-ভাবে অবস্থিত। বেলটের নটবর গোস্বামী ইতঃপূর্বে ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বাটীতে পদধূলি দিবার জন্য আমন্ত্রণও করিয়াছিলেন। হৃদয়কে সঙ্গে নিয়া ঠাকুর তাঁহার বাটীতে যান ও সাতদিন সেখানে অবস্থান করেন। ঠাকুরকে কীর্তন শুনাইবার জন্য নটবর রামজীবনপুরের প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া ধনঞ্জয় দে ও কৃষ্ণগঞ্জের বিখ্যাত খোলবাদক রাইচরণ দাসকে আনাইয়াছিলেন, আর শ্যামবাজারের ঈশান-চন্দ্র মল্লিক তাঁহাকে সাদরে নিজবাটীতে আহ্বান করিয়াছিলেন। ঠাকুর শ্রীমুখে বলিয়াছেন:

"ওদেশে যখন হৃদের বাড়ীতে ছিলুম তখন শ্যামবাজারে নিয়ে গেল। বুঝলুম গৌরাঙ্গভক্ত, গাঁয়ে ঢুকবার আগে দেখিয়ে দিলে। দেখলুম গৌরাঙ্গ। এমনি আকর্ষণ—সাত দিন সাত রাত লোকের ভিড়! কেবল কীর্তন আর নৃত্য। পাঁচীলে লোক, গাছে লোক!

"নটবর গোস্বামীর বাড়ীতে ছিলুম, সেখানে রাতদিন ভিড়। আমি আবার পালিয়ে এক তাঁতীর ঘরে সকালে গিয়ে বসতুম; সেখানে আবার দেখি, খানিক পরে সব গিয়েচে—খোল করতাল নিয়ে গেছে! আবার 'তাকুটী, তাকুটী' করচে। খাওয়া দাওয়া বেলা তিনটার সময় হত।

"রব উঠে গেল—সাতবার মরে, সাতবার বাঁচে, এমন এক লোক এসেচে! পাছে আমার সর্দিগরমি হয়, হৃদে মাঠে টেনে নিয়ে যেত; সেখানে আবার পিঁপড়ের সার! আবার খোল করতাল—তাকুটী, তাকুটি! হৃদে বকলে, আর বল্লে, আমরা কি কখনো কীর্তন শুনি নাই?

"সেখানকার গোসাঁইরা ঝগড়া করতে এসেছিল। মনে করেছিল, আমরা বুঝি তাদের পাওনা গণ্ডা নিতে এসেচি। দেখলে, আমি একখানা কাপড় কি একগাছা সূতাও লই নাই। কে বলেছিল, 'ব্রহ্মজ্ঞানী'। তাই গোসাঁইরা বিড়তে এসেছিল। একজন জিজ্ঞাসা করলে, এঁর মালা তিলক নাই কেন? তাদেরই একজন বল্লে, নারকেলের বেল্লো, আপনা আপনি খসে গেছে। 'নারকেলের বেল্লো' কথাটি ঐখানে শিখেচি। জ্ঞান হলে উপাধি আপনি খসে পড়ে যায়।

"দূর গাঁ থেকে লোক এসে জমা হত, তারা রাত্রে থাকত।···আকর্ষণ কাকে বলে, ঐখানেই বুঝলুম। হরিলীলায় যোগমায়ার সাহায্যে আকর্ষণ হয়, যেন ভেলকি লেগে যায়!" [কথামৃত]

পরবর্তী কালের একটি ঘটনা। ঠাকুর বাগবাজারে বসু-বলরাম-ভবনে আছেন (১২৯২)। শরতের অপরাহ্ণ। দ্বিতলের বৃহৎ ঘরখানি লোকে পরিপূর্ণ। মহাভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার সঙ্গী কালীপদ ঘোষ মহোৎসাহে গান ধরিয়াছেন:

আমায় ধর নিতাই,
আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন।

শরচ্চন্দ্র (সারদানন্দ) কোনরূপে ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন: ঠাকুর সমাধিস্থ; ঘরের পশ্চিমপ্রান্তে পূর্বমুখী হইয়া বসিয়া। তাঁহার মুখে প্রসন্নতা ও আনন্দের অপূর্ব হাসি; দক্ষিণ চরণ প্রসারিত—একজন পরম প্রেমের সহিত উহা হৃদয়ে ধরিয়া আছেন। ভক্তটির চক্ষু নিমীলিত, নয়ন-ধারায় তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতেছে। গৃহ নিস্তব্ধ এবং একটা দিব্য ভাবের আবেশে জমজম করিতেছে। গান চলিতে লাগিল—

আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন,
আমায় ধর নিতাই।

(নিতাই) জীবকে হরিনাম বিলাতে উঠিল যে ঢেউ প্রেমনদীতে,
সেই তরঙ্গে এখন আমি ভাসিয়ে যাই।
(নিতাই) খত লিখেছি আপন হাতে, অষ্টসখী সাক্ষী তাতে,
(এখন) কি দিয়ে শুধিব আমি প্রেমের মহাজন ;
(আমার) সঞ্চিত ধন ফুরাইল, তবু ঋণের শোধ না হল,
প্রেমের দায়ে এখন আমি বিকাইয়ে যাই।

গীত সাঙ্গ হইল। তাহার পরেও কিছুকাল অতিবাহিত হইল।

ঠাকুর ক্রমশঃ অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন ও সম্মুখস্থ ভক্তটিকে বলিলেন, 'বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।' তিনবার তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করাইয়া ঠাকুর সহজ অবস্থায় আসিলেন।

ভক্তটির নাম নিত্যগোপাল গোস্বামী, বাড়ী ঢাকা শহরে। তিনি যেমন ভক্তিমান, দেখিতেও তেমনি সুপুরুষ ছিলেন।

পারিবারিক পরিবেশে

সাধনান্তে ঠাকুরের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয় ও তিনি একটু পেটরোগা হইয়া পড়েন। সকালবেলা তিনি মাকে প্রণাম করিতে গেলেই চন্দ্রাদেবী প্রশ্ন করিতেন, তোমার পেটটা কেমন আছে? আর ভাল নয় শুনিলে বলিতেন, মা-কালীর ভোগ খেয়ো নি, বৌমাকে বলব এখন, মাছের ঝোল আর কাঠের জ্বালে চাট্টি ভাত রেঁধে দিবে।

চন্দ্রাদেবী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত ঠাকুর নহবতখানায় তাঁহার কাছে বসিয়া আহার করিতেন। চন্দ্রাদেবীর পরলোক-গমনের পরে মাতাঠাকুরাণী ঠাকুরকে খাওয়াইতেন তাঁহার ঘরে খাবার লইয়া গিয়া, কাছে বসিয়া। ঠাকুর তাঁহার জননীকে মাঝে মাঝে বলিতেন: তুমি মা, সেই দেশের মতন করে ফোড়ন টোড়ন দিয়ে দুটো একটা তরকারি কর না, খেতে বড় মন যায়, আর এদের তরকারি রুচে নি। জননীর রান্না তরকারি খাইয়া তিনি খুশী হইতেন। মাতাঠাকুরাণী যখন তাঁহাকে খাওয়াইতেন কাছে বসিয়া, তিনি মাঝে মাঝে রহস্য করিয়া বলিতেন: ভাগ্যিস গাছতলাটি ছিল, নইলে কে আর এমন করে রেঁধে খাওয়াত! শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে থাকিলে ঠাকুর অন্য কাহারও হাতে খাইতে চাহিতেন না।

কালীবাটী হইতে প্রতি মাসে ঠাকুরকে সাতটি করিয়া টাকা দেওয়া হইত ও সেই টাকা হৃদয় একটা বাক্সে ফেলিয়া রাখিত। ঠাকুর একদিন বলিলেন হৃদয়কে: দেখ্ তো তোর বাক্সে কত টাকা আছে, ওকে গয়না গড়িয়ে দিতে হবে; ওরে, ওর নাম সারদা—ও সরস্বতী, তাই সাজতে ভালবাসে। শ্রীশ্রীমাকে তিনি দুই ছড়া মূল্যবান তাবিজ, দুইগাছি বালা, ইত্যাদি অলঙ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। সাধনকালে যখন তিনি শ্রীমতী সীতাকে দর্শন করেন, তাঁহার হাতে ডায়মনকাটা বালা দেখিয়াছিলেন। ঠাকুরের নির্দেশে মার বালা সীতার বালার অনুরূপ করিয়া নির্মিত হইয়াছিল।

বাঁকুড়ার ঈশ্বর চাটুজ্যে শ্রীশ্রীমাকে তনয়াসদৃশ জ্ঞান করিতেন। তিনি মা-কালীর পাচক ছিলেন, ঠাকুর তাঁহাকে কলাইয়ের ডাল হিং দিয়া রাঁধিয়া ও অন্যান্য ভাল ভাল জিনিস করিয়া মাকে খাওয়াইতে বলিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমা যখন নহবত ঘরে একাকিনী থাকিতেন, ঠাকুর তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে পাড়ায় বেড়াইতে যাইতে বলিতেন। দ্বিপ্রহরে আহারের পর যখন পঞ্চবটী নির্জন হইত, ঠাকুরের উপস্থিতিতে মা তখন খিড়কী-ফটক দিয়া নিকটবর্তী পাঁড়ে গিন্নীদের বাসায় যাইতেন; সেখানে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকিয়া ও কথা কহিয়া আরতির সময় পঞ্চবটী আবার নির্জন হইলে ফিরিয়া আসিতেন।

এইরূপে ঠাকুর মাতাঠাকুরাণীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানে তাঁহার পক্ষে যাহা যাহা সম্ভব সবই করিয়াছিলেন, আর সেইজন্যই মার অতিক্ষুদ্র ঘরে আবদ্ধ হইয়া থাকার কষ্টকে আর কষ্ট বলিয়া মনে হইত না, অন্যান্য অসুবিধা সত্ত্বেও। প্রথম দিকে, ১২৮৬ সাল পর্যন্ত, ভক্ত-সমাগম তেমন বেশী না থাকায় তিনি অনেক সময়ে ঠাকুরের ঘরে থাকিয়া তাঁহার পরিচর্যা করিতে পাইতেন—স্নানের পূর্বে তাঁহাকে তেল মাখাইয়া দিতেন, বিশ্রামের সময়ে পদতলে বসিয়া—নারায়ণপদমূলে মা-লক্ষ্মীর মত—তাঁহার পদ-সংবাহন করিতেন।

ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ রামেশ্বরের তিনটি সন্তান—রামলাল, লক্ষ্মী, শিবরাম। রামলাল কালীবাটীতে পূজকরূপে নিযুক্ত হইলে কামারপুকুরের সংসারে 'রামলালের মা' তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যা ও শিশু পুত্রকে লইয়া বাস করিতেন।

১২৭০ সালে লক্ষ্মীর জন্ম। মৃত্যুর পূর্বেই রামেশ্বর তাহার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। এগার বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ হয় ও ইহার দুইএক মাস পরেই স্বামী নিখোঁজ হইয়া যাওয়ায় কার্যতঃ তাহার বৈধব্য ঘটে। ইহার আগে, দক্ষিণেশ্বরে রামলালের মুখে লক্ষ্মীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, সে বিধবা হবে। ভাবভঙ্গ হইলে হৃদয় দুঃখ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল: মামা, তুমি

লক্ষ্মীকে এত ভালবাস, তার বিয়ের কথা শুনে কোথায় তাকে আশীর্বাদ করবে, না, কী-একটা ছাইভস্ম কথা বলে ফেল্লে। 'কী বল্লুম?' ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন। 'কী মাথামুণ্ডু একটা বল্লে।' হৃদয় কহিল। তারপরে নিজের মুখ হইতে যে কথাটি বাহির হইয়াছে তাহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন: মা বলালে আমি কী করব। লক্ষ্মীর শীতলার অংশে জন্ম; সে ভারী রোখা দেবী, আর যার সঙ্গে বিয়ে হল সে সামান্য জীব; সামান্য জীবের ভোগে লক্ষ্মী আসতে পারে না। যদি শিব স্বয়ং নরশরীর ধারণ করে আসতেন তবে লক্ষ্মী তাঁর স্ত্রী হতে পারত।

১২৮৩ সালে ঠাকুর যখন কামারপুকুরে আসেন সেই সময় হইতেই ভাইঝি লক্ষ্মীকে তিনি তাঁহার স্ব-ভাবে গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাকে বলিয়াছিলেন: ধর্ম-কর্ম যা সব ঘরে বসে করবি। বাইরে তীর্থে তীর্থে একলাটি ঘুরে বেড়াবি নি। কার পাল্লায় পড়বি, কে জানে। ঐ খুড়ীমার সঙ্গে থাকবি, বাইরে বড় ভয়।

বৈধব্যের পর লক্ষ্মীর অংশে শ্বশুরবাড়ীর অনেক সম্পত্তি পড়িয়াছিল। সেকথা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন: কোন সম্পত্তি জোটাস নি, আঁটকুড়ের সম্পত্তির দরকার নাই। লক্ষ্মী তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি অন্যান্য অংশীদারদের নামে লিখিয়া দিয়াছিলেন।

একদিন বিকালে লক্ষ্মী বারান্দায় পরিধানের কাপড় খুলিয়া রাখিয়া ৺রঘুবীরের ঘর হইতে গুড় লইয়া আসিয়াছিলেন। ঠাকুর ইহা জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন: তুই রঘুবীরকে একটা পাথর মনে করলি? সে হিন্দুস্থানী যুবক, বেটা ছেলে। আর কখনো এমন কাজ করবি নি।

পরমহংসের স্বভাব বালকবৎ হয় ও পরমহংস সব চৈতন্যময় দেখে, দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা পরিস্ফুট করিতে গিয়া ঠাকুর তাঁহার কনিষ্ঠ ভাইপো শিবরামের বালচরিত্র এইরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন: "যখন আমি ওদেশে, রামলালের ভাই···পুকুরের ধারে ফড়িঙ ধরতে যাচ্ছে। পাতা নড়চে, আর পাতার শব্দ পাছে হয় তাই পাতাকে বলচে, চুপ! আমি ফড়িঙ ধরব। ঝড়বৃষ্টি হচ্চে, আমার সঙ্গে ঘরের ভিতরে সে আছে; বিদ্যুৎ

চমকাচ্চে, তবুও দ্বার খুলে খুলে বাইরে যেতে চায়। বকার পর আর বাইরে গেল না, উঁকি মেরে মেরে এক একবার দেখচে আর বলচে, খুড়ো, আবার চকমকি ঠুকচে!

"…রামলালের ভাই একদিন বলচে, তুমি খুড়ো, না পিসে?

"…হৃদের বাড়ী দুর্গাপূজা দেখতে গিছিল। হৃদের বাড়ী থেকে ছুটকে আপন' আপনি কোন্ দিকে চলে গেছে। চার বছরের ছেলে দেখে পথের লোক জিজ্ঞাসা করেচে, তুই কোথা থেকে এলি? তা কিছু বলতে পারে না, কেবল বল্লে—'চালা' (অর্থাৎ যে আটচালায় পূজা হইয়াছে)। যখন জিজ্ঞাসা করলে, কার বাড়ী থেকে এসেচিস? তখন কেবল বলে—'দাদা'।" [কথামৃত]

শিবুদা অতি সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। প্রবীণ বয়সে দুঃখ করিয়া তিনি বলিতেন: আমি তখন ছোট ছিলুম, ঠাকুরকে কত কষ্ট দিয়েচি! তাঁকে জানি নাই, বুঝি নাই। কাঁধে চড়ে দুহাতে তাঁর কান ধরে টানতুম; তিনি বলতেন, দেখ্ হৃদু, কী করে।

কামারপুকুরের ঘটনা, শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন: রান্নাঘরে কুকুর সেঁধুচ্চে। উনি (ঠাকুর) বল্লেন হৃদয়কে, আমরা কি এখানে থাকচি? যেমন তেমন করে সেরে দাও। আমি শুনে বল্লুম, আচ্ছা তো স্বার্থপর! তিনি কোথা যাচ্চিলেন—শিওড়, আর যাওয়া হল না; দাঁড়িয়ে, 'স্বার্থ ছাড়া আর কি কিছু আছে?'—এই বলে, স্বার্থ সম্বন্ধেই নানা কথা বলতে লাগলেন—সে কী উচ্ছ্বাস!

কামারপুকুরের আরও দুইটি ঘটনা লক্ষ্মী দেবী বলিয়াছেন:

বৈঠকখানার সম্মুখে বসিয়া ঠাকুর কীর্তন শুনিতেছিলেন। প্রেমী নামে মাঝারি বয়সের একটি মেয়ে 'আমার এ প্রেম রাখব কোথা!'—এই কথাটি সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে করিতে গানের আসরে আসিল। বাহু তুলিয়া ও অঙ্গভঙ্গী-সহকারে তালে তালে পা ফেলিয়া সে আসিয়াছিল। আসরে আসিয়াই ধপাস্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং গাহিতে গাহিতে ও গড়াইতে গড়াইতে ঠাকুরের কাছে আসিয়া পড়িল। ঠাকুর

তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটা ভাঙা ধুচুনি লইয়া আসিয়া—ধুচুনিটি নিকটবর্তী খাঁ-পুকুরের ধারে গুলঞ্চগাছের তলায় ছাইগাদার পাশে পড়িয়া ছিল—কহিলেন, এই ভাঙা ধুচুনিটাতে রাখ; তোমার যেমন প্রেম, এ পাত্রটি তারি উপযুক্ত!

খাঁ-পুকুরে দুইটি বৌ বাসন মাজিতে মাজিতে পরস্পর কথা কহিতেছিল ও এক বৃদ্ধা কাছে বসিয়া শুনিয়া যাইতেছিলেন। একজন কহিল: মাছের নেজাটার ঝাল করলুম,. মুড়োটা ডালে দিলুম, চাকাটার ঝোল হল। বৈঠকখানা হইতে শুনিতে পাইয়া ঠাকুর বলিলেন, একবার যাই রে হৃদু, ওরা কি কেবল চাকা-নেজা-মুড়ো করেই যাবে? হৃদয়ের মানা সত্ত্বেও, পুকুরের ধারে আসিয়া তিনি বলিলেন: হাঁগা, তোমরা কী চাকা-নেজা-মুড়ো করচ? (বৃদ্ধার প্রতি) তোমার তো বাপু অনেক বয়েস হয়েচে, এদের দুটো ভাল কথা শোনাতে পার না? তুমি তো বৃন্দাবন গিছিলে, এদের কাছে সেসব কথা—গোবিন্দ-রাধারমণ-দর্শনের কথা বলবে। তা যদি এদের ভাল না লাগে, শুনতে না চায়, তো শেঠের বাড়ীর সোনার তালগাছের গল্প করবে; তা হলে এরা শুনবে। 'ঠাকুর, তুমি বেশ আছ, আমি মলেই বাঁচি।' বৃদ্ধা কহিলেন। 'ওগো, মলে কি বাঁচবার জো আছে? মলে যে বাঁচবে তার কাজ কর আগে। তোমার কি সেখানে বেয়াইবাড়ী কুটুমবাড়ী আছে, পিঁড়ে পোঁদে দিয়ে বসবে, আর লুচি ভেজে ভেজে দেবে—খাবে তুমি?' ঠাকুর উত্তর দিলেন।

কামারপুকুর হইতে ঠাকুর গিয়াছেন শিহড়ে, হৃদয়ের বাড়ীতে। একদিন তিনি ঈশ্বরীয় ভাবে আবিষ্ট হইয়া হৃদয়ের মাতা হেমাঙ্গিনী দেবীর মাথায় পা রাখিয়া বলিলেন: 'তোর কাশীতে মৃত্যু হবে।' হেমাঙ্গিনী ঠাকুরকে দেবতা জ্ঞান করিতেন; তাঁহার পা ধোয়াইয়া নিজের মাথার চুল দিয়া মুছিয়া দিতেন ও ফুলচন্দন দিয়া পূজা করিতেন।

হৃদয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজারামের সহিত গ্রামের একটি লোকের বচসা হয়, বচসা ক্রমে হাতাহাতিতে পরিণত হয় ও রাজারাম একটি হুঁকা দিয়া লোকটির মাথায় আঘাত করে। আহত হইয়া সে রাজারামের বিরুদ্ধে

বিষ্ণুপুর কোর্টে ফৌজদারী মামলা রুজু করিল ও ঠাকুরকে সত্যবাদী জানিয়া —ঠাকুরের সম্মুখেই ঘটনাটি হইয়াছিল—তাঁহাকে সাক্ষী মানিল। বাধ্য হইয়া ঠাকুরকে বিষ্ণুপুরে যাইত হইল। ক্রোধান্ধ হওয়ার জন্য রাজারামকে ঠাকুর আগেই অনেক তিরস্কার করিয়াছিলেন, এখন বিষ্ণুপুরে আসিয়া কহিলেন: ওকে টাকাকড়ি দিয়ে যেমন করে পারিস মকদ্দমা মিটিয়ে নে, নয় তো তোর ভাল হবে না; আমি তো আর মিথ্যা বলতে পারব না, জিজ্ঞাসা করলেই যা জানি যা দেখেচি সব কথা বলে দেব। রাজারাম আপসে মামলা মিটাইয়া ফেলিতে লাগিল, সেই অবসরে ঠাকুর শহর দেখিতে বাহির হইলেন।

এখানে বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী বন-বিষ্ণুপুরের রাজাদের অনেক কীর্তি, বিশেষতঃ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর অনেকগুলি মন্দির বিদ্যমান। ঐসকল মন্দির ব্যতীত রাজাদের প্রতিষ্ঠিতা ও পূজিতা ৺মৃন্ময়ী-নাম্নী দুর্গাদেবীর একটি মণ্ডপ আছে এখানে। মৃন্ময়ী জাগ্রতা দেবী, লোকে বলিত।

৺মৃন্ময়ীকে দর্শন করিতে যাওয়ার পথে ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর তাঁহার দেবভাবমণ্ডিত অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, কিন্তু মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া বিগ্রহের সেই মুখ দেখিতে পাইলেন না। অনুসন্ধানে জানা গেল, এক পাগলিনী মূর্তিটি ভগ্ন করিয়াছিল, নূতন মূর্তির মুখ পুরাতন মূর্তির মুখের অনুরূপ হয় নাই।[১]

বিষ্ণুপুর দর্শন করিয়া আসিয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে বলিয়াছিলেন: ওগো, বিষ্ণুপুর গুপ্তবৃন্দাবন, তুমি দেখো। 'আমি মেয়েমানুষ, কী করে দেখব?' মা প্রশ্ন করিলেন। 'না গো, দেখবে দেখবে।' ঠাকুর কহিলেন।

জন্মভূমি কামারপুকুরের ও কামারপুকুরবাসিগণের প্রতি ঠাকুরের একটা সহজাত প্রীতি ও আকর্ষণ ছিল। তাঁহার ভিক্ষামাতা ধনী কবে

---

১ পুরাতন মূর্তির বিচ্ছিন্ন মুখখানি এক ব্রাহ্মণ সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ মুখখানি সংযোজিত করিয়া তিনি অন্য একটি দ্বিভুজা মূর্তি নির্মাণ করান ও লালবাঁধের ধারে প্রতিষ্ঠা করেন, 'সর্বমঙ্গলা' নাম দিয়া। মৃন্ময়ীর মুখখানিও পরে পূর্বমুখের অনুরূপ করিয়া নির্মিত হইয়াছে।

দেহরক্ষা করিয়াছিলেন জানা যায় না। তাঁহার প্রতি নিরতিশয় স্নেহশীলা প্রসন্নময়ী অনেক বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন।[১] ঠাকুর দেশে আসিলে প্রসন্ন বলিতেন, 'গদাই, আইস্ ?' আবার দেশ হইতে চলিয়া যাইবার সময় বলিতেন, 'গদাই, আবার এসিস।' ঠাকুরকে তিনি খুব ভালভাল জিনিস খাওয়াইতেন। মাতাঠাকুরাণীকে ও লক্ষ্মীকে দেখাশুনা করিবার ভার তাঁহাকে দিয়া ঠাকুর নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু শ্রীশ্রীমাকে সঙ্গে লইয়া যান নাই। তিনি অভিমানে পড়িয়া আছেন জ্বরের ভান করিয়া, চাদর মুড়ি দিয়া। কামারপুকুরবাসী যোগীন্দ্র চাটুজ্যে-বাড়ীতে যাওয়া-আসা করিত, মাকে এইভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, দিদিমা শুয়ে আছেন কেন? লক্ষ্মীকে সে মাতৃ-সম্বোধন করিত ও মা-ঠাকুরাণীকে দিদিমা বলিত। লক্ষ্মী কহিলেন, তাঁর জ্বর হয়েচে। যোগীন্দ্র কীর্তনীয়া, সে অমনি কীর্তনের সুরে গান ধরিল: 'দিদিমার এ নয় বিষ্ণুজ্বর, এ নয় ব্রহ্মজ্বর, এ নয় শিবজ্বর—এ দিদিমার বিচ্ছেদ-বিকার-জ্বর!' গান গাহিয়া সে ধড়াস্ কবিয়া আছাড় খাইয়া উঠানে পড়িল। মা তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন, লক্ষ্মী, যোগেনের কী হল—কী হল? সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্বরও ছাড়িয়া গেল!

বর্ষাকালে যদি শ্রীশ্রীমা থাকিতেন কামারপুকুরে, আর ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে, একটি ব্রাহ্মণ আসিয়া ঠাকুরের জন্য ঝোল-ভাত রাঁধিয়া দিয়া যাইত; মন্দিরের প্রসাদ সহ্য হইত না। রাত্রে ঠাকুরের ঘুম বড় একটা ছিল না, তিনি দুইটায় উঠিয়া একটি থালাতে দুইটা পটল, একটা বেগুন, আধখানা কাঁচাকলা, একটি আলু—এই সব তরকারি এবং কয়েকটা গোলমরিচ, অল্প জিরা, লবণ ইত্যাদি সাজাইয়া রাখিতেন। এই কাজটি করিবার সময় একটু শব্দ হইলেই হৃদয় বলিত: মামা, তোমার চোখে কি ঘুম নাই গা? খাবে তো বেলা বারটায়, এখন থেকে খালি খুটখাট কচ্চ! ঠাকুর বলিতেন: তুই ঘুমুচ্চিস ঘুমো না, তোর এদিকে

১ ১৩০৮ সালে ৯০।৯২ বছর বয়সে প্রসন্নময়ীর দেহান্ত হয়।

নজর করবার দরকার কী? জানিস, কাজের আর রোগের শেষ রাখতে নাই।

ঠাকুর ভাবাবেশে জগন্মাতার সহিত কথা কহিতেছেন, আর হৃদয় চীৎকার করিয়া বলিতেছেঃ ওগো মামা, কী এত নুন-তেলের কথা হচ্ছে মার সঙ্গে? লুচি ভোগ হয়ে গেল মার, খাবে এস না? ঠাকুর কহিলেনঃ দূর শালা, খালি চেঁচাচ্ছিস কেন, যাচ্চি।

ঠাকুরের লুচিতে ডেয়ো পিঁপড়া লাগিয়াছে। তিনি হাত দিয়া ছাড়াইতে গেলেন, একটা পিঁপড়া দংশন করিল; সুকোমল হাত রক্তে লাল হইয়া গেল। তিনি তখন একটা কাঠি দিয়া পিঁপড়া মারিতে লাগিলেন। একটি লোক তাহা দেখিয়া বলিলঃ আপনি পরমহংস হয়েচেন, জীবহত্যা করচেন? ঠাকুর উত্তর দিলেনঃ যা যা, তোকে এত উপদেশ দিতে হবে না, মা তা হলে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ করতেন না।

চৌদ্দ বছর বয়সে লক্ষ্মী তাঁহার খুড়ীমার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে আসেন, সম্ভবতঃ ১২৮৪ সালের মাঘমাসে। এই সময় হইতে অন্যূন একযুগ তিনি মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে বাস করিয়াছেন দেশে, দক্ষিণেশ্বরে, কাশীপুরে, বৃন্দাবনে, পুরীধামে। লক্ষ্মী দক্ষিণেশ্বরে আসিবার অল্পদিন পরেই তাঁহাকে বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পড়াইবার জন্য ঠাকুর কালীবাটীর ভাণ্ডারী পীতাম্বর সামন্তের এগার বছরের ছেলে শরৎকে বলিয়া দেন। কামারপুকুরে থাকিতেই লক্ষ্মী, এবং সেই সঙ্গে শ্রীশ্রীমাও, প্রথম ভাগ অনেকটা পড়িয়াছিলেন। লক্ষ্মীর দ্বিতীয় ভাগ পড়া সম্পূর্ণ হইলে ঠাকুর বলিলেন, আর বেশী পড়ার দরকার নাই, এখন রামায়ণাদি ধর্মপুস্তক বেশ পড়তে পারবে।

কামারপুকুরে থাকিতে শ্রীশ্রীমা ও লক্ষ্মী পূর্ণানন্দ নামে উত্তরদেশের এক সন্ন্যাসীর নিকট শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করেন। পূর্ণানন্দ বাঙ্গালী ছিলেন, সেইজন্য উত্তরদেশ বলিতে কামারপুকুরের উত্তরদিগ্‌বর্তী কোন স্থান বলিয়া মনে হয়। দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পরে ঠাকুর মাতাঠাকুরাণীর জিহ্বায় অন্য একটি মন্ত্র লিখিয়া দেন। লক্ষ্মীকে মা বলিলেন, কাল উনি আমার জিভে

লিখে দিয়েচেন, তুইও যা না। লক্ষ্মী কহিলেন, আমার বড় লজ্জা করে, কী বলে চাইব—কারা সব আছে।

একদিন লক্ষ্মী প্রণাম করিতে গেলে ঠাকুর নিজ হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর কোন্ ঠাকুর ভাল লাগে? লক্ষ্মী কহিলেন, কৃষ্ণ। ঠাকুর তাঁহার জিহ্বায় কৃষ্ণমন্ত্র লিখিয়া দেন।[১] লক্ষ্মীর গলায় তখন একগাছি তুলসীর মালা ছিল, কামারপুকুরের "পেসন্ন দিদি" পরাইয়া দিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, মালা রাখবি, তোকে বেশ মানায়।

অন্য একদিন ঠাকুর লক্ষ্মীকে বলিলেন: ঠাকুরদেবতা যদি স্মরণে না আসে তো আমায় ভাববি, তা হলেই হবে। আমায় মনে হয় তো?—কেমন মনে হয়? লক্ষ্মী উত্তর দিলেন: হ্যাঁ তা হয়, এই যেমন দেখচি এমন।

লক্ষ্মীদেবী বলিয়াছেন: ঠাকুর শেষরাত্রি প্রায় তিনটার সময় শৌচে যেতেন। যাবার সময় নহবতের পাশে এসে আমায় ডেকে বলতেন, 'ও লক্ষ্মী, উঠ্‌রে উঠ্। তোর খুড়ীকে তুল্‌রে, আর কত ঘুমুবি? রাত পোহাতে চল্ল। গঙ্গাজল মুখে দিয়ে মার নাম কর্, ধ্যানজপ আরম্ভ করে দে।' তখন আমাদের ঘুম পাতলা হয়ে এসেচে, শীতের সময় ওঁর সাড়া পেলে খুড়ীমা মাঝে মাঝে লেপের ভিতর শুয়ে থেকে আমাকে আস্তে আস্তে বলতেন, 'তুই চুপ কর্। ওঁর চোখে ঘুম নাই। এখনো উঠবার সময় হয় নি, কাক-কোকিল ডাকে নি, সাড়া দিস নি।' সাড়া না পেলে, বা আমরা উঠি নি মনে হলে, তিনি দরজার নীচে দিয়ে জল ঢেলে দিতেন। সব ভিজে যাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি আমাদের উঠে পড়তে হত। একএক দিন বিছানা ভিজেও যেত। সেই থেকে খুব ভোরে উঠবার অভ্যাস হয়ে গেছে।

তিনি আরও বলিয়াছেন: ঠাকুর বল্লেন, লক্ষ জপে কী হবে যদি স্বভাব ভাল না থাকে? মেয়েছেলে যুবতী,…ব্যভিচার থেকে খুব

১ লক্ষ্মীদেবীর সেবক বিপিনের মুখে শুনিয়াছি, লক্ষ্মী শক্তিমন্ত্র নিয়াছেন শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন: 'তোরাই তো শক্তি, তোদের আবার শক্তিমন্ত্র কী? শক্তিরা সব কৃষ্ণমন্ত্রী।'

সাবধান! গাছ যেমন ভিতরে ভিতরে জল শুষে নেয়, তেমন করলে চলবে না।' তাঁকে প্রণাম করলে বলতেন, 'গোবিন্দের চরণে ভক্তি হোক।' তাঁর অন্য কোন আশীর্বাদ ছিল না।

ঠাকুর একদিন লক্ষ্মীকে তাঁহার পাতে খাইতে বলিয়াছেন; মাছের ঝোল একটু ছিল, তিনি খাইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া বলিলেন: খেয়ে ফেল্, পেসাদ। নইলে আবার জন্ম হবে—একটা মোষের মত কালো ষণ্ডা বরের হাতে পড়বি—গর্ভ হবে—ছেলেকে বের করবার জন্যে পেট কাটা হবে। লক্ষ্মী তখন ঝোলটুকু খাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এবার তবে আমি সে-সব দণ্ড থেকে নিষ্কৃতি পেলুম? ঠাকুর বলিলেন, হ্যাঁ।

লক্ষ্মীর একাদশী শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, আমি শাস্ত্রের পার, খুব খাবে। আর থান ধুতি পরার কথায় বলিয়াছিলেন, থান ধুতি যেন রাক্ষুসে বেশ।

নানা স্থান হইতে স্ত্রীলোকেরা কালীবাটীতে আসিত ও ঠাকুরের সম্বন্ধে নানা কথা বলাবলি করিত। ঠাকুর বলিতেন শ্রীশ্রীমাকে: দেখ গো, ওরা সব এসে হাঁসপুকুরের চারধারে ঘুরে বেড়ায়, আর আমায় দেখে গিয়ে আপনাদের ভিতর কত কী বলে। আমি সব টের পাই। বলে, 'এঁর সবই ভাল, তবে ঐ যে রাত্রে স্ত্রীর কাছে শোন না—এই যা।' ওদের পরামর্শ তুমি শুনো নি বাপু। ওরা সব বলবে আমার মন ফেরাবার জন্যে ওষুধপালা করতে, তাদের কথায় আমায় ওষুধপালা কোরো নি। আমার সবই আছে, তবে ভগবানের জন্যে সব শক্তি তাঁতে দিয়ে রেখেচি। মা উত্তর দিতেন: না না, সে কী কথা!

একদিন সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের ঘরে খাবার রাখিতে গিয়াছেন। ঠাকুর তখন খাটে চক্ষু বুজিয়া শুইয়াছিলেন, লক্ষ্মী খাবার রাখিয়া গেল মনে করিয়া বলিলেন, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাস। 'হ্যাঁ বন্ধ কল্লুম।' মা কহিলেন। ঠাকুর সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, আহা তুমি! আমি ভেবেছিলুম লক্ষ্মী। কিছু মনে কোরো নি। 'দিয়ে যেয়ো' না বলিয়া 'দিয়ে যাস' বলিয়া ফেলার জন্য ঠাকুরের এত অনুশোচনা হইয়াছিল যে,

সারারাত তাঁহার ঘুম হইল না ; সকাল বেলা নহবতে মার কাছ উপস্থিত হইয়া বলিলেন, দেখ গো, সারারাত আমার ঘুম হয় নি—ভেবে ভেবে, কেন এমন রুক্ষ কথা বলে ফেল্লুম !

ঠাকুরের চুলদাড়ি পাকিয়াছিল কি না, জিজ্ঞাসিত হইয়া লক্ষ্মীদেবী বলিয়াছেন : মাথার দুচার গাছা, দাড়িরও কিছু কিছু।...আর তিনি বুড়ো হয়ে বেঁচে থাকতে মোটেই চাইতেন না। বলতেন, 'লোকে যে বলবে, রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে একটা বুড়ো সাধু থাকে সেকথা আমি সইতে পারব নি বাপু।' খুড়ীমা বল্লেন, 'ওকথা কি বলতে আছে ? তোমার কি এর মধ্যেই যাবার সময় হয়েচে ? আর বুড়ো হয়ে এখানে থাকলেও লোকে বলবে, রাসমণির কালীবাড়ীতে কেমন একজন পিরবীণ সাধু থাকেন!' ঠাকুর বল্লেন, 'হ্যাঁ ! লোকে তোমার পিরবীণ মিরবীণ অতশত বলতে যাচ্চে আর কি। চণ্ডীদাসের গল্প জান তো ? চণ্ডীদাস অনেক দিন বেঁচেছিলেন, বুড়ো হয়েছিলেন।...পাড়ার যুবতী মেয়েরা সব তাঁর কাছে আসত, তাঁকে বাপ বলত। তাঁর ছিল মধুরভাব, তিনি অতি খেদে বলতেন—

বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে এ বড় বিষম তাপ।
যুবতী আসিয়া শিয়রে বসিয়া আমারে কহিবে বাপ॥

তা আমিও বুড়ো নাম সহ্য করতে পারব নি বাপু।' গল্প শুনে সবাই হেসে কুটিকুটি। ঠাকুরের প্রসঙ্গে লক্ষ্মীদেবী আরও বলিয়াছেন :

তাঁর রঙ ফরসা ছিল, কিন্তু সাদা নয়। দুধে আলতাগোলা রঙ। সে এক দিব্য রঙ, সে রঙের তুলনা নাই।

সমাধির সময় তিনি নিস্পন্দ হয়ে যেতেন, চক্ষু থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত; কখন কখন উদরের দুই পাশ কাঁপত আর তাঁকে ঘিরে একটা আলোর রেখা দেখা যেত। তখন তাঁকে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর দেখাত !

বড় থালা-বাটি না হলে ঠাকুর খেতে বসতেন না। মণি মল্লিকের বাড়ীতে তাঁকে ছোট ছোট বাটিতে তরকারি দেওয়া হয়েছিল, তা দেখে তিনি বল্লেন : ও মণি, আমি কি কাকাতুয়া পাখী, ঠোঁটে ঠুকরে ঠুকরে খাব, তাই তুমি আমায় এই টুকু টুকু বাটি দিয়েচ ?

অন্তরঙ্গ ভক্তদের জন্য ব্যাকুলতা ও কেশব সেনের সহিত মিলন

তন্ত্রসাধনা সমাপ্ত হওয়ার পরেই যোগারূঢ় অবস্থায় ঠাকুর জানিতে পারিয়াছিলেন, উত্তর কালে বহুলোক ধর্মলাভ করিতে আসিবে তাঁহার কাছে ; তাঁহার অন্তরঙ্গশ্রেণীর ভক্তেরাও আসিবেন, যাঁহারা তাঁহার উদার ধর্মমত গ্রহণ ও নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করিয়া কেবল নিজেরাই ধন্য হইবেন না, পরন্তু ভারতে ও ভারতেতর দেশে উহা প্রচার করিয়া ধর্মগ্লানি-নিবারণে ও যুগধর্ম-সংস্থাপনে ঈশ্বরের যন্ত্রস্বরূপ হইবেন। সেই সময় হইতে প্রায় একযুগ গত হইয়াছে তাঁহাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া। সেই সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা কালাত্যয়ে অসহনীয় হইয়া অধীরতায় ও আকুল ক্রন্দনে আত্মপ্রকাশ করিল।

স্বীয় ভক্তগণকে বলিয়াছেন ঠাকুর :

তোদের দেখবার জন্যে প্রাণের ভিতরটা তখন এমন করে উঠত, এমনভাবে মোচড় দিত যে, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়তুম। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হত। লোকে কী মনে করবে ভেবে কাঁদতে পারতুম না, কোন রকমে সামলে থাকতুম। যখন দিন গিয়ে রাত আসত, মন্দিরে মন্দিরে আরতির বাজনা বেজে উঠত, তখন আরও একটা দিন গেল—তোরা এলি নি ভেবে আর সামলাতে পারতুম না ; কুঠির উপরে ছাদে উঠে 'তোরা সব কে কোথায় আছিস আয় রে!' বলে চেঁচিয়ে ডাকতুম আর ডাক ছেড়ে কাঁদতুম! মনে হত পাগল হয়ে যাব। তার কিছুদিন বাদে তোরা সব একে একে আসতে আরম্ভ করলি, তখন ঠাণ্ডা হই। আর আগে দেখেছিলুম বলে, তোরা যেমন যেমন আসতে লাগলি অমনি চিনতে পারলুম। তারপর পূর্ণ যখন এল তখন মা বল্লে, 'ঐ পূর্ণতে যারা সব আসবে বলে দেখেছিলি তাদের আসা পূর্ণ হল।' মা দেখিয়ে বলে দিলে, 'এরাই সব তোর অন্তরঙ্গ।'

ঠাকুর তাঁহার ভক্তগণকে তিন বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নির্দেশ করিতেন—অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ ও রসদ্দার। অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গের ভেদ বুঝাইতে

গিয়া বলিয়াছেন, ঘরের ভিতরের থাম আর বাইরের থাম। আরও বলিয়াছেন: যারা অন্তরঙ্গ তাদের দুটি জিনিস জানলেই হল—প্রথম আমি কে, তার পর তারা কে, আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কী। একথায় স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, অন্তরঙ্গ ভক্তেরা তাঁহার বহু কালের পরিচিত আপন জন, তাঁহার সহিত জন্মান্তরীণ সম্বন্ধের প্রেরণায় তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন, ভাগবতী লীলার রসাস্বাদন ও পুষ্টিবিধান করিবার জন্য; তাঁহারা মরমী ভক্ত। ঠাকুরের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণেব মিলনের পূর্বেই বহিরঙ্গ ভক্তগণের মিলন সংঘটিত হইয়াছে, এবং অধিকাংশ স্থলে বহিরঙ্গদের মাধ্যমেই অন্তরঙ্গদের কাছে তাঁহার মর্ত্যে আগমনের বার্তা গিয়া পৌঁছিয়াছে।

১২৮১ সালের চৈত্রমাসের মধ্য ভাগে, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চমাসে, ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজনেতা কেশবচন্দ্র সেনের সহিত দেখা করিতে যান হৃদয়কে সঙ্গে নিয়া, কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের গাড়ীতে করিয়া। কেশব তখন বেলঘরিয়া গ্রামে জয়গোপাল সেনের উদ্যানবাটীতে সশিষ্য অবস্থান করিতেছিলেন। ইহার অনেক বৎসর আগে ঠাকুর একবার কেশববাবুকে দেখিতে পাইয়াছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহে; মথুরবাবুর সঙ্গে তিনি গিয়াছিলেন; এবং কেশবকে বেদীর উপর ধ্যানস্থ অবস্থায় উপবিষ্ট দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ওর ফাতনায় মাছ খেয়েচে। বেলঘরিয়ায় কেশবকে দেখিতে যাওয়ার আগে ঠাকুর নারায়ণ শাস্ত্রীকে তাঁহার কাছে পাঠান; শাস্ত্রী দেখিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন: লোকটা জপে সিদ্ধ; কেশব সেনের ভাগ্য ভাল; আমি সংস্কৃতে কথা কইলাম, সে ভাষায় কথা কইল।

উদ্যানস্থ পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে কেশব বসিয়াছিলেন অনুচরগণকে সঙ্গে করিয়া, বেলা প্রায় একটা হইবে। এমন সময়ে হৃদয় যাইয়া নিবেদন করিল: আমার মামা হরিকথা শুনতে বড় ভালবাসেন, আপনার মুখে শুনতে এসেচেন; আদেশ পেলে তাঁকে এখানে নিয়ে আসব। কেশবের সম্মতিক্রমে হৃদয় ঠাকুরকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া আসিল।

ঠাকুর কহিলেন : বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বরকে দর্শন করে থাক, সে দর্শন কিরূপ তা জানতে বাসনা, তাই এসেচি। সংপ্রসঙ্গ সুরু হইল। কিছুক্ষণ পরেই ঠাকুর 'কে জানে কালী কেমন, ষড়্দর্শনে না পায় দরশন'—এই গানটি গাহিতে গাহিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন।

ঠাকুরের সমাধি দেখিয়া কেশবাদি ব্রাহ্মভক্তেরা উহাকে উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই, মাথার বিকারবিশেষ বা ভানমাত্র মনে করিয়াছিলেন। হৃদয় তখন ঠাকুরকে প্রণব শুনাইতে আরম্ভ করিল ও দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখমণ্ডল মধুর হাস্যে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া তিনি গভীর তত্ত্বসমূহ সরল ভাষায় সর্বজনবিদিত উদাহরণের সাহায্যে বলিয়া যাইতে লাগিলেন ও সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতে লাগিল তাঁহার শ্রীমুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া; শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের স্নানাহারের সময় যে অনেকক্ষণ অতীত হইয়াছে সেকথা একবারও তাঁহাদের মনে পড়িল না! পরিশেষে ঠাকুর কেশবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমার লেজ খসেচে। কেশব-শিষ্যেরা তাহাতে বিরক্ত হইয়াছে দেখিয়া আবার বলিতে লাগিলেন : বেঙাচির যতদিন লেজ থাকে ততদিন সে জলেই থাকে, ডাঙ্গায় উঠতে পারে না; কিন্তু লেজ যখন খসে পড়ে তখন সে জলেও থাকতে পারে, ডাঙ্গাতেও থাকতে পারে। তেমনি মানুষের যতদিন অবিদ্যারূপ লেজ থাকে ততদিন সে কেবল সংসার-জলেই থাকতে পারে; অবিদ্যা-লেজ খসে পড়লে সংসারে বা সচ্চিদানন্দে ইচ্ছামত যাওয়াআসা করতে পারে। তোমার এখন সে অবস্থা হয়েচে।

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসিলেন। এই একদিনের দেখাশুনাতেই কেশব তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। নিজের তিনজন অনুচরকে তিনি দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইলেন, তিনদিন সেখানে থাকিয়া তাহারা ঠাকুরের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করিবে। বলিয়াছেন ঠাকুর : "আমাকে পরখ করবার জন্যে তিনজন ব্রহ্মজ্ঞানী পাঠিয়েছিল, তার ভিতর প্রসন্নও ছিল। রাতদিন আমায় দেখত, দেখে কেশবের কাছে

খবর দিবে। আমার ঘরের ভিতর রাত্রে ছিল, কেবল 'দয়াময়, দয়াময়' করতে লাগল। আর আমাকে বলে, তুমি কেশববাবুকে ধর, তা হলে তোমার ভাল হবে। আমি বল্লুম, আমি সাকার মানি। তবুও দয়াময়, দয়াময় করে! তখন আমার একটা অবস্থা হল, বল্লুম, এখান থেকে যা! ঘরের মধ্যে কোনমতে থাকতে দিলুম না। তারা বারান্দায় গিয়ে শুয়ে রইল।" [কথামৃত]

ভাগ্যবান কেশবের শিষ্য তিনজন।
প্রভুর বিবিধ ভাব করি দরশন॥
পরস্পর বিচারিয়া বুঝিলেন সার।
প্রভু এক সাধু ভক্ত আশ্চর্য প্রকার॥
আশ্চর্য প্রকার কেন, ঠিক নাই ভাবে।
এহেন অবস্থা মাত্র গুরুর অভাবে॥

এইরূপ বুঝিয়াই ঠাকুরকে কেশব-শিষ্যেরা যখন কেশববাবুকে ধরিতে, অর্থাৎ গুরুপদে বরণ করিতে বলিল, আর তাহা হইলেই তিনি চতুর্বর্গ ফল পাইবেন বলিল, ঠাকুর তখন দাশরথি রায়ের নিম্নোক্ত গানটি গাহিয়া তাহাদের কথার উত্তর দিয়াছিলেন:

আমার কি ফলের অভাব, তোরা এলি বিফল ফল [illegible]
পেয়েছি যে ফল, জনম সফল, মোক্ষফলের বৃক্ষ [illegible]॥
শ্রীরামচরণ-কল্পতরু-মূলে রই, যে ফল বাঞ্ছা [illegible] সেই ফল প্রা[illegible]
ফলের কথা কই, ও-ফলগ্রাহক নই, যা[illegible]॥

গান শুনিয়া ব্রাহ্মভক্তেরা কী বু[illegible] না। [illegible]বর্তন করিয়া আচার্যকে তাঁহারা সকল [illegible] নিবেদন করিলেন [illegible]

কেশব চৈতন্যবান চৈ[illegible] তেজে।
গুপ্তসার মধ্যে কিবা [illegible] পেয়ে [illegible]
ব্যাকুল পরাণ হৈল [illegible] তরে।
[illegible]

কেশব ছিলেন [illegible] তিনি ঠাকুরের প্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়া[illegible] করিবার জন্য মাঝে মাঝে

প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন, কখন বা কলিকাতাস্থ নিজবাটী 'কমলকুটিরে' তাঁহাকে লইয়া যাইতেন। ঠাকুরও তাঁহাকে এতই ভালবাসিতেন যে, কিছুদিন তাঁহার খবর না পাইলেই স্বয়ং তাঁহার আবাসে গিয়া উপস্থিত হইতেন। একবার কেশবের অসুখের কথা শুনিয়া ঠাকুর বিষম চিন্তিত হইয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছেন: কেশবের জন্তে মার কাছে ডাব-চিনি মেনেছিলুম। শেষরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যেত, আর মার কাছে কাঁদতুম এই বলে, 'মা, কেশবের অসুখ ভাল করে দাও; কেশব না থাকলে আমি কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কইব?'

ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসবের সময় ঠাকুরের নিকটে আসিয়া, অথবা তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া তাঁহার সঙ্গে একদিন অতিবাহিত করাকে কেশব উৎসবের অঙ্গমধ্যে পরিগণিত করিতেন। অনেকবার ঐ সময়ে জাহাজে করিয়া কীর্তন করিতে করিতে সদলবলে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন এবং ঠাকুরকে জাহাজে তুলিয়া নিয়া তাঁহার কথামৃত পান করিতে করিতে সানন্দে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করিয়াছেন।

শুধু গায়ে, ফল হাতে করিয়া কেশব দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন ও ঠাকুরের সম্মুখে ফলটি রাখিয়া অনুগত শিষ্যের ন্যায় তাঁহার পদমূলে উপবেশন করিতেন। ঠাকুর একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি এত লোককে বক্তৃতায় মুগ্ধ কর, আমাকে কিছু শোনাও। কেশব সবিনয়ে উত্তর করেন: মহাশয়, আমি কি কামারের দোকানে ছুঁচ বিক্রী করব? আপনি বলুন, আমি শুনি; আপনারই মুখের কথা লোককে আমি বলি, আর শোনামাত্র তারা মুগ্ধ হয়।

ঠাকুরের আগ্রহাতিশয্যে একদিন কিন্তু কেশবকে কিছু বলিতেই হইয়াছিল। গঙ্গার ঘাটে চাঁদনীতে প্রার্থনাসভা হয় ও তাঁহার বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষণ শুনিয়া শ্রোতারা মুগ্ধ হইয়া যান। ঠাকুর বলিয়াছেন: বেশ বল্লে, আমার ভাব হয়ে গিছিল। পরে কেশবকে আমি বল্লুম, 'তুমি এগুলো এত বল কেন—হে ঈশ্বর, তুমি কী সুন্দর ফুল করিয়াছ, তুমি আকাশ করিয়াছ, তুমি তারা করিয়াছ, তুমি সমুদ্র করিয়াছ, এইসব?...ঈশ্বরের

মাধুর্যরসে ডুবে যাও। তাঁর অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত ঐশ্বর্য! অত খবরে আমাদের কাজ কী?' [কথামৃত]

দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর বলিলেন কেশবকে, ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মশক্তির অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হয়, অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তির মত ব্রহ্ম-ব্রহ্মশক্তি অভেদ। কেশব ইহা স্বীকার করিলেন। আবার ঠাকুর বলিলেন তাঁহাকে, ভাগবত-ভক্ত-ভগবান এই তিন পদার্থও তেমনি অভিন্ন—তিনে এক, একে তিন। যুক্তি দ্বারা বুঝিয়া নিয়া কেশব তাঁহার এই কথাও মানিয়া নিলেন। তারপরে ঠাকুর যখন বলিলেন, গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব তিনে এক, একে তিন, এবং উহা বুঝাইয়া দিতেও চাহিলেন, তখন কী যেন চিন্তা করিয়া কেশব সবিনয়ে নিবেদন করিলেন যে, তিনি এতদূর অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। 'বেশ বেশ, এখন ঐ পর্যন্ত থাক্।' ঠাকুর কহিলেন। "ঐরূপে পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত শ্রীযুত কেশবের মন ঠাকুরের দিব্যসঙ্গ-লাভে জীবনে বিশেষালোক উপলব্ধি করিয়াছিল এবং বৈদিক ধর্মের সার রহস্য দিন দিন বুঝিতে পারিয়া সাধনায় নিমগ্ন হইয়াছিল। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার পর হইতে তাঁহার ধর্মমত দিন দিন পরিবর্তিত হওয়ায় ঐকথা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়।"

ব্রাহ্মরা সগুণ ব্রহ্ম বা নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক। ব্রহ্মকে তাঁহারা কেবল পিতৃভাবে উপাসনা করিতেন। ঠাকুরের সঙ্গগুণে মাতৃভাবে উপাসনার মাধুর্য উপলব্ধি করিয়া কেশব তাঁহার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে সেইভাবের উপাসনাও প্রবর্তিত করেন। ঠাকুর বলিয়াছেন: "কেশব আগে খ্রীষ্টান ধর্ম, খ্রীষ্টানি মত খুব চিন্তা করেছিলেন। সেই সময় দেবেন্দ্র ঠাকুরের ওখানে (আদি ব্রাহ্মসমাজে) ছিলেন।...কেশব এখন কালী মানেন—চিন্ময়ী কালী—আদ্যাশক্তি, আর মা মা বলে তাঁর নামগুণ কীর্তন করেন।" [কথামৃত]। 'জীবনবেদে' কেশব তাঁহার এই মাতৃভাবে উপাসনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সমাজমন্দিরের উপাসনাকালীন ভাষণে তিনি একদিন যাহা বলিয়াছিলেন উহার ভাব এইরূপ:

যে না দেখিয়াছে মার রূপের গঠন।
আজিতক নহে তার ব্রহ্ম-দরশন ॥
দেখ কি রূপের ছবি মায়ের চেহারা।
দেখিয়া করিল মোরে পাগলের পারা ॥
বিশ্ব কিবা আলোময় রূপের কিরণে।
যেমন রূপেতে রূপ সেই মত নামে ॥
ভবনে ভবনে হবে মায়ের গমন।
কান্তিরূপে যাবে ব্যাপে গোটা ত্রিভুবন ॥
ইংরাজি পুস্তক-পাঠ অনর্থের মূলে।
বিশুষ্ক হৃদয়-ভাব পতিত অকূলে ॥
বরাভয়দাত্রী মাতা দিবেন কিনারা।
সময়ে আনন্দরূপ ধরিবেন ধরা ॥
না হয় না হোক আজি দশদিন পরে।
রটিবে মায়ের নাম জগৎ-ভিতরে ॥
দ্বেষপূর্ণ সম্প্রদায়ী ভাব অগণন।
আনন্দময়ীর নামে হইবে নিধন ॥
আর নাহি পূজ কারে পূজ সনাতনী।
ভক্তি-প্রেম-জ্ঞান-দাত্রী জগৎজননী ॥
শুষ্কপত্র কেবল কুড়ান ছিল মোর।
মায়ের প্রসাদে আজি আনন্দে বিভোর ॥
শক্তি-বলে শক্তি পেয়ে পাইনু সুপথ।
মেতেছি যেমন মাতা মাতাও জগৎ ॥
হাবুডুবু খাই ভক্তিরসের বন্যায়।
এতদিন হেন দিন আছিল কোথায় ॥
সাধ যদি মৃত্যুকালে দেখিবারে পাই।
ভেসে যায় বিশ্ব যেন নিজে ভেসে যাই ॥
এস মা এস মা গুপ্ত না থাকিও আর।
রূপেতে করহ মুক্ত লোচন-আঁধার ॥
একবার আসিয়া দাঁড়াও মাঝখানে।
মা বলে ছায়ালে যত নাচি চারিপানে ॥

কেশবের চিন্ময়ী মার অনুধ্যানের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া, ঐ ভাব-সাধনার অনুকূল উৎকৃষ্ট পদাবলী রচনা করিয়া সমাজের অন্যতম আচার্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (চিরঞ্জীব শর্মা) সেই সময়ে বাঙ্গলার সাধককুলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। উহাদের কয়েকটির প্রথমাংশ এইরূপ ঃ

(১) নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।
(২) আমায় দেমা পাগল করে, আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে।
(৩) কত ভালবাস গো মা মানব-সন্তানে।

ঠাকুরের ভাব, সমাধি ও ভক্তসঙ্গে বিহার দর্শন করিয়া তিনি নিম্নোক্ত অনুপম পদগুলিও রচনা করিয়াছিলেন ঃ

(১) গভীর সমাধিসিন্ধু অনন্ত অপার।
(২) চিদাকাশে হল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয় রে।
(৩) চিদানন্দ-সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।
(৪) প্রেমের বাজারে আনন্দের মেলা, হরি ভক্তসঙ্গে রসরঙ্গে করিছেন কত খেলা।

চিরঞ্জীবের সঙ্গীত-শ্রবণে ঠাকুরকে অনেক সময় সমাধিস্থ হইতে দেখা গিয়াছে।

ঠাকুরের সহিত মিলনের পর হইতেই কেশব 'ধর্মতত্ত্ব', 'সুলভ সমাচার', 'সান্‌ডে মিরার', 'থিইষ্টিক কোয়ার্টারলি রিভিউ' প্রভৃতি নিজেদের সমাজের পত্রিকাগুলিতে ঠাকুরের বিষয় লিখিতে আরম্ভ করেন; ইহার ফলে কলিকাতার শিক্ষিত জনসাধারণ ক্রমশঃ ঠাকুরের কথা জানিতে পারেন। 'পরমহংসের উক্তি' নামে একখানি পুস্তিকাও তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন (১২৮৫)। 'মিরার' পত্রিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন: "আমরা অল্পদিন হইল, দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস রামকৃষ্ণকে বেলঘরিয়ার বাগানে দর্শন করিয়াছি। তাঁহার গভীরতা, অন্তর্দৃষ্টি, বালকস্বভাব দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি শান্তস্বভাব, কোমলপ্রকৃতি, আর দেখিলে বোধ হয়, সর্বদা যোগেতে আছেন। এখন আমাদের বোধ হইতেছে যে, হিন্দুধর্মের গভীরতম প্রদেশ অনুসন্ধান করিলে কত সৌন্দর্য, সত্য ও সাধুতা

দেখিতে পাওয়া যায়। তা না হইলে পরমহংসের ন্যায় ঈশ্বরীয় ভাবে ভাবিত যোগী পুরুষ কিরূপে দেখা যাইতেছে?"[১]

একদিন গ্রীষ্মকালে ঠাকুরের দুইজন গৃহী ভক্ত রাম ও মনোমোহন কমলকুটিরে কেশবের সহিত দেখা করিতে যান। তাঁহাদের জানিতে ইচ্ছা ছিল, কেশববাবু ঠাকুরকে কিরূপ মনে করেন। কেশব তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন: "দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস সামান্য নহেন, এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে এতবড় লোক কেহ নাই। ইনি এত সুন্দর, এত অসাধারণ ব্যক্তি, এঁকে অতি সাবধানে সন্তর্পণে রাখতে হয়; অযত্ন করলে এঁর দেহ থাকবে না, যেমন সুন্দর মূল্যবান জিনিস গ্লাসকেসে রাখতে হয়।"[২]

১২৮৪ সালের ফাল্গুন মাসে কেশব কুচবিহারের মহারাজার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। এই ঘটনাকে নিমিত্ত করিয়া—কন্যার বিবাহযোগ্য বয়সের যে সীমা ব্রাহ্মসমাজ নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল, কেশব-দুহিতার বয়স তাহা হইতে কিছু কম ছিল বলিয়া—সমাজে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং 'সাধারণ ব্রহ্মসমাজ' নাম দিয়া বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে পৃথক্ এক দল গঠন করিয়া বসেন। ঠাকুর কিন্তু এই ব্যাপারে কেশবের দোষ দেখিতে পান নাই, যেহেতু কেশব সংসারী মানুষ ও সন্তানের হিতকামী পিতা। তবে আইন করিয়া বিবাহের বয়ঃসীমা নির্ধারণ করা তিনি সমর্থন করেন নাই, 'জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে'—তিনি বলিতেন। এই ঘটনায় ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই, উভয় পক্ষের প্রকৃত ধর্মপিপাসু ব্যক্তিরা পূর্ববৎ তাঁহার কাছে যাতায়াত করিতে ও সাধনার পথে তাঁহার সহায়তা লাভ করিতে থাকেন। উৎসবাদি উপলক্ষে আমন্ত্রিত হইয়া গিয়া তিনিও উভয় দলের ভক্তগণের সহিত সম্মিলিত হইতেন।

আঘাত আধ্যাত্মিক জীবনে গভীরতা আনয়ন করে। ঠাকুরের কৃপায় কেশবের আধ্যাত্মিক জীবন এই সময় হইতে সুগভীর হইয়া উঠিয়াছিল।

---

১ কথামৃতে বিধৃত। ২ কথামৃতে বিধৃত।

"হোম, অভিষেক, মুণ্ডন, কাষায়-ধারণাদি স্থূল ক্রিয়াসকলের সহায়ে মানব-মন আধ্যাত্মিক রাজ্যের সূক্ষ্ম ও উচ্চ স্তরসমূহে আরোহণে সমর্থ হয়, একথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি ঐসকলের স্বল্পবিস্তর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বুদ্ধ, শ্রীগৌরাঙ্গ, ঈশা প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জীবন্ত ভাবময় তনুতে নিত্য বিদ্যমান, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে এক এক বিশেষ বিশেষ ভাবপ্রস্রবণ-স্বরূপে সতত অবস্থান করিতেছেন, একথা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগের ভাব যথাযথ উপলব্ধি করিবার জন্য তিনি কখন একের কখন অন্যের ধ্যানে তন্ময় হইয়া কিয়ৎকাল যাপন করিয়াছিলেন। ... ঐরূপে সাধনসমূহের স্বল্পবিস্তর অনুষ্ঠানপূর্বক 'যত মত তত পথ' রূপ ঠাকুরের নবাবিষ্কৃত তত্ত্বের বিষয় শ্রীযুত কেশব যতদূর বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহাই কুচবিহার-বিবাহের প্রায় দুই বৎসর পরে 'নববিধান' আখ্যা দিয়া জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। ঠাকুরকে তিনি উক্ত বিধানের ঘনীভূত মূর্তি জানিয়া কতদূর শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন তাহা প্রকাশ করিতে আমরা অসমর্থ। ... অনেকে দেখিয়াছে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তিনি 'জয় বিধানের জয়' এই কথা বারংবার উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতেছেন। 'নববিধান' প্রচারের প্রায় চারি বৎসর পরে তিনি ইহলোক হইতে প্রস্থান না করিলে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন ক্রমে আরও কত সুগভীর হইত, তাহা কে বলিতে পারে?"

কেশব একদিন ঠাকুরকে নিজবাটীতে আনয়ন করিয়া যেখানে যেখানে তিনি শয়নভোজনাদি করিতেন সেই স্থানগুলি তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন, ও শেষে নিজের উপাসনাগৃহে তাঁহাকে লইয়া গিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিয়াছিলেন। শেষোক্ত ঘটনাটি ঠাকুর প্রকাশ করিয়াছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের কাছে।

কেশবের শেষ অসুখের সময় তাঁহাকে দেখিতে গিয়া অনেক কথার পর ঠাকুর বলিয়াছিলেন: মালী বসরাই গোলাপের গাছ শিকড় শুদ্ধ তুলে দেয়, শিশির পেলে ভাল করে গজাবে। তাই বুঝি

তোমার শিকড়সুদ্ধ তুলে দিচ্চে, ফিরে ফিরতি বুঝি একটা বড় কাণ্ড হবে!

সেইদিন কেশবের বড় ছেলে কাছে আসিয়া বসিলে ঠাকুর সস্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়াছিলেন। কেশব দেহরক্ষা করিলে (২৫শে পৌষ, ১২৯০) তিনি শোকাভিভূত হইয়া তিনদিন শয়ন করিয়া ছিলেন, মৌনাবলম্বী হইয়া। পরে বলিয়াছিলেন: কেশবের মৃত্যুর কথা শুনে আমার বোধ হল যেন আমার একটা অঙ্গ পড়ে গেছে! কেশবের মৃত্যুর প্রায় ছয়মাস পরের ঘটনা, ঠাকুর বলিতেছেন: কেশব সেনের মা, বোন এরা এসেছিল, তাই খানিকটা নাচলুম। কী করি, ভারী শোক পেয়েচে!

ঠাকুর ও বিজয়াদি ব্রাহ্মভক্তেরা

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্যপ্রভুর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত সরল ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিবার জন্য যখন তিনি কলিকাতায় আসেন তখন তাঁহার অঙ্গ ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবোচিত শিখা-সূত্র-কবচাদিতে ভূষিত ছিল; সত্যের অনুরোধে একদিনে সেইসব বিসর্জন দিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াছিলেন। সত্যের অনুরোধে, কুচবিহার-বিবাহের পরে, গুরুতুল্য কেশবকে বর্জন করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। আবার সেই সত্যেরই অনুরোধে পাশ্চাত্যভাববহুল, সমাজসংস্কার-প্রধান ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া সনাতন হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, সাকার-নিরাকারে তুল্যবিশ্বাসী হইয়া। ব্রাহ্মসমাজের তিনি বৃত্তিভোগী আচার্য ছিলেন, বৃত্তিলোপে অনেক অসুবিধায় পড়িতে হইলেও তিনি কাতর হন নাই। ঠাকুরের পুণ্যদর্শন ও সঙ্গলাভের ফলে প্রাগ্‌জন্মার্জিত ও বংশানুগত শুভ সংস্কার প্রবুদ্ধ হইয়া সহজেই তাঁহার মধ্যে এই পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছিল।

অতঃপর বিজয়ের সাধনানুরাগ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় ও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষানুভূতির জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। ধ্যানের প্রগাঢ় অবস্থায় তিনি অনেক ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করিতেন; কীর্তনকালে তাঁহার ভাবাবেশ ও উদ্দাম নৃত্য দেখিয়া লোকে মোহিত হইত। আধ্যাত্মিক অনুভূতির রাজ্যে তিনি যে উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই বিষয়ে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন: "যে ঘরে প্রবেশ করিলে লোকের ঈশ্বরসাধনা পূর্ণত্ব লাভ করে তাহার পার্শ্বের ঘরে পৌঁছিয়া বিজয় দ্বার খুলিয়া দিবার নিমিত্ত করাঘাত করিতেছে!"

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পরে একদলের লোকের সহিত অন্যদলের লোকের বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এক সুযোগে কেশব ও বিজয়কে একত্র করিয়া ঠাকুর তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে পূর্বসদ্ভাব ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হন ও ইহার ফলে পুনরায় তাঁহাদের

পরস্পর কথাবার্তা চলিয়াছিল। কেশবকে সম্বোধন করিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন: "ওগো, এই বিজয় এসেচেন। তোমাদের ঝগড়াবিবাদ—যেমন শিব ও রামের যুদ্ধ। রামের গুরু শিব, যুদ্ধও হল, দুজনে ভাবও হল। কিন্তু শিবের ভূতপ্রেতগুলো আর রামের বানরগুলো ওদের ঝগড়া কিচিকিচি আর মেটে না। আপনার লোক! তা এরূপ হয়ে থাকে। লব-কুশ যে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। আবার জানো, মায়ে-ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলবার করে, যেন মার মঙ্গল মেয়ের মঙ্গল দুটো আলাদা। কিন্তু এর মঙ্গলে ওর মঙ্গল হয়, ওর মঙ্গলে এর মঙ্গল হয়। তেমনি তোমাদের এর একটি সমাজ আছে, আবার ওর একটি দরকার।...রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, তার গুরু ছিলেন অদ্বৈতবাদী; শেষে দুজনে অমিল। গুরু-শিষ্য পরস্পর মত খণ্ডন করতে লাগল! এরূপ হয়েই থাকে। যাই হোক তবু আপনার লোক।" [কথামৃত]

একবার ঢাকায় অবস্থান করিবার কালে বিজয় যখন ঈশ্বরচিন্তা করিতেছিলেন ঘরের দরজায় খিল দিয়া বসিয়া, সেই সময়ে গৃহমধ্যে হঠাৎ ঠাকুরকে দেখিতে পান, এবং উহা মাথার খেয়াল কি-না জানিবার জন্য ঠাকুরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেকক্ষণ ধরিয়া টিপিয়া দেখেন। কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি এই ঘটনাটি বলিয়াছিলেন ঠাকুরের ও বহুভক্তের সম্মুখে বসিয়া, শ্যামপুকুরে। তিনি আরও বলিয়াছিলেন: "দেশবিদেশ পাহাড়-পর্বত ঘুরে ফিরে অনেক সাধু মহাত্মা দেখলাম, কিন্তু (ঠাকুরকে দেখাইয়া) এমনটি আর কোথাও দেখলাম না। এখানে যে ভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখচি তারই কোথাও দু আনা, কোথাও এক আনা, কোথাও এক পাই, কোথাও আধ পাই মাত্র; চার আনাও কোন জায়গায় দেখলাম না।...(ঠাকুরের প্রতি) অতি সহজ হয়েই আপনি যত গোল করেচেন। কলকাতার পাশেই দক্ষিণেশ্বর, যখনি ইচ্ছা তখনি এসে আপনাকে দর্শন করতে পারি; আসতে কোন কষ্টও নাই, নৌকা গাড়ী যথেষ্ট; ঘরের পাশে এইরূপে এত সহজে আপনাকে পাওয়া যায় বলেই আমরা আপনাকে বুঝলাম না। যদি কোন পাহাড়ের চূড়ায় বসে থাকতেন, আর পথ হেঁটে অনাহারে গাছের শিকড়

ধরে উঠে আপনার দর্শন পাওয়া যেত, তা হলে আমরা আপনার কদর করতাম। এখন মনে করি, ঘরের পাশেই যখন এইরকম, তখন না জানি বাইরে দূরদূরান্তরে আরো কত ভাল ভাল সব আছে। তাই আপনাকে ফেলে ছুটাছুটি করে মরি।”

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ব্রাহ্মসমাজ বর্জন করিলে অনেকে তাঁহাকে অনুসরণ করেন ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। আচার্য শিবনাথ তখন নেতা হইয়া দলটিকে কোনরূপে রক্ষা করেন। শিবনাথ ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করিতেন, তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তিও করিতেন, কিন্তু ঠাকুরের প্রভাবেই বিজয়ের ধর্মমত পরিবর্তিত হইয়াছে মনে করিয়া তিনি ঠাকুরের কাছে যাওয়া বন্ধ করিয়া দেন। নরেন্দ্রনাথ (শ্রীবিবেকানন্দ) ইতঃপূর্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন, তিনি শিবনাথকে ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শিবনাথ বলিয়াছিলেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিলে তাঁহার দেখাদেখি অন্যেরাও যাইবে ও ব্রাহ্মসমাজ তাহাতে ভাঙ্গিয়া যাইবে। তিনি নরেন্দ্রনাথকেও সেখানে আর না যাইতে পরামর্শ দেন এবং ঠাকুরের ভাবাবেশ ও সমাধি স্নায়ুবিকার-প্রসূত রোগবিশেষ বলিয়া মন্তব্য করেন।

ঠাকুর কিন্তু এইসব কথা শুনিয়াও শিবনাথকে ভালবাসিতেন ও কখন কখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। পরে যখন শিবনাথের সহিত ঠাকুরের দেখা হইল, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন: হ্যাঁ শিবনাথ, তুমি নাকি এগুলোকে রোগ বল, আর বল যে, ঐ সময়ে আমি অচৈতন্য হয়ে যাই? তোমরা ইট, কাঠ, মাটি, টাকা এইসব জড় বস্তুতে দিনরাত মন রেখে ঠিক থাকলে, আর যাঁর চৈতন্যে জগৎ চৈতন্যময় তাঁকে দিনরাত ভেবে আমি অচৈতন্য হলুম—এ কোন্‌দিশি বুদ্ধি তোমার? শিবনাথ নিরুত্তর।

কাশীপুরের মহিমাচরণ চক্রবর্তী একদিন নববিধান ব্রাহ্মসমাজের আচার্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কাছে জানিতে চাহেন, ঠাকুরের সঙ্গলাভে ব্রাহ্ম-সমাজের ভাব-পরিণতি কতদূর কিরূপ হইয়াছে। প্রতাপবাবু

বলিয়াছিলেন: এঁকে (ঠাকুরকে) দেখবার আগে আমরা ধর্ম কী বস্তু তা কি বুঝতাম ?—কেবল গুণ্ডামি করে বেড়াতাম ; এঁর দর্শনলাভের পরে বুঝেচি যথার্থ ধর্মজীবন কাকে বলে। 'থিইষ্টিক কোয়ার্টারলি রিভিউ' পত্রিকায় প্রতাপ ঠাকুরের সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৮৭৯), উহার কিয়দংশ (অনুবাদ) এইরূপ :

"এই অদ্ভুত পুরুষ দেশ-কাল-নির্বিশেষে আপনার চারিদিকে এক আনন্দময় ভাবপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া থাকেন। এখনও আমার মন সেই দিব্য ভাবধারায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ··· তাঁহার সহিত আমার এমন কী সাদৃশ্য আছে ? আমি একজন পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন, সভ্য, দেহগণ্ডিবদ্ধ, অর্ধসংশয়বাদী, শিক্ষাভিমানী তার্কিক ; আর তিনি দরিদ্র, অশিক্ষিত, অমার্জিতরুচি, অর্ধপৌত্তলিক, অসহায় হিন্দুসাধক। ··· রামকৃষ্ণ পরমহংস শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, অথবা বেদান্তী, কোনটিই নহেন ; তথাপি তাঁহাকে এই সব কয়টি অভিধাই দেওয়া চলে। ··· তাঁহার অন্তরের পবিত্রতা ও স্ত্রীজাতির প্রতি মাতৃভাব অতি অদ্ভুত ও বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। কেবলমাত্র কাম-কাঞ্চন-ত্যাগই তাঁহার অতুলনীয় নৈতিক চরিত্রের মূল রহস্য। ··· তিনি যেরূপ অনায়াসে ও সহজভাবে পুরাণাদি শাস্ত্রের অতি দুর্বোধ্য স্থলসমূহেরও অপূর্ব প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইতে কল্পনা করাও অসম্ভব যে, তিনি একজন অশিক্ষিত লোক। ··· লিপিবদ্ধ করিলে তাঁহার উক্তিসমূহ এক অত্যদ্ভুত জ্ঞানের গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইবে। ···এই মহান সাধু-পুরুষ হিন্দুধর্মের গভীরতা ও মাধুর্যের জ্বলন্ত নিদর্শন। ···এই সিদ্ধ হিন্দু তপস্বী জগতের অনিত্যতা ও অসারতার সাক্ষ্যস্বরূপ বিরাজমান। ইঁহার ঐশ্বর্যহীন জীবনে ভগবান ব্যতীত আর কোন আত্মীয় বা বন্ধু নাই, ঈশ্বরানুধ্যান ব্যতীত অপর কোন চিন্তা বা কর্ম নাই। ·· আমাদের ধর্মজীবনের আদর্শ ভিন্ন ; কিন্তু যতদিন ভগবান ইঁহাকে আমাদের মধ্যে রাখেন, আমরা আনন্দের সহিত ইঁহার পদতলে বসিয়া পবিত্রতা, ত্যাগ, ধর্ম ও গভীর ঈশ্বরপ্রেমের উচ্চ তত্ত্বসমূহ শিক্ষা করিব।"

পাশ্চাত্ত্যভাবে ভাবিত ব্রাহ্মভক্তেরা যে তাঁহার সকলপ্রকার ভাব ও উপদেশ যথাযথ বুঝিতে পারিবেন না, এবং যাহা বুঝিতে পারিবেন তাহাও সর্বাংশে গ্রহণ করিতে পারিবেন না, এবিষয় ঠাকুর তাঁহাদের সহিত প্রথম মিলনের দিন হইতেই হৃদয়ঙ্গম করিয়া আসিতেছিলেন। সেইজন্যই দেখা যায়, তাঁহাদের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করিবার পরে তিনি প্রায়ই বলিতেন, আমি যা বলবার বলে গেলুম, তোমরা নেজামুড়ো বাদ দিয়ে নিয়ো। অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণকেও তিনি প্রয়োজন-বোধে অনুরূপ কথা বলিতেন। যেমন, গোপীপ্রেমের বিষয় একশ্রেণীর শ্রোতা ঠিকভাবে নিতে পারিতেছে না দেখিলে বলিতেন, কৃষ্ণের উপর গোপীদের এই টানটুকু নিয়ো।

ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত পিপাসু ব্যক্তিগণের সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধ ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। উৎসবাদি উপলক্ষে আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহাদের বাটীতে তিনি যাইতেন ও কীর্তনাদিতে যোগ দিয়া তাঁহাদের আনন্দবর্ধন করিতেন। ঐসকল ব্যক্তিগণের মধ্যে সিঁদুরিয়াপটির মণিমোহন মল্লিক, মাথাঘসা গলির জয়গোপাল সেন, সিঁতির বেণীমাধব পাল ও নন্দন বাগানের কাশীশ্বর মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঠাকুর ব্রাহ্ম-সমাজের, এবং অন্যান্য সম্প্রদায়েরও, ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তিগণের সহিত একত্র পানভোজন করিতে কখনও দ্বিধা করিতেন না।[১]

ব্রাহ্মভক্তগণের সহিত ঠাকুরের কীর্তনানন্দ উপভোগের এক অনুপম চিত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে ভাষান্বিত হইয়াছে। সেদিন ঠাকুর সিঁদুরিয়াপটিতে মণিমোহন মল্লিকের বাড়ীতে গিয়াছিলেন, উৎসব উপলক্ষে সেখানে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। সন্ধ্যাকাল, ১২৯০ সালের ১১ই অগ্রহায়ণ, সোমবার। অতিরিক্ত ভিড়ের মধ্যে বৈঠকখানার এক দ্বারপার্শ্ব হইতে কোনরূপে ভিতরে মাথা গলাইয়া শরচ্চন্দ্র দেখিলেন :

১ ব্রাহ্মভক্ত অমৃতলাল বসু একদা ঠাকুরের জন্য মুসলমানের দোকান হইতে উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন কিনিয়া লইয়া আসেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন : "সন্তানবাৎসল্যে গোরস যেমন দেবভোগ্য দুগ্ধে পরিণত হয়, তোমার অকপট ভক্তিতে ইহাও সেইরূপ পবিত্র হইয়াছে।" [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত]

"অপূর্ব দৃশ্য! গৃহের ভিতরে স্বর্গীয় আনন্দের বিশাল তরঙ্গ খরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। সকলে এককালে আত্মহারা হইয়া কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, উদ্দাম নৃত্য করিতেছে, ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে, বিহ্বল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করিতেছে; আর ঠাকুর সেই উন্মত্ত দলের মধ্যভাগে নৃত্য করিতে করিতে কখন দ্রুতপদে তালে তালে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন, আবার কখন বা ঐরূপে পশ্চাতে হটিয়া আসিতেছেন। এবং ঐরূপে যখন যেদিকে তিনি অগ্রসর হইতেছেন সেই দিকের লোকেরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া তাঁহার অনায়াস গমনাগমনের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিতেছে। তাঁহার হাস্যপূর্ণ আননে অদৃষ্টপূর্ব দিব্যজ্যোতি ক্রীড়া করিতেছে এবং প্রতি অঙ্গে অপূর্ব কোমলতা ও মাধুর্যের সহিত সিংহের ন্যায় বলের যুগপৎ আবির্ভাব হইয়াছে। সে এক অপূর্ব নৃত্য! তাহাতে আড়ম্বর নাই, লম্ফন নাই, কৃচ্ছ্রসাধ্য অস্বাভাবিক অঙ্গবিকৃতি বা অঙ্গসংযমরাহিত্য নাই; আছে কেবল, আনন্দের অধীরতায় মাধুর্য ও উদ্যমের সম্মিলনে প্রতি অঙ্গের স্বাভাবিক সংস্থিতি ও গতিবিধি! নির্মল সলিলরাশি প্রাপ্ত হইয়া মৎস্য যেমন কখন ধীরভাবে এবং কখন দ্রুত সন্তরণ দ্বারা চতুর্দিকে ধাবিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করে, ঠাকুরের এই অপূর্ব নৃত্যও যেন ঠিক তদ্রূপ। তিনি যেন আনন্দসাগর ব্রহ্মস্বরূপে নিমগ্ন হইয়া নিজ অন্তরের ভাব বাহিরের অঙ্গসংস্থানে প্রকাশ করিতেছিলেন। ঐরূপে নৃত্য করিতে করিতে তিনি কখন বা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেছিলেন, কখন বা তাঁহার পরিধেয় বসন স্খলিত হইয়া যাইতেছিল এবং অপরে উহা তাঁহার কটিতে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দিতেছিল, আবার কখন বা কাহাকেও ভাবাবেশে সংজ্ঞাশূন্য হইতে দেখিয়া তিনি তাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া তাহাকে পুনরায় সচেতন করিতেছিলেন। বোধ হইতেছিল যেন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এক দিব্যোজ্জ্বল আনন্দধারা চতুর্দিকে প্রসৃত হইয়া যথার্থ ভক্তকে ঈশ্বরদর্শনে, মৃদুবৈরাগ্যবানকে তীব্র বৈরাগ্যলাভে, অলস মনকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে সোৎসাহে অগ্রসর হইতে সামর্থ্য প্রদান করিতেছিল, এবং ঘোর বিষয়ীর মন

হইতেও সংসারাসক্তিকে সেই ক্ষণের জন্য কোথায় বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার ভাবাবেশ অপরে সংক্রমিত হইয়া তাহাদিগকে ভাববিহ্বল করিয়া ফেলিতেছিল এবং তাঁহার পবিত্রতায় প্রদীপ্ত হইয়া তাহাদের মন যেন কোন এক উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে আরোহণ করিয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণের ত কথাই নাই, অন্য ব্রাহ্মভক্ত-সকলের অনেকেও সেদিন মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পতিত হইয়াছিলেন। আর সুকণ্ঠ আচার্য চিরঞ্জীব সেদিন একতারা-সহায়ে 'নাচ্ রে আনন্দময়ীর ছেলে তোরা ঘুরে ফিরে' ইত্যাদি সঙ্গীতটি গাহিতে গাহিতে তন্ময় হইয়া যেন আপনাতে আপনি ডুবিয়া গিয়াছিলেন। ঐরূপে প্রায় দুই ঘণ্টারও অধিক কাল কীর্তনানন্দে অতিবাহিত হইলে, 'এমন মধুর হরিনাম জগতে আনিল কে?' এই পদটি গীত হইয়া সকল ধর্মসম্প্রদায় ও ভক্ত্যাচার্যদিগকে প্রণাম করিয়া সেই অপূর্ব কীর্তনের বেগ সেদিন শান্ত হইয়াছিল।"

ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধ পর্যালোচনা করিয়া লীলা-প্রসঙ্গকার লিখিয়াছেন: "ব্রাহ্মসমাজই ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম অনুশীলন করিয়া কলিকাতার জনসাধারণের চিত্ত দক্ষিণেশ্বরে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে বসিয়া যাঁহারা আধ্যাত্মিক শক্তি ও শান্তি-লাভে ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকে ঐ বিষয়ের জন্য 'নববিধান' ও 'সাধারণ' উভয় ব্রাহ্মসমাজের নিকটেই চিরঋণে আবদ্ধ। বর্তমান লেখক আবার তদুভয় সমাজের নিকটে অধিকতর ঋণী। কারণ, উচ্চাদর্শ সম্মুখে ধারণ করিয়া যৌবনের প্রারম্ভে আধ্যাত্মিকভাবে চরিত্রগঠনে তাহাকে ঐ সমাজদ্বয়ই সাহায্য করিয়াছিল। অতএব, ব্রহ্ম, ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মমণ্ডলী বা সমাজরূপী ত্রিরত্নকে স্বরূপতঃ এক জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভরে আমরা পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতেছি।"

ঠাকুরের দুই অন্তরঙ্গ ভক্ত রাম ও মনোমোহন

কেশবের সহিত ঠাকুরের মিলনের চারিবৎসরাধিক কাল পরে ঠাকুরের দুই অন্তরঙ্গ গৃহী ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্র কেশব-পরিচালিত 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় বার্তা পাইয়া ঠাকুরের কাছে আগমন করেন দক্ষিণেশ্বরে। সেদিন ১২৮৬ সালের ২৮শে কার্তিক। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' গ্রন্থে রাম লিখিয়াছেন : "সে সময় আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতাম না। স্বভাবে সকলেই হয়, যায়, রহে—এইপ্রকার সিদ্ধান্ত ছিল। সুতরাং আমরা একপ্রকার নরাকারে জন্তু-বিশেষ ছিলাম। জানিতাম আহার-নিদ্রাদি জীবধর্ম। এই সকল কার্য সাধনা করিতে যে পারিবে সেই ব্যক্তিই ধন্য। সুতরাং যাহাতে তদ্বিষয়ে নিপুণ হওয়া যায় তাহার ব্যবস্থাই হইত। আমাদের যে স্বভাব বর্ণনা করিলাম উহাই এখনকার বাজার। ... আমরা বেলা একটার সময় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখন তাঁহার (ঠাকুরের) ঘরের দ্বার রুদ্ধ ছিল। কাহাকে ডাকিব, কি বলিয়া ডাকিব ভাবিতেছি এমন সময়ে এক ব্যক্তি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের প্রাণ যেন শীতল হইল; কিন্তু কে তিনি, তখন জানিতে পারিলাম না। ঘরের ভিতরে যাইয়া প্রণামানন্তর উপবেশন করিলাম এবং মনে হইল যে, ইনিই সেই মহাপুরুষ হইবেন। ·· আমাদের সেইদিন সৌভাগ্যসূর্য উদিত হইল. আমাদের মনের কুসংস্কারের গুদাম সেইদিন পরিষ্কৃত হইল। বিলাতী কুশিক্ষায় যেসকল বিষয়কে কুসংস্কার বলিয়া অতি যত্নে শিক্ষা করিয়াছিলাম, পুনরায় তাহাদের আদর করিয়া লইতে শিক্ষা পাইলাম। ... যেমন আমরা কাঙ্গাল, যেমন দরিদ্র ছিলাম, যেমন আমাদের সকল স্থানই শূন্য ছিল, তেমনই আমাদের দাতা জুটিল।"

নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া রামচন্দ্র মাত্র আড়াই বছর বয়সে মাতৃহারা হন। পৈত্রিক সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তিনি এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া পড়াশুনা করেন, এবং ডাক্তারী শিক্ষা করিয়া ক্রমে

মেডিকেল কলেজে সহকারী রাসায়নিক পরীক্ষক ও সায়েন্স এসোসিয়েশনে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার আর্থিক সচ্ছলতা ঘটে এবং কলিকাতার সিমলা-পল্লীস্থ মধু রায়ের গলিতে তিনি নিজস্ব এক বাটী নির্মাণ করেন। জড়বিজ্ঞানের মাত্রাতিরিক্ত চর্চার ফলে তাঁহার বাল্যের ভক্তিভাব উবিয়া যাইতে আরম্ভ করে ও ক্রমে তিনি নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক হইয়া পড়েন। নাস্তিক হইয়াও তিনি কুলাচার ত্যাগ করেন নাই, আজীবন নিরামিষাহারী ছিলেন।

মনোমোহন ছিলেন রামের মাসতুতো ভাই, মাত্র দুইমাস বড়। কোন্নগরে তাঁহার নিজ বাড়ী থাকিলেও কলিকাতার সিমলা স্ট্রীটে তিনি একখানি বাড়ী ক্রয় করিয়াছিলেন, এবং কাজের সুবিধার জন্য কলিকাতার বাড়ীতেই বাস করিতেন। তিনি বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে কাজ পাইয়াছিলেন। মনোমোহন কেশবের ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন, তাঁহার ভাবে কতকটা ভাবিত হইয়াও গিয়াছিলেন, কিন্তু রামের প্রবল যুক্তির প্রভাবে সংশয়বাদী হইয়া পড়েন।

কলিকাতার বাড়ীতে আসিবার পূর্বে, কোন্নগরে থাকিতে, মনোমোহনের একটি সাতমাসের কন্যা মারা যায়। শোকে তিনি এতই আত্মহারা হইয়াছিলেন যে, একএক দিন কন্যার খোঁজে অতর্কিতে তাহার সমাধিস্থলে চলিয়া যাইতেন। ইহার কিছুদিন পরে রামেরও প্রাণসমা একটি কন্যা দেহত্যাগ করিয়া তাঁহার শোকদগ্ধ হৃদয়ে মৃত্যুরহস্য সম্বন্ধে প্রবল জিজ্ঞাসা উদ্রিক্ত করে। জিজ্ঞাসার সদুত্তর ও শান্তিলাভের আশায় কিছুদিন তিনি ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টান-কর্তাভজাদি সম্প্রদায়ের লোকদের সহিত মেলা-মেশা ও তাহাদের গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলেন, কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। এইরূপ একটা অসহায় অসহনীয় অবস্থায় সমপ্রাণ সমব্যথী দুই ভাই রাম ও মনোমোহন অতি শুভক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হন ঠাকুরের শ্রীপদ-প্রান্তে, দক্ষিণেশ্বরে। তাঁহাদের উভয়েরই বয়স তখন আটাশ বৎসর হইবে।

অন্তরে অপার সুখ প্রভু ভগবান।
দেখিতে দেখিতে দুই ভক্তের বয়ান॥

সোহাগে সম্ভাষ কত কতই আদর।
বসাইলা আপনার খাটের উপর ॥

ভাগিনেয় হৃদয় সেই সময়ে জ্বরে শয্যাগত ছিল ঠাকুরের ঘরে: তাহাকে সম্বোধন করিয়া ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, ওরে হৃদু, এরা ব্রাহ্মদলের নয়।

শ্রীমনোমোহন কন প্রভু-সন্নিকটে।
বাল্যাবধি ব্রাহ্মধর্ম বুঝি সত্য বটে ॥
সমাজেতে যাওয়া আসা আছয়ে আমার।
এত শুনি প্রভুদেব কন পুনর্বার ॥
যাহা যাও যাহা বুঝ ধর্মের বারতা।
তুমি নহ ব্রাহ্মদের, এই মোর কথা ॥

তারপরে রামকে বলিলেন ঠাকুর, তুমি না ডাক্তার? (হৃদয়কে দেখাইয়া) এর জ্বর হয়েচে, নাড়ী টিপে দেখ দেখি কিরকম আছে। রাম নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, জ্বর ছেড়ে গেছে। পুনরায় ঠাকুর কহিলেন:

তুমি রাম দেহতত্ত্ব জান বিলক্ষণ ॥
বল দেখি বুঝাইয়া এবার আমারে।
যা খাই কোথায় যায় উদর-ভিতরে ॥
এত শুনি পাকস্থলী উদরে যেখানে।
দেখাইল রাম প্রভু-অঙ্গ-পরশনে ॥
উদরের মধ্যভাগে পাকস্থলী-স্থান।
শুনিয়া বিস্ময়ে কন প্রভু ভগবান ॥
দেখ মম পাকস্থলী নহে মধ্যস্থানে।
উদরের অধোদেশে সবাকার বামে।
হাত দিয়া কর লক্ষ্য আমি খাই জল।
হইবে প্রতীয়মান কথা অবিকল ॥

... ...

দেখিয়া বিস্ময়ে ভরে শ্রীরামের মন।
সৃষ্টিছাড়া শ্রীপ্রভুর দেহের গড়ন ॥

এইসকল হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপে ও ব্যবহারে রাম ও মনোমোহনের মনোহরণ করিয়া—তাঁহাদের বিষয় তিনি যে সবিশেষ জ্ঞাত আছেন এই

কথাটিই যেন প্রকারান্তরে জানাইয়া দিয়া—তাঁহাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে ঠাকুর শক্তিপূর্ণ সংশয়চ্ছেদী বাক্যে বলিতে লাগিলেন: ঈশ্বর আছেনই আছেন। দিনের আকাশে তারা দেখা যায় না, তাই বলে কি আকাশে তখন তারা নাই? দুধে মাখন আছে, মাখন পেতে হলে দুধকে দই করে নিয়ে মন্থন করতে হয়; ঈশ্বরের দেখা পেতে হলে কিছু সাধনা দরকার। বড় পুকুরে মাছ ধরতে হলে আগে যারা তাতে মাছ ধরেচে তাদের কাছে কেমন মাছ আছে, কিসের টোপে খায়, কী চার প্রয়োজন, এই সব খবর জেনে নিতে হয়; ছিপ ফেলে ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হয়; 'ঘাই-ফুট' দেখতে পেলে মাছ আছে বলে বিশ্বাস হবে, ক্রমে মাছও ধরা পড়বে। ঠিক তেমনি যিনি ঈশ্বরকে দেখেচেন তাঁর কথায় বিশ্বাস করে মন-ছিপে প্রাণ-কাঁটায় নামের টোপ দিয়ে, ভক্তির চার ফেলে অপেক্ষা করতে হবে, তবে ঈশ্বরের ঘাই-ফুট দেখতে পাওয়া যাবে; পরে একদিন তাঁর কৃপায় তাঁর সাক্ষাৎকার হবে।

প্রত্যক্ষদর্শন ব্যতীত দুর্বল মন ঈশ্বর আছেন বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, রামের মুখে এইপ্রকার কথা শুনিয়া ঠাকুর আবার বলিলেন: বিকারের রোগী বলে, এক জালা জল খাব, এক হাঁড়ি ভাত খাব, কবিরাজ কি সেকথায় কান দেন? আজ জ্বর হয়েচে, কাল কুইনাইন দিলে কি জ্বর বন্ধ হয়? না, ডাক্তার রোগীর কথায় তার ব্যবস্থা করতে পারেন? জ্বর পরিপাক পেলে ডাক্তার আপনি কুইনাইন দিয়ে থাকেন, রোগীকে কিছু বলতে হয় না।

বিদায় মাগিতে প্রভু বলিলেন দুয়ে।
যাবে যদি ঘরে আজি কিছু খাও খেয়ে॥
দুই ভেয়ে মণ্ডা সহ ঠাণ্ডা জল খান।
সম্মুখে দণ্ডায়মান প্রভু ভগবান॥
চিরকাল ভক্তের ঠাকুর প্রভুরায়।
মহাসুখ দেখিয়া ভকতদ্বয় খায়॥
বিদায়ের কালে দুয়ে লয় পদধূলি।
বিদায় সেদিন হয় পুনঃ এস বলি॥

ছুটির দিনে প্রাণের টানে রাম ও মনোমোহন এখন হইতে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু ইহার ফলে তাঁহাদের সংসারে অশান্তি হইতে লাগিল, বিশেষতঃ মনোমোহনের। নানাকথা বলিয়া বুঝাইয়া তাঁহার এক পিসী তাঁহাকে ঠাকুরের কাছে যাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু মনোমোহন পিসীর কথা রাখিতে পারিলেন না। পরদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া দেখেন, ঠাকুর ম্লানমুখে বসিয়া আছেন ও তাঁহার চক্ষে বারিধারা। ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া ঠাকুর কহিলেন, একটি ভক্ত কখন কখন তাঁহার কাছে আসে বলিয়া ঘরে তাহার পিসী 'মহামার' করে।

তাই বাছা বড় দুঃখে ঝুরে দুনয়ন।
কি জানি যদি না আসে শুনিয়া বারণ ॥

আর একদিন মনোমোহনের বাড়ীর দরজায় আসিয়া রাম তাঁহাকে ডাকিলেন, একসঙ্গে যাইবেন দক্ষিণেশ্বরে। মনোমোহনের একটি মেয়ের সেদিন জ্বর হইয়াছিল, সেই অছিলায় পত্নী তাঁহাকে যাইতে বারণ করিলেন। বারবার বাধা পাইয়া মনোমোহনের কান্না পাইল, কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন। দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া দেখেন, ঠাকুরও কাঁদিতেছেন, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি যেন জবাফুল হইয়াছে! মনোমোহন করজোড়ে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর কহিলেন :

হরিতত্ত্ব-পিয়াসী ভকত একজন।
আমার নিকটে আসে কখন কেমন ॥
যথা তথা মোর কথা লয়ে মত্ত থাকে।
সে কারণে রমণী তাহারে ঘরে বকে ॥
... ...
পাছে বাছা রমণীর শুনে নিবারণ।
তাই মনোবেদনায় ঝুরে দুনয়ন ॥
... ...
অকৃত্রিম স্নেহ বুঝে শ্রীমনোমোহন।
ধরায় যদ্যপি কেহ আছয়ে আপন ॥
মুখপানে চান, যার মুখপানে চাই।
ঠাকুর কেবল একা, অন্য কেহ নাই ॥

ঠাকুরের কাছে কিছুদিন যাওয়াআসা করিয়া রাম ঈশ্বরদর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। একদিন নিশাবসানে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন: পূর্বপরিচিত এক সরোবরে স্নান করিয়া উঠিয়াছেন, এমন সময়ে ঠাকুর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে একটি মন্ত্র দিয়া বলিলেন, প্রত্যহ স্নানের পর আর্দ্রবস্ত্রে একশতবার জপ করবে। তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্বরে ছুটিয়া গিয়া ঠাকুরকে তিনি সেকথা জানাইলেন। 'স্বপ্নে মন্ত্র পাওয়া নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা' বলিয়া ঠাকুর আনন্দপ্রকাশ ও আশীর্বাদ করিলেন।

ইহার পরে একপ্রকার অশান্তি আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল ও দিন দিন বাড়িয়া চলিল। বিষয়চিন্তায় বা বিষয়সংস্পর্শে সে অশান্তি তীব্রতর হইয়া উঠে; বুকের ভিতর থাকিয়া থাকিয়া একপ্রকার ক্লেশ অনুভূত হইতে থাকে। তিনি লিখিয়াছেন: "তখন আপনা আপনি আক্ষেপ করিয়া কহিতাম, 'কি কুক্ষণেই পরমহংসদেবের কাছে আমরা গিয়াছিলাম, কেন আমাদের এ দুর্বুদ্ধি হইয়াছিল! ··· এখন উপায় কি? ঈশ্বর আছেন কি না, তাহা স্থির হইল না। কথায় কে বিশ্বাস করে? যদি এমন আভাস পাওয়া যায় যে, ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন তাহা হইলে চুপ করিয়া থাকিতে পারি। জ্ঞানবিচারে ঈশ্বর নিরূপণ করা পাগলের কথা।' ···একদিন বেলা এগারটার সময় পটলডাঙ্গার গোলদীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আমরা দুইজনে আমাদের মনোদুঃখ বলাবলি করিতেছিলাম, এমন সময়ে একটি শ্যামকায় ব্যক্তি নিকটে আসিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, 'ব্যস্ত হচ্চ কেন, সয়ে থাক।' আমরা চমকিয়া উঠিলাম। কে আমাদের প্রাণের কথা বুঝিয়া অশান্তিরূপ প্রজ্বলিত হুতাশনে···আশাবারি ঢালিয়া দিলেন?···এই কি ঈশ্বরের 'ফুট ঘাই'? কি এ? তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দেখি, আর তিনি নাই!···সেইদিন এই ধারণা হইল যে, ঈশ্বর আছেন। পরমহংসদেবকে এই সংবাদ প্রদান করা হইলে তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ মৃদুহাস্যে কহিলেন, 'কত কি দেখবে।'

"এতদিনে বাস্তবিক আমাদের শান্তি হইল এবং মনের অন্ধকারপুঞ্জ বিদূরিত হইতেছে বলিয়া বুঝিলাম। আমরা ক্রমে আনন্দের আভাস

পাইতে লাগিলাম। সময়ে সময়ে হৃদয়মাঝে কেমন একপ্রকার ভাব হইত, পরে উহা বৃদ্ধি পাইয়া এপ্রকার উচ্চহাস্যের ফোয়ারা ছুটাইত যে; আমরা ক্রমাগত অর্ধঘণ্টা হাসিয়া ক্লান্ত হইয়া যাইতাম। কখন এত রোদন করিতাম যে, নয়নজলে বস্ত্র ভিজিয়া যাইত। কখন কথায় কথায় হাসি এবং কথায় কথায় কান্না আসিত। এ ক্রন্দন বিরহজনিত নহে।”

কিছুদিন ধরিয়া ভাবে হাসাকাঁদা চলিবার পর আবার অবস্থার পরিবর্তন হইল। হঠাৎ রামের মনের শান্তি তিরোহিত হইল ও বুকের ভিতরটা যেন মরুভূমিপ্রায় বোধ হইতে লাগিল। ঠাকুরকে তিনি সেকথা নিবেদন করিলেন। ‘আমি কী করব, সবই হরির ইচ্ছা।’ ঠাকুর কহিলেন। ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইয়া রাম বলিলেন: সে কী মহাশয়, আপনার আশায় এতদিন যাওয়াআসা করচি, এখন এপ্রকার কথা বল্লে আমরা কোথায় যাব? বিরক্তির সহিত উত্তর দিলেন ঠাকুর: আমি তোমাদের কিছু খাই নি, নিই নি, আমার দোষ কী? ইচ্ছা হয় এসো, না হয় এসো না। তোমরা যেসব দ্রব্যসামগ্রী করেচ (রাত্রিবাসের জন্য) তা নিয়ে যাও।

রাম দশদিক শূন্য বোধ করিতে লাগিলেন। মনে নানা তোলাপাড়া করিয়া ঠাকুরের সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলেন, এবং তাঁহার ঘরের উত্তরদিকের বারান্দায় শয়ন করিয়া থাকিয়া, মন্ত্রশক্তি পরীক্ষা করিবার মানসে একমনে স্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্রটি জপ করিতে লাগিলেন। গভীর রাত্রে সেইদিকের দরজা খুলিয়া ঠাকুর তাঁহার পাশে আসিয়া বসিলেন ও ভক্তসেবা করিবার আদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। কিছু টালবাহানা করিয়া হইলেও, তাঁহার সে আদেশ প্রতিপালিত হইল। ভক্তদিগকে নিয়া রাম উৎসবের আয়োজন করিলেন ও সেই উৎসবে যোগদান করিয়া ঠাকুর তাঁহার বাড়ীতে আনন্দের হাটবাজার বসাইলেন।

রাম চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পাঠ করিতে করিতে গ্রন্থখানিকে ঠাকুরেরই জীবনবৃত্তান্তবিশেষ বলিয়া তাঁহার বোধ হইতে থাকে। দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠিক সন্ধ্যার সময় তিনি

ঠাকুরের কাছে বসিয়া ছিলেন একাকী, তাঁহার ঘরে। অতি প্রশান্তভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, 'কী দেখচ?' 'আপনাকে দেখচি।' রাম কহিলেন। 'আমাকে কী মনে কর?' 'আপনাকে শ্রীচৈতন্যদেব বলে জ্ঞান হয়।' কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ঠাকুর কহিলেন, 'বামনী ঐকথা বলত বটে।'

যেদিন রাম নিজের বাড়ীতে ভক্তসেবা করেন তাহার পরদিন সন্ধ্যা-কালে তিনি ঠাকুরের কাছে যান দক্ষিণেশ্বরে। কথায় কথায় রাত্রি দশটা হইল ও ঠাকুরের কাছে বিদায় লইয়া তিনি বাহিরের বারান্দায় আসিলেন; সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরও বারান্দায় আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, রাম, কী চাও? কী চাহিবেন ভাবিয়া রাম প্রথমতঃ দিশাহারা হইলেন ও তারপরে কহিলেনঃ প্রভু, কী চাইব তা জানি না। অনেক ভেবে দেখলাম, আপনার নিকট কী লইব তা বুঝতে পারলাম না। কী লইব, আপনি বলে দিন। তৎক্ষণাৎ ঠাকুর কহিলেনঃ মন্ত্রটি আমায় ফিরিয়ে দাও, আর জপতপের প্রয়োজন নাই। রাম তখন তাঁহার পাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া মনে মনে মন্ত্রটি সমর্পণ করিলেন, ঠাকুরও ভাবাবিষ্ট হইয়া নিজ দক্ষিণচরণের অঙ্গুষ্ঠ তাঁহার ব্রহ্মতালুতে স্থাপন করিলেন। ভাবাবসানে চরণ সরাইয়া নিয়া ঠাকুর কহিলেনঃ যদি কিছু দেখবার ইচ্ছা থাকে তো আমায় দেখ, আর যখন আসবে এক পয়সার কোন দ্রব্য আনবে।

রাম লিখিয়াছেনঃ "আমরা তদবধি শান্তির রাজ্য লাভ করিয়াছি। এখন একদিনও মনে হয় না যে, আর আমাদের কোন কার্য আছে। তিনি আমাদের সর্বস্ব ধন। যখন যে ভাবে, যে অবস্থায়, যে প্রকারে রাখেন, তাহাতেই পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকি। ... তাঁহার নিকটে যাইবার সময় আমাদের যাহা প্রয়োজন ছিল, এক্ষণে তাহা পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে।"

'আমার ভক্তি যেবা পায়, তারে কেবা পায়, সে যে সেবা পায় হয়ে ত্রিলোকজয়ী'—ঠাকুর গাহিতেন। এখানে 'সেবা' মানে ভগবৎসেবার

অধিকার। ভক্তিলাভে আপ্তকাম রাম দেবতাবাঞ্ছিত এই সেবাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট সমগ্র জীবন নানাভাবে ভক্ত-ভগবানের সেবা করিয়া কাটাইয়াছেন। রামের বাটীতে ঠাকুরের আগমন উপলক্ষে কথামৃতকার লিখিয়াছেন: "রামচন্দ্র শ্রীগুরু-করুণাবলে বিদ্যার সংসার করিতে চেষ্টা করিতেন। ঠাকুর দশমুখে রামের সুখ্যাতি করিতেন—বলিতেন, রাম বাড়ীতে ভক্তদের স্থান দেয়, কত সেবা করে, তার বাড়ী ভক্তদের একটি আড্ডা। নিত্যগোপাল, লাটু, তারক (শিবানন্দ) রামচন্দ্রের একরকম বাড়ীর লোক হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত অনেক দিন একসঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। আর বাড়ীতে ৺নারায়ণের নিত্যসেবা। রাম ঠাকুরকে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন—ফুলদোলের দিন—এই ভদ্রাসন-বাটীতে পূজার্থে প্রথম লইয়া আসেন। প্রায় প্রতিবর্ষে ঐদিনে ঠাকুরকে লইয়া গিয়া ভক্তদের লইয়া মহোৎসব করিতেন।"

ফুলদোলের দিন ব্যতীত অন্যান্য দিনেও—এক সময়ে প্রায় প্রত্যেক শনিবারে—ঠাকুরকে রাম নিজবাটীতে লইয়া যাইতেন উৎসবের আয়োজন করিয়া; পাঠ, কথকতা বা কীর্তনের ব্যবস্থা করিতেন তাঁহাকে আনন্দ দিবেন বলিয়া; ভাল গায়ক বা কীর্তনীয়া পাইলে ঠাকুরের কাছে লইয়া যাইতেন সঙ্গে করিয়া; আর পানিহাটির বার্ষিক মহোৎসবে যাইয়া ঠাকুরের সংকীর্তনবিলাসরূপ মহারাসের আনন্দ সম্ভোগ করিতেন তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া।

রাম ধ্যানভজনের অনুকূল একটি নির্জন স্থান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, এমন জায়গায় স্থানটি কোরো যেখানে একশটা খুন হলেও কেউ টের পাবে না। কাঁকুড়গাছির জঙ্গলপূর্ণ স্থানে একটি উদ্যানবাটী ক্রয় করিয়া রাম উহা ঠাকুরকে দেখাইতে লইয়া যান (১২ই পৌষ, ১২৯০)। উদ্যানস্থ তুলসীকানন দেখিয়া ঠাকুর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, বাঃ বেশ জায়গা, এখানে বেশ ঈশ্বরচিন্তা হয়। পুষ্করিণীর দক্ষিণ দিকের ঘরে বসিয়া ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ করিতে করিতে তিনি ফলমিষ্টি খাইয়াছিলেন ও সমগ্র উদ্যানটি পরিক্রমা করিয়াছিলেন।

'শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যান' নামে পরিচিত হইয়া উহাই পরে মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে, শ্রীরামকৃষ্ণ-পূতাস্থি বক্ষে ধারণ করিয়া।

উৎসবের মাধ্যমে ঈশ্বরীয় ভাব যত সহজে জনমানসে সঞ্চারিত হয় এমন আর কিছুতেই নহে। ভক্তদের কেহ কেহ নিজবাটীতে উৎসব করিতে চাহিলে ঠাকুর সানন্দে সম্মতি দিতেন ও উহার আয়োজন-ব্যাপারে রামের পরামর্শ লইতে বলিতেন। কেশবের লোকান্তরের পরে লেখার মাধ্যমে ঠাকুরের ভাবধারা-প্রচার কিছুদিন বন্ধ ছিল। তাঁহার কিছু উপদেশ সংকলন করিয়া 'তত্ত্বসার' নামে রাম একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন (বৈশাখ, ১২৯২)। ভক্তদের কেহ কেহ তাহাতে বাধা দিয়াছিলেন এবং উহা ঠাকুরের কর্ণগোচরও করিয়াছিলেন। রাম কতকগুলি উপদেশ মাত্র প্রকাশ করিতেছেন জানিয়া ঠাকুর তাহাতে আপত্তি করেন নাই; তবে বলিয়াছিলেন: এখন আমায় জীবনী ছেপো না—আমার জীবনী বের করলে শরীর থাকবে না। 'তত্ত্বসার' প্রকাশের অল্পদিন পরেই নিজের সম্পাদনায় রাম 'তত্ত্বমঞ্জরী' নামে একটি ধর্মবিষয়ক মাসিক পত্রিকাও বাহির করেন (শ্রাবণ, ১২৯২) ঠাকুরের উপদেশাবলী-সংবলিত করিয়া। পত্রিকাটি তখন বিনামূল্যে বিতরিত হইত ও মাঝে কয়েক বৎসর বন্ধ থাকিলেও, ১৩২৮ সাল অবধি প্রায় বত্রিশ বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল।

কথা, কাজ ও নিজের জীবন দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া হৃদয়বান রাম আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং অপর যে কেহ তাঁহার সান্নিধ্যে আসিত, সকলকেই ঠাকুরের ভাবে ভাবিত করিয়া তুলিতে ও তাঁহার কৃপালাভের জন্য তাঁহার কাছে লইয়া যাইতে চাহিতেন। এই বিষয়ে তিনি ঠাকুরের কথিত 'চাপরাশ'ও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন: আমি মাকে বলছিলুম, আর আমি বকতে পারি না, রাম, মহেন্দ্র, গিরিশ, বিজয়, কেদার—এদের একটু শক্তি দে, এরা উপদেশ দিয়ে প্রস্তুত করবে, আমি একবার স্পর্শ করে দেব।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার প্রচারে রামের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন মনোমোহন। তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের অন্তরের দৈন্য রাম সবিশেষ

জানিতেন। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ তথ্যনিষ্ঠ ভাষণের আবেগ ও মনোমোহনের প্রগাঢ় ভাবুকতার আবেগ মিলিত হইয়া যুগাবতারের যে মহিমময় রূপ ফুটাইয়া তুলিত তাহা দেখিয়া লোকে মোহিত হইত ও অনেকে সেই পরমশরণের আশ্রয়লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

একবার মনোমোহনের আত্মীয় নবচৈতন্য মিত্র ঠাকুরকে কোন্নগরে নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া মহোৎসব করেন (১৮ই অগ্রহায়ণ, ১২৮৯)। ইহার ফলে স্থানীয় লোকেরা ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং মনোমোহন রামকে সপ্তাহে একবার কোন্নগরে যাইয়া প্রচারকার্য করিতে বলেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন: টেনে বুনে কিছু কোরো না, তাঁর যেমন ইচ্ছা হবে তেমনি করাবেন। অতঃপর প্রতি শনিবার রাম ও মনোমোহন কোন্নগর যাইতে আরম্ভ করিলেন। ষ্টেশন হইতে ঘরে যাইবার পথে অনেকে তাঁহাদিগকে নিজ নিজ বাড়ীতে লইয়া গিয়া ঠাকুরের কথা শুনিতেন। মনোমোহনের বাড়ীতেও আলোচনার আসর বসিত। রবিবার প্রাতে রাম, মনোমোহন ও নবচৈতন্য সংকীর্তন লইয়া বাহির হইতেন, পথে শত শত লোক যোগদান করিয়া দল বৃদ্ধি করিতেন। একদিন দক্ষিণেশ্বর হইয়া কলিকাতায় যাইবার পথে রাম ও মনোমোহনকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন: এখানে আর কেউ নাই, তোমরা নিজের লোক, তোমাদের বলচি। একটি কথা আছে, 'সাঝ পহরে ভাতার ম'ল কাঁদব কত রাত!' তোমরা এখনই এত খাটচ কেন? এর পর এমন দিন আসবে যখন তোমরা খেতে শুতে সময় পাবে না।

সাপ্তাহিক প্রচারকার্য বন্ধ হইয়া গেলেও কোন্নগরবাসীরা রামকে মাঝে মাঝে লইয়া যাইতেন। কোন্নগর হরিসভার বার্ষিক উৎসবে আমন্ত্রিত হইয়া ঠাকুর রাম ও মনোমোহনকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এই বলিয়া, 'তোমরা গেলেই আমার যাওয়া হবে।' রাম সেখানে 'সত্যধর্ম' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তারপরে কীর্তন আরম্ভ হইলে রাম ও মনোমোহন ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। বহুলোক তাঁহাদিগকে ঘেরিয়া সেই কীর্তনে ও নৃত্যে যোগদান করিল। ক্রমে মনোমোহন

বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়া উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন; কয়েকজন তাঁহার সংজ্ঞাহীন দেহ কাঁধে করিয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে রাত্রি একটা পর্যন্ত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। রাত্রি প্রায় তিনটার সময় মনোমোহন প্রকৃতিস্থ হইলেন। কোন্নগরে যখন এই ব্যাপার চলিতেছিল, দক্ষিণেশ্বরে তখন হাততালি দিয়া ঠাকুর বলিতেছিলেন, 'লাগ্ ভেলকি লাগ্।'

ঠাকুরের শেষবার দেশে গমন ও হৃদয়ের কর্মচ্যুতি

১২৮৬ সালের মধ্যভাগ হইতে পাঁচছয় বৎসরের মধ্যে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তেরা সকলেই তাঁহার কাছে আসিয়া পড়েন। ঠাকুর যাঁহাদিগকে 'নিত্যসিদ্ধের থাক' বা 'ঈশ্বরকোটি' বলিয়াছেন, যাঁহারা পূর্বপূর্বাবতারে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন বলিয়াছেন, এবং যাঁহাদের সম্বন্ধে 'নিজের লোক', 'এখানকার লোক' ইত্যাকার আত্মীয়তাবোধক কথা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্ত বলিয়া মনে হয়। বাহিরের জীবনযাত্রা দেখিয়া অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ নির্ণয় করা যায় না। গৃহস্থ ভক্তেরাও অনেকে তাঁহার অন্তরঙ্গ ছিলেন, সন্ন্যাসাশ্রমী ভক্তেরা সকলেই তাঁহার অন্তরঙ্গ না হইতেও পারেন। 'ও এখানকার লোক নয়, যদি আপনার হত, ওকে দেখবার জন্যে আমি কাঁদি নাই কেন ?'—এই কথাটি ঠাকুর উচ্চাবস্থাপ্রাপ্ত ভক্ত নিত্যগোপাল সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'জ্ঞানানন্দ অবধূত' নাম নিয়া যিনি পরে ভিন্ন এক সম্প্রদায় গঠন করেন।

ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্য শ্রীতুরীয়ানন্দের মুখে কেহ কেহ[১] শুনিয়াছেন, তিনি (ঈশ্বর) বহিরঙ্গ ভক্তকেও অন্তরঙ্গ করিতে, এবং জীবকোটি ভক্তকে ঈশ্বরকোটিতে উন্নীত করিতে পারেন, করিয়াও থাকেন। ইহার মধ্যে নাকি মনোনয়নের ব্যাপার আছে। নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি নিউ রিক্রুট।' অর্থাৎ ঠাকুর তাঁহাকে অন্যস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া নিজের দলে আনয়ন করিয়াছেন।

সাধক-ভক্তগণের বহুসংখ্যায় আগমনের পূর্বে ১২৮৬ সালের শেষাশেষি একবার দেশে গিয়া ঠাকুর সেখানে সাতমাস বাস করেন। দেশে তখন ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া তিনি বিশেষ কষ্ট পান ও বিরক্ত হইয়া বলিয়া ফেলেন, এখানে আর আসব না। স্থূলশরীরে তিনি আর কামারপুকুরে যান নাই।

৺রঘুবীর একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে স্বপ্ন দিয়াছিলেন, 'আজ দুদিন ধরে আমার খাওয়াই হচ্চে না।' রঘুবীরের সেবার আনুকূল্য করিবার

১ স্বামী জগদানন্দ প্রভৃতি।

জন্য, তাঁহার সেবায় যাহাতে কোনরূপ অনাচার না ঘটে তাহা দেখিবার জন্য, ঠাকুর রামলালের বিধবা মাসীমা অঘোরমণিকে চিরকালের জন্য কামারপুকুরের বাড়ীতে আনিয়া রাখেন।

সংসারে সময়ে সময়ে অন্নের অপ্রতুলতা ঘটিতেছে বুঝিতে পারিয়া ইহার প্রতিকার করিবার জন্য ঠাকুর গঙ্গাবিষ্ণু লাহার সাহায্যে কামারপুকুরে ও হৃদয়ের সাহায্যে শিহড়ে কিছু ধান্যজমি ক্রয় করাইয়া ৺রঘুবীরের নামে দেবোত্তর করিয়া দিয়াছিলেন। কথামৃতকারের মতে, এইবারেই জমিক্রয়ের কাজটি নিষ্পন্ন হয়; রামলালের বর্ণনানুসারে, কামারপুকুরে ডোমপাড়ায় দেড়বিঘা ও শিহড়ে চৌদ্দ বিঘা জমি সংগৃহীত হইয়াছিল। ঠাকুর স্বয়ং পালকিতে করিয়া গোঘাট সাবরেজিষ্ট্রী অফিসে গিয়া জমি রেজিষ্ট্রী করাইয়া দেন। সমাদরে গ্রহণ করিয়া, সহজে কাজটি করিয়া দিয়া ও সুমিষ্ট আম খাওয়াইয়া সাবরেজিষ্ট্রার তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

বিশ বাইশ বছর ধরিয়া একনিষ্ঠভাবে ঠাকুরের সেবা করিয়া আসিলেও হৃদয়ের মন স্বার্থচেষ্টা ও ভোগবাসনা হইতে বিযুক্ত হইতে পারে নাই। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার অর্থপিপাসা বাড়িয়াই চলিয়াছিল, এবং দেবস্থানের সেবাইত পাণ্ডারা বিগ্রহকে যেভাবে নিজেদের জীবিকার উপায়রূপে ব্যবহার করে, ঠাকুরকেও হৃদয় সেইভাবে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। 'পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' গ্রন্থে রাম লিখিয়াছেন: "হৃদয়কে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে কেহ প্রাণ ভরিয়া পরমহংসদেবের নিকট বসিতে অথবা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিত না। সুতরাং যাঁহার যেমন সঙ্গতি, তিনি সেই প্রকারে হৃদয়ের পূজা করিতে বাধ্য হইতেন। ক্রমে তাঁহার লোভ বাড়িয়া গেল। পরমহংসদেব তাহা জানিতে পারিয়া হৃদয়কে নানাপ্রকার উপদেশ দিতেন এবং কেহ কিছু দিতে চাহিলে তিনি নিষেধ করিতেন। হৃদয় তাহাতে বিরক্ত হইতে লাগিলেন এবং সময়ে সময়ে পরমহংসদেবকে কটুকাটব্যও বলিতে আরম্ভ করিলেন। হৃদয়ের বিশেষ কষ্ট এবং পরমহংসদেবের প্রতি বিরক্তির কারণ সেই লক্ষ্মীনারায়ণের দশ হাজার টাকা।"

গীতা-ভাগবতে ব্যুৎপন্ন মাড়োয়ারী ভক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। একদিন তিনি লক্ষ্য করেন যে, ঠাকুরের বিছানার চাদরখানি একটু ছেঁড়া। বাঙ্গালীরা সাধুদের সেবা কিভাবে করিতে হয় তাহা জানে না, ইত্যাদি কথা তিনি বলেন, এবং নিজের মনে সংকল্প করেন যে, ঠাকুরের সেবা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে চলে এমন একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। একদিন তিনি দশ হাজার টাকার নোট সঙ্গে নিয়া ঠাকুরের কাছে আসেন, তাঁহার নামে লিখিয়া দিবেন বলিয়া। ঠাকুর নিজেকে বড়ই বিপন্ন বোধ করেন এবং এই কাজ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য লক্ষ্মীনারায়ণকে কাতর অনুনয় করিতে থাকেন। লক্ষ্মীনারায়ণ তখন মাতাঠাকুরাণীর নামে টাকাটা লিখিয়া দিতে চাহিলেন, শ্রীশ্রীমা সেই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। তিনিও টাকা নিতে ঘোরতর আপত্তি করিলে লক্ষ্মীনারায়ণ হৃদয়ের নামে উহা লিখিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিয়া বসেন। তাঁহার জেদ দেখিয়া ঠাকুর অসহায় বালকের মত কাঁদিয়া উঠেন, আর লক্ষ্মীনারায়ণ টাকা ফিরাইয়া লইয়া যান, 'তোমার এখনো পূর্ণজ্ঞান হয় নাই, ত্যাজ্যগ্রাহ্য-বোধ আছে' —এই মন্তব্য করিয়া।

"হৃদয়ের হৃদয় ক্রমে পরমহংসদেবের প্রতি বীতরাগ হইয়া উঠিল। তিনি সময়ে সময়ে এমন মর্মভেদী কথা বলিয়া পরমহংসদেবকে বিরক্ত করিতেন যে, সেকথা শুনিলে আপাদমস্তক ক্রোধে পরিপূর্ণ হইত এবং তাঁহার সমুচিত দণ্ড হওয়া বিধেয় বলিয়া আপনি মনে মনে ঈশ্বরের কাছে কামনা হইয়া যাইত। একএক দিন পরমহংসদেব বালকের ন্যায় কত কাঁদিতেন, কৃতাঞ্জলি হইয়া হৃদয়কে কত অনুনয় করিতেন, কিন্তু তিনি সে কথায় আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেন।...একদিন পরমহংসদেব রামপ্রসাদের একটি গান গাহিতেছিলেন। তিনি যেমন এই কয়েকটি চরণ গাহিয়াছেন, 'ও মা, কাঁদছে কে তোর ধন বিহনে? রত্ন আদি ধন দিবি মা, পড়ে রবে ঘরের কোণে।'—অমনি হৃদয় রোষাবেশে, বিদ্রূপচ্ছলে এবং বিকৃতস্বরে বলিলেন, ও কে কাঁদছে তোর ধন বিহনে—

যদি কাঁদছ না, তবে রাসমণির দেবালয়ে কেন?···পরমহংসদেব তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, আর কিছুই বলিলেন না।···

"একদা পরমহংসদেব জ্বরগ্রস্ত হইয়া শয়ন করিয়া আছেন, কোন ভক্ত একটি ফুলকপি লইয়া তাঁহার সম্মুখে সংস্থাপন করিয়া দিল। পরমহংসদেব আহ্লাদে উঠিয়া বসিলেন এবং কপিটির কতই প্রশংসা করিলেন। অবশেষে বলিলেন, দেখ, তোমরা ঐ ঘরের মধ্যে ইহা লুকাইয়া রাখিয়া আইস। হৃদয়কে বলিও না যে, আমি ইহা দেখিয়াছি, তাহা হইলে আমায় বড় গালাগালি দিবে। আজ্ঞামাত্র কপিটি স্থানান্তরিত করা হইল। পরমহংসদেব কহিতে লাগিলেন,—দেখ, হৃদে আমার যে সেবা করিয়াছে তাহা আমি কখনই ভুলিব না। হয়ত মা-কালীর ইচ্ছায় সে না থাকিলে আমার দেহ এতদিন থাকিত না।···হৃদে যেমন আমার সেবা করিয়াছে, মা-কালী উহার আশাতীত ফলও দিয়াছেন। দেশে বিলক্ষণ জমিজমা করিয়াছে, লোককে টাকা ধার দেয়, এই মন্দিরে কর্তার ন্যায় হইয়া রহিয়াছে এবং এত লোকে উহাকে সম্মান করিয়া থাকে। এই কথা বলিতে বলিতে হৃদয় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।·· পরমহংসদেব তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ, আমি উঁহাদের কপি আনিতে বলি নাই, উহারা আপনারা আনিয়াছে, মাইরি বলিতেছি আমি উহাদের কিছুই বলি নাই। হৃদয় এই কথা শুনিয়া তিরস্কারের অবধি রাখিলেন না। তাঁহার সেই মূর্তি মনে হইলে এখনও আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! পরমহংসদেব সরোদনে···বলিতে লাগিলেন, 'মা, তুই আমার সংসারবন্ধন কাটিয়া দিলি—পিতা গেল, মাতা গেল, ভাই গেল, স্ত্রী গেল, জাতি গেল—শেষে কিনা হৃদয়ের হাতে আমার এই দুর্গতি হইতে লাগিল!' এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, 'ও আমায় বড় ভালবাসে, ভালবাসে বলিয়াই বকে; ছেলেমানুষ, উহার বোধ হয় নাই। উহার কথায় কি রাগ করিতে হয় মা?' এইরূপ বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু হৃদয়ের ক্রোধ শান্ত হইল না।

"...ঠাকুরবাটীর প্রত্যেক কর্মচারী তাঁহার দ্বারা উৎপীড়িত ও মর্মাহত হইয়া পড়িল। পরমহংসদেব বারবার নিষেধ করিলেন। তিনি নিষেধ-বাক্য না শুনিয়া গর্বিতভাবে বলিলেন, রাসমণির অন্ন ব্যতীত তোমার গতি নাই, তুমি সকলকে ভয় করিবে; আমি কাহাকে গ্রাহ্য করি? না হয় চলিয়া যাইব।...

"কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার বাৎসরিক উৎসবের দিন সমাগত হইল।... ত্রৈলোক্যবাবু [মথুরবাবুর পুত্র] সপরিবারে তথায় আগমন করিয়াছিলেন। উৎসবের দিন প্রাতঃকালে হৃদয় পূজা করিতে যাইলেন। তথায় ত্রৈলোক্য-বাবুর একটি দশমবর্ষীয়া বিবাহিতা কন্যা পট্টবস্ত্রাদি পরিধান করিয়া দণ্ডায়মান ছিল, হৃদয় সেই বালিকাটির চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেন।... ত্রৈলোক্যবাবুর স্ত্রী কন্যার অকল্যাণ হইবে ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার রোদনে ত্রৈলোক্যবাবু মাতিয়া উঠিলেন এবং মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় আস্ফালনপূর্বক দ্বারবান দ্বারা হৃদয়কে উদ্যান হইতে একবস্ত্রে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন এবং সেই ক্রোধে পরমহংসদেবকেও নাকি চলিয়া যাইবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। দ্বারবান এ সংবাদ আনিয়া পরমহংসদেবের সমীপে উপস্থিত হইল। তিনি হাসিয়া বলিলেন, তোমার বাবুর আমি কি করিলাম? তিনি তদবস্থায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া একমনে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। পরমহংসদেব যখন বাবুদিগের বৈঠকখানার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন তখন...ত্রৈলোক্যবাবু 'আপনি কোথায় যাইতেছেন?' বলায় পরমহংসদেব অমনি ফিরিলেন এবং তাঁহাদের নিকটে যাইয়া বসিলেন। ত্রৈলোক্যবাবু হৃদয়ের সম্বন্ধে নানা কথা কহিলেন এবং কন্যাটির অকল্যাণের আশঙ্কায় ভীত হইলেন। পরমহংসদেব অভয় দিয়া পুনরায় নিজকক্ষে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

"হৃদয় যদু মল্লিকের উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। পরমহংসদেব দুই বেলা তাঁহার নিজ অংশ হইতে অন্নব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি পাঠাইয়া দিতেন এবং নিজে তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন। হৃদয়...পরমহংসদেবকে মন্দির হইতে চলিয়া আসিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন ও...বলিয়াছিলেন যে,

কোন স্থানে যাইয়া একটি কালীমূর্তি স্থাপনপূর্বক উভয়ে সুখে বাস করিবেন। পরমহংসদেব এইকথা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, তুই কি আমায় লইয়া দ্বারে দ্বারে ফিরি করিয়া বেড়াইবি ?"

১২৮৮ সালের স্নানযাত্রার দিন হৃদয়ের কর্মচ্যুতি ঘটে ও কালীবাটীতে তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। ১২৯১ সালের ১১ই কার্তিক একবার সে ঠাকুরের সহিত দেখা করিতে আসে। যদু মল্লিকের বাগানের ফটকে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া সে ঠাকুরকে প্রণাম করে ও হাতজোড় করিয়া কাঁদিতে থাকে। ঠাকুরের চোখেও জল দেখা দেয়, তিনি হাত দিয়া মুছিয়া ফেলেন। হৃদয়ের সহিত তাঁহার নিম্নোক্তরূপ কথাবার্তা হয়ঃ

'এখন যে এলি ?' '(কাঁদিতে কাঁদিতে) তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলুম, আমার দুঃখ আর কার কাছে বলব ?' 'সংসারে এইরূপ দুঃখ আছে, সংসার করতে গেলেই সুখ-দুঃখ আছে।···তোর কিসের দুঃখ ?' '(কাঁদিতে কাঁদিতে) তোমার সঙ্গ ছাড়া, তাই দুঃখ।' 'তুই তো বলেছিলি, তোমার ভাব তোমাতে থাক্, আমার ভাব আমাতে থাক্।' 'তা তো বলেছিলুম, আমি কি জানি ?' 'আজ এখন তবে আয়,···আজ রবিবার অনেক লোক এসেচে, তারা বসে রয়েচে। এবার দেশে ধান টান কেমন হয়েচে ?' 'তা একরকম মন্দ হয় নাই।' 'আজ তবে আয়, আবার একদিন আসিস।'

ঘরে ফিরিয়া যাইতে যাইতে সঙ্গে আগত মাষ্টারকে ঠাকুর কহিলেনঃ আমার সেবাও যত করেচে, যন্ত্রণাও তেমনি দিয়েচে। আমি যখন পেটের ব্যারামে দুখানা হাড় হয়ে গেছি, কিছু খেতে পারতুম না, তখন আমায় বল্লে, এই দেখ আমি কেমন খাই, তোমার মনের গুণে খেতে পার না। আবার বলত, বোকা, আমি না থাকলে তোমার সাধুগিরি বেরিয়ে যেত। একদিন এরকম করে যন্ত্রণা দিলে যে পোস্তার উপর দাঁড়িয়ে জোয়ারের জলে দেহত্যাগ করতে গিয়েছিলুম !

লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারীর অর্থঘটিত ব্যাপারটি ঠাকুরের দেশে যাওয়ার অব্যবহিত পূর্বে ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। দেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হইতে ১২৮৮ সালের স্নানযাত্রা পর্যন্ত সাত-আট মাস সময় তিনি

হৃদয়ের হৃদয়শূন্য ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে, ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে, মাতাঠাকুরাণী দক্ষিণেশ্বরে আসেন। তিনি বলিয়াছেন:

"আমি, মা, লক্ষ্মী, আরও কে কে দক্ষিণেশ্বরে আসি···যেতেই হৃদয় আপনা হতে বলতে থাকে, 'কেন এসেচ? কী জন্যে এসেচ? এখানে কী?' এই সব কথা বলে তাদের অশ্রদ্ধা করে। আমার মা সে-কথায় কোন জবাব দেন নি। হৃদয় শিওড়ের পুরুষ, আমার মাও শিওড়ের মেয়ে, কাজেই হৃদয় মাকে কোন মান্য কল্লে না। মা বল্লেন, চল ফিরে দেশে যাই, এখানে কার কাছে মেয়ে রেখে যাব? ঠাকুর হৃদয়ের ভয়ে আগাগোড়া হাঁ-না কিছুই বলেন নি। আমরা সকলে সেইদিনই চলে গেলুম। রামলাল পারের নৌকো এনে দিলে। আমি মনে মনে মা-কালীকে বল্লুম, মা, যদি কোন দিন আনাও তো আসব।

"তারপর হৃদয় ওখান থেকে চলে গেল। রামলাল কালীঘরের পূজারী হল—হয়েই ভাবলে, আর কী, এবার মা-কালীর পূজারী হয়েচি! সে ঠাকুরের অত খোঁজখবর নিত না। উনি ভাবটাব হয়ে হয়তো পড়ে থাকতেন, এদিকে মা-কালীর প্রসাদ শুকিয়ে থাকত। ঠাকুরের খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হতে লাগল, তখন অন্য কেউ নাই।[১] ঠাকুর পুনঃপুনঃ আমাকে আসবার জন্যে খবর দিতে লাগলেন। ওদেশের যে আসত তাকে দিয়েই বলে পাঠাতেন আসবার জন্যে। কামারপুকুরের লক্ষ্মণ পানকে দিয়ে বলে পাঠালেন: এখানে আমার কষ্ট হচ্চে; রামলাল মা-কালীর পূজারী হয়ে বামুনের দলে মিশেচে, এখন আমাকে আর অত খোঁজখবর করে না। তুমি অবিশ্যি আসবে। ডুলি করে হোক, পালকি করে হোক, দশ টাকা লাগুক, বিশ টাকা লাগুক, আমি দেব। ঠাকুরের এই সংবাদ পেয়ে শেষে আমি এলুম (১২৮৮, মাঘ বা ফাল্গুন)।"

---

১ বিষ্ণুমন্দিরের পূজারী, জ্ঞাতিসম্পর্কে ঠাকুরের ভাইপো ও স্নেহপাত্র দীনু বাঁচিয়া থাকিলে ঠাকুরের অতটা কষ্ট হইত না। অক্ষয়ের মত অকালে সে দেহত্যাগ করিয়াছিল। ঠাকুর ও মা উভয়েই তাহাকে নিজ নিজ পাদোদক দিয়াছিলেন তাহার অন্তিমকাল আসন্ন জানিয়া।

শ্রীশ্রীমার শ্রীমুখোচ্চারিত কথাগুলির মধ্যে লক্ষ্য করিবার মত একটি বিষয় এই যে, তিনি হৃদয়ের গুরুতর অপরাধকেও অত্যন্ত লঘু করিয়াছেন তাঁহার জননীর ও হৃদয়ের মধ্যে একগ্রামবাসিত্বের দোহাই দিয়া; তাঁহার নিজের প্রতি হৃদয় যেন কোন অন্যায়ই করে নাই, এই ভাবটিও ব্যক্ত করিয়াছেন 'তাদের অশ্রদ্ধা করে'—এই কথাটি বলিয়া। নিজে তিনি মা-কালীর ইচ্ছাতে আসিয়াছিলেন ও চলিয়া গেলেন, মা-কালীর ইচ্ছা হইলে তবেই পরে আবার আসিবেন—ইহাই যেন তাঁহার নিজের সম্বন্ধে একমাত্র বক্তব্য।

পরবর্তী কালেও দেখা গিয়াছে, ঠাকুরের প্রতি হৃদয়ের অশোভন আচরণকে তিনি অপরাধ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন নাই, বরং উহার সমর্থনে বলিয়াছেন: যে অত সেবা করে পালন করেচে, যে যত্ন করে, সে অমন বলতে পারে, বলে থাকে। আর তাহার ঠাকুরের সঙ্গ-ছাড়া হওয়ার কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন: ভাল জিনিসটি কি কেউ চিরদিন ভোগ করতে পায়?

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

'দেবীপুত্র' সুরেন্দ্রের আগমনাদি-কথা

কলিকাতার সিমলা পল্লীর সুরেশচন্দ্র মিত্রকে ঠাকুর অনেক সময়ে 'সুরেন্দর' বলিয়া ডাকিতেন; শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে সেইজন্যই তিনি 'সুরেন্দ্র' ও 'সুরেশ' এই উভয় নামেই অভিহিত হইয়াছেন। সুরেন্দ্রকে ঠাকুর তাঁহার অর্ধেক রসদ্দার বলিতেন। রাম ও মনোমোহনের দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার প্রায় এক বৎসর পরে যখন তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন (১২৮৭) তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর হইবে। 'পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' গ্রন্থে ভক্তবর রাম লিখিয়াছেন:

"সুরেন্দ্রবাবু একজন কৃতবিদ্য এবং কলিকাতার সম্ভ্রান্তকুলোদ্ভব ব্যক্তি। ইনি সওদাগরী অফিসের প্রধান বাঙ্গালী কর্মচারী, সুতরাং তাঁহার অর্থোপার্জন পক্ষে অসুবিধা ছিল না। সুরেন্দ্রবাবু বর্তমান বাজারের লোক ছিলেন।...কিন্তু তিনি যে একজন হৃদয়বান লোক, তাহার ভুল নাই। তিনি আমাদের মত নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না...। তাঁহার নিকটে শ্রবণ করিয়াছি যে, একদিন মধ্যাহ্ন কালে আহারান্তে বহির্বাটীতে তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন, এমন সময়ে একটি কৃষ্ণবর্ণা আলুলায়িতকেশা রক্তবস্ত্রপরিধানা ত্রিশূলহস্তা স্ত্রীলোককে রাজপথ দিয়া গমন করিতে দেখিলেন। ভৈরবী সুরেন্দ্রকে দেখিয়া কহিলেন, 'বাবা, সব ফাঁকি, কেবল সেই সত্য।'...তাঁহার এই সময়ে নিতান্ত মানসিক ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছিল,...তাহাতে তাঁহার প্রাণসংশয় হইয়াছিল। এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তাঁহার কোন পরমবন্ধু তাঁহাকে পরমহংসদেবের নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন।...সুরেন্দ্রবাবু সেইদিন ভব-সমুদ্রের মধ্যে কূল পাইলেন, জীবনের লক্ষ্য কি বুঝিলেন, এবং মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

"পরমহংসদেব তাঁহাকে যেসকল উপদেশ দিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটি উপদেশ তাঁহার হৃদয়ে মূলমন্ত্রবৎ কার্য করিয়াছিল। পরমহংসদেব কহিয়াছিলেন, 'লোকে বাঁদরছানা হইতে চায় কেন? বিড়ালছানা হইলে ত

ভাল হয়। বাঁদরছানার স্বভাব এই যে, সে ইচ্ছা করিয়া তাহার মাতাকে জড়াইয়া ধরে, তখন মাতা তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যায়। কিন্তু বিড়ালছানার স্বভাব সেরূপ নহে, তাহার মাতা তাহাকে যেস্থানে রাখিয়া দেয়, সে সেই স্থানে পড়িয়া ম্যাও ম্যাও করিতে থাকে। ...' সুরেন্দ্রবাবুর মন এই কথায় একেবারে মজিয়া গেল, তিনি তদবধি প্রত্যেক রবিবারে দক্ষিণেশ্বরে না যাইলে স্থির থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু পূর্বসংস্কার সকলেরই সমান। সুরেন্দ্রবাবু পরমহংসদেবের উপদেশে বিমোহিত এবং পরিবর্তিত হইয়াও পূর্বসংস্কারবশতঃ মধ্যে মধ্যে তথা হইতে পাশ কাটাইতে চেষ্টা করিতেন...। কোন রবিবারে তিনি অফিসের কর্মের ভান করিয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন না। পরমহংসদেব তাহা শুনিলেন এবং ভাবাবেশে কহিতে লাগিলেন, দিন কতক আমোদ আহ্লাদ করিবার সাধ আছে, করুক, পরে ওসব কিছুই থাকিবে না।...

"পরের রবিবারে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন বটে, কিন্তু... সকলের পশ্চাতে উপবেশন করিলেন। পরমহংসদেব...বলিলেন 'চোরটির মত অমন করিয়া বসিলে যে? নিকটে আইস।' সুরেন্দ্রবাবু কি করেন, সম্মুখে যাইয়া বসিলেন। পরমহংসদেব...কহিতে লাগিলেন, 'দেখ, লোকে যখন কোথাও যায়, মাকে সঙ্গে লইয়া যায় না কেন? তাহা হইলে অনেক বিষয়ে, যাহা করিবার কোন সংকল্প ছিল না তাহা হইতে, রক্ষা পায়। পুরুষত্ব সর্বদা প্রয়োজন।' সুরেন্দ্রবাবু...মনে মনে কহিতেছিলেন, 'ঐ পুরুষত্বের জ্বালায় অস্থির হইয়াছি।' পরমহংসদেব অমনি...বলিলেন, 'কুক্কুর-শৃগালের পুরুষত্বকে পুরুষত্ব বলে না। পুরুষত্ব ছিল অর্জুনের, যখনই যাহা করিবেন বলিয়া মনে করিতেন তখনই তাহা সম্পন্ন করিতে পারিতেন।' সুরেন্দ্রবাবু এইকথা শ্রবণ করিয়া...মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, 'প্রভু, আর বাড়াবাড়ি করিবেন না।...মনের কথা টানিয়া বাহির করিলেন। কোথায় কি লুকাইয়া করিলাম তাহা যদি দেখিতে পাইলেন তবে আর যাইব কোথায়?...আর কিছু ভাঙ্গিবেন না, এখনই এই ভক্তমণ্ডলী সকলে জানিতে পারিবে।' পরমহংসদেব

নিরস্ত হইলেন। সুরেন্দ্রবাবু তদবধি তাঁহার পূর্বের যেসকল কু-অভ্যাস ছিল তাহা ক্রমে পরিত্যাগ করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। পরমহংসদেবের শক্তির প্রভাবে তিনি কিছুদিনের মধ্যে একজন ভক্তশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বাটীতে পরমহংসদেব সর্বদাই আসিতেন এবং ভক্তগণ লইয়া মহা আনন্দ করিয়া যাইতেন।…তিনি অতিশয় ভক্তিসহকারে প্রত্যহ তাঁহার ইষ্টদেবী কালীর পূজা করিতে লাগিলেন, এবং দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকটে যেসকল ভক্ত থাকিতেন তাঁহাদের জন্য এবং পরমহংসদেব-সম্বন্ধীয় নানাকার্যে অর্থব্যয় করিতেন। তিনি মুক্তহস্ত পুরুষ হইয়া উঠিলেন।

"…একদা মহাষ্টমীর দিন নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বরে যাইবার সময় কোন ভক্ত সুরাপরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করায় সুরেন্দ্রবাবু কহিয়াছিলেন যে, তিনি ইচ্ছা করিয়া কিছু করিতে পারিবেন না, তাহা তাঁহার সাধ্যাতীত। পরমহংসদেব যেপ্রকার আদেশ করিবেন সেইরূপ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।…তাঁহারা উভয়ে মন্দির-উদ্যানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, পরমহংসদেব ভাবাবেশে বকুলতলার ঘাটের নিকটে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।…কিয়ৎকাল পরে তিনি আপন কক্ষাভিমুখে যাত্রা করিলেন।…তখনও নয়নোন্মীলন করেন নাই, কিন্তু…বলিয়া উঠিলেন, 'ও সুরেন্দ্র, খাইব বলিয়া খাইবে কেন? কুণ্ডলিনীকে দিবার নিমিত্ত অতি অল্পপরিমাণে কারণ পান করিবে। সাবধান, পা না টলে এবং মন না টলে।…'

"…পরমহংসদেবের শক্তির কি মহিমা, সুরা সেবন করিয়া সুরেন্দ্রবাবু একদিনও অন্য কথা কহিতেন না।…তাঁহার বালকবৎ 'মা, মা' শব্দে পাষণ্ডের হৃদয়েও প্রেমের সঞ্চার হইত। সে সময়ে তাঁহাকে দেখিলে অকপট, সরল এবং ভক্তির মূর্তি বলিয়া জ্ঞান হইত।…তিনি পরমহংসদেবের সর্বধর্ম-সমন্বয় করা ভাব বুঝিয়া একখানি ছবি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই ছবিতে শিবের মন্দির ও গির্জার সম্মুখে গৌরাঙ্গদেব ও ঈশা উভয়ে উভয়ের হস্তধারণপূর্বক নৃত্য করিতেছেন, সঙ্গে সকল সম্প্রদায়ের একটি

করিয়া ভক্ত আছেন, খোল করতাল ও শিঙ্গা বাজিতেছে—পরমহংসদেব কেশববাবুকে তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। এই চিত্রখানি প্রস্তুত করিবার দুইটি ভাব ছিল। প্রথম, এই ভাবটি পরমহংসদেবের নিজের সাধনের ফলস্বরূপ, এবং দ্বিতীয়, উহা কেশববাবু পরমহংসদেবের নিকট হইতে পাইয়াছেন।···নববিধান ভাবটি যে পরমহংসদেবের ভাবের বিকৃতি, তাহা সুরেন্দ্রবাবুও বুঝিয়াছিলেন, এবং এই নিমিত্ত ছবিখানি কেশববাবুকে দেখাইতে পাঠাইয়াছিলেন। 'কেশববাবু ছবিখানি দেখিয়া সুরেন্দ্রবাবুকে এই বলিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, 'যাঁহা হইতে এই ছবির ভাব বাহির হইয়াছে, তিনি ধন্য।' সুরেন্দ্রবাবু এই মর্মে একটি যন্ত্রও নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের যেসকল চিহ্নবিশেষ আছে—যথা, বৈষ্ণবদের খুন্তি, খৃষ্টানদের ক্রস, মুসলমানদের পাঞ্জা ইত্যাদি—সেগুলি লইয়া একস্থানে মিলাইয়া ছিলেন। কেশববাবু ঐ যন্ত্রটি লইয়া একবার নগরকীর্তনে বাহির হইয়াছিলেন।···

"সুরেন্দ্রবাবু একজন নিতান্ত সহজ ব্যক্তি ছিলেন না।···যেদিন তাঁহাকে পরমহংসদেবের নিকটে গমন করিবার নিমিত্ত তাঁহার বন্ধু প্রস্তাব করেন সেইদিন তিনি পরমহংস নাম শুনিয়া কহিয়াছিলেন, 'দেখ, তোমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা কর ভালই, আমায় কেন আর সেস্থানে লইয়া যাইবে? আমি 'হংসমধ্যে বকো যথা' ঢের দেখিয়াছি। তিনি যদি বাজে কথা কহেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার কান মলিয়া দিব।' সুরেন্দ্রবাবু শেষে এই কথা কহিয়া রোদনপূর্বক বলিতেন, 'অবশেষে তাঁহার নিকটে আমি নাককান-মলা খাইয়া আসিলাম!"

পূর্বোক্ত গ্রন্থের অন্যত্র আছে :

"একদিন তাঁহাকে (ঠাকুরকে) দেখিবার জন্য সুরেশবাবুর (সুরেন্দ্র বাবুর) মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠে। তিনি অফিসে যাইয়া কাজকর্ম করিতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে···হইয়াছিল। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, পরমহংসদেব একখানি গাড়ী আনাইয়া সুরেশবাবুর বাটীতে আসিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

সুরেশকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি যদি আসিয়াছ তবে আর কেন যাইব? তোমায় দেখিবার নিমিত্ত বড়ই উতলা হইয়াছিলাম। সুরেশবাবু তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিজ বাটীতে আসিয়াছিলেন। আরও দুইদিন তিনি পরমহংসদেবের সাক্ষাৎকার প্রয়োজন বিবেচনায় কাঁদিয়াছিলেন, তিনি দুই দিবসই আসিয়া প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছিলেন।"

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন সুরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন: দেবীভক্ত ধর্ম-মোক্ষ দুইই পায়, আবার অর্থ-কামও ভোগ করে; তোমাকে একদিন দেবীপুত্র দেখেছিলুম।

বারান্তরে বলিয়াছিলেন: তুমি আপিসে মিথ্যা কথা কও, তবে তোমার জিনিস খাই কেন? তোমার যে দান ধ্যান আছে। তোমার যা আয় তার চেয়ে বেশী দান কর—বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি। কৃপণের জিনিস খাই না।···যে দান ধ্যান করে সে অনেক ফল লাভ করে—চতুর্বর্গ ফল। [কথামৃত]

১২৮৭ সাল হইতেই ঠাকুরের ভক্তেরা তাঁহার জন্মোৎসব করিতে আরম্ভ করেন, সংখ্যায় যদিও তাঁহারা তখন নগণ্য ছিলেন। উহার মূলে ছিল সুরেন্দ্রের উৎসাহ ও প্রেরণা; প্রথম দুই বৎসর তিনি একাই যাবতীয় ব্যয় বহন করিয়াছিলেন।

ব্রজমণ্ডলের রাখালের সহিত মিলন

মনোমোহন মিত্রের সেজ ভগিনী বিশ্বেশ্বরীর সহিত আনন্দমোহন ঘোষের পুত্র রাখালচন্দ্রের যখন বিবাহ হয়, রাখালের বয়স তখন আঠার বৎসর। আনন্দমোহন বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শিকরাকুলীনগ্রামের অধিবাসী। শৈশবে মাতৃহীন রাখাল সেই সময়ে কলিকাতার বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটে বিমাতার পিত্রালয়ে থাকিয়া পড়াশুনা ও ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করিতেছিলেন। বিবাহের কয়েক দিন পরেই, ১২৮৭ সালের শেষভাগে মনোমোহন ভগিনীপতিকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের কাছে আসেন দক্ষিণেশ্বরে।

রাখালের সম্বন্ধে ঠাকুর নিম্নোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন বিভিন্ন সময়ে :

"রাখাল আসিবার কয়েক দিন পূর্বে দেখিতেছি, মা একটি বালককে আনিয়া সহসা আমার ক্রোড়ে বসাইয়া দিয়া বলিতেছেন, এইটি তোমার পুত্র। শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম, সে কি, আমার আবার ছেলে কি ? তিনি তাহাতে হাসিয়া বুঝাইয়া দিলেন, সাধারণ সংসারিভাবে ছেলে নহে, ত্যাগী মানসপুত্র। তখন আশ্বস্ত হই। ঐ দর্শনের পরেই রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বুঝিলাম এই সেই বালক।

"তখন তখন রাখালের এমন ভাব ছিল, ঠিক যেন তিনচারি বৎসরের ছেলে। আমাকে ঠিক মাতার ন্যায় দেখিত। থাকিত থাকিত, সহসা দৌড়িয়া আসিয়া ক্রোড়ে বসিয়া পড়িত এবং মনের আনন্দে নিঃসঙ্কোচে স্তনপান করিত। বাড়ী ত দূরের কথা, এখান হইতে কোথাও এক পা নড়িতে চাহিত না। তাহার বাপ পাছে এখানে না আসিতে দেয় সে জন্য কত বলিয়া বুঝাইয়া একএক বার বাড়ীতে পাঠাইতাম। বাপ জমিদার, অগাধ পয়সা, কিন্তু বড় কৃপণ ছিল। প্রথম প্রথম নানারূপে চেষ্টা করিয়াছিল যাহাতে ছেলে এখানে আর না আসে। পরে যখন দেখিল এখানে ধনী বিদ্বান লোক সব আসে, তখন আর ছেলের আসায় আপত্তি করিত না। ছেলের জন্য কখন কখন এখানে আসিয়াও উপস্থিত

হইয়াছিল। তখন রাখালের জন্য তাহাকে বিশেষ আদরযত্ন করিয়া সন্তুষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম।

"শ্বশুরবাড়ীর তরফ হইতে কিন্তু রাখালের এখানে আসা সম্বন্ধে কখনও আপত্তি উঠে নাই। কারণ মনোমোহনের মা, স্ত্রী, ভগ্নীরা, সকলের এখানে আসাযাওয়া ছিল। রাখাল আসিবার কিছুকাল পরে যেদিন মনোমোহনের মাতা রাখালের বালিকা বধূকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিল, সেদিন মনে হইল বধূর সংসর্গে আমার রাখালের ঈশ্বরভক্তির হানি হইবে না ত?—ভাবিয়া, তাহাকে কাছে আনাইয়া পা হইতে মাথার কেশ পর্যন্ত শারীরিক গঠনভঙ্গী তন্নতন্ন করিয়া দেখিলাম এবং বুঝিলাম ভয়ের কারণ নাই, দেবীশক্তি, স্বামীর ধর্মপথের অন্তরায় কখনও হইবে না। তখন সন্তুষ্ট হইয়া নহবতে (শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে) বলিয়া পাঠাইলাম, টাকা দিয়া যেন পুত্রবধূর মুখ দেখে।

"আমাকে পাইলে আত্মহারা হইয়া রাখালের ভিতর কিরূপ বালকভাবের আবেশ হইত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। তখন যে-ই তাহাকে ঐরূপ দেখিত সে-ই অবাক হইয়া যাইত। আমিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষীরননী খাওয়াইতাম, খেলা দিতাম। কত সময় কাঁধেও উঠাইয়াছি! তাহাতেও তাহার মনে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের ভাব আসিত না। তখনি কিন্তু বলিয়াছিলাম বড় হইয়া স্ত্রীর সহিত একত্র বাস করিলে তাহার এই বালকের ন্যায় ভাবটি আর থাকিবে না।"

> রাখাল বিহনে যেন গাভী বৎসহারা।
> হইল রাখাল ছুটি নয়নের তারা॥
> গোপাল গোপাল বলি কতই আদর।
> আলিঙ্গন বসাইয়া কোলের উপর॥
> ভাবেতে কখন প্রভু এতই উন্মত্ত।
> কাঁধেতে করিয়া তায় করিতেন নৃত্য॥

"ঠাকুর···ভাবচক্ষে রাখালকে দর্শন করিতেছেন। রাখালকে দেখিতে দেখিতে বাৎসল্যরসে আপ্লুত হইলেন, অঙ্গে পুলক হইতেছে।···সমাধিস্থ হইলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

"রাখালকে বাৎসল্যভাবে দেখিতে লাগিলেন ও গোবিন্দ গোবিন্দ এই নাম প্রেমভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।…সব স্থির।

"রাখালকে দেখিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। রাখালকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—আমি অনেকদিন এখানে এসেছি, তুই কবে এলি ?" [কথামৃত]

অবিচ্ছিন্নভাবে না হইলেও প্রায় তিন বৎসর ধরিয়া প্রেমলীলার এইরূপ অভিনয় চলিয়াছিল।

রাখাল ঠাকুরের পুত্র ; ব্রজের রাখাল—সাক্ষাৎ নারায়ণ—পুত্ররূপে। শয়নে অশনে সকল বিষয়ে তাঁহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। অপর ভক্তেরা ঠাকুরের সম্মুখে মেজেয় বসিতেন, রাখাল কোলের কাছে ; তাঁহারা মেজেয় শুইতেন, রাখাল ক্যাম্পখাটে ; তাঁহাদের জন্য মাতাঠাকুরাণী ভাত বা রুটি রান্না করিতেন, রাখালের জন্য খিচুড়ি।

পুঁথিকার বাৎসল্যলীলার এই দিব্য অভিব্যক্তির মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরাখালের স্বরূপগত নিত্যসম্বন্ধ দেখিতে পাইয়াছেন।

স্বভাবে স্বভাব থাকে স্বভাবের প্রথা।
বীজের ভিতরে যেন ফলফুলপাতা॥
সম্পর্ক সমানভাবে বাঁধা চিরকাল।
এখন রাখাল যিনি পূর্বেও রাখাল॥
ভবিষ্যতে তিনিই রাখাল পুনঃ পরে।
রাখালের রাখালত্ব কিসেও না মরে॥
প্রভুর গোপাল তাঁর গুণান্তর নাই।
গোসাঁইর শ্রীরাখাল তাঁহার গোসাঁই॥

নিত্যসিদ্ধ পার্ষদভক্তগণের কথায় ঠাকুর বলিয়াছেন : ওদের কেমন জান, ফল আগে, তারপর ফুল ; আগে দর্শন, তারপর গুণমহিমা শ্রবণ, তারপর মিলন। ঠাকুরের কাছে আসার স্বল্পকালের মধ্যেই রাখাল ঈশ্বরীয় ভাবে আবিষ্ট হন। ঠাকুর বলিয়াছেন : এইখানে (ঠাকুরের ঘরে) বসে পা টিপতে টিপতে রাখালের ভাব হয়েছিল। একজন ভাগবতের

পণ্ডিত···ভাগবতের কথা বলছিল, সেই সকল কথা শুনতে শুনতে রাখাল মাঝে মাঝে শিউরে উঠতে লাগল; তারপর একেবারে স্থির! দ্বিতীয়বার ভাব বলরামের বাটীতে, ভাবেতে শুয়ে পড়েছিল। [কথামৃত]

কথামৃতে আছে, মহিমাচরণ চক্রবর্তী একদিন রাত্রি নয়টার সময় রাখাল, মাষ্টার, কিশোরীমোহন ও অন্য দুইএকটি ভক্তকে লইয়া ঠাকুরের ঘরের মেজেতে ব্রহ্মচক্র রচনা করিলেন ও সকলকে ধ্যান করিতে বলিলেন। রাখালের ভাবাবস্থা হইল ও ঠাকুর খাট হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহার বুকে হাত দিয়া মার নাম করিতে করিতে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। রাখালের প্রথমদিনের ভাবাবেশ কৃষ্ণগুণমহিমা-শ্রবণে, আর শেষোক্তটি জগন্মাতার অনুধ্যানে। উত্তরকালে কৃষ্ণ ও কালী-নামগুণকীর্তন শ্রবণ করিয়া মুহুর্মুহু তাঁহাকে ভাবাবিষ্ট হইতে দেখা যাইত। শ্যাম-শ্যামা উভয়েই তাঁহার ইষ্ট দেবদেবী ছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পরে স্বল্পকালের মধ্যেই ঠাকুর তাঁহার বালককে মন্ত্রদীক্ষিত করিয়া থাকিবেন। ঐ সময় হইতেই রাখাল সর্বক্ষণ জপ করিতেন, আর একএক সময়ে তাহা লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেন। 'আর আছে ত্রিগুণাতীত ভক্ত, তার বালকের স্বভাব; ঈশ্বরের নাম করাই তাঁর পূজা, শুদ্ধ তাঁর নাম।' ঠাকুর কহিয়াছেন।

দিনের পর দিন অহেতুককৃপাসিন্ধু শ্রীগুরুর সাহচর্যে থাকিয়া, তাঁহার সেবা করিয়া ও তাঁহার উপদেশানুযায়ী চলিয়া রাখাল অভীষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হইতেছিলেন। অন্তর্জগতের এই ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস অন্যের জানিবার উপায় নাই। কেবলমাত্র কতকগুলি নিয়ম বা কঠোর অনুশাসনের বাঁধনে না রাখিয়া, হাস্যপরিহাস ও কৌতুকাভিনয়ের মধ্য দিয়া, শুভসংস্কারসমূহকে জাগ্রত ও সক্রিয় তথা অশুভসংস্কাররাশিকে নিস্তেজ ও পরিক্ষীণ করিয়া ঠাকুর তাঁহার বালক শিষ্যদিগকে ঈশ্বরের পথে পরিচালিত করিতেন; আর অন্তর্জগতের ন্যায় বহির্জগতেও যাহাতে তাহারা সকল অশুভ শক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে সেই বিষয়েও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন।

'হাজরা মহাশয়' একদা মুরুব্বিয়ানা করিয়া রাখাল ও লাটুর মনে সংশয়ের বীজ বপন করেন। তিনি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়াছিলেন যে, অনেকদিন ঠাকুরের কাছে থাকিয়াও তাঁহাদের কোনই উন্নতি হয় নাই, খাইয়া খেলিয়া শুধু সময় নষ্ট হইয়াছে; আর বলিয়াছিলেন যে, না চাহিলে ঠাকুর কিছুই করিয়া দিবেন না।

প্রতাপচন্দ্র হাজরা ঠাকুরের দেশের লোক, ঠাকুরের কাছে তাঁহার ঘরের পূর্বদিকের বারান্দায় থাকিয়া মালাজপ করিতেন; আবার বাড়ীতে কিছু দেনা থাকায় লোকের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহের ফিকিরেও থাকিতেন। তাঁহার কথায় বিচলিত হইয়া লাটু ও রাখাল ঠাকুরের কাছে যাইয়া উপস্থিত হন।

কেশকণ্ডুয়ন সহ জড়জড় স্বর।
রাখাল কহেন কথা প্রভুর গোচর॥
এতদিন এইখানে দিবা বিভাবরী।
কি হইল ফল কিছু বুঝিতে না পারি॥
শুনি বাণী রাখালের প্রভু গুণধর।
... ...
চমকিয়া উঠিয়া কহেন সেইক্ষণে।
অনিমিখে নিরখিয়া রাখালের পানে॥
কেবা দিল হেন শিক্ষা ভীষণ বারতা।
এ নহে তোদের নিজ অন্তরের কথা॥
নিরমলচিত্ত তোরা অন্তর সরল।
তাহে কে ঢালিয়া দিল ভীষণ গরল॥
জড়স্বরে শিরে হাত বুদ্ধি আলথাল।
হাজরার শিক্ষা ইহা কহেন রাখাল॥
গরজিয়া প্রভুদেব কেশরীর ন্যায়।
দ্রুতপদে ধাইলেন হাজরা যেথায়॥
কর্কশ ভাষায় কত তিরস্কার তারে।
পশ্চাৎ কহেন তুমি যাও স্থানান্তরে॥
কত কষ্টে লালিপালি ছাবাল আমার।
বিনষ্ট কারণে দেহ শিক্ষা কদাকার॥

হইলে উহা যন্ত্রক্রিয়াবৎ প্রাণহীন হইয়া পড়ে, দর্শকগণেরও চিত্তহারী হয় না। রাখালের সংসারলীলার অভিনয়টিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে ঠাকুরই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রযত্নপর ছিলেন, নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র ছিলেন না।

রাখাল বিশাই দুয়ে নিজের প্রভুর।
দিনেক দুজনে পেয়ে লীলার ঠাকুর॥
জিজ্ঞাসা করিলা দোঁহে সহাস্য আননে।
কাহার বাসনা কিবা আছে মনে মনে॥
দীনক্ষীণ মৃদুভাবে কহিল বিশাই।
হৃদয়ে বাসনা মোর কিছুমাত্র নাই॥
জানিতে বাসনা কিবা রাখালের মনে।
প্রভুর কটাক্ষপাত হৈল তার পানে॥
সঙ্কেতে অঙ্গুলি এক তুলিয়া তখন।
প্রার্থনা করিলা এক পুত্রের কারণ॥
সত্বর পাইবে পুত্র পূর্ণ হবে সাধ।
এত বলি ঠাকুর করিলা আশীর্বাদ॥

বিশ্বেশ্বরী অন্তঃসত্ত্বা হইলে ঠাকুর তাহার জন্য চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং প্রসব হইবার জন্য কখন তাহাকে কোন্নগরে আনিয়া রাখা ভাল হইবে, স্ত্রী ভক্তগণের সহিত পরামর্শ করেন। ছেলেকে নিয়া বিশ্বেশ্বরী যেদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিল, ঠাকুর ছেলেটিকে কোলে নিয়া টাকা দিয়া চুম্ব খাইলেন, আর নহবতে মাতাঠাকুরাণীকে বলিয়া পাঠাইলেন টাকা দিয়া দেখিতে।

গিরিশবাবুকে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন কাশীপুরে : রাখাল টাখাল এখন বুঝেচে, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা; ওরা যে সংসারে গিয়ে থাকে, সে জেনেশুনে। পরিবার আছে, ছেলেও হয়েচে, কিন্তু বুঝেচে যে সব মিথ্যা, অনিত্য। রাখাল টাখাল এরা সংসারে লিপ্ত হবে না। যেমন পাঁকাল মাছ—পাঁকের ভিতর বাস, কিন্তু গায়ে পাঁকের দাগটি পর্যন্ত নাই। [কথামৃত]

প্রথম হইতেই ঠাকুর তাঁহার মানসপুত্রের জীবন সন্ন্যাসের অভিমুখে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছিলেন। অহঙ্কার-অভিমান দূর করিবার জন্য ধনীর দুলালকে দিয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করাইয়াছেন। উদ্দেশ্যবিশেষ সিদ্ধ করিবার জন্য মাঝে কিছুদিন তাঁহাকে দিয়া সংসারলীলার অভিনয় করাইয়া নিয়াছিলেন, এইমাত্র। কিন্তু সেই অভিনয়কালে যে অভিনিবেশ ঘটে, আর তাহার ফলে যেসব নূতন সংস্কার অর্জিত হয় ও যেসব নূতন বন্ধনের সৃষ্টি হয় সেইগুলির বাধা অতিক্রম করিতে কী ভীষণ প্রয়াসই না তাঁহাকে করিতে হইয়াছে! সেই প্রয়াস—সেই সুতীব্র তপস্যা—তাঁহার জীবনকে গভীর হইতে গভীরতর করিয়াছে, এবং পরিশেষে গভীরতম আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-সংঘের শীর্ষদেশে তাঁহার আসন নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে।

তাঁহার জীবনের ব্যবহারিক দিক্‌টাও যে অনন্যসাধারণ হইবে ইহা তৎকালে অপরে বুঝিতে না পারিলেও ত্রিকালদর্শী ঠাকুরের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। আর সেইজন্য লীলাসম্বরণের প্রাক্কালে—যে সময়ে তিনি নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার সংসারত্যাগী সন্তানগণকে কিভাবে পরিচালনা করিতে হইবে তাহা উপদেশ করিতেছিলেন সেইকালে—বলিয়াছিলেন: রাখালের রাজবুদ্ধি আছে, সে একটা রাজ্য চালাতে পারে। পরবর্তী কালে ঠাকুরের বহুমুখী প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী রাখাল-মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) তাঁহার সন্ন্যাসি-সংঘে 'রাজা-মহারাজ' বা শুধু 'মহারাজ' নামে অভিহিত হইতেন।

'অখণ্ডের ঘর' নরেন্দ্রের সহিত মিলন

শিমলাপল্লীর সুরেন্দ্র মিত্র যেদিন আনন্দোৎসব করেন ঠাকুরকে স্বগৃহে আনয়ন করিয়া, সেদিন তিনি প্রতিবেশী বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র নরেন্দ্রনাথকেও সেখানে লইয়া যান ভজন গাহিতে অনুরোধ জানাইয়া। ঠাকুর ও তাঁহার প্রধান লীলাসঙ্গী নরেন্দ্রনাথের মিলন এইরূপে সংঘটিত হইয়াছিল। তখন ১২৮৮ সালের হেমন্তের শেষভাগ, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাস হইবে। নরেন্দ্রের বয়স তখন প্রায় উনিশ বৎসর, এবং তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ-এ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র ঠাকুর তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন, রামকে ও সুরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া সুগায়ক যুবকের পরিচয় যতদূর সম্ভব জানিয়া লন এবং তাঁহার অঙ্গলক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সহিত দুইএকটি কথা কহিয়া অচিরে একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করেন।

এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ-এ পরীক্ষা হইয়া যায়, এবং শহরের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া বিশ্বনাথ তাঁহার কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে সচেষ্ট হন। পাত্রী শ্যামবর্ণা ছিল বলিযা তাহার পিতা দশহাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। বিষম বিরক্তির সহিত নরেন্দ্র সে-বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ধর্মভাবের প্রেরণা হইতেই নরেন্দ্র বিবাহ করিলেন না বুঝিতে পারিয়া রাম তাহাকে বলিয়াছিলেন—পাঠ্যাবস্থায় রাম বিশ্বনাথের সংসারে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন—"যদি ধর্মলাভ করিতে তোমার যথার্থ বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি স্থলে ঘুরিয়া না বেড়াইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে চল।" নরেন্দ্র একথায় সম্মত হন ও সুরেন্দ্রের সহিত গাড়ীতে করিয়া একদিন দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন দুইতিন জন বয়স্যকে সাথে লইয়া।

ঠাকুর বলিয়াছেন: "পশ্চিমের দরজা দিয়া নরেন্দ্র প্রথম দিন এই ঘরে ঢুকিয়াছিল। দেখিলাম, নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য নাই, মাথার চুল ও

বেশভূষার কোনরূপ পারিপাট্য নাই, বাহিরের কোন পদার্থেই ইতর-সাধারণের মত একটা আঁট নাই, সবই যেন তার আল্‌গা, এবং চক্ষু দেখিয়া মনে হইল তাহার মনের অনেকটা ভিতরের দিকে কে যেন সর্বদা জোর করিয়া টানিয়া রাখিয়াছে! দেখিয়া মনে হইল, বিষয়ী লোকের আবাস কলিকাতায় এত বড় সত্ত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভবে!

"মেজেতে মাদুর পাতা ছিল, বসিতে বলিলাম। যেখানে গঙ্গাজলের জালাটি রহিয়াছে তাহার নিকটেই বসিল।...বাঙ্গলা গান সে দুইচারিটি মাত্র তখন শিখিয়াছে, তাহাই গাহিতে বলিলাম। তাহাতে সে ব্রাহ্মসমাজের 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটি ধরিল ও ষোল আনা মনপ্রাণ ঢালিয়া ধ্যানস্থ হইয়া যেন উহা গাহিতে লাগিল। শুনিয়া আর সামলাইতে পারিলাম না, ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম।'

"পরে, সে চলিয়া যাইলে, তাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণের ভিতরটা চব্বিশ ঘণ্টা এমন ব্যাকুল হইয়া রহিল যে, বলিবার নহে। সময়ে সময়ে এমন যন্ত্রণা হইত যে, মনে হইত বুকের ভিতরটা যেন কে গামছা নিংড়াইবার মত জোর করিয়া নিংড়াইতেছে!...ছুটিয়া বাগানের উত্তরাংশের ঝাউতলায়...যাইয়া 'ওরে তুই আয় রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারচি না'বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতাম!...ক্রমান্বয়ে ছয়মাস ঐরূপ হইয়াছিল! আর সব ছেলেরা যারা এখানে আসিয়াছে তাদের কাহারও কাহারও জন্য কখন কখন মন কেমন করিয়াছে, কিন্তু নরেন্দ্রের জন্য যেমন হইয়াছিল তাহার তুলনায় সে কিছুই নয় বলিলে চলে।"

দক্ষিণেশ্বরে নিজের প্রথমাগমন-দিবসের কথাপ্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ শরচ্চন্দ্র-প্রমুখ গুরুভাইদিগকে বলিয়াছিলেন: "গান ত গাহিলাম, তাহার পরেই ঠাকুর সহসা উঠিয়া আমার হাত ধরিয়া তাঁহার ঘরের উত্তরে যে বারাণ্ডা আছে তথায় লইয়া যাইলেন। তখন শীতকাল, উত্তুরে-হাওয়া নিবারণের জন্য উক্ত বারাণ্ডায় থামের অন্তরালগুলি ঝাঁপ দিয়া ঘেরা ছিল।...বারাণ্ডায় প্রবিষ্ট হইয়াই ঠাকুর ঘরের দরজাটি বন্ধ করায় ভাবিলাম, আমাকে বুঝি নির্জনে কিছু উপদেশ দিবেন। কিন্তু যাহা বলিলেন ও

করিলেন তাহা একেবারে কল্পনাতীত। সহসা আমার হাত ধরিয়া দরদরিত-ধারে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন এবং পূর্বপরিচিতের ন্যায় আমাকে পরমস্নেহে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এতদিন পরে আসিতে হয়? আমি তোমার জন্য কিরূপে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি তাহা একবার ভাবিতে নাই? বিষয়ী লোকের বাজে প্রসঙ্গ শুনিতে শুনিতে আমার কান ঝলসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে; প্রাণের কথা কাহাকেও বলিতে না পাইয়া আমার পেট ফুলিয়া রহিয়াছে!'—ইত্যাদি কত কথা বলেন ও রোদন করেন! পরক্ষণেই আবার আমার সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া দেবতার মত আমার প্রতি সম্মান-প্রদর্শনপূর্বক বলিতে লাগিলেন, 'জানি আমি প্রভু, তুমি সেই পুরাতন ঋষি, নররূপী নারায়ণ, জীবের দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরায় শরীর ধারণ করিয়াছ', ইত্যাদি।

"আমি ত তাঁহার ঐরূপ আচরণে একেবারে নির্বাক—স্তম্ভিত! মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম এ কাহাকে দেখিতে আসিয়াছি, এ ত একেবারে উন্মাদ! না হইলে, বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র আমি, আমাকে এই সব কথা বলে? যাহা হউক, চুপ করিয়া রহিলাম, অদ্ভুত পাগল যাহা ইচ্ছা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। পরক্ষণে আমাকে তথায় থাকিতে বলিয়া তিনি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং মাখম, মিছরি ও কতকগুলি সন্দেশ আনিয়া আমাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। আমি যত বলিতে লাগিলাম 'আমাকে খাবারগুলি দিন, আমি সঙ্গীদের সহিত ভাগ করিয়া খাইগে', তিনি তাহা কিছুতেই শুনিলেন না। বলিলেন, 'উহারা খাইবে এখন, তুমি খাও'—বলিয়া সকলগুলি আমাকে খাওয়াইয়া তবে নিরস্ত হইলেন। পরে হাত ধরিয়া বলিলেন, 'বল, তুমি শীঘ্র একদিন এখানে আমার নিকটে একাকী আসিবে?' তাঁহার ঐরূপ একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা 'আসিব' বলিলাম এবং তাঁহার সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বক সঙ্গীদের নিকটে উপবিষ্ট হইলাম।

"বসিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম ও ভাবিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তাঁহার চালচলনে, কথাবার্তায়, অপর সকলের সহিত আচরণে

উন্মাদের মত কিছুই নাই। তাঁহার সদালাপে ও ভাবসমাধি দেখিয়া মনে হইল সত্যসত্যই ইনি ঈশ্বরার্থে সর্বস্বত্যাগী এবং যাহা বলিতেছেন তাহা স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়াছেন। 'তোমাদিগকে যেমন দেখিতেছি, তোমাদিগের সহিত যেমন কথা কহিতেছি এইরূপে ঈশ্বরকে দেখা যায় ও তাঁহার সহিত কথা কহা যায়, কিন্তু ঐরূপ করিতে চাহে কে? লোকে স্ত্রীপুত্রের শোকে ঘটী ঘটী চক্ষের জল ফেলে, বিষয় বা টাকার জন্য ঐরূপ করে, কিন্তু ঈশ্বরকে পাইলাম না বলিয়া ঐরূপ কে করে বল? তাঁহাকে পাইলাম না বলিয়া যদি ঐরূপ ব্যাকুল হইয়া কেহ তাঁহাকে ডাকে তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় তাহাকে দেখা দেন।'—তাঁহার মুখে ঐসকল কথা শুনিয়া মনে হইল তিনি অপর ধর্মপ্রচারকসকলের ন্যায় কল্পনা বা রূপকের সহায় লইয়া ঐরূপ বলিতেছেন না, সত্যসত্যই সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া এবং সম্পূর্ণমনে ঈশ্বরকে ডাকিয়া যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাই বলিতেছেন। তখন তাঁহার ইতিপূর্বের আচরণের সহিত ঐসকল কথার সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া 'এবারক্রম্বি'-প্রমুখ ইংরাজ দার্শনিকগণ তাঁহাদিগের গ্রন্থমধ্যে যেসকল অর্ধোন্মাদের উল্লেখ করিয়াছেন সেই সকল দৃষ্টান্ত মনে উদয় হইল এবং দৃঢ়নিশ্চয় করিলাম, ইনিও ঐরূপ হইয়াছেন।…কিন্তু ইহার ঈশ্বরার্থে অদ্ভুত ত্যাগের মহিমা ভুলিতে পারিলাম না। নির্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, উন্মাদ হইলেও ঈশ্বরের জন্য ঐরূপ ত্যাগ জগতে বিরল ব্যক্তিই করিতে সক্ষম; উন্মাদ হইলেও এ ব্যক্তি মহাপবিত্র, মহাত্যাগী এবং ঐজন্য মানবহৃদয়ের শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মান পাইবার যথার্থ অধিকারী! ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেদিন তাঁহার চরণবন্দনা ও তাঁহার নিকটে বিদায়গ্রহণপূর্বক কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।"

প্রথম দর্শনের প্রায় একমাস পরে নরেন্দ্র একদিন একাকী পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। সেই দিনের কথায় তিনি বলিয়াছিলেন: "দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী যে কলিকাতা হইতে এত অধিক দূরে তাহা ইতিপূর্বে গাড়ী করিয়া একবারমাত্র যাইয়া বুঝিতে পারি নাই।…জিজ্ঞাসা করিতে করিতে কোনরূপে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিলাম এবং একেবারে

ঠাকুরের গৃহে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম তিনি···ছোট তক্তাপোশখানির উপর একাকী আপন মনে বসিয়া আছেন, নিকটে কেহই নাই। আমাকে দেখিবামাত্র সাহ্লাদে নিকটে ডাকিয়া উহারই একপ্রান্তে বসাইলেন। বসিবার পরেই কিন্তু দেখিতে পাইলাম, তিনি যেন কেমন একপ্রকার ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন এবং অস্পষ্টস্বরে আপনা-আপনি কি বলিতে বলিতে স্থির দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে আমার দিকে সরিয়া আসিতেছেন।···সহসা নিকটে আসিয়া নিজ দক্ষিণপদ আমার অঙ্গে সংস্থাপন করিলেন এবং উহার স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে আমার এক অপূর্ব উপলব্ধি উপস্থিত হইল। চক্ষু চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, দেয়ালগুলির সহিত গৃহের সমস্ত বস্তু বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে এবং সমগ্র বিশ্বের সহিত আমার আমিত্ব যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে একাকার হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে! তখন দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িলাম, মনে হইল—আমিত্বের নাশেই মরণ, সেই মরণ সম্মুখে, অতি নিকটে। সামলাইতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'ওগো, তুমি আমার একি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন!' অদ্ভুত পাগল আমার ঐকথা শুনিয়া খলখল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং হস্ত দ্বারা আমার বক্ষ স্পর্শ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 'তবে এখন থাক্, একেবারে কাজ নাই, কালে হইবে।'···বলিবামাত্র আমার সেই অপূর্ব প্রত্যক্ষ এককালে অপনীত হইল; প্রকৃতিস্থ হইলাম, এবং ঘরের ভিতরের ও বাহিরের পদার্থসকলকে পূর্বের ন্যায় অবস্থিত দেখিতে পাইলাম।···ঘটনাটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে হইয়া গেল এবং উহার দ্বারা মনে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল।···বুদ্ধির উন্মেষ হওয়া পর্যন্ত দর্শন, অনুসন্ধান ও যুক্তিতর্ক-সহায়ে প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তি সম্বন্ধে একটা মতামত স্থির না করিয়া কখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারি নাই, অদ্য সেই স্বভাবে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রাণে একটা যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। ফলে মনে পুনরায় প্রবল সংকল্পের উদয় হইল, যেরূপে পারি এই অদ্ভুত পুরুষের স্বভাব ও শক্তির কথা যথাযথভাবে বুঝিতে হইবেই হইবে।

"...ঠাকুর কিন্তু পূর্বোক্ত ঘটনার পরে যেন এক ভিন্ন ব্যক্তি হইয়া গেলেন, এবং পূর্বদিবসের ন্যায় নানাভাবে আমাকে আদর যত্ন করিয়া খাওয়াইতে ও সকল বিষয়ে বহুকালের পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অতি প্রিয় আত্মীয় বা সখাকে বহুকাল পরে নিকটে পাইলে লোকের যেরূপ হইয়া থাকে, আমার সহিত তিনি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। খাওয়াইয়া, কথা কহিয়া, আদর এবং রঙ্গপরিহাস করিয়া তাঁহার যেন আর আশ মিটিতেছিল না। তাঁহার ঐরূপ ভালবাসা ও ব্যবহারও আমার স্বল্প চিন্তার কারণ হয় নাই।...সেদিনও আমাকে পূর্বের ন্যায় আসিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে বাটীতে ফিরিতে হইয়াছিল।"

তৃতীয়বার যখন নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছে যান দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুর তাঁহাকে সঙ্গে নিয়া বেড়াইতে যান পার্শ্ববর্তী যদু মল্লিকের বাগানবাড়ীতে। উদ্যানমধ্যে ও গঙ্গাতীরে খানিক পরিভ্রমণ করিয়া ঠাকুর বৈঠকখানায় আসিয়া বসেন; সেখানে তাঁহার শক্তিপূর্ণ স্পর্শে নরেন্দ্র বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়া ফেলেন ও চৈতন্য হইলে দেখিতে পান, ঠাকুর তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে মৃদুমধুর হাস্য করিতেছেন। এইদিনের ঘটনা সম্বন্ধে ঠাকুর পরে বলিয়াছিলেন: "বাহ্যসংজ্ঞার লোপ হইলে নরেন্দ্রকে সেদিন নানাকথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—কে সে, কোথা হইতে আসিয়াছে, কেন আসিয়াছে, কতদিন এখানে থাকিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেও.... যথাযথ উত্তর দিয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছিলাম ও ভাবিয়াছিলাম তাহার ঐকালের উত্তরসকল তাহাই সপ্রমাণ করিয়াছিল।...উহা হইতেই কিন্তু জানিয়াছি, সে যেদিন জানিতে পারিবে সে কে, সেদিন আর ইহলোকে থাকিবে না, দৃঢ়সংকল্প-সহায়ে যোগমার্গে তৎক্ষণাৎ শরীর পরিত্যাগ করিবে! নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ।"

নরেন্দ্রের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্বেই ঠাকুর যাহা দেখিয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে বলিয়াছেন: "একদিন দেখিতেছি—মন সমাধিপথে জ্যোতির্ময় বর্ত্মে উচ্চে উঠিয়া যাইতেছে। চন্দ্র-সূর্য-তারকামণ্ডিত স্থূল জগৎ সহজে

অতিক্রম করিয়া উহা প্রথমে সূক্ষ্ম ভাবজগতে প্রবিষ্ট হইল। ঐ রাজ্যের উচ্চ উচ্চতর স্তরসমূহে উহা যতই আরোহণ করিতে লাগিল, ততই নানা দেবদেবীর ভাবঘন বিচিত্র মূর্তিসমূহ পথের দুই পার্শ্বে অবস্থিত দেখিতে পাইলাম। ক্রমে উক্ত রাজ্যের চরমসীমায় উহা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিলাম এক জ্যোতির্ময় ব্যবধান প্রসারিত থাকিয়া খণ্ড ও অখণ্ডের রাজ্যকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া মন ক্রমে অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করিল। দেখিলাম সেখানে মূর্তিবিশিষ্ট কেহ বা কিছুই আর নাই, দিব্যদেহধারী দেবদেবীসকল পর্যন্ত যেন এখানে প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইয়া বহুদূর নিম্নে নিজ নিজ অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম দিব্যজ্যোতির্ঘনতনু সাতজন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। বুঝিলাম, জ্ঞান ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে ইঁহারা মানব ত দূরের কথা, দেবদেবীদিগকে পর্যন্ত অতিক্রম করিয়াছেন। বিস্মিত হইয়া ইঁহাদিগের মহত্ত্বের বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে দেখি, সম্মুখে অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের ভেদমাত্র-বিরহিত সমরস জ্যোতির্মণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হইয়া দিব্য শিশুর আকারে পরিণত হইল। ঐ দেবশিশু ইঁহাদিগের অন্যতমের নিকটে অবতরণপূর্বক নিজ অপূর্ব সুললিত বাহুযুগলের দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল ; পরে বীণানিন্দিত নিজ অমৃতময়ী বাণী দ্বারা সাদরে আহ্বান-পূর্বক সমাধি হইতে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিতে অশেষ প্রযত্ন করিতে লাগিল। সুকোমল প্রেমস্পর্শে ঋষি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেন এবং অর্ধস্তিমিত নির্নিমেষ লোচনে সেই অপূর্ব বালককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের প্রসন্নোজ্জ্বল ভাব দেখিয়া মনে হইল, বালক যেন তাঁহার বহুকালের পূর্বপরিচিত হৃদয়ের ধন। অদ্ভুত দেবশিশু তখন অসীম আনন্দপ্রকাশপূর্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিল, 'আমি যাইতেছি, তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে।' ঋষি তাহার ঐরূপ অনুরোধে কোন কথা না বলিলেও তাঁহার প্রেমপূর্ণ নয়ন তাঁহার অন্তরের সম্মতি ব্যক্ত করিল। পরে ঐরূপ সপ্রেম দৃষ্টিতে বালককে কিছুক্ষণ দেখিতে দেখিতে তিনি

পুনরায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন বিস্মিত হইয়া দেখি, তাঁহারই শরীরমনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকারে পরিণত হইয়া বিশোমমার্গে ধরাধামে অবতরণ করিতেছে! নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছিলাম, এ সেই ব্যক্তি।"

ঠাকুর স্বয়ং ঐ শিশুর আকার ধারণ করিয়াছিলেন, পরে একদিন জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছেন। ঠাকুরের সম্বন্ধে নরেন্দ্রের অর্ধোন্মাদ বলিয়া যে ধারণা হইয়াছিল, পর পর দুইদিন তাঁহার দুরতিক্রমণীয় শক্তির পরিচয় পাইয়া সেই ধারণাটি পরিবর্তিত হয়। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ঠাকুর দৈবশক্তিসম্পন্ন অলৌকিক মহাপুরুষ, এবং তাঁহাকে গুরুরূপে লাভ করা তাঁহার পক্ষে স্বল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। তথাপি ঠাকুরের সকল কথাই নির্বিচারে গ্রহণ করিতে তখনও তিনি সম্মত হন নাই। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে পড়িয়া যুক্তিবাদী নরেন্দ্র ঈশ্বরের সাকার ব্যক্তিত্বে ও মানববিগ্রহধারণে বা অবতারত্বে বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। সর্বত্যাগী ঠাকুরের সংস্পর্শে থাকিয়া তিনি ত্যাগের পথে বিশেষ প্রেরণা লাভ করেন, এবং তাঁহার উপদেশানুযায়ী চলিয়া ঈশ্বরের অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিতে তৎপর হইয়া উঠেন।

"কথিত আছে, ভগবান ঈশা তাঁহার কোন শিষ্যপ্রবরের সহিত মিলিত হইবামাত্র বলিয়াছিলেন, 'পর্বতসদৃশ অচল অটল শ্রদ্ধাসম্পন্ন এই পুরুষের জীবনকে ভিত্তিস্বরূপে অবলম্বন করিয়া আমি আমার আধ্যাত্মিক মন্দির গঠিত করিয়া তুলিব।' নরেন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হইয়া ঠাকুরের মনেও ঐরূপ ভাব দৈবপ্রেরণায় প্রথম হইতেই উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, নরেন্দ্র তাঁহার বালক, তাঁহার সখা, তাঁহার আদেশ পালন করিতেই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং তাঁহার ও তাহার জীবন পূর্ব হইতে চিরকালের মত প্রণয়িযুগলের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন প্রেমবন্ধনে সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে! তবে ঐ প্রেম উচ্চ আধ্যাত্মিক প্রেম—যাহা প্রেমাস্পদকে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা প্রদান করিয়াও যুগে যুগে আপনার করিয়া রাখে, যাহাতে আপনার জন্য কিছু না

চাহিয়া পরস্পর পরস্পরকে যথাসর্বস্ব দানেই কেবলমাত্র পরিতৃপ্তি লাভ করে।”

শরচ্চন্দ্র যখন ঠাকুরের কাছে নূতন যাওয়া-আসা করিতেছেন (১২৯০) সেই সময়ে একদিন তাঁহাকে দেখাইয়া ঠাকুর রতন নামক যদু-মল্লিকের উদ্যানবাটীর প্রধান কর্মচারীকে বলিয়াছিলেন: “এরা সব ছেলে মন্দ নয়, দেড়টা পাস করিয়াছে, শিষ্ট শান্ত, কিন্তু নরেন্দ্রের মত একটি ছেলেও আর দেখিতে পাইলাম না! যেমন গাইতে বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি বলতে কইতে, আবার তেমনি ধর্মবিষয়ে। সে রাত-ভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁশ থাকে না! আমার নরেন্দ্রের ভিতর এতটুকু মেকি নাই, বাজিয়ে দেখ—টং টং করচে। আর সব ছেলেদের দেখি, যেন চোখ-কান টিপে কোনও রকমে দুই তিনটে পাস করেচে, বস্, এই পর্যন্ত—ঐ করতেই যেন তাদের সমস্ত শক্তি বেরিয়ে গেছে। নরেন্দ্রের কিন্তু তা নয়, হেসে খেলে সব কাজ করে, পাস করাটা যেন তার কাছে কিছুই নয়! সে ব্রাহ্মসমাজেও যায়, সেখানে ভজন গায়, কিন্তু অন্য সকল ব্রাহ্মের ন্যায় নয়—সে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী। ধ্যান করতে বসে তার জ্যোতি-দর্শন হয়। সাধে নরেন্দ্রকে এত ভালবাসি।”

ব্রাহ্মনেতা কেশব ও বিজয় একদিন একত্র বসিয়াছিলেন, নরেন্দ্রও ছিলেন সেখানে। প্রসন্নমনে তাঁহাদিগকে দেখিতে দেখিতে নরেন্দ্রের ভাবী জীবনের উজ্জ্বলরূপ ঠাকুরের মানস চক্ষে প্রতিভাত হইল ও সভাভঙ্গে তিনি কহিলেন: “দেখিলাম, কেশব যেরূপ একটা শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে, নরেন্দ্রের ভিতর ঐরূপ আঠারটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান! আবার দেখিলাম, কেশব ও বিজয়ের অন্তর দীপশিখার ন্যায় জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল রহিয়াছে; পরে নরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখি, তাহার ভিতরে জ্ঞানসূর্য উদিত হইয়া মায়ামোহের লেশ পর্যন্ত তথা হইতে দূরীভূত করিয়াছে!” নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন: “মহাশয়, করেন কি? লোকে আপনার ঐরূপ কথা শুনিয়া আপনাকে উন্মাদ বলিয়া নিশ্চয় করিবে। কোথায় জগদ্বিখ্যাত কেশব ও

মহামনা বিজয় এবং কোথায় আমার ন্যায় একটা নগণ্য স্কুলের ছোঁড়া! আপনি তাঁহাদিগের সহিত আমার তুলনা করিয়া আর কখনও ঐরূপ কথা-সকল বলিবেন না।" একথায় ঠাকুর তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন: "কি করব রে, তুই কি ভাবিস আমি ঐরূপ বলিয়াছি, মা আমাকে ঐরূপ দেখাইলেন তাই বলিয়াছি; মা ত আমাকে সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখনও দেখান নাই তাই বলিয়াছি।"

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার পরে নরেন্দ্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগদান করিতেন নিয়মিতভাবে। কিছুদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইতে না পারায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য ঠাকুর এক রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় সমাজমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হন। উপাসনার কাজ যথারীতি শেষ করিয়া আচার্য তখন উপদেশমূলক ভাষণ দিতেছিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বেদীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন এবং ক্রমে বেদীর নিকটে আসিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। সমাধিমগ্ন ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য উপস্থিত জনতা চঞ্চল হইয়া উঠে ও সমাজের নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি যাবতীয় গ্যাসালোক নির্বাপিত করিয়া দেওয়ায় এক চরম বিশৃঙ্খলা ও গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়াই নরেন্দ্র তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, পেছনের দরজা দিয়া তিনি কোনরূপে তাঁহাকে বাহিরে আনয়ন করিলেন ও গাড়ীতে উঠাইয়া দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্তা ব্যক্তিগণের কেহ কেহ ঠাকুরকে পূর্ববৎ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না; কেশব ও বিজয়ের মতপরিবর্তন ঘটিয়াছে ঠাকুরেরই প্রভাবে, তাহারা মনে করিতেন।

নরেন্দ্র বলিতেন: "আমার জন্য ঠাকুরকে সেদিন ঐরূপে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়া মনে কতদূর দুঃখকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বলা অসম্ভব। ঐ কার্যের জন্য তাঁহাকে সেদিন কত না তিরস্কার করিয়াছিলাম! তিনি কিন্তু পূর্বোক্ত ঘটনায় ক্ষুণ্ণ হওয়া বা আমার কথায় কর্ণপাত করা, কিছুই করেন নাই।

"আমার প্রতি ভালবাসার জন্য তিনি ঐরূপে আপনার দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখেন না দেখিয়া তাঁহার উপর বিষম কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেও কখন কখন কুণ্ঠিত হই নাই। বলিতাম পুরাণে আছে, ভরত রাজা 'হরিণ' ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুর পরে হরিণ হইয়াছিল, একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আপনার আমার বিষয়ে অত চিন্তা করার পরিণাম ভাবিয়া সতর্ক হওয়া উচিত। বালকের ন্যায় সরল ঠাকুর আমার ঐ কথা শুনিয়া বিষম চিন্তিত হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'ঠিক বলিয়াছিস, তাই ত রে, তা হলে কি হবে, আমি যে তোকে না দেখে থাকতে পারি না!' দারুণ বিমর্ষ হইয়া ঠাকুর মাকে ঐ কথা জানাইতে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'যা শালা, আমি তোর কথা শুনব না। মা বল্লেন, তুই ওকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে জানিস, তাই ভালবাসিস, যেদিন ওর ভিতর নারায়ণকে না দেখতে পাবি সেদিন ওর মুখ দেখতেও পারবি না।' ঐরূপে আমি ইতিপূর্বে যত কথা বুঝাইয়াছিলাম, ঠাকুর সেই সকলকে এক কথায় সেইদিন উড়াইয়া দিয়াছিলেন।"

"নরেন্দ্রনাথকে উত্তম অধিকারী জানিয়া…ঠাকুর তাঁহাকে অদ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাসবান করিতে প্রযত্ন করিতেন।…তাঁহাকে অষ্টাবক্রসংহিতাদি গ্রন্থসকল পাঠ করিতে দিতেন। নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের দ্বৈতভাবে উপাসনায় নিযুক্ত নরেন্দ্রনাথের চক্ষে ঐসকল গ্রন্থ তখন নাস্তিক্য-দোষ-দুষ্ট বলিয়া মনে হইত।…একটু আধটু পাঠ করিবার পরেই তিনি স্পষ্ট বলিয়া বসিতেন, 'ইহাতে আর নাস্তিকতাতে প্রভেদ কি? সৃষ্ট জীব আপনাকে স্রষ্টা বলিয়া ভাবিবে? ইহা অপেক্ষা অধিক পাপ আর কি হইতে পারে? আমি ঈশ্বর, তুমি ঈশ্বর, জন্মমরণশীল যাবতীয় পদার্থ সকলই ঈশ্বর—ইহা অপেক্ষা অযুক্তিকর কথা অন্য কি হইবে?…ঋষিমুনিদের নিশ্চয় মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, নতুবা এমন সকল কথা লিখিবেন কিরূপে?' ঠাকুর স্পষ্টবাদী নরেন্দ্রনাথের ঐরূপ কথা শুনিয়া হাসিতেন এবং… বলিতেন, 'তা তুই ঐকথা এখন নাই বা নিলি, তা বলে মুনিঋষিদের নিন্দা

ও ঈশ্বরীয় স্বরূপের ইতি করিস কেন? তুই সত্যস্বরূপ ভগবানকে ডাকিয়া যা, তারপর তিনি তোর নিকটে যেভাবে প্রকাশিত হইবেন তাহাই বিশ্বাস করিবি।' কিন্তু ঠাকুরের ঐকথা নরেন্দ্র বড় একটা শুনিতেন না। কারণ, যুক্তি দ্বারা যাহার প্রতিষ্ঠা হয় না তাহাই তাঁহার নিকট তখন মিথ্যা বলিয়া মনে হইত এবং সর্বপ্রকার মিথ্যার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল।"

একদিন ঠাকুরের মুখে অদ্বৈতজ্ঞানের অনেক কথা শুনিয়া নরেন্দ্র ধারণা করিতে পারিলেন না, হাজরা মহাশয়ের কাছে বসিয়া তামাকু সেবন করিতে করিতে সেইসব কথা উত্থাপন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এ কখনো হতে পারে? ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিটা ঈশ্বর, যা কিছু দেখছি আর আমরা সবাই ঈশ্বর?' হাজরা মহাশয়ও সেকথায় যোগদান করিয়া ব্যঙ্গ করিতে থাকায় উভয়ের মধ্যে হাস্যের রোল উঠিল। সেই হাসি শুনিয়া পরিধানের কাপড়খানি বগলে করিয়া ঠাকুর বাহিরে আসিলেন এবং 'তোরা কী বলচিস রে?' বলিয়া হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া নরেন্দ্রকে স্পর্শ করিয়া সমাধিস্থ হইলেন।

নরেন্দ্র বলিতেন: "ঠাকুরের··স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। স্তম্ভিত হইয়া সত্যসত্যই দেখিতে লাগিলাম, ঈশ্বর ভিন্ন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে অন্য কিছুই আর নাই! ঐরূপ দেখিয়াও কিন্তু নীরব রহিলাম, ভাবিলাম—দেখি, কতক্ষণ পর্যন্ত ঐভাব থাকে। কিন্তু সেই ঘোর সেদিন কিছুমাত্র কমিল না। বাটীতে ফিরিলাম, সেখানেও তাহাই—যাহা কিছু দেখিতে লাগিলাম সে সকলই তিনি এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। খাইতে বসিলাম, দেখি অন্ন, থাল, যিনি পরিবেষণ করিতেছেন, সে সকলই এবং আমি নিজেও তিনি ভিন্ন অন্য কেহ নহে! দুইএক গ্রাস খাইয়াই স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। 'বসে আছিস কেন রে, খা না'—মার ঐরূপ কথায় হুঁশ হওয়ায় আবার খাইতে আরম্ভ করিলাম। ঐরূপে খাইতে, শুইতে, কলেজে যাইতে, সকল সময়েই ঐরূপ দেখিতে লাগিলাম এবং সর্বদা কেমন একটা ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া রহিলাম।···যখন আচ্ছন্ন ভাবটা

একটু কমিয়া যাইত তখন জগৎটাকে স্বপ্ন বলিয়া মনে হইত। হেতুয়া পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতে যাইয়া উহার চতুষ্পার্শ্বের লৌহরেলে মাথা ঠুকিয়া দেখিতাম, যাহা দেখিতেছি তাহা স্বপ্নের রেল, অথবা সত্যকার! হস্তপদের অসাড়তার জন্য মনে হইত, পক্ষাঘাত হইবে না ত? ঐরূপে কিছুকাল পর্যন্ত ঐ বিষম ভাবের ঘোর ও আচ্ছন্নতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই নাই। যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম তখন ভাবিলাম উহাই অদ্বৈতবিজ্ঞানের আভাস! তবে ত শাস্ত্রে ঐবিষয়ে যাহা লেখা আছে তাহা মিথ্যা নহে! তদবধি অদ্বৈততত্ত্বের উপরে আর কখন সন্দিহান হইতে পারি নাই।"

এই সময়ের আর একটি আশ্চর্য ঘটনা নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন তাঁহার দুই গুরুভ্রাতা শরচ্চন্দ্র ও শশিভূষণকে। শেষোক্ত দুইজন বেলা দুইপ্রহরের কিছু পূর্বে নরেন্দ্রের শিমলাপল্লীস্থ বাসভবনে গিয়াছিলেন ও রাত্রি প্রায় এগারটা পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। শরচ্চন্দ্র লিখিয়াছেন:

"প্রথম দর্শন-দিন হইতে আমরা নরেন্দ্রের প্রতি যে দিব্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, বিধাতার নিয়োগে উহা সেদিন সহস্রগুণে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিপূর্বে আমরা ঠাকুরকে একজন ঈশ্বরজানিত ব্যক্তি বা সিদ্ধপুরুষ মাত্র বলিয়া ধারণা করিয়াছিলাম; কিন্তু ঠাকুরের সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের অদ্যকার প্রাণস্পর্শী কথাসমূহ আমাদের অন্তরে নূতন আলোক আনয়ন করিয়াছিল। আমরা বুঝিয়াছিলাম, মহামহিম শ্রীচৈতন্য ও ঈশা প্রভৃতি জগদ্গুরু মহাপুরুষগণের জীবনেতিহাসে লিপিবদ্ধ যেসকল অলৌকিক ঘটনার কথা পাঠ করিয়া আমরা এতকাল অবিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, তদ্রূপ ঘটনাসকল ঠাকুরের জীবনে নিত্যই ঘটিতেছে। ইচ্ছা বা স্পর্শমাত্রেই তিনি শরণাগত ব্যক্তির সংস্কারবন্ধন মোচনপূর্বক তাহাকে ভক্তি দিতেছেন, সমাধিস্থ করিয়া দিব্যানন্দের অধিকারী করিতেছেন, অথবা তাহার জীবনগতি আধ্যাত্মিক পথে এরূপভাবে প্রবর্তিত করিতেছেন যে, অচিরে ঈশ্বরদর্শন উপস্থিত হইয়া চিরকালের মত সে কৃতার্থ হইতেছে! ...ঠাকুরের কৃপা লাভ করিয়া নিজ জীবনে যে দিব্যানুভবসমূহ উপস্থিত হইয়াছে সে-সকলের কথা বলিতে বলিতে নরেন্দ্রনাথ সেদিন আমাদিগকে

সন্ধ্যাকালে হেদুয়া পুষ্করিণীর ধারে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং কিছুকালের জন্য আপনাতে আপনি মগ্ন থাকিয়া অন্তরের অদ্ভুত আনন্দাবেশ পরিশেষে কিন্নরকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছিলেন—

প্রেমধন বিলায় গোরা রায়!
চাঁদ নিতাই ডাকে আয় আয়! (তোরা কে নিবি রে আয়!)
প্রেম কলসে কলসে ঢালে, তবু না ফুরায়!
প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়!
গৌর-প্রেমের হিল্লোলেতে নদে ভেসে যায়!

"গীত সাঙ্গ হইলে নরেন্দ্রনাথ যেন আপনাকে আপনি সম্বোধনপূর্বক ধীরে ধীরে বলিয়াছিলেন, 'সত্যসত্যই বিলাইতেছেন! প্রেম বল, ভক্তি বল, জ্ঞান বল, মুক্তি বল, গোরা রায় যাহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাকে তাহাই বিলাইতেছেন! কি অদ্ভুত শক্তি!···রাত্রে ঘরে খিল দিয়া বিছানায় শুইয়া আছি, সহসা আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে হাজির করাইলেন—শরীরের ভিতরে যেটা আছে সেইটাকে; পরে কত কথা কত উপদেশের পর পুনরায় ফিরিতে দিলেন। সব করিতে পারেন—দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় সব করিতে পারেন!'

"সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া তামসী রাত্রিতে পরিণত হইয়াছে। পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পাইতেছি না, প্রয়োজনও হইতেছে না। কারণ, নরেন্দ্রের জ্বলন্ত ভাবরাশি মরমে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তরে এমন এক দিব্য মাদকতা আনিয়া দিয়াছে যাহাতে শরীর টলিতেছে এবং এতকালের বাস্তব জগৎ যেন দূরে স্বপ্নরাজ্যে অপসৃত হইয়াছে আর অহেতুকী কৃপার প্রেরণায় অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের সান্তবৎ হইয়া উদয় হওয়া এবং জীবের সংস্কারবন্ধন বিনষ্ট করিয়া ধর্মচক্র প্রবর্তন করারূপ সত্য—যাহা জগতের অধিকাংশের মতে অবাস্তব কল্পনাসম্ভূত—তাহা তখন জীবন্ত সত্য হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে! সময় কোথা দিয়া কিরূপে পলাইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু সহসা শুনিতে পাইলাম রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে বিদায় গ্রহণ করিবার সংকল্প করিতেছি এমন সময়ে

নরেন্দ্র বলিলেন, চল তোমাদিগকে কিছুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়া আসি। যাইতে যাইতে আবার পূর্বের ন্যায় কথাসকলের আলোচনা আরম্ভ হওয়ায় আমরা এতদূর তন্ময় হইয়া যাইলাম যে, চাঁপাতলার নিকটে বাটীতে পৌঁছিবার পরে মনে হইল, শ্রীযুত নরেন্দ্রকে এতদূর আসিতে দেওয়া ভাল হয় নাই।…কিছু জলযোগ করাইবার পরে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহাদের বাটী পর্যন্ত তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলাম।"

"নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আসিলে ঠাকুর তাঁহাকে লইয়া ব্যস্ত হইতেন। তাঁহাকে দূরে দেখিবামাত্র ঠাকুরের সম্পূর্ণ অন্তর যেন প্রবলবেগে শরীর হইতে নির্গত হইয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিত! 'ঐ ন—, ঐ ন—' বলিতে বলিতে আমরা কতদিন ঠাকুরকে সমাধিস্থ হইয়া পড়িতে দেখিয়াছি তাহা বলা যায় না।…পরে এমন একদিন আসিয়াছিল যেদিন নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে আগমন করিলে তিনি তাঁহার সহিত সর্বপ্রকারে উদাসীনের ন্যায় আচরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্র আসিলেন, ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন, সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া কিছুকাল অপেক্ষা করিলেন; ঠাকুর কিন্তু আদরযত্ন করা দূরে থাকুক, একবার কুশলপ্রশ্ন পর্যন্ত না করিয়া সম্পূর্ণ অপরিচিতের ন্যায় তাঁহার দিকে একবার দৃষ্টিপাতপূর্বক আপন মনে বসিয়া রহিলেন। নরেন্দ্র ভাবিলেন, ঠাকুর বুঝি ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। অগত্যা কিছুক্ষণ পরে গৃহের বাহিরে আসিয়া হাজরা মহাশয়ের সহিত বাক্যালাপে ও তামাকু সেবনে নিযুক্ত রহিলেন। ঠাকুর অপরের সহিত কথা কহিতেছেন শুনিতে পাইয়া নরেন্দ্র পুনরায় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখনও ঠাকুর তাঁহাকে কিছুই না বলিয়া অপরদিকে মুখ ফিরাইয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।…সন্ধ্যা উপস্থিত হইলেও ঠাকুরের ভাবান্তর না দেখিয়া নরেন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কলিকাতায় ফিরিলেন।

"সপ্তাহকাল অতীত হইতে না হইতে নরেন্দ্রনাথ পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক ঠাকুরকে তদবস্থ দেখিলেন। সেদিনও হাজরা মহাশয় ও অন্যান্য ব্যক্তির সহিত নানাবিধ আলাপে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া

সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন।...একমাসের অধিককাল ঐরূপে গত হইলে ঠাকুর যখন দেখিতে পাইলেন নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতে বিরত হইলেন না, তখন একদিন...জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, আমি ত তোর সহিত একটা কথাও কহি না, তবু তুই এখানে কি করিতে আসিস বল্ দেখি?' নরেন্দ্র বলিলেন, 'আমি কি আপনার কথা শুনিতে এখানে আসি? আপনাকে ভালবাসি, দেখিতে ইচ্ছা করে, তাই আসিয়া থাকি।' ঠাকুর...বিশেষ প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, 'আমি তোকে বিড়ে দেখছিলুম আদরযত্ন না পেলে তুই পালাস কি-না; তোর মত আধারই এতটা সহ্য করিতে পারে।"

বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার কিছু পূর্বে নরেন্দ্রের জীবনে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে—তাঁহার পিতা সহসা দেহত্যাগ করেন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া (১২৯১); নরেন্দ্র সেই সময়ে বরাহনগরে বন্ধুদের নিকটে ছিলেন, রাত্রি দুইটার সময়ে সেই দুঃসংবাদ অবগত হন। পিতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করিবার পরেই তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁহার পিতা কিছু ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন এবং পাঁচ-সাতটি প্রাণীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা এখন হইতে তাঁহাকেই করিতে হইবে। তিনি আরও জানিতে পারিলেন, যেসব জ্ঞাতিরা একদিন তাঁহার পিতার সাহায্যে নিজেদের অবস্থা উন্নত করিয়াছিল—পিতা উপার্জনশীল আইনব্যবসায়ী এটর্ণী ছিলেন—তাহারা এখন শত্রুতা করিতে, এমনকি বসতবাটী হইতেও তাঁহাদিগকে উচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে। নরেন্দ্র চাকরির অন্বেষণে ফিরিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনচারি মাস অবিরাম চেষ্টা করিয়াও কোন স্থায়ী কাজই পাইলেন না! তিনি বলিয়াছেন:

"মৃতাশৌচের অবসান হইবার পূর্ব হইতেই কর্মের চেষ্টায় ফিরিতে হইয়াছিল। অনাহারে নগ্নপদে চাকরির আবেদন হস্তে লইয়া মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রে...ঘুরিয়া বেড়াইতাম।...সংসারের সহিত এই প্রথম পরিচয়েই বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল, স্বার্থশূন্য সহানুভূতি এখানে অতীব বিরল—দুর্বলের দরিদ্রের এখানে স্থান নাই। দেখিতাম, দুইদিন পূর্বে

যাহারা আমাকে কোন বিষয়ে কিছুমাত্র সহায়তা করিবার অবসর পাইলে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছে, সময় বুঝিয়া তাহারাই এখন আমাকে দেখিয়া মুখ বাঁকাইতেছে এবং ক্ষমতা থাকিলেও সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে।···একজন কেবল আমার অজ্ঞাতে অন্তের নিকট হইতে আমার অবস্থা জানিয়া লইয়া বেনামী পত্রমধ্যে মাতাকে সময়ে সময়ে টাকা পাঠাইয়া আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছিল।

"যৌবনে পদার্পণপূর্বক যেসকল বাল্যবন্ধু চরিত্রহীন হইয়া অসদুপায়ে যৎসামান্য উপার্জন করিতেছিল তাহাদিগের কেহ কেহ আমার দারিদ্র্যের কথা জানিতে পারিয়া···দলে টানিতে সচেষ্ট হইয়াছিল।···যাহারা ইতিপূর্বে আমার ন্যায় অবস্থার পরিবর্তনে সহসা পতিত হইয়া একরূপ বাধ্য হইয়াই···হীন পথ অবলম্বন করিয়াছিল, দেখিতাম তাহারা সত্যসত্যই আমার জন্য ব্যথিত হইয়াছে। সময় বুঝিয়া অবিদ্যারূপিণী মহামায়াও এইকালে পশ্চাতে লাগিতে ছাড়েন নাই। এক সঙ্গতিপন্না রমণীর পূর্ব হইতে আমার উপর নজর পড়িয়াছিল,···সে এখন প্রস্তাব করিয়া পাঠাইল, তাহার সহিত তাহার সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্যদুঃখের অবসান করিতে পারি। বিষম অবজ্ঞা ও কঠোরতা-প্রদর্শনে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইয়াছিল।···

"এত দুঃখকষ্টেও এতদিন আস্তিক্যবুদ্ধির বিলোপ, অথবা 'ঈশ্বর মঙ্গলময়'—একথায় সন্দেহ হয় নাই। প্রাতে···তাঁহার নাম করিতে করিতে শয্যাত্যাগ করিতাম এবং আশায় বুক বাঁধিয়া উপার্জনের উপায় অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। একদিন ঐরূপে শয্যাত্যাগ করিতেছি এমন সময়ে··· মাতা শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'চুপ কর্ ছোঁড়া, ছেলেবেলা থেকে কেবল ভগবান ভগবান—ভগবান ত সব কল্লেন!' কথাগুলিতে মনে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইলাম। স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ভগবান কি বাস্তবিক আছেন, এবং থাকিলেও মানবের সকরুণ প্রার্থনা কি শুনিয়া থাকেন? তবে এত যে প্রার্থনা করি তাহার কোনরূপ উত্তর নাই কেন? শিবের সংসারে এত অশিব কোথা হইতে আসিল, মঙ্গলময়ের রাজত্বে

এতপ্রকার অমঙ্গল কেন?…ঈশ্বরের প্রতি প্রচণ্ড অভিমানে হৃদয় পূর্ণ হইল, অবসর বুঝিয়া সন্দেহ আসিয়া অন্তর অধিকার করিল।

"গোপনে কোন কার্যের অনুষ্ঠান করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। বাল্যকাল হইতে কখন ঐরূপ করা দূরে থাকুক, অন্তরের চিন্তাটি পর্যন্ত ভয়ে বা অন্য কোন কারণে কাহারও নিকটে কখনও লুকাইবার অভ্যাস করি নাই। সুতরাং ঈশ্বর নাই, অথবা যদি থাকেন ত তাঁহাকে ডাকিবার কোন সফলতা এবং প্রয়োজন নাই—একথা হাঁকিয়া ডাকিয়া লোকের নিকটে সপ্রমাণ করিতে এখন অগ্রসর হইব, ইহাতে বিচিত্র কি? ফলে স্বল্প দিনেই রব উঠিল, আমি নাস্তিক হইয়া এবং দুশ্চরিত্র লোকের সহিত মিলিত হইয়া মদ্যপানে ও বেশ্যালয় পর্যন্ত গমনে কুণ্ঠিত নহি।…

"কথা কানে হাটে। আমার ঐসকল কথা নানারূপে বিকৃত হইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট এবং তাঁহার কলিকাতাস্থ ভক্তগণের কাছে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। কেহ কেহ আমার স্বরূপ-অবস্থা নির্ণয় করিতে দেখা করিতে আসিলেন এবং যাহা রটিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ না হইলেও কতকটা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, ইঙ্গিতে-ইসারায় জানাইলেন।… ভাবিলাম ঠাকুরও হয়ত ইঁহাদের মুখে শুনিয়া ঐরূপ বিশ্বাস করিবেন। ঐরূপ ভাবিবামাত্র আবার নিদারুণ অভিমানে অন্তর পূর্ণ হইল। স্থির করিলাম, তা করুন, মানুষের ভাল-মন্দ মতামতের যখন এতই অল্প মূল্য, তখন তাহাতে আসে যায় কি? পরে শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম, ঠাকুর তাঁহাদিগের মুখে ঐকথা শুনিয়া প্রথমে হাঁ না কিছুই বলেন নাই; পরে ভবনাথ রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে ঐকথা জানাইয়া যখন বলিয়াছিল, 'মহাশয়, নরেন্দ্রের এমন হইবে একথা স্বপ্নেরও অগোচর।'—তখন বিষম উত্তেজিত হইয়া তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'চুপ কর্ শালারা, মা বলিয়াছেন, সে কখনও ঐরূপ হইতে পারে না; আর কখন আমাকে ঐসব কথা বলিলে তোদের মুখ দেখিতে পারিব না।'

"ঐরূপে অহঙ্কারে-অভিমানে নাস্তিকতার পোষণ করিলে হইবে কি, পরক্ষণেই বাল্যকাল হইতে, বিশেষতঃ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পরে,

জীবনে যেসকল অদ্ভুত অনুভূতি উপস্থিত হইয়াছিল সেই সকলের কথা উজ্জ্বল বর্ণে মনে উদয় হওয়ায় ভাবিতে থাকিতাম—ঈশ্বর নিশ্চয় আছেন এবং তাঁহাকে লাভ করিবার পথও নিশ্চয় আছে, নতুবা এই সংসারে প্রাণধারণের কোনই আবশ্যকতা নাই; দুঃখকষ্ট জীবনে যতই আসুক না কেন, সেই পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।···

"গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসিল, এখনও পূর্বের ন্যায় কর্মের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। একদিন সমস্ত দিবস উপবাসে ও বৃষ্টিতে ভিজিয়া রাত্রে অবসন্নপদে ও ততোধিক অবসন্নমনে বাটীতে ফিরিতেছি, এমন সময়ে শরীরে এত ক্লান্তি অনুভব করিলাম যে, আর এক পদও অগ্রসর হইতে না পারিয়া পার্শ্বস্থ বাটীর রকে জড়পদার্থের ন্যায় পড়িয়া রহিলাম।···মনে নানা বর্ণের চিন্তা ও ছবি তখন আপনা হইতে পরপর উদয় ও লয় হইতেছিল এবং উহাদিগকে তাড়াইয়া কোন এক চিন্তাবিশেষে মনকে আবদ্ধ রাখিব—এরূপ সামর্থ্য ছিল না। সহসা উপলব্ধি করিলাম,···একের পর অন্য এইরূপে ভিতরের অনেকগুলি পর্দা যেন উত্তোলিত হইল, এবং শিবের সংসারে অশিব কেন, ঈশ্বরের কঠোর ন্যায়পরতা ও অপার করুণার সামঞ্জস্য, প্রভৃতি যেসকল বিষয় নির্ণয় করিতে না পারিয়া মন এতদিন নানা সন্দেহে আকুল হইয়াছিল সেইসকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা অন্তরের নিবিড়তম প্রদেশে দেখিতে পাইলাম। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম।··· শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই, মন অমিত বল ও শান্তিতে পূর্ণ, এবং রজনী অবসান হইবার স্বল্পই বিলম্ব আছে!

"সংসারের প্রশংসা ও নিন্দায় এখন হইতে এককালে উদাসীন হইলাম, এবং···অর্থোপার্জন করিয়া পরিবারবর্গের সেবা ও ভোগসুখে কালযাপন করিবার জন্য আমার জন্ম হয় নাই—একথায় দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া পিতামহের ন্যায় সংসারত্যাগের জন্য গোপনে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। যাইবার দিন স্থির হইলে সংবাদ পাইলাম, ঠাকুর ঐদিন কলিকাতায় জনৈক ভক্তের বাটীতে আসিতেছেন। ভাবিলাম, ভালই হইল, গুরুদর্শন করিয়া চিরকালের মত গৃহত্যাগ করিব। ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তিনি ধরিয়া

বসিলেন, 'তোকে আজ আমার সহিত দক্ষিণেশ্বরে যাইতে হইবে।'... দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া অন্য সকলের সহিত কিছুক্ষণ তাঁহার গৃহমধ্যে উপবিষ্ট রহিয়াছি এমন সময়ে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। ...সহসা নিকটে আসিয়া আমাকে সস্নেহে ধারণপূর্বক সজলনয়নে গাহিতে লাগিলেন—

কথা কহিতে ডরাই, না কহিতেও ডরাই,
(আমার) মনে সন্দ হয় বুঝি তোমায় হারাই, হা—রাই !

"অন্তরের প্রবল ভাবরাশি সযত্নে রুদ্ধ রাখিয়াছিলাম, আর বেগ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।...বক্ষ নয়নধারায় প্লাবিত হইতে লাগিল। নিশ্চয় বুঝিলাম ঠাকুর সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন !...রাত্রে অপর সকলকে সরাইয়া আমাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, 'জানি আমি, তুমি মার কাজের জন্য আসিয়াছ, সংসারে কখনই থাকিতে পারিবে না, কিন্তু আমি যতদিন আছি ততদিন আমার জন্য থাক।'—বলিয়াই ঠাকুর হৃদয়ের আবেগে রুদ্ধকণ্ঠে পুনরায় অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন !

"ঠাকুরের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া পরদিন বাটীতে ফিরিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সংসারের শত চিন্তা আসিয়া অন্তর অধিকার করিল।...এটর্ণির আপিসে পরিশ্রম করিয়া এবং কয়েকখানি পুস্তকের অনুবাদ প্রভৃতিতে সামান্য উপার্জন হইয়া কোনরূপে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল...। কিছুকাল পরে মনে হইল, ঠাকুরের কথা ত ঈশ্বর শুনেন, তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া মাতা ও ভ্রাতাদিগের খাওয়াপরার কষ্ট যাহাতে দূর হয় এরূপ প্রার্থনা করিয়া লইব।...নাছোড়বান্দা হইয়া ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলাম, 'মা-ভাইদের আর্থিক কষ্ট নিবারণের জন্য আপনাকে মাকে জানাইতে হইবে!' ঠাকুর বলিলেন, 'ওরে, আমি যে ওসব কথা বলতে পারি না। তুই জানা না কেন? মাকে মানিস না, সেইজন্যই তোর এত কষ্ট!' বলিলাম, 'আমি ত মাকে জানি না, আপনি আমার জন্য মাকে বলুন। বলতেই হবে, আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়ব না।' ঠাকুর সস্নেহে বলিলেন, 'ওরে, আমি যে কতবার বলেছি, মা নরেন্দ্রের দুঃখকষ্ট দূর কর; তুই মাকে মানিস না, সেইজন্যই ত মা শুনে না। আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার; আমি

বলছি, আজ রাত্রে কালীঘরে গিয়া মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি মা তোকে তাই দিবেন। মা আমার চিন্ময়ী ব্রহ্মশক্তি, ইচ্ছায় জগৎ প্রসব করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারেন!'

"দৃঢ় বিশ্বাস হইল, ঠাকুর যখন ঐরূপ বলিলেন তখন নিশ্চয় প্রার্থনামাত্র সকল দুঃখের অবসান হইবে। প্রবল উৎকণ্ঠায় রাত্রির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, ক্রমে রাত্রি হইল। এক প্রহর গত হইবার পরে ঠাকুর আমাকে শ্রীমন্দিরে যাইতে বলিলেন। যাইতে যাইতে একটা গাঢ় নেশায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম, পা টলিতে লাগিল, এবং মাকে সত্য-সত্য দেখিতে ও তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনিতে পাইব এইরূপ স্থির বিশ্বাসে মন অন্য সকল বিষয় ভুলিয়া বিষম একাগ্র ও তন্ময় হইয়া ঐ কথাই ভাবিতে লাগিল। মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সত্যসত্যই মা চিন্ময়ী, সত্যসত্যই জীবিতা এবং অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রস্রবণ-স্বরূপিণী। ভক্তিপ্রেমে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল, বিহ্বল হইয়া বারংবার প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম, 'মা বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, যাহাতে তোমার অবাধ দর্শন নিত্য লাভ করি এইরূপ করিয়া দাও!' শান্তিতে প্রাণ আপ্লুত হইল, জগৎসংসার নিঃশেষে অন্তর্হিত হইয়া একমাত্র মা-ই হৃদয় পূর্ণ করিয়া রহিলেন!

"ঠাকুরের নিকটে ফিরিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরে, মার নিকটে সাংসারিক অভাব দূর করিবার প্রার্থনা করিয়াছিস ত?'...চমকিত হইয়া বলিলাম, 'না মহাশয়, ভুলিয়া গিয়াছি! তাইত, এখন কি করি?' তিনি বলিলেন, 'যা যা, ফের যা, গিয়ে ঐকথা জানিয়ে আয়।'... মার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পুনবায় মোহিত হইয়া সকল কথা ভুলিয়া পুনঃপুনঃ প্রণামপূবক জ্ঞানভক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করিয়া ফিরিলাম। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'কিরে, এবার বলিয়াছিস ত?' আবার চমকিত হইয়া বলিলাম, 'না মহাশয়, মাকে দেখিবামাত্র...সব কথা ভুলিয়া কেবল জ্ঞানভক্তিলাভের কথাই বলিয়াছি!—কি হবে?' ঠাকুর বলিলেন, 'দূর ছোড়া, আপনাকে একটু সামলাইয়া ঐ প্রার্থনাটা করিতে পারিলি

না? পারিস ত আর একবার গিয়ে ঐ কথাগুলো জানিয়ে আয়, শীঘ্র যা।' পুনরায় চলিলাম, কিন্তু মন্দিরে প্রবেশমাত্র দারুণ লজ্জা আসিয়া হৃদয় অধিকার করিল। ভাবিলাম, একি তুচ্ছ কথা মাকে বলিতে আসিয়াছি! ঠাকুর যে বলেন, রাজার প্রসন্নতা লাভ করিয়া তাঁহার নিকট লাউকুমড়া ভিক্ষা করা, এ যে সেইরূপ নির্বুদ্ধিতা! এমন হীনবুদ্ধি আমার! লজ্জায় ঘৃণায় পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলাম, 'অন্য কিছু চাহি না মা, কেবল জ্ঞানভক্তি দাও।' মন্দিরের বাহিরে আসিয়া মনে হইল ইহা নিশ্চয়ই ঠাকুরের খেলা, নতুবা তিনতিন বার মার নিকটে আসিয়াও বলা হইল না! অতঃপর তাঁহাকে ধরিয়া বসিলাম, '…এখন আপনাকে বলিতে হইবে, আমার মা-ভাইদের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব থাকিবে না।'…যখন তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িলাম না তখন তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা যা, তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের কখন অভাব হবে না।'"

লীলাপ্রসঙ্গকার লিখিয়াছেন: "নরেন্দ্রনাথের জীবনে উহা যে একটি বিশেষ ঘটনা, তাহা বলিতে হইবে না। ঈশ্বরের মাতৃভাবের, এবং প্রতীক ও প্রতিমায় তাঁহাকে উপাসনা করিবার, গূঢ় মর্ম এতদিন তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবদেবী-মূর্তিসকলকে তিনি ইতিপূর্বে অবজ্ঞা ভিন্ন কখন ভক্তিভয়ে দর্শন করিতে পারিতেন না। এখন হইতে ঐরূপ উপাসনার সম্যক রহস্য তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাসিত হইয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনে অধিকতর পূর্ণতা ও প্রসার আনয়ন করিল। ঠাকুর উহাতে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা বলিবার নহে।"

এই ঘটনার পরদিন মধ্যাহ্নে ঠাকুরের গৃহী ভক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া দেখেন, ঠাকুর গৃহমধ্যে একাকী বসিয়া আছেন এবং নরেন্দ্র বাহিরে একপার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন; ঠাকুরের মুখখানি আনন্দে উৎফুল্ল। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন: ওরে দেখ্, ঐ ছেলেটি বড় ভাল, ওর নাম নরেন্দ্র, আগে মাকে মানত না, কাল

মেনেচে। কষ্টে পড়েচে, তাই মার কাছে টাকা চাইবার কথা বলে দিয়েছিলুম, কিন্তু চাইতে পারলে না—বলে, 'লজ্জা করলে!' আমাকে বল্লে, মার গান শিখিয়ে দাও। 'মা ত্বং হি তারা' গানটি শিখিয়ে দিলুম; সমস্ত রাত ঐ গানটা গেয়েচে, তাই এখন ঘুমুচ্চে। (আনন্দে হাসিতে হাসিতে) নরেন্দ্র কালী মেনেচে, বেশ হয়েচে—না? (কিছুক্ষণ পরে আবার হাসিতে হাসিতে) নরেন্দ্র মাকে মেনেচে! বেশ হয়েচে—কেমন?

নিদ্রাভঙ্গে প্রায় চারিটার সময় নরেন্দ্র ঠাকুরের নিকটে আসিয়া বসিলেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর তখন তাঁহার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিতে লাগিলেন: দেখচি কী—(নিজের ও নরেন্দ্রের শরীর পর পর দেখাইয়া) এটা আমি, আবার এটাও আমি; সত্য বলচি, কিছুই তফাৎ বুঝতে পারচি না! যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফেলায় দুভাগ দেখাচ্চে, সত্যসত্য কিন্তু ভাগাভাগি নাই—একটাই রয়েচে—বুঝতে পাচ্চ? তা মা ছাড়া আর কী আছে বল?

অতঃপর ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, তামাক খাব। বৈকুণ্ঠনাথ তামাক সাজিয়া হুঁকাটি তাঁহার হাতে দিলেন। দুই-এক টান টানিয়াই তিনি হুঁকাটি ফিরাইয়া দিয়া 'কল্‌কেতে খাব' বলিয়া কল্‌কেটি হাতে নিয়া টানিতে লাগিলেন; তারপরে উহা নরেন্দ্রের মুখের কাছে ধরিয়া বলিলেন, খা, (নরেন্দ্রকে সঙ্কুচিত দেখিয়া) তোর তো ভারি ভেদবুদ্ধি—তুই-আমি কি আলাদা? এটাও আমি, ওটাও আমি। অগত্যা নরেন্দ্র ঠাকুরের হাতে মুখ লাগাইয়া দুইতিন বার তামাক টানিয়া নিরস্ত হইলেন।

"একদিন নরেন্দ্রনাথের মুখশ্রী দেখিতে দেখিতে তিনি (ঠাকুর) বলিয়াছিলেন এইরূপ চক্ষু কি কখনও শুষ্ক জ্ঞানীর হইয়া থাকে? জ্ঞানের সহিত রমণীসুলভ ভক্তির ভাব তোর ভিতরে বিলক্ষণ রহিয়াছে। কেবলমাত্র পুরুষোচিত ভাবসকল যাহার ভিতরে থাকে তাহার স্তনের বোঁটার চারিদিকে ভেলার দাগ (কালবর্ণ) থাকে না—মহাবীর অর্জুনের ঐরূপ ছিল।

অন্য একদিন ঠাকুর বলিয়াছিলেন, নরেন্দ্রের বাহিরে জ্ঞান, ভিতরে ভক্তি।

নরেন্দ্রনাথকে ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ও ভক্তিপথের সাধনসমূহ করাইয়া জ্ঞান-ভক্তি-সমন্বয়াচার্য ঠাকুর তাঁহার ভাবধারা-প্রচারের শ্রেষ্ঠ যন্ত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। উত্তরকালে এই সুমহান যন্ত্র তাঁহার সন্ন্যাসি-সংঘে 'স্বামীজী' ও বহির্বিশ্বে 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে অভিহিত হইতেন।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

মিলনলীলার আসরে অন্যান্য ত্যাগী পার্ষদেরা

যোগীন্দ্র

স্বীয় ভক্তগণের মধ্যে নরেন্দ্র, রাখাল, যোগীন্দ্র, বাবুরাম, নিরঞ্জন ও পূর্ণ এই ছয়জনকে ঠাকুর নিত্যসিদ্ধ বা ঈশ্বরকোটি বলিয়া নির্দেশ করিতেন। এই ছয়জনের মধ্যে তিনজন বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনজন করেন নাই। পূর্ণ গৃহমেধী হইয়া সংসারে ছিলেন, রাখাল একটি পুত্র জন্মিবার পরেই চিরকালের জন্য সংসারত্যাগ করিয়াছিলেন, আর যোগীন্দ্র নামে মাত্র বিবাহিত হইয়াছিলেন ঘটনাচক্রে পড়িয়া।

যোগীন্দ্রের পিতা নবীনচন্দ্র রায়চৌধুরী দক্ষিণেশ্বরের সুবিখ্যাত সাবর্ণচৌধুরী-বংশের সন্তান ও ধনাঢ্য জমিদার ছিলেন, কিন্তু যোগীন্দ্র কৈশোর অতিক্রম করিবার পূর্বেই তাঁহাদের অধিকাংশ সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। এক সময়ে তাঁহাদের বাসভবন ভারত-ভাগবতাদি-পাঠে ও কীর্তনাদিতে মুখরিত থাকিত। ঠাকুর একাধিকবার গিয়াছিলেন সেখানে হরিকথা শুনিতে, ঠাকুরের তখন সাধন-কাল।

যোগীন্দ্র ধীর, বিনয়ী, মধুরপ্রকৃতি ছিলেন, কখনও তাঁহাকে ক্রুদ্ধ হইতে দেখা যায় নাই। আবাল্য তাঁহার মধ্যে একটা আত্মসমাহিত ভাব পরিলক্ষিত হইত। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সর্বদা মনে হইত, তিনি পৃথিবীর লোক নহেন, অতি দূরের কোন এক নক্ষত্রপুঞ্জে তাঁহার আবাস এবং তাঁহার প্রিয় সঙ্গীরা এখনও রহিয়াছে সেই দেশে। বাল্য-সাথীদের সহিত খেলিতে গিয়া বিশেষভাবে এইরূপ সব কথা জাগিত তাঁহার মনে।

শৈশব অতিক্রম করিয়া যোগীন্দ্র যখন পাঠশালায় ভর্তি হইলেন,

> তখন রজনীযোগে প্রায় প্রতিনিশি।
> শুইবার ঘরে তাঁর জলে জ্যোতিরাশি॥
> গোটা ঘর জ্যোতির্ময় জ্যোতির ছটায়।
> ঘরে কোন্‌খানে কিবা সব দেখা যায়॥

যোগীন্দ্রের বয়স যখন ষোল বৎসর সেই সময়ে তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন, কেশব সেনের 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় তাঁহার বার্তা পাইয়া, ১২৮৩ সাল হইবে। অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যে যোগীন্দ্রই ঠাকুরের কাছে আসিয়াছিলেন সকলের আগে। ইহার আগেও তিনি কখন কখন ঠাকুরকে দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু তখন তিনি ঠাকুরের পরিচয় পান নাই। দক্ষিণেশ্বরে কেই বা তখন ঠাকুরকে চিনিত!

প্রভুর দর্শন-আশে লোলুপ হইয়া।
পুরীতে আসেন, ঘরে কিছু না কহিয়া॥
সভয়-অন্তর একা লজ্জা তায় খেলে।
সঙ্গে নাই দাসদাসী, ধনাঢ্যের ছেলে॥
মন্দির-বাহিরে হয় প্রভুর তল্লাস।
প্রবেশিতে ভিতরে অন্তরে আসে ত্রাস॥

... ...

এইরূপে যাতায়াত হয় বারে বারে।
দরশনে একদিন সুযোগ মন্দিরে॥
ঘরভরা লোক দূরে ঠিক করা ভার।
গঙ্গাপানে মন্দিরের বিমুক্ত দুয়ার॥

... ...

কিবা ঈশ্বরীয় কথা হয় আলোচনা।
দুই কান পাতি রহে যদি যায় শুনা॥
হেনকালে অকস্মাৎ কোন একজন।
লয়ে গেল শ্রীমন্দিরে যথা নারায়ণ॥
শ্রীমন্দিরে আজি ব্রাহ্মণগণের বাজার।
নাম জয়গোপাল, উপাধি সেন তাঁর॥

... ...

একে একে যতগুলি সব গেল সরে।
ব্রাহ্মণকুমার দেখে বসে একধারে॥

বড় খুসি প্রভু দেখি ব্রাহ্মণকুমার।
জিজ্ঞাসিলা কোথা ঘর কেবা পিতা তাঁর॥
... ...
সোহাগে ধরিয়া হাত পুনশ্চ জিজ্ঞাসা।
কি মনে করিয়া আজ এইখানে আসা॥
আমারে দেখিয়া মনে কি হয় তোমার।
হৃদয়ে প্রত্যয় কিবা কহ সমাচার॥
সরলে যোগীন্দ্র কৈল উত্তর প্রদান।
অন্য কেহ নহ তুমি নিজে ভগবান॥

উদাসীন দ্রষ্টার ভাব লইয়া যোগীন্দ্র সংসারে আগমন করিয়াছিলেন; ঠাকুরের সংসর্গে দিনে দিনে বাড়িয়া তাহা বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার পড়াশুনা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিবার পরেই তিনি কানপুরে তাঁহার এক আত্মীয়ের কাছে প্রেরিত হইয়াছিলেন, সেখানে কোনরূপ কাজকর্ম করিবেন বলিয়া। তাঁহাদের অবস্থা তখন বেশ সচ্ছল ছিল না। কানপুরে কাজের কোন সুরাহা হইল না, এবং যথেষ্ট অবসর পাইবার ফলে যোগীন্দ্রের স্বাভাবিক ধ্যাননিষ্ঠা সেখানে অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। সহসা একদিন দক্ষিণেশ্বর হইতে এই মর্মে তার আসিল, 'যোগীনকে পাঠিয়ে দাও, বাড়ীতে অসুখ।' তাড়াতাড়ি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া যোগীন্দ্র সেখানে অসুখের কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলেন না, তাহার পরিবর্তে দেখিলেন তাঁহার বিবাহের আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া আছে। তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। পিতাকে তিনি দৃঢ়তা-সহকারে জানাইয়া দিলেন, তিনি বিবাহ করিতে পারিবেন না। পিতা রাগিয়া অগ্নিশর্মা হইলেন, এমন অবাধ্য পুত্রের আর মুখদর্শন করিবেন না বলিলেন, আর মাতা পুত্রের দুই হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, নিজের ইচ্ছা না থাকলেও তুমি আমার জন্যে বিয়ে কর—কর্তার মুখরক্ষা কর, তিনি কথা দিয়েচেন।

সুদীর্ঘকাল পরে সত্যনির্ণয় করা কঠিন কাজ, তথাপি মনে না হইয়া পারে না যে, এই সমস্ত ঘটনার অন্তরালে যেন একটা চক্রান্ত আত্মগোপন

করিয়া আছে। মনে হয়, কর্মের অছিলায় কানপুরে যোগীন্দ্রকে পাঠানো হইয়াছিল ঠাকুরের প্রভাব হইতে তাঁহাকে দূরে সরাইয়া রাখিবার জন্য, আর তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার বিবাহের আয়োজন করা হইয়াছিল অতর্কিতে সংসারবিমুখ পুত্রের জীবনের মোড় সংসারমুখে ঘুরাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে নাই, বিবাহ করিয়াও যোগীন্দ্র সংসারী হন নাই। তিনি বলিয়াছেন :

"বিবাহ করিয়াই মনে হইল—ঈশ্বরলাভের আশা করা এখন বিড়ম্বনা মাত্র ; যে ঠাকুরের প্রথম শিক্ষা কামিনীকাঞ্চনত্যাগ তাঁহার কাছে ...ম্যম্ কিসের জন্য যাইব ; হৃদয়ের কোমলতায় জীবনটা নষ্ট করিয়াছি, উহা ভক্তির ফিরিবার নহে ; এখন যত শীঘ্র মৃত্যু হয় ততই মঙ্গল। পূর্বে ...ন্যাসিসংঘে নিকটে প্রতিদিন যাইতাম, ঐ ঘটনার পরে এককালে যাওয়া এবং দারুণ হতাশা ও মনস্তাপে দিন কাটাইতে লাগিলাম ...য়াছেন। ছাড়িলেন না, বারংবার···ডাকিয়া পাঠাইতে লাগিলেন এক ব্যক্তি কোন দ্রব্য ক্রয় করিয়া দিবার নিমিত্ত আমা... কয়েকটি মুদ্রা দিয়াছিলেন,···দ্রব্যটি লোক মারফত তাঁ... বলিয়া দিয়াছিলাম উদ্বৃত্ত পয়সা শীঘ্র পাঠাইতেছি। ঠাকুর ... পারিয়া একদিন···আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'তুই কেমন ... লোকে জিনিস কিনিতে দিলে···বাকি পয়সা ফিরাইয়া দেওয়া দূরে থাকুক, করে দিবি তাহার একটা সংবাদ পাঠান পর্যন্ত নাই।' ···হৃদয়ে বিষম অভিমান জাগিয়া উঠিল ; ভাবিলাম, ঠাকুর আমাকে এতদিন পরে জুয়াচোর মনে করিলেন! থাক্, আজ···এই গণ্ডগোল মিটাইয়া দিয়া আসিব ; পরে কালীবাড়ীর দিক আর মাড়াইব না।··· মৃতকল্প হইয়া অপরাহ্নে কালীবাড়ীতে যাইলাম। দূর হইতে দেখিতে পাইলাম, ঠাকুর পরিধানের কাপড়খানি বগলে ধারণ করিয়া···দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে দেখিবামাত্র বেগে অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'বিবাহ করিয়াছিস তাহাতে ভয় কি? এখানকার কৃপা থাকিলে লাখটা বিবাহ করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। যদি সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরলাভ করিতে চাস তাহা হইলে তোর

স্ত্রীকে একদিন এখানে লইয়া আসিস, তাহাকে ও তোকে সেইরূপ করিয়া দিব ; আর যদি সংসার ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরলাভ করিতে চাস তাহা হইলে তাহাই করিয়া দিব!' ...কথাগুলি একেবারে প্রাণের ভিতর স্পর্শ করিল ...। অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, তিনিও সস্নেহে আমার হাত ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন... ।"

যোগীন্দ্রের উদাসভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মাতা একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি টাকা-রোজগারের চেষ্টা না করবি তো বিয়ে করলি কেন? [illegible]গীন্দ্র উত্তর দিলেন, আমি তো বারবার বলেছিলুম বিয়ে করব না, [illegible]র জন্যে বিয়ে করতে হল—তোমার কান্না সহ্য করতে না পেরে! ঠাকুরের [illegible]চ্ছা না থাকলে তুই আমার জন্যে বিয়ে করেচিস, এ কখনো হতে হইয়াছিল। [illegible]র মাতা কহিলেন। তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া, তাঁহার প্রবেশিকা-পরী[illegible]মিল দেখিয়া, সংসারে যোগীন্দ্রের একেবারে বিতৃষ্ণা জন্মিল। কাছে প্রেরিত হই[illegible]যোগীন্দ্র মাঝে মাঝে রাত্রেও ঠাকুরের কাছে থাকিতে তাঁহাদের অবস্থা ত[illegible] রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি দেখিলেন সুরাহা হইল না[illegible]ালা রহিয়াছে ও ঠাকুর বিছানায় নাই। তিনি বাহিরে ধ্যাননিষ্ঠা [illegible]রিতেছেন মনে করিয়া বাহিরে গিয়াও তাঁহাকে দেখিতে হইতে [illegible]না। যোগীন্দ্রের মনে তখন এক দারুণ সন্দেহের ছায়াপাত হইল [illegible]তবে কি ঠাকুর নহবতে নিজ পত্নীর কাছে গিয়াছেন?—তবে কি তিনিও মুখে যাহা বলেন কাজে তাহা করেন না? এই চিন্তার উদয়মাত্র ভয়ে অভিভূত হইয়াও তিনি স্থির করিলেন, নিতান্ত কঠোর এবং রুচিবিরুদ্ধ হইলেও যাহা সত্য তাহা জানিতে হইবে। নহবতের দিকে কয়েক পা অগ্রসর হইয়াই এক অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে পাইয়া যোগীন্দ্র স্তম্ভিত হইলেন। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, তিনি দেখিলেন—

বাহির দুয়ারে মাতা জগৎ-জননী।
সমাধিতে বসিয়া আছেন একাকিনী॥
প্রকাশ্য বদন, আবরণ নাহি তায়।
চন্দ্র-সূর্য-পবনে যা দেখিতে না পায়॥

আর ঠিক সেই সময়ে পঞ্চবটীর দিক হইতে চটিজুতার চটচট শব্দ করিতে করিতে আসিয়া ঠাকুর তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। 'কিরে, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে?' ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, আর যোগীন্দ্রের ভয়াতুর বিষণ্ণ মুখভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর পাইয়া বলিলেন: বেশ বেশ, সাধুকে দিনে দেখবি, রাত্রে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি!

লীলাপ্রসঙ্গকার লিখিয়াছেন: "গুরুপদে সর্বতোভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়া প্রথমে তাঁহার, এবং তাঁহার অন্তর্ধানে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সেবাতে প্রাণপাত করিয়া স্বামী যোগানন্দ পরজীবনে পূর্বোক্ত অপরাধের সম্যক্ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় তীব্রবৈরাগ্যসম্পন্ন, জ্ঞান ও ভক্তির সমভাবে অধিকারী, সমাধিমান যোগিপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসিসংঘে বিরল দেখিতে পাওয়া যায়।"

যোগীন্দ্রকে ঠাকুর অর্জুন বলিতেন, মাতাঠাকুরাণী বলিয়াছেন।

বাবুরাম

সুন্দর গড়ন, হাসি সর্বদা বয়ানে।
কৃষ্ণপদে রতিমতি অতুল ভুবনে॥
স্বভাবসুলভ কিবা আঁখি ঠেরে কথা।
পশ্চাতে সময়ে পাবে তাঁহার বারতা॥
... . বাবুরাম নাম তাঁর।
কৃপায় যাঁহার হয় ভক্তির সঞ্চার॥

বাবুরাম সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছেন বিভিন্ন সময়ে: 'বাবুরামকে দেখলুম দেবীমূর্তি—গলায় হার, সখী সঙ্গে।' 'ও নৈকষ্য-কুলীন, হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ।' 'ও রত্নপেটিকা।' শ্রীমতী রাধারাণীর অংশে বাবুরামের জন্ম, এই কথাও ঠাকুর বলিয়াছিলেন।

'রত্নপেটিকা' শব্দটি নিগূঢ়ার্থব্যঞ্জক। ভক্তিরসশাস্ত্রে ঐ বিশেষণ কেবলমাত্র শ্রীরাধার সখীদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়। সুতরাং 'দেবীমূর্তি' বলিতে ব্রজদেবী বা ব্রজগোপী বুঝিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির সারাংশকে প্রেম বলে। শ্রীরাধা সেই প্রেমের ঘনীভূত প্রতিমা, আর তাঁহার সখীরা সেই প্রেমেরই অংশভূতা।

সখীরা যেন শ্রীরাধারূপ প্রেমলতিকার পত্রপুষ্পাদিতুল্য, সুতরাং তাঁহা হইতে অভিন্ন। কৃষ্ণলীলামৃতরসে সিক্ত হইয়া লতিকায় যখন উল্লাস ঘটে, পত্রপুষ্পাদিতে সেই উল্লাস ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। মহাভাবে বিভাবিত ঠাকুরকে শ্রীবাবুরাম ধরিয়া রহিতেন, স্পর্শের দ্বারা সেই মহাভাবের উল্লাস বাবুরামেও সঞ্চারিত হইত, এবং এইরূপে ইহার আবেগ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর ক্রমশঃ সহজ অবস্থায় ফিরিয়া আসিতেন। মনে হয়, এই অতি অন্তরঙ্গতার জন্যই বাবুরামকে ঠাকুর তাঁহার দরদী বলিতেন, আর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এই গানটিও গাহিতেন ঃ

মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা।
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না॥

পরবর্তী জীবনে ভক্তদের সংস্পর্শে আসিয়া বাবুরাম-মহারাজ—স্বামী প্রেমানন্দ—ক্বচিৎ ব্রজগোপীদের অনুরাগের কথা কহিযাছেন, ক্বচিৎ শ্রীরাধার অনুপম প্রেমমহিমাও কীর্তন করিয়াছেন। সময়ে সময়ে অন্তর্মুখ অবস্থায় অনুচ্চস্বরে 'গোবিন্দ গোবিন্দ' বলিতেন। শেষরাত্রে জাগিয়া পুনঃপুনঃ গোবিন্দ-নাম—একএক শ্বাসে যতবার সম্ভব ততবার করিয়া—উচ্চারণ করিতেন। তথাপি কৃষ্ণকথা না কহিয়া তিনি সর্বদাই শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ করিতেন। তাঁহার কৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ অভেদে মিলিয়া মিশিয়া গিয়াছিলেন।

তাঁহার তিরোভাবের পরে শ্রীসারদানন্দ বলিয়াছিলেন: ঠাকুরের মহাভাবের সময় বাবুরাম-মহারাজ ভিন্ন আর কেউ তাঁকে ছুঁতে পারতেন না। স্বামীজী, মহারাজ এঁরা সকলেই বীরভাবের সাধক। বাবুরাম-মহারাজের মনে পুরুষোচিত কোন ভাব ছিল না, তাই হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ। ঠাকুরের লীলাসহচররূপে বাবুরাম-মহারাজ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সেখানে স্বামীজীও নাই, আমাদের কা কথা। তোমরা বাবুরাম-মহারাজের যত চিন্তা করবে ততই তোমাদের কল্যাণ হবে।

মং ভাব শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব; ভক্তিশাস্ত্রে তাঁহাকে মহাভাবস্বরূপা বলা হইয়াছে।

হুগলী জেলায়, আরামবাগ মহকুমার আঁটপুর গ্রামে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণববংশে বাবুরামের জন্ম। শৈশবে পিতৃহারা হইয়া তিনি মাতার স্নেহযত্নে প্রতিপালিত হন। মাতার ইচ্ছানুসারে পড়াশুনা করিতে আসিয়া তিনি কলিকাতায় এক জ্ঞাতিকাকার বাসায় থাকিতেন ও পাঠ্যবিষয়ে অধিক মনোনিবেশ না করিয়া গঙ্গার তীরে তীরে সাধু খুঁজিয়া বেড়াইতেন। কোনও সাধুর দেখা পাইলে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার কথাবার্তা শুনিতে থাকিতেন। কোনদিন ব্রাহ্মসমাজে কেশব সেনের বক্তৃতা, কোনদিন হরিসভায় ভাগবতপাঠ ও নামকীর্তন শুনিতে যাইতেন, শুনিয়া তন্ময় হইয়া পড়িতেন। সাধুর অন্বেষণে বাবুরামকে যত্রতত্র ঘুরিতে দেখিয়া একদিন তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা **তুলসীরাম** তাঁহাকে বলেন, দক্ষিণেশ্বরে একজন সাধু আছেন, তাঁর মহাপ্রভুর মত হরিনাম কীর্তন করতে করতে ভাব হয়, ভগবানের কথা কইতে কইতে তাঁর সমাধি হয়, তাঁকে দেখতে যাবি ?

ইতঃপূর্বে বাবুরামের ভগিনীপতি বাগবাজারনিবাসী **বলরাম বসু** ঠাকুরের দর্শনলাভে ধন্য হইয়াছিলেন, এবং তাঁহারই সঙ্গে যাইয়া বাবুরামের মাতা শ্রীমতী **মাতঙ্গিনী** ও দাদা তুলসীরাম ঠাকুরকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন।

সহপাঠী রাখালের সঙ্গে বাবুরামের প্রণয় ছিল। রাখাল প্রায় এক বৎসর পূর্ব হইতে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করিতেছিলেন। তাঁহার কাছে ঠাকুরের খবর লইয়া ও তাঁহার সঙ্গে এক নৌকায় করিয়া যাইয়া বাবুরাম একদিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুরকে দর্শন করেন ও সেইরাত্রে তাঁহার কাছে থাকিয়া যান। ১২৮৮ সালের চৈত্রমাস, বাবুরামের বয়স তখন কিঞ্চিদধিক বিশ বৎসর, যদিও বালিকাসুলভ দেহকান্তির জন্য তাঁহার বয়স অনেক কম দেখাইত।

রাখাল ও বাবুরামের সঙ্গে একই নৌকায় বলরামবাবুর পুরোহিত-পুত্র **রামদয়াল চক্রবর্তী** সেইদিন ঠাকুরের কাছে আসিয়াছিলেন ; রামদয়ালের কাছে বাবুরামের পরিচয় পাইয়া ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, -'বটে ? বলরামের কুটুম্ব, তবে তো আমাদেরও কুটুম্ব ! তা বেশ বেশ।...একটু দূরে একটি প্রদীপ মিটমিট করিতেছিল, বাবুরামের হাত ধরিয়া প্রদীপের

নিকটে গেলেন ও তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'হুঁ হুঁ।' তারপরে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া, বাবুরামের একখানি হাত নিজের হাতের উপর রাখিয়া উহার ভার অনুভব করিতে করিতে প্রফুল্লমুখে বলিলেন, 'হুঁ হুঁ, তা বেশ বেশ!' তারপরে রামদয়ালকে বলিলেন: নরেন কেমন আছে জান? শুনেছিলুম তার একটু অসুখ করেছিল।...সে অনেকদিন আসে নি।...তাকে এখানে আসতে বোলো। মনে থাকবে তো? রামদয়াল কহিলেন, আজ্ঞে অবিশ্যি মনে থাকবে; বলব, ভুলব না।

কথায় কথায় প্রায় দশটা বাজিল। রামদয়াল অনেক উত্তম ভোজ্যদ্রব্য আনিয়াছিলেন, উহার কিয়দংশ নিজে গ্রহণ করিয়া ঠাকুর বাকি সমস্তটাই তিনজনকে খাওয়াইলেন। তারপরে রাখাল ঘরে, এবং রামদয়াল ও বাবুরাম পূর্বদিকের ভিতরের বারান্দায় শয়ন করিলেন। শয়নের এক ঘণ্টা পরে ঠাকুর পরিধেয় বগলে করিয়া মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে আসিয়া রামদয়ালকে ডাকিয়া কহিলেন, হ্যাঁগা, ঘুমুলে? 'আজ্ঞে না' বলিয়া দুইজনেই উঠিয়া বসিলেন। ঠাকুর বলিতে লাগিলেন: দেখ, তাকে একবার আসতে বোলো। তার জন্যে আমার বুকের ভিতরটা (বগল হইতে কাপড় লইয়া মোড়া দিয়া) এইরকম মোড়া দিচ্চে, যেন গামছা নিংড়ুচ্চে! তুমি একবার তাকে আসতে বোলো। রামদয়াল কহিলেন: আজ্ঞে, আমি কালই তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলব আপনার সঙ্গে দেখা করতে। বলব, তিনি আপনার জন্যে অস্থির হয়েচেন, একবার গিয়ে দেখা করে আসুন।

সমস্ত রাত্রি ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঠাকুর এইরূপ করিলেন। নিশাবসান হইল। প্রাতঃকালে ঠাকুরকে প্রণাম করিতে আসিয়া বাবুরাম দেখিলেন তাঁহার রাত্রের মত ভাব এখন আর নাই, যেন সেই লোকই নহেন। ঠাকুর তাঁহাকে শৌচাদি সারিয়া পঞ্চবটী দেখিয়া আসিতে বলিলেন।

বাবুরামের বয়স যখন আট বৎসর মাত্র, তাঁহার মনে হইত, বেশ একজন সাধু সঙ্গী পাই তো গঙ্গার ধারে গাছপালার মধ্যে নির্জন কুটিরে

সাধু হয়ে থাকি। পঞ্চবটী ও তন্মধ্যস্থ কুটির দেখিয়া পূর্বস্মৃতি উদ্দীপিত হইল। হুবহু এই স্থানটিই যে তিনি দেখিয়াছিলেন মানস চক্ষে।

মিলনের সুরুতেই, চাঁদের আকর্ষণে উত্তাল সমুদ্রের মত, প্রিয়জন-বিরহে উদ্বেলিত এক প্রেম-মহোদধি বাবুরাম দেখিলেন। আর কেবল দূরে দাঁড়াইয়া দেখাই নহে, উহার তরঙ্গাভিঘাতে কিছুটা আহতও হইয়াছিলেন। সেই আঘাত বিস্মৃতির আগল অপসারিত করিয়া তাঁহাকে এক মধুময় স্মৃতির দেশ দেখাইয়া দিয়াছিল কি? সোনার প্রতিমা, রূপে গুণে অনুপমা এক বিরহোন্মাদিনী সহসা তাঁহার মানসলোক উদ্ভাসিত করিয়া দেখা দিয়াছিলেন কি? কে বলিবে!

ঠাকুরের কাছে প্রথমাগমনের পর, বৎসরকাল না যাইতেই বাবুরাম শ্রীগুরুর স্থায়ী সান্নিধ্য ও সেবাধিকার লাভের জন্য অন্তরে আকুলতা অনুভব করিতেন, কিন্তু ঠাকুরের কৃপা ভিন্ন উহা সম্ভব নহে জানিয়া তাঁহারই মুখ চাহিয়া দীনভাবে থাকিতেন। ঠাকুরের সঙ্গগুণে তাঁহার ঈশ্বরানুরাগ যতই বৃদ্ধি পাইতেছিল, অপরা বিদ্যা অর্জনের আগ্রহ ততই কমিয়া যাইতে থাকে। একবার তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন (১২৯০), কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। বৈকুণ্ঠনাথের মুখে সেকথা শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন: ভালই তো, ও পাশমুক্ত হল। যার য-টা পাস, তার ত-টা পাশ। ইহার কিছুকাল পরে বাবুরাম যখন একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন তাঁহার জননীকে সঙ্গে নিয়া, ঠাকুর কহিলেন জননীকে, তোমার এই ছেলেটিকে ইখানকে দাও। শ্রীমতী মাতঙ্গিনী উত্তর দিলেন: 'বাবা, আপনার কাছে বাবুরাম থাকবে এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। এই ভিক্ষা—ভগবানে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে, আর আমাকে যেন পুত্রকন্যার শোক না পেতে হয়'। 'তাই হবে।' ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে অভয়বাণী নির্গত হইল। শ্রীমতী মাতঙ্গিনীকে ঠাকুর বিদ্যাশক্তি বলিতেন।

বন্ধনমুক্ত হইয়া বাবুরাম ইচ্ছামত ঠাকুরের কাছে থাকিবার ও আশ মিটাইয়া সেবা করিবার সুযোগ পাইলেন। স্নানের পূর্বে ঠাকুরকে তিনি তেল মাখাইয়া দিতেন, গ্রীষ্মের দিনে পাখা নিয়া হাওয়া করিতেন। রাত্রে

ঠাকুরের শয়নের পর হাওয়া করিতে করিতে যখনই তিনি ঘুমের ঘোরে ঢুলিয়া পড়িতেন ঠাকুর তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে টানিয়া নিয়া মশারির ভিতর নিজের বিছানায় শয়ন করাইতেন। ঠাকুরের ভাবাবেশের সময় তাঁহার বিকারপ্রাপ্ত অঙ্গ যথাযথভাবে সংস্থিত করিয়া দেওয়া, তাঁহাকে ধরিয়া থাকা, নাম শুনাইয়া তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা আনয়ন করা—এইগুলিই ছিল বাবুরামের মুখ্য সেবাকার্য। ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুর কখন যে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িবেন তাহার কিছু স্থিরতা ছিল না, সেইজন্য সেবককেও অবহিত থাকিতে হইত সকল সময়েই।

ঠাকুর বলিতেন: 'গোপীদের প্রেমাভক্তি; প্রেমাভক্তিতে দুটো জিনিস থাকে—অহংতা আর মমতা।' গুপ্তগোপীদেহ বাবুরামেরও ছিল প্রেমাভক্তি। মাতাঠাকুরাণী বলিয়াছেন: ঠাকুর যখন বল্লেন, আমি পরে সূক্ষ্ম শরীরে লক্ষমুখে খাব, বাবুরাম বলেছিল, তোমার লক্ষটক্ষ আমি চাই নে—আমি চাই তুমি এই মুখটিতে খাবে, আর আমি এই মুখটিই দেখব।

নিরঞ্জন

সুন্দর মুরতিখানি বালক-বয়েস।
রূপে গুণে তেজে যেন কুমারবিশেষ॥
সরলস্বভাবযুক্ত সবল গড়ন।
বিখ্যাত কায়স্থকুলে তাহার জনম॥
নির্ভয় হৃদয়ালয় বীরের আকৃতি।
বাল্যাবধি অস্ত্রে শস্ত্রে স্বভাবতঃ প্রীতি॥
নয়নরঞ্জন ঠাম প্রফুল্ল বয়ান।
শ্রবণমধুর নিত্যনিরঞ্জন নাম॥

চব্বিশ পরগণা জেলায় রাজারহাট-বিষ্ণুপুর গ্রামে ঘোষ-বংশে নিত্যনিরঞ্জনের জন্ম। লোকমুখে ঠাকুরের কথা শুনিয়া ১২৮৮ সালের শেষের দিকে যখন তিনি ঠাকুরকে দেখিতে আসেন তখন তাঁহার বয়স আনুমানিক কুড়ি বৎসর। কলিকাতায় মাতুল-বাড়ীতে থাকিয়া তিনি পড়াশুনা করিতেন, মা ছাড়া সংসারে অপর কোন বন্ধন তাঁহার ছিল না।

কলিকাতার আহিরীটোলায় এক ভূতুড়ে দলের সঙ্গে তিনি মিশিতেন; মিডিয়াম-রূপে তাঁহাকে তাহারা ব্যবহার করিত, তাঁহার উপর সহজেই ভূতের আবেশ হইত।

প্রথম মিলনের দিনেই ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, দেখ্ নিরঞ্জন, ভূত ভূত করলে তুই ভূত হয়ে যাবি, আর ভগবান ভগবান করলে ভগবানই হবি, তা কোন্‌টা হওয়া ভাল? নিরঞ্জন উত্তর দিলেন, তা হলে ভগবান হওয়াই ভাল। তিনদিন না যাইতে নিরঞ্জন আবার যখন আসিলেন দক্ষিণেশ্বরে, তাঁহাকে দেখিবামাত্র ছুটিয়া গিয়া, আলিঙ্গন করিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেনঃ ওরে নিরঞ্জন, দিন যে যায় রে, তুই ভগবানলাভ করবি কবে? দিন যে চলে যায়, ভগবানকে লাভ না করলে সবই যে বৃথা হবে। তুই কবে তাঁকে লাভ করবি বল্, কবে তাঁর পাদপদ্মে মন দিবি বল্? আমি যে তাই ভেবে আকুল!

এই অদ্ভুত অহেতুক ভালবাসা নিরঞ্জনকে অভিভূত করিল ও পরপর তিনদিন তাঁহাকে ঠাকুরের কাছে ধরিয়া রাখিল।

মাতুল আকুলপ্রাণ ছিলেন ভবনে।
নিরুদ্দেশ দিনত্রয় দেখি নিরঞ্জনে॥
হইল তাঁহার আজ্ঞা দাসদাসী-লোকে।
রেতে দিনে নিরঞ্জনে রাখে চোখে চোখে॥

... ...

ত্রস্তচিত্ত সকলেই পায় দেখিবারে।
গোলক-আকারে এক অপরূপ জ্যোতি।
বেড়িয়া থাকয়ে নিরঞ্জনে দিবারাতি॥
বুঝিতে না পারে কেহ ইহার কারণ:
ভাবে পাছে যদি হয় অশিব লক্ষণ॥
নিরঞ্জনে নিবারণ আর নাহি করে।
যথায় তথায় যায় ইচ্ছা-অনুসারে॥
একদিন শ্রীমন্দিরে প্রভু গুণমণি।
উপবিষ্ট নিকটে গোলাপঠাকুরাণী॥

সম্বোধিয়া তাঁহারে শ্রীপ্রভুদেব কন।
দেখ আমি দেখিতেছি যেন নিরঞ্জন॥
পরমসুন্দর-অঙ্গ তেজঃপুঞ্জ-তনু।
খেলিছে শিশুর সম হাতে শর-ধনু॥
বলিতে বলিতে কথা বাহ্য গেল চলে।
উদিল অপূর্ব ভাতি শ্রীমুখমণ্ডলে॥

… …

ক্রমে ক্রমে বহু পরে আইল চেতন।
এমন সময়ে দেখা দিল নিরঞ্জন॥
কুতুহলে গোলাপ-মা জিজ্ঞাসিল তায়।
নিরঞ্জন এতক্ষণ আছিলে কোথায়॥
সতত সহাস্যমুখ কহে ভক্তবর।
খেলিতেছিলাম আমি লয়ে ধনুঃশর॥

… …

ঈশ্বরকোটির ভক্ত নিত্যনিরঞ্জন।
রামের অংশেতে জন্ম, প্রভুর বচন॥

নিরঞ্জনকে ঠাকুর মন্ত্রদীক্ষা দেন। তাঁহার শক্তিপূর্ণ স্পর্শে তিনদিন নিরঞ্জনের চোখের পাতা পড়ে নাই, অবিচ্ছিন্নভাবে জ্যোতি দর্শন ও জপ চলিয়াছিল!

'নিরঞ্জন ভারি সরল', 'আমার নিরঞ্জনে অঞ্জন নাই'—এইরূপ অনেক কথা ঠাকুর বলিতেন। বৃদ্ধা জননীকে প্রতিপালন করিবার জন্য নিরঞ্জনকে কিছুকাল চাকরি করিতে হইয়াছিল; সেই সময়ে একদিন ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন: দেখ্, তোর মুখে যেন একটা কালো আবরণ পড়েচে। তুই আপিসের কাজ করিস কিনা,…সর্বদা ভাবতে হয়।…তুই মার জন্যে চাকরি স্বীকার করেচিস। মা গুরুজন, ব্রহ্মময়ীস্বরূপা। যদি মাগ-ছেলের জন্যে চাকরি করতিস তা হলে আমি বলতুম, ধিক্ ধিক্, শত ধিক্! একশ ছি! তাঁহার সম্বন্ধে অন্য একদিন ঠাকুর বলিয়াছিলেন: নিরঞ্জন কিছুতেই লিপ্ত নয়। নিজের টাকা দিয়ে গরীবদের ডাক্তারখানায় নিয়ে

যায়। বিবাহের কথায় বলে—বাপ রে, ও বিশালাক্ষীর দ! ওকে দেখি যে, একটা জ্যোতির উপর বসে রয়েচে! [কথামৃত]

ঠাকুরের ত্যাগিসংঘরূপ আকাশের এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

লাটু

যেইখানে ভক্ত রাম ভকতের খনি।
উঠিল তাহাতে এক সমুজ্জ্বল মণি॥
প্রভুভক্ত-চূড়ামণি হিন্দুস্থানী জেতে।
প্রবল অটল দাস্যভক্তিভাব চিতে॥
... ...
চিরভক্ত শ্রীপ্রভুর অনাসক্ত জনা।
দুঃখী তবু অবিদ্যায় অতিশয় ঘৃণা॥
উপরে ইক্ষুর মত কর্কশ আকার।
ভিতরে মধুর ভক্তিরসের সঞ্চার॥
খর্বাকৃতি পুষ্টকায় বীর বলবান।
সবল সকল শিরা, লাটু তাঁর নাম॥

সারণ জেলার পল্লীগ্রামে দরিদ্র এক মেষপালকের ঘরে জন্ম হয় রাখতুরামের। পাঁচ বছর বয়সে মাতাপিতা হারাইয়া তিনি নিঃসন্তান পিতৃব্যের দ্বারা প্রতিপালিত হন এবং যৌবনে পদার্পণ না করিতেই জীবিকার্জনের জন্য কলিকাতায় আসেন। পিতৃব্যের সহিত দেশের মায়া কাটাইয়া আসিতে তাঁহার কোমল প্রাণে ব্যথা বাজিয়াছিল। কলিকাতায় ভক্তবর রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে তিনি ভৃত্য নিযুক্ত হন এবং কর্তব্যনিষ্ঠা ও সচ্চরিত্র-গুণে সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। আদর করিয়া রাম ও তাঁহার গৃহিণী রাখতুরামকে 'লালটু' বলিয়া ডাকিতেন; পরে লালটুকে ঠাকুর ডাকিতেন 'লাটু' বলিয়া।

রামের মুখে লাটু ঠাকুরের কথা শুনিতে পাইতেন, শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। একদিন রামের সঙ্গে গিয়া ঠাকুরকে দর্শন করিয়াও আসিলেন, সম্ভবতঃ ১২৮৭ সালের মধ্যভাগে। লাটুর হাত দিয়া রাম অতঃপর মাঝে মাঝে

ঠাকুরকে ফলমিষ্টান্নাদি পাঠাইতে লাগিলেন। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বাড়িল ও ঠাকুরের পাদপদ্মে লাটুর মন মজিল। তিনি ঠাকুরের কাছেই থাকিয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু ঠাকুর ইহার পরেই দেশে চলিয়া যাওয়ায় তখনই তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। দেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের কয়েক মাস পরে যখন হৃদয়কে কালীবাটী হইতে চলিয়া যাইতে হইল ও উপযুক্ত সেবকের অভাবে ঠাকুরের কষ্ট হইতে লাগিল, সেই সময়ে একদিন ঠাকুর রামের নিকট হইতে ভৃত্যবেশে আগত তাঁহার চিরন্তন সেবক লাটুকে চাহিয়া নিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে তখন প্রত্যহ হরিনাম-কীর্তন হইত ঠাকুরের ঘরে। রাখাল, হরীশ, লাটু প্রভৃতি সকলে মিলিয়া কীর্তন করিতেন। কীর্তনে কখন কখন লাটুর ভাব হইত ও ভাবে তিনি হাসিতে বা কাঁদিতে থাকিতেন। লাটুর ভাব ঠিক ঠিক, ঠাকুর বলিতেন। ঠাকুরের মুখে শুনিয়া লাটু এই গানটি শিখিয়াছিলেন ও প্রায়ই গাহিতেন :

মনুয়া রে সীতারাম-ভজন কর্‌লিয়ো।
ভুখে অন্ন প্যাসে পানি লেঙ্গে বস্ত্র দিয়ো॥

মাতাঠাকুরাণী তখন দক্ষিণেশ্বরে। লাটুকে দিয়া তিনি জল আনা, ময়দা ঠাসা, বাজার করা ইত্যাদি ছোটখাট কাজ করাইতেন। তাঁহাকে কাজে সাহায্য করিবার জন্য ঠাকুরই লাটুকে বলিয়া দিয়াছিলেন।

দিনমান নানা কাজে ব্যাপৃত থাকিয়া সন্ধ্যাসমাগমে লাটু প্রায়ই ঘুমাইয়া পড়িতেন। একদিন ইহা লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, সন্ধ্যার সময়ে ঘুমুবি তো ধ্যানধারণা করবি কখন? লাটু নৈশ নিদ্রা পরিহার করিতে সংকল্প করিলেন ও ক্রমে তাহা আয়ত্ত করিয়াও নিলেন। ঠাকুরের সেবার অসুবিধা না ঘটাইয়া দিবাভাগে তিনি কয়েক ঘণ্টা ঘুমাইয়া নিতেন ও সমস্ত রাত ধ্যানধারণায় অতিবাহিত করিতেন। 'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী'—গীতার এই কথাটি আক্ষরিক অর্থে সত্য হইয়াছিল তাঁহার জীবনে।

নিরক্ষর হইয়াও লাটু যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করিয়াছিলেন চক্ষু-কর্ণের সদ্ব্যবহার করিয়া; শাস্ত্রমর্ম অধিগত হইয়াছিলেন শ্রীগুরুর সেবায় ও সাহচর্যে

থাকিয়া। মাত্র তিনবৎসরের চেষ্টায় সাধনমার্গে তিনি কতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন তাহা ঠাকুরের একটি ছোট উক্তি হইতে অনুমান করিতে পারা যায়ঃ ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'নোটো চড়েই রয়েচে, ক্রমে লীন হবার জো!' লাটু-মহারাজ—স্বামী অদ্ভুতানন্দ—মানুষ গড়ার শ্রেষ্ঠ শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি।

তারক

বিদেশে প্রভুর নাম করিয়া শ্রবণ।
জুটিলেন যুবা এক ব্রাহ্মণনন্দন॥
বাল্যাবধি ধর্মপথে আন্তরিক টান।
কৃতদার, তারক ঘোষাল তাঁর নাম॥
জনক তাঁহার শ্রীপ্রভুর পরিচিত।
শ্যামাভক্ত দ্বিজবর ভকত পণ্ডিত॥
বৈরাগ্য প্রবল বড় তারকের মনে।
দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় প্রভুর সদনে॥

উন্নত শক্তিসাধক রামকানাই ঘোষাল বারাসতে মোক্তারী করিয়া স্বোপার্জিত অর্থে বহু ছাত্রের ভরণপোষণ করিতেন। তাঁহার সহধর্মিণী সেই ছাত্রদের জন্য স্বহস্তে অন্নপাক করিতেন ও স্বহস্তে তাহাদিগকে পরিবেষণ করিয়া খাওয়াইতেন। তারকনাথ এই মহাপ্রাণ মাতাপিতার সন্তানরূপে আগমন করিয়াছিলেন সংসারে। ৺তারকনাথের বরলব্ধ সন্তান বলিয়া তাঁহারও নাম রাখা হইয়াছিল তারকনাথ।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে যাতায়াত করিয়া রামকানাই ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হন। তাঁহার পরামর্শে গাত্রদাহের শান্তির জন্য ঠাকুর ইষ্টকবচ ধারণ করিয়াছিলেন। ইহা ঠিক কোন্ সময়ের ঘটনা, জানা যায় না।

নয় বছর বয়সে তারকের মাতৃবিয়োগ হয়। প্রবেশিকা-শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতে সহসা তিনি তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া পড়েন এবং এইখানেই তাঁহার পড়াশুনার ইতি হইয়া যায়। স্বাবলম্বী হইবার জন্য রেলওয়েতে চাকরি লইয়া তিনি গাজিয়াবাদ, মোগলসরাই প্রভৃতি স্থানে কয়েক বৎসর বাস করেন। তারপরে দেশে ফিরিয়া বিবাহ করেন, এবং ম্যাকিনন

ম্যাকেঞ্জির আপিসে চাকরি লইয়া কলিকাতায় বসবাস ও ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে থাকেন। ঠাকুরের কথা তিনি আগেই শুনিয়াছিলেন, এইবার তাঁহাকে দর্শন করিতে অভিলাষী হন ও সম্ভবতঃ ১২৮৮ সালের মাঝামাঝি কোন সময়ে ভক্তবর রামের বাড়ীতে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তারকের বয়স তখন ছাব্বিশ বৎসর হইবে। ঠাকুর সেদিন সমাধিতত্ত্বের কথা বলিতেছিলেন, এই সমাধিতত্ত্ব জানিবার জন্য তারকের মন এক সময়ে উতলা হইয়াছিল।

পরবর্তী এক শনিবার তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেন আপিসের ছুটির পরে; কৈশোরে মাতৃহারা তারকের ঠাকুরকেই মা বলিয়া মনে হইতে থাকে; তিনি ঠাকুরের ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করেন ও ঠাকুর সস্নেহে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দেন। তৃতীয়বার যেদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেন, তাঁহার বুকে পা দিয়া ঠাকুর তাঁহাকে সমাধিস্থ করেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া তারক দেখিলেন ঠাকুর তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতেছেন, 'মা, নেমে এস, নেমে এস।'

তারক মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিবাস করিতে লাগিলেন। একদিন ঠাকুর অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহার জিহ্বায় কিছু লিখিয়া দিলে তিনি দ্বিতীয়বার সমাধিস্থ হন। ঈশ্বরের নিরাকার ভাবের সাধক তারকনাথ নিরাকারের ভিতর দিয়া সাকারে আসিয়াছিলেন।

সংসার তাঁহাকে বেশী দিন ধরিয়া রাখিতে পারে নাই; কিছুকাল পরে স্ত্রীবিয়োগ হইলে তিনি সর্ববন্ধবিনির্মুক্ত হন। শিবাংশসম্ভূত এই মহাপুরুষ—স্বামী শিবানন্দ—উত্তরকালে 'মহাপুরুষ' নামেই অভিহিত হইতেন।

শশী ও শরৎ

নবীন বালক এক সুন্দর গড়ন।
অঙ্গময় কান্তি মাখা চম্পকবরণ॥
বয়স বিশের মধ্যে আর নয় বেশী।
সেবাভক্তিপ্রিয় তেঁহ কুমার-সন্ন্যাসী॥

ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম শশী নাম তাঁর।
শুদ্ধসত্ত্ব দিব্যভাবে পূর্ণিত আধার॥
... ...
সুন্দর যেমন শশী শরৎ তেমতি।
বাল্যাবধি দুইজনে বড়ই পিরীতি॥
উভয়েই লালিত পালিত এক ঠাঁই।
পরস্পর খুল্লতাত জ্যেষ্ঠতাত ভাই॥
শরৎ সুধীর শান্ত গম্ভীর-চেহারা।
যোগী-ঋষি-তপস্বীর বালকের পারা॥

'শশী আর শরৎকে দেখেছিলুম, ঋষিকৃষ্ণের (যীশুখ্রীষ্টের) দলে ছিল।' ঠাকুর বলিয়াছেন।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী ময়াল-ইছাপুর গ্রামে পিত্রালয়ে শশিভূষণের জন্ম। তাঁহার পিতা ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী একজন বিশিষ্ট শক্তিসাধক ছিলেন; এইরূপ কথিত আছে যে, কালীঘাটে এক গভীর রাত্রে মা-কালী তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন বালিকাবেশে। শরচ্চন্দ্রের জন্ম হয় কলিকাতায়। তাঁহার পিতা গিরীশচন্দ্র স্বোপার্জিত অর্থে কলিকাতার চাঁপাতলায় এক বৃহৎ বাড়ী নির্মাণ করিয়াছিলেন। গিরীশচন্দ্র ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের জেঠতুতো ভাই ও তাঁহার অপেক্ষা বয়সে বড়; কিন্তু শশিভূষণ ছিলেন শরতের জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

শশী ও শরৎ উভয়েই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কলিকাতায় জ্যেষ্ঠতাতের বাড়ীতে থাকিয়া শশী পড়াশুনা করিতেন ও প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া জলপানি পাইয়াছিলেন।

শশী, শরৎ ও তাঁহাদের বন্ধুরা মিলিয়া ব্রাহ্মসমাজের অনুকরণে পাড়ায় একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সমিতির অবশ্যকরণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে ছিল—সৎচর্চা, সদ্‌গ্রন্থের আলোচনা, সত্যভাষণ, শারীরিক ব্যায়াম ও রোগীর সেবা। এই সমিতির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া তাঁহারা ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন। শশীর সহপাঠী কালীপ্রসাদ চক্রবর্তীও সেইদিন তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। ১২৯০ সালের কার্তিক মাস,

শরতের বয়স তখন প্রায় আঠার বৎসর এবং শশীর কিঞ্চিদধিক কুড়ি বৎসর।

প্রথম দর্শনেই ঠাকুর শরৎ ও শশীকে তাঁহার অন্তরঙ্গ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া লৌকিক ভাবে তাঁহাদের পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং দুইজনেই কেশবের সমাজে যাওয়া আসা করেন শুনিয়া প্রীত হইয়া কহিলেন, বেশ, বেশ! তারপর দুইজনকেই শীঘ্রই আবার একদিন তাঁহার কাছে একা একা আসিতে বলিয়া দিলেন। ইহার ফল হইল এই যে, দুইজনেই তাঁহার কাছে যাইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু পরস্পরের অগোচরে।

প্রথম দর্শনের দিনই ঠাকুর শশীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তোমার সাকারে বিশ্বাস, না নিরাকারে? শশী বলিয়াছিলেন, ঈশ্বর আছেন কি না তাই যখন জানি না তখন কী করে একথার জবাব দেব! এই সরল উত্তরে ঠাকুর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

কালীবাড়ীতে বসিয়া শশী একদিন ফার্সী ভাষা অধ্যয়ন করিতেছিলেন। সুফী কবিদের মূল রচনাবলী পড়িতে তাঁহার আগ্রহ হইয়াছিল, নরেন্দ্রনাথ সুফী কাব্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। অধ্যয়নে তিনি এতই অভিনিবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনবার নাম ধরিয়া ডাকিয়াও ঠাকুর তাঁহার সাড়া পান নাই। তাঁহার এই বাহ্যবিস্মৃতির কারণ অবগত হইয়া ঠাকুর তাঁহাকে অপরা বিদ্যা অর্জনে নিরুৎসাহিত করিয়াছিলেন—জীবনের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত করিয়া ইহা তাঁহার ভক্তির হানি ঘটাইবে বলিয়াছিলেন। শশীর ফার্সী শিক্ষার বাসনা তৎক্ষণাৎ পরিত্যক্ত হইল, ফার্সী বইগুলিও গঙ্গাগর্ভে বিসর্জিত হইল।

একদিন যখন শশী ঠাকুরের ঘরের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন, ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন: দেখ্, তুই যাকে খুঁজছিস, (নিজের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া) সে এই—সে এই—সে এই! মেঘে বিদ্যুৎস্ফুরণের মত ঠাকুরের মধ্যে শশীর ইষ্টরূপ পলকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টের সহিত তাঁহার পূর্ব সম্বন্ধের স্মৃতিও উদ্বোধিত হইয়া চিত্তে স্থায়ী

রেখাপাত করিল। সেইদিন হইতে তিনি শ্রীগুরুর সেবাকেই জীবনের একমাত্র কাম্য ও পরমশ্রেয়ঃ বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

গরমের দিনে ঠাকুর বরফ খাইতে ভালবাসিতেন। একদিন দ্বিপ্রহরে একখণ্ড বরফ চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া শশী কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। প্রচণ্ড তাপে তাঁহার সারা দেহ লাল হইয়া গিয়াছিল এবং উত্তপ্ত রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া আসাতে পায়েও ফোস্কা পড়িয়াছিল, কিন্তু নিজের শরীরের উপর তাঁহার মন ছিল না। বরফখণ্ড পাইয়া ঠাকুর বালকের মত আনন্দিত হইলেন ও মুখে দুইবার শুধু 'আহা!' উচ্চারণ করিয়া শশীর গাত্রজ্বালার উপশম করিলেন।

দাস্যভক্তির মূর্তবিগ্রহ শশী-মহারাজ—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—ঠাকুরের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া নিজে ধন্য হইয়াছিলেন এবং অপরকেও ধন্য হইবার পথ দেখাইয়াছিলেন।

সেবাভক্তি শ্রীপ্রভুর যাহার কামনা।
সে পাবে যদ্যপি করে শশীর সাধনা॥

প্রথম দর্শনের দিন হইতেই শরচ্চন্দ্র "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারা বিশেষরূপে আকৃষ্ট হন—কেন, কি কারণে, এবং উহা কতদূর গড়াইবে, সেকথা অবশ্য কিছুই অনুভব করিতে পারেন নাই; কিন্তু 'ইনি বেশ লোক, যথার্থ সাধুভক্ত এবং ইঁহার নিকট পুনরায় সময় পাইলেই আসিব'—এইরূপভাবে কেমন একটা অব্যক্ত টানের উদয় হইয়াছিল।"

প্রথম দর্শনের দিনই ঠাকুর শরচ্চন্দ্র সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, ছেলেটির দেখছি তীব্র বৈরাগ্য। পরে অন্যান্য ভক্তদের কাছেও বলিয়াছেন, শরতের সংসারে কোন অভাব নাই, তবু ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুল!

শরৎ তখন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে এফ্‌-এ ক্লাশে পড়িতেন। বৃহস্পতিবার সেই কলেজে ছুটির দিন; তিনি সংকল্প করিলেন, প্রতিবন্ধক না ঘটিলে প্রত্যেক বৃহস্পতিবারই তিনি ঠাকুরের কাছে যাইবেন, আর সেইরূপ করিতেও লাগিলেন। ক্রমশঃ তিনি ঠাকুরের অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গেও পরিচিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পরিচয় ক্রমে

ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল এবং একটা গভীর প্রীতির সম্পর্কে পরস্পর আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। উহা জানিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, গিন্নী জানে, কোন্ হাঁড়ির মুখে কোন্ সরা রাখতে হয়।

একদিন ঠাকুর হাত চাপড়ে একটি ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিয়া শুনাইয়া শরৎকে বলিয়াছিলেন, এর মধ্যেকার যে কোন একটি ভাব আয়ত্ত করলেই তোমার সব হবে। গানটি এই—

নাথ, তুমি সর্বস্ব আমার, প্রাণাধার সারাৎসার।
নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে বলিবার আপনার॥

বাল্যকাল হইতেই স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া শরৎ দীনদুঃখীর সেবা করিতেন। তাঁহার ছোটখাট সেবা গ্রহণ করিয়া ঠাকুরও তাঁহাকে কৃতার্থ করিতেন। শরৎ অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতি ছিলেন, ঠাকুরের আদিষ্ট কাজগুলি তিনি করিতেন অতি সন্তর্পণে, মৃদু হস্তপদ-সঞ্চালনে। রঙ্গপ্রিয় ঠাকুর উহা হুবহু নকল করিয়া তাঁহাকে ও উপস্থিত সকলকে হাসাইতেন।

মধ্যে মধ্যে ঠাকুর তাঁহাকে ভিক্ষা করিতে পাঠাইতেন; তাঁহার রান্না করা ভিক্ষান্নের অগ্রভাগ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিতেন। কখনো বা তাঁহাকে গান গাহিতে বলিতেন, আর তাঁহার গান শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। মাঝে মাঝে ছোট খাটটিতে বসিয়া ঠাকুর নিজের দিব্যোন্মাদ ও সাধনের কথা, দর্শন ও উপলব্ধির কথা, দেহতত্ত্ব ও কুলকুণ্ডলিনীর কথা অনর্গল বলিয়া যাইতেন, আর মেজেতে পাতা মাদুরের উপর বসিয়া শরৎ একচিত্তে শ্রবণ করিতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গের পাঁচটি খণ্ড সেই শ্রবণকীর্তনরূপ সুধাফলের সঞ্জীবন রসে সিক্ত হইয়া আছে।

একদা ঠাকুর নিভৃতে শরৎকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার কোন্ ভাব ভাল লাগে। শরৎ কহিলেন, গণেশের ভাব। গণেশ জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য; স্ত্রীমূর্তি জীবসমূহ স্বীয় জননীর অংশে এবং পুংমূর্তি জীবসমূহ পিতার অংশে জন্মিয়াছে শুনিয়া গণেশ আর বিবাহ করেন নাই। 'শিবশক্ত্যাত্মকং জগৎ'—এই জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া চিরকাল ব্রহ্মচারীই

থাকিয়া যান। শরতের উত্তর শুনিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন : না, গণেশের ভাব তোমার নয়, তোমার শিবের ভাব। শক্তি তোমার ইষ্ট। তোমার ইষ্ট—তোমার শক্তিসামর্থ্য যা কিছু সব (নিজের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া) এইখানে।

শ্রীশ্রীসারদামাতা বলিতেন, 'শরৎ আর যোগীন, এ দুটি আমার অন্তরঙ্গ।' দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুরের অধিকাংশ ভক্তেরাই মাকে একদিনও চাক্ষুষ দর্শন করিতে পান নাই। মায়ের অন্তরঙ্গ সেবকদ্বয় কিন্তু দুর্লভ এই সৌভাগ্য হইতে একেবারে বঞ্চিত ছিলেন না। গভীর নিশীথে পঞ্চবটীর দিকে যাইবার কালে যোগীন্দ্র নহবতের বারান্দায় সমাধিমগ্না মায়ের মুক্তকেশী রূপ দর্শন করিয়াছিলেন। আর শরৎ দেখিয়াছিলেন অন্নপূর্ণামূর্তি—মা অন্নথালা হাতে করিয়া ঠাকুরকে খাওয়াইতে আসিয়াছেন, তাঁহার সিঁথায় সিন্দূর ও পরিধানে কস্তাপেড়ে লাল শাড়ী। মাকে তিনি এই অন্নপূর্ণারূপেই চিন্তা করিতেন।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে শরৎ একদিন ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া আছেন, এমন সময় ঠাকুর আপন মনে পাদচারণ করিতে করিতে হঠাৎ আসিয়া তাঁহার ক্রোড়ে উপবিষ্ট হন। ভক্তেরা তাঁহার ঐরূপ আচরণের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, দেখলুম, ও কতটা ভার সইতে পারবে।

শরচ্চন্দ্ররূপী এই শক্তিধর পুরুষের—স্বামীসারদানন্দের—দীর্ঘকালব্যাপী, দুর্বহ ও বহুবিচিত্র ভার-বহনের কাহিনী আজও বহুলাংশে অনুক্ত রহিয়া গিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের ইতিহাসে।

বুড়োগোপাল

কেশব সেনের সহিত ঠাকুরের মিলনের কিছুকাল পরে সিঁতি-নিবাসী কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ পাল ঠাকুরকে দর্শন করেন। গোপালচন্দ্র ঘোষ তাঁহার বন্ধু ছিলেন। প্রৌঢ়বয়সে গোপালের পত্নীবিয়োগ হয় ও সেই শোকে তিনি একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়েন। শোকার্ত গোপালকে

মহেন্দ্রনাথই ঠাকুরের কাছে লইয়া গিয়াছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। মহেন্দ্রনাথ ছিলেন—

শ্রীপ্রভুর কবিরাজ মহাভাগ্যবান।
... ...
ব্যবসা চিকিৎসা কিন্তু সরলহৃদয়।
তাঁহার ঔষধে বড় প্রভুর প্রত্যয়॥
... ...
ঠাকুরের গুণগাথা শ্রবণ-কীর্তনে।
মত্ততর কবিরাজ রহে রেতেদিনে॥
যেখানে যাহারে দেখে আত্ম কিবা পর:
যত্নে আনে যেথা প্রভু রাজরাজেশ্বর॥

গোপাল ঠিক কোন্ সময়ে ঠাকুরের কাছে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার বয়সই বা ছিল কত, জানা যায় না। ঠাকুরের অপেক্ষা তিনি বয়সে অনেক বড় ছিলেন বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে 'মুরুব্বি' সম্বোধন করিতেন; আর সাধারণতঃ 'বুড়োগোপাল' নামে পরিচিত হইলেও ভক্তেরা অনেকেই তাঁহাকে গোপালদাদা বলিতেন। "রহস্যপ্রিয় নরেন্দ্রনাথ কহিতেন, আশ্চর্যময় ঠাকুরের আশ্চর্য কাণ্ড, তাই বাপের বয়সী বুড়াকেও শিষ্য করেছেন!" [লীলামৃত]

চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত জগদ্দল গ্রামে গোপাল জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতা গোবর্ধন ঘোষ ছিলেন জাতিতে সদ্‌গোপ। সিঁতির ব্রাহ্মভক্ত বেণীমাধব পালের চীনাবাজারের দোকানে গোপাল কাজ করিতেন ও কাজের সুবিধার জন্য সিঁতিতেই অবস্থান করিতেন। বেণী পালের বাড়ীতে উৎসবের ভিড়ের মধ্যে পূর্বে তিনি একবার ঠাকুরকে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সে দেখা চোখের দেখামাত্র।

বাবুরাম-মহারাজ বলিয়াছিলেন: বুড়োগোপালদা বলত, ঠাকুরের কাছে প্রথমবার গিয়ে কোন কিছুই বুঝতে পারলুম না, কেন লোকে এঁকে মহাপুরুষ বলে। দ্বিতীয়বারও তাই হল। আর যাবে না ঠিক করলে। শেষে এক বন্ধুর [কবিরাজের] অনুরোধে যখন তৃতীয়বার গেল তখন

ঠাকুর তাকে ধরলেন। আর যাবি কোথায়? গোপালদা বলত, তারপর থেকে দিনরাত কেবল ঠাকুরের কথা মনে হত, বুকের মধ্যে যেন সর্বদাই কী একটা ব্যথা, চেষ্টা করেও ঠাকুরের মুখ ভুলতে পারতুম না।

সর্বদা ঠাকুরের চিন্তার ফলে গোপালদার হৃদয় হইতে বিষয়ভোগজনিত মালিন্য ধুইয়া মুছিয়া যাইতে লাগিল। ঠাকুরের কথামত প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে বিষ্ণুমন্দিরে বসিয়া তিনি কীর্তন করিতেন। সংসারসম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া—গোপালদা ঠাকুরের কাছেই অনেক কাল কাটাইতে লাগিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে শ্রীশ্রীমার কাছে লইয়া গিয়া পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন; তিনি মাতাঠাকুরাণীর ফাইফরমাশ খাটিতেন।

আজীবন স্বাবলম্বী গোপালদা-মহারাজের—স্বামী অদ্বৈতানন্দের—সেবা-কর্মময় ও সুব্যবস্থিত জীবন ভক্তজনের অনুকরণীয়।

গঙ্গাধর

১২৯০।৯১ সালে গঙ্গাধর যখন ঠাকুরের কাছে যান দক্ষিণেশ্বরে, তখন তাঁহার বয়স ১৯।২০ বৎসর। ইহার ছয়সাত বৎসর পূর্বেও একবার তিনি ঠাকুরকে দেখিয়াছিলেন বাগবাজারে, দীননাথ বসুর বাড়ীতে।

গঙ্গাধরের পিতা শ্রীমন্ত ঘটক কলিকাতার আহিরীটোলা পল্লীতে থাকিয়া কুলাচার্যের কাজ করিতেন ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন।

গঙ্গাধর-মহারাজ—স্বামী অখণ্ডানন্দ—নিজের 'স্মৃতিকথা' রাখিয়া গিয়াছেন, উহার কিয়দংশ এইরূপ:

"ঠাকুরের কাছে যেদিন আমি প্রথম যাই সেদিন তিনি হাসতে হাসতে আমাকে বড় যত্ন করে নিজের কাছে বসালেন।...জিজ্ঞাসা করলেন, তুই আমাকে আগে দেখেছিলি?...তাঁর কথায় সে রাত্রির দক্ষিণেশ্বরেই থাকি। ...তখন গোপালদাদা তাঁর কাছে থাকতেন।

"...আবার একদিন শনিবারে তাঁর কাছে গেলে তিনি আর সেদিন আমাকে ফিরতে দিলেন না। সন্ধ্যার পর আরতি হয়ে গেলে তিনি একেবারে উলঙ্গ হয়ে পশ্চিম দিকের বারান্দায় আমাকে একখানা মাদুর

দিয়ে বল্লেন, পাত।...আমার কোমরের কাপড়ের বাঁধ খুলে দিতে বল্লেন। বল্লেন, মার কাছে যেন ছেলে। তারপরে আমাকে সুখাসনে বসিয়ে ধ্যান করালেন। বল্লেন, একেবারে ঝুঁকে বসতে নাই, আবার এমনি (টান) হয়েও বসতে নাই; বাড়া ভাত পেলে তুই যেমন করেই খা, পেট ভরবে।...তারপর শুয়ে পড়লেন এবং আমার কোলে পা রেখে পা টিপে দিতে বল্লেন। তখন একটু একটু কুস্তি করি। আমি একটু জোরে টিপতেই বল্লেন, ওরে, করিস কী, করিস কী? ছিঁড়ে যাবে যে। এমনি করে, আস্তে আস্তে। তখন দেখি শরীর কী নরম, যেন হাড়ের উপর মাখন দেওয়া রয়েচে!...

"আমি তখন প্রত্যহ একবার মালসা পুড়িয়ে স্বপাক হবিষ্যি করতাম। ...পাছে কালীবাড়ীতে খেতে হয় এই ভয়ে...সকালেই আমি কালীবাড়ী থেকে চলে আসতাম। তখন আমি প্রত্যহ চারবার গঙ্গাস্নান করি বিনা তেলে, মাথার চুল বড় উস্কখুস্ক এবং হরীতকী ছিল আমার মুখশুদ্ধি। মুখশুদ্ধিটা কিছু বাড়াবাড়ি রকমের ছিল। একদিন ঠাকুর আমাকে বল্লেন, তুই ছেলে মানুষ, তোর অত বুড়োপনা কেন? অতটা ভাল নয়।

"...আমি খুব প্রাণায়াম করতাম।...প্রাণায়াম বাড়াতে বাড়াতে আমার এমন অবস্থা হয়েছিল যে, স্বেদ ও কম্প হত।...তিনি প্রাণায়াম করতে নিষেধ করেন।...বল্লেন, রোজ গায়ত্রীজপ করবি।...

"একটা একাদশীর দিনে কলকাতা থেকে...ঠাকুরের জন্যে একটি তরমুজ নিয়ে ঠিক দুপুরের পর তাঁর কাছে হাজির হই।...তরমুজটি দিয়ে প্রণাম করতেই তিনি ভারি খুশী, বল্লেন, আজ তুই আবার এখনি যাবি নাকি? আমি বল্লাম, আজ্ঞে না।...[পরদিন দুপুরে] ভোগারতির পর তিনি আমাকে নিয়ে তার ঘরের পূর্বদিকে বারান্দায়...এসে বলচেন, যা, গঙ্গাজলে পাক, মা কালীর প্রসাদ—মহাহবিষ্যি; যা খেগে যা।... কালীঘরে গিয়ে আমি নিরামিষ প্রসাদই খেয়েছিলাম।...খেয়ে ফিরে এসে দেখি ঠাকুর আমার জন্যে একটি পানের খিলি হাতে করে...দাঁড়িয়ে আছেন।...বল্লেন, খা, খাওয়ার পরে দুটো একটা খেতে হয়, নইলে মুখে

গন্ধ হয়।…নরেন একশটা পান খায়, যা পায় তাই খায়"; এত বড় বড় চোখ—ভিতর দিকে টান, কলকাতার রাস্তা দিয়ে যায় আর বাড়ী ঘরদোর, ঘোড়া গাড়ী সব নারায়ণময় দেখে। তুই তার কাছে যাস—সিমলেয় বাড়ী।…

"[একদিন বিকালে] তিনি তাঁর বিছানায় বসে তাঁর সেই মধুরকণ্ঠে গোবিন্দ অধিকারীর 'বৃন্দাবনবিলাসিনী রাই আমাদের—রাই আমাদের, আমরা রাই-এর'—এই কীর্তন করচেন। কীর্তনটি রঙ্গে ভঙ্গে সম্পূর্ণ করতে করতে অজস্র অশ্রুধারায় তাঁর বক্ষ প্লাবিত হল এবং তিনি সমাধিমগ্ন হয়ে গেলেন।…এ জীবনে তেমন অদ্ভুত ব্যাপার আর দেখি নি। ঐ কীর্তন কত রকমেই গাইলেন! সমস্ত বিকালটা কীর্তনেই কেটে গেল!…

"একদিন সকালে আমাকে কালীঘরে নিয়ে গেলেন।…মন্দিরের ভিতর নিয়ে গিয়ে বলচেন, এই দেখ চৈতন্যময় শিব। আমার মনে হল যেন চৈতন্যময়, নিশ্বাস ফেলচেন! ঠাকুর বলচেন, দেখ দেখ এই চৈতন্যময় শিব কী করে শুয়ে আছেন! আমি তো স্তম্ভিত। আমার ঠিক বোধ হল যেন সত্যই চৈতন্যময় শিবই শুয়ে আছেন!…সে যে কী আনন্দ ঠাকুর প্রাণে চালিয়ে দিলেন তা মুখে আর কী বলব, অনুভূতিরই বিষয়।

"তারপর ঠাকুর…মার কাপড় একটু টেনে দিলেন, পাঁইজর একটু সরিয়ে দিলেন, বাউটি একটু নেড়ে দিলেন। ফিরে আসবার সময় একেবারে উলঙ্গ। পাঁচসাত বোতল মদ খেলে যেমন হয় তেমনি উন্মত্ত! বহু কষ্টে তাঁকে ঘরে আনবার পর অনেকক্ষণ সমাধিস্থ হয়ে রইলেন। সেদিনকার কথা আর কী বলব, আমাকে যে কী দেখালেন ঠাকুর, এই ভাবতে ভাবতে দিনটা যে কোন্ দিক দিয়ে গেল তা জানতেও পারলাম না।…

"দক্ষিণেশ্বরে অভেদানন্দের সঙ্গে আমার খুব আলাপ হয়। স্কুল পালিয়ে যেতেন। গলায় কোঁচার খুঁট, খুব সরল, কাজকর্ম খুব পরিষ্কার। ঠাকুর ভালবাসতেন।…

"দক্ষিণেশ্বরে কোন কোন দিন ঠাকুর রামলালদাদাকে ডেকে একখানি গান গাইতে বলতেন, সেই গানটি রামলালদাদার মুখে শুনতে তিনি ভালবাসতেন। গানটি এই—'প্রসীদ গুণময়ি প্রপন্নে।' ইত্যাদি।

"…ঠাকুরের অবস্থা সেদিন মুহুর্মুহু অন্তর্মুখী। বাহ্যজ্ঞান হতেই…বল্লেন, 'যার যে ইষ্ট, তার সেই আত্মা। ইষ্ট আর আত্মা অভেদ। ইষ্টসাক্ষাৎকার হলেই আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান হলেই ইষ্টসাক্ষাৎকার।'…

"আর একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছি। ঠাকুরের ঘরের উত্তরদিকের যে বারান্দা তা ঘেরা ছিল এবং তাতে পূর্বপশ্চিমে ত্নখানা তক্তাপোশ ছিল। সেই রাত্রে আমি পূর্বদিকের তক্তাপোশে, আর পশ্চিমে হরীশ। আন্দাজ দেড়ঘণ্টা রাত থাকতে ঠাকুর প্রণবধ্বনি করতে করতে সমাধিস্থ। আর এদিকে হরীশের সুমধুর দুর্গানাম, অজপার ন্যায়—'দুর্গা দুর্গা, শিব শিব দুর্গা, শিব শিব দুর্গা, শিব শিব দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, শিব শিব দুর্গা, শিব শিব দুর্গা!' সেই শুভ মুহূর্তে ঠাকুরের ঘর, আকাশ, বাতাস—সব যেন সমাধিস্থ! ভগবান তখন অন্তরে বাইরে হস্তামলকবৎ বলে মনে হল!"

কালীপ্রসাদ

যোগশিক্ষা করিবার মানসে, ১২৯০ সালের শেষভাগে কোন সময়ে, কালীপ্রসাদ যখন দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন তখন তাঁহার বয়স কিঞ্চিদধিক সতর বৎসর মাত্র। সহপাঠী যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্যের কাছে তিনি ঠাকুরের কথা শুনিয়াছিলেন।

এক অদ্ভুত জ্ঞানার্জন-স্পৃহা দ্বারা পরিচালিত হইয়া, কৈশোর অতিক্রম না করিতেই, কালীপ্রসাদ ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি এমনই প্রতিভাধর ছিলেন যে, দুই বছরের পড়া এক বছরে সম্পূর্ণ করিয়া ডবল প্রমোশন পাইতেন। পাতঞ্জল-যোগসূত্র পাঠ করিয়া শুভসংস্কারবশতঃ তিনি যোগ-সাধনা করিবার জন্য নিজের মধ্যে প্রবল প্রেরণা অনুভব করিতেছিলেন।

উত্তর কলিকাতার নিমু গোস্বামী লেনের অধিবাসী রসিকলাল চন্দ্র ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ও 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারী' নামক উচ্চ বিদ্যালয়ের

খ্যাতিমান শিক্ষক ছিলেন। কালীপ্রসাদ তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহের সন্তান। ধর্মশীলা 'নয়নতারা' বংশের মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র কামনা করিয়াছিলেন কালীঘাটে মা-কালীর নিকটে।

এক শুভ সকালে রওনা হইয়া কালীপ্রসাদ যখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আসিয়া পৌছিলেন তখন দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে। না জানিয়া তিনি অনেকদূর চলিয়া গিয়াছিলেন দক্ষিণেশ্বর পশ্চাতে ফেলিয়া। আসিয়াই শুনিলেন ঠাকুর কলিকাতায় গিয়াছেন। ক্লান্তদেহে নৈরাশ্য-পীড়িতহৃদয়ে তিনি ঠাকুরের ঘরের উত্তরদিকের বারান্দায় গিয়া বসিলেন, এমন সময়ে ঠাকুরের যুবক-ভক্ত শশীর সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। মন্দিরে প্রসাদ পাইয়া ঠাকুরের প্রসঙ্গ করিতে করিতে সময়টা তাঁহারা ভালভাবেই কাটাইলেন।

রাত্রি নয়টায় ঠাকুর কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলে কালীপ্রসাদ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, আমি যোগসাধনা করব, আপনি আমাকে শিক্ষা দেবেন কি? ঠাকুর উত্তর দিলেন: হাঁ, তোমাকে শিখাব। আর জন্মে তুমি যোগী ছিলে, সিদ্ধিলাভের একটু বাকি ছিল, এই তোমার শেষ জন্ম ব্রাহ্মমুহূর্তে কালীপ্রসাদকে উত্তর দিকের বারান্দায় লইয়া গিয়া ঠাকুর তাঁহাকে যোগাসনে বসাইলেন এবং ডান হাতের মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা মন্ত্রবিশেষ তাঁহার জিহ্বায় লিখিয়া হস্ত দ্বারা তাঁহার বক্ষ স্পর্শ করিলেন। অমনি কালীপ্রসাদ গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন। কিছুক্ষণ পরে, পুনরায় করস্পর্শ দ্বারা তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিয়া, সাধনাঙ্গ উপদেশ দিয়া ও মিষ্টিমুখ করাইয়া, ঠাকুর কহিলেন, আবার এসো, যদি পয়সার জোগাড় না হয় এখান থেকে দেওয়া হবে।

লীলাপ্রসঙ্গকার লিখিয়াছেন: "আমাদের একটি বন্ধু (কালীপ্রসাদ)··· ধ্যানাদি করিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রথম প্রথম ধ্যানের সময় ইষ্টমূর্তির নানাভাবে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। যেমন যেমন দেখিতেন, কয়েকদিন অন্তর দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উহা ঠাকুরকে জানাইতেন। ঠাকুরও শুনিয়া বলিতেন, 'বেশ হইয়াছে', অথবা 'এইরূপ করিস' ইত্যাদি। পরে একদিন

ঐ বন্ধুটি ধ্যানের সময় দেখিলেন, যতপ্রকার দেবদেবীর মূর্তি একটি মূর্তির অঙ্গে মিলিত হইয়া গেল। ...ঠাকুর বলিলেন, যা, তোর বৈকুণ্ঠদর্শন হয়ে গেল, ইহার পর আর দর্শন হবে না। আমাদের বন্ধু বলেন, বাস্তবিকও তাহাই হইল—ধ্যান করিতে করিতে কোন মূর্তিই আর দেখিতে পাইতাম না, শ্রীভগবানের সর্বব্যাপিত্বাদি অন্যপ্রকারের উচ্চ ভাবসমূহ আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া বসিত।"

উচ্চ:শ্রেণীর সাধক এই কালীপ্রসাদই পরে 'স্বামী অভেদানন্দ' নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

হরিনাথ

সম্ভবতঃ ১২৮৪ সালের কোন সময়ে হরিনাথ ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন বাগবাজারে দীননাথ বসুর বাড়ীতে। দীননাথ বসুর বাড়ীতে ঠাকুর দুইবার শুভাগমন করিয়াছিলেন। হরিনাথের বয়স তখন প্রায় চৌদ্দ বছর হইবে। ঠাকুরের জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডল দেখিয়া হরিনাথের তাঁহাকে পুরাণে বর্ণিত শুকদেবের মত একজন বলিয়া মনে হইয়াছিল। এই ঘটনার প্রায় তিন বৎসর পরে তিনি ঠাকুরের কাছে যান দক্ষিণেশ্বরে।

বাগবাজার-বসুপাড়ার চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ধর্মনিষ্ঠ ও তেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন; হরিনাথ তাঁহার তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্র। তিন বৎসর বয়সে মাতৃহারা হইয়া—পাগলা শিয়ালের আক্রমণ হইতে শিশু ছেলেকে বাঁচাইতে গিয়া জননী নিজে দংশিতা হইয়াছিলেন—তিনি বড় বৌদির দ্বারা প্রতিপালিত হন। পিতাকেও তিনি হারাইয়াছিলেন কৈশোরে দ্বাদশ বৎসর বয়সে।

প্রাক্তন সংস্কারের এমনই প্রভাব যে, মা ও এক মাতৃস্থানীয়ার আত্ম-বিসর্জনে ও যত্নে সংবর্ধিত হইয়াও কঠোর ব্রহ্মচারী হরিনাথ নারীজাতিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। 'আমি তাদের হাওয়া সইতে পারি না!' চরম বিদ্বেষের পরিচায়ক এই উক্তিটি একদা তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন তিরস্কার করিয়া: তুই বোকার মত বলচিস। মেয়েরা জগন্মাতার প্রতিরূপ, মায়ের মত তাদের দেখবি। তাদের যত ঘৃণা করবি ততই তাদের খপ্পরে পড়বি।

এইরূপ একটা সাময়িক মনোভাব সত্ত্বেও কিন্তু হরিনাথ স্বভাবে স্নেহপরায়ণ ছিলেন। দাদাদের ও খুড়তুতো ভাইদের তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহাদিগকে একদিন ছাড়িয়া যাইতেই হইবে, একথা ভাবিতেই কান্নায় ফাটিয়া পড়িতেন। যতদিন তাঁহার বড় বৌদি জীবিতা ছিলেন ততদিন পর্যন্ত তাঁহার ভাবনা তিনি ভাবিয়াছেন, সন্ন্যাসী হইয়াও।

সন্ন্যাসের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া হরিনাথ নিষ্ঠার সহিত ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করিতেন এবং এই ব্রতেরই অঙ্গস্বরূপ দিনে তিনবার গঙ্গাস্নান, স্বপাকে হবিষ্যান্নভোজন, কঠিন শয্যায় শয়ন, ব্যায়ামচর্চা ও স্বাধ্যায় করিতেন। এইসকল কাজে তাঁহার জুড়ি ছিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতেন তাঁহার প্রতিবেশী ও প্রায় সমবয়সী গঙ্গাধর। প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিবার পূর্বেই তিনি ইংরাজী পড়া ছাড়িয়া দেন, জীবনে উহা কোনই কাজে লাগিবে না মনে করিয়া।

হরিনাথের সহিত যাতায়াত করিতেন এমন এক ব্যক্তিকে ঠাকুর একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরে, তুই যে একলা—সে আসে নি? জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি কহিলেন, সে মশাই আজকাল খুব বেদান্তচর্চায় মন দিয়েচে, রাতদিন পাঠ, বিচারতর্ক নিয়ে আছে, তাই বোধ হয় সময় নষ্ট হবে বলে আসে নি। ইহার কিছুদিন পরে হরিনাথের সহিত দক্ষিণেশ্বরে দেখা হইতেই ঠাকুর বলিলেন: কিগো, তুমি নাকি আজকাল খুব বেদান্তবিচার করচ? তা বেশ, বেশ। তা বিচার তো খালি এই গো—'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা,'—না আর কিছু?…

"ইতঃপূর্বে তাঁহার ধারণা ছিল—উপনিষৎ, পঞ্চদশী ইত্যাদি নানা জটিল গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে, সাংখ্য-ন্যায়াদি দর্শনে ব্যুৎপত্তিলাভ না করিলে বেদান্ত কখনই বুঝা যাইবে না এবং মুক্তিলাভও সুদূরপরাহত থাকিবে। ঠাকুরের সোদনকার কথাতেই বুঝিলেন, বেদান্তের যত কিছু বিচার সব ঐ ধারণাটি হৃদয়ে দৃঢ় করিবার জন্য।"

এই ঘটনার কিছুকাল পরে ঠাকুর একদিন বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীতে আসিয়াছেন, সংবাদ পাইয়া ভক্তেরা অনেকে আসিয়া উপস্থিত

হইয়াছেন। প্রতিবেশী এক যুবক যাইয়া হরিনাথকেও ডাকিয়া লইয়া আসিলেন। হরিনাথ আসিয়া শুনিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন—"কাম-কাঞ্চনকে ঠিক ঠিক মিথ্যা বলে বোধ হওয়া, জগৎটা তিন কালেই অসৎ বলে ঠিক ঠিক মনে জ্ঞানে ধারণা হওয়া কি কম কথা? তাঁর দয়া না হলে কি হয়? তিনি কৃপা করে ঐরূপ ধারণা যদি করিয়ে দেন তো হয়। নইলে মানুষ নিজে সাধন করে সেটা কি ধারণা করতে পারে? তার কতটুকু শক্তি! সেইশক্তি দিয়ে সে কতকুটু চেষ্টা করতে পারে?··বলিতে বলিতে ঠাকুরের সমাধি হইল।" সমাধিভঙ্গে ভাবাবস্থায় 'একটা ঠিক করতে পারে না, আবার আর একটা চায়!'—এই কথাটি বলিয়াই ঠাকুর গান ধরিলেন—'ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব. ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে।'

গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের দুই চক্ষে এত জলধারা বহিতে লাগিল যে, বিছানার চাদরের খানিকটা ভিজিয়া গেল! হরিনাথও সে অপূর্ব শিক্ষায় দ্রবীভূত হইয়া কাঁদিয়া আকুল! তিনি বলিতেন, "সে শিক্ষা চিরকাল আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। সেদিন হইতেই বুঝিলাম ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কিছুই হইবার নহে।"

হরি-মহারাজ—স্বামী তুরীয়ানন্দ—ধ্যাননিষ্ঠ শান্ত সন্ন্যাসীদের আদর্শ পূর্ণভাবে রূপায়িত করিয়াছিলেন নিজের জীবনে।

সারদাপ্রসন্ন

মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (কথামৃতকার শ্রীম) যখন তাঁহার প্রিয় ছাত্র সারদাপ্রসন্নকে ঠাকুরের কাছে লইয়া যান (পৌষ, ১২৯১) সারদাপ্রসন্নের বয়স তখন কিঞ্চিন্ন্যূন কুড়ি বৎসর। প্রবেশিকা-পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে তাঁহার সাধের সোনার ঘড়িটি চুরি যাওয়ায় ও পরীক্ষা ভালভাবে দিতে না পারায় তিনি মনমরা হইয়াছিলেন। ঠাকুরের দর্শনস্পর্শনে তাঁহার বিষণ্ণভাবটি কাটিয়া যায় এবং উচ্চতর আনন্দলোকের আভাস প্রাপ্ত হইয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে থাকেন।

সারদাপ্রসন্নের জন্ম হইয়াছিল মাতুলালয়ে, চব্বিশ পরগনা জেলার পইহাটি গ্রামে। তিনি পিতার মধ্যম পুত্র ছিলেন, কলিকাতায় পিতৃগৃহে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেন। তাঁহার পিতা শিবকৃষ্ণ মিত্র বাহ্যতঃ ঈশ্বর-বিশ্বাসী হইয়াও ঘোর বিষয়ী ও সাধুসঙ্গবিরোধী লোক ছিলেন। পুত্রের দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া বন্ধ করিবার জন্য তিনি নানাভাবে বাধাদান, গোপনে তাঁহার বিবাহের আয়োজন ও নির্যাতন, সব উপায়গুলিই একে একে অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। 'তোর বাড়ীর ওরা সব করতে পারে, ওদের বিশ্বাস করিস নি।' এই কথা বলিয়া ঠাকুর আগেই সারদাপ্রসন্নকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন।

বিবাহের ষড়যন্ত্র হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সারদাপ্রসন্ন পুরীতে পলাইয়া যান, কিন্তু তাঁহার মাতাপিতা পুরীতে গিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া লইয়া আসেন। মাতাপিতার ও ভাইবোনদের প্রতি স্নেহাসক্তি-জনিত দুর্বলতা কিছুদিন তাঁহার মনকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল, সন্দেহ নাই। নতুবা পুরীতে যাওয়ার পথে পাঁশকুড়া হইতে মাতাপিতাকে তিনি পত্র লিখিতেন না, নিজের ঐ দুর্বলতা প্রকট করিয়া। পুরী হইতে ফিরিবার পর এফ-এ প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা দিয়া তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, যদিও সারা বৎসর পড়াশুনায় তেমন মন দিতে পারেন নাই। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন।

অতঃপর সারদাপ্রসন্নের মনে সত্যকার বৈরাগ্যের উদয় হয়, এবং ঈশ্বর-লাভকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া তিনি নিজের জীবন নিয়ন্ত্রিত করেন। শ্রীশ্রীসারদামাতার সেবায় তাঁহার প্রসন্নতা অর্জন করিয়া ও প্রভুর কাজে আত্মবলি দিয়া সারদাপ্রসন্ন-মহারাজ—স্বামী ত্রিগুণাতীত—নিজের জন্মজীবন সার্থক করিয়াছিলেন।

সুবোধ

খুব সম্ভবতঃ ১২৯২ সালের শ্রাবণ মাসে, প্রতিবেশী ও সহপাঠী বন্ধু ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্রকে সঙ্গে নিয়া সুবোধ ঠাকুরকে দর্শন করিতে যান দক্ষিণেশ্বরে। তাঁহার বয়স তখন কিঞ্চিদধিক সতর বৎসর। সুবোধ

কলিকাতার ছেলে, জীবনে এই প্রথম তিনি দেখিতে পাইলেন পল্লী-অঞ্চলের নয়নসুখকর শ্যামলিমা ও ধান্যক্ষেত্র। অগ্রে ক্ষীরোদ গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রণাম করিতেই ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, আপনারা কোথা থেকে আসচ? তারপরে কহিলেন, ও বাবুটি অত দূরে দাঁড়িয়ে কেন? ওগো বাবু, এগিয়ে কাছে এস না। সুবোধ তখন কাছে আসিয়া প্রণাম করিলে ঠাকুর তাঁহাকে খাটের উপর বসাইয়া বলিলেন: তুই শঙ্কর ঘোষের বাড়ীর, কেমন? যখন ঝামাপুকুরে ছিলুম, তোদের সিদ্ধেশ্বরী-মন্দিরে আর তোদের বাড়ীতে কতবার গিয়েচি। তুই তখন জন্মাস নি। তুই এখানে আসবি জানতুম। যাদের ধর্মলাভ হবে মা তাদের এখানে পাঠিয়ে দেন।

সুবোধের পিতা কৃষ্ণদাস ঘোষ ছিলেন ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী-কালীমাতার সেবক শঙ্কর ঘোষের নাতি। কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন, পুত্রদিগকেও সেখানে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তাহাদিগকে ধর্মগ্রন্থ আনিয়া পড়িতে দিতেন। সুরেশচন্দ্র দত্ত-সংকলিত 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি' নামক পুস্তিকা পড়িয়া সুবোধের ঠাকুরকে দর্শন করার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছিল।[১]

সুবোধ ও ক্ষীরোদকে ঠাকুর শনি বা মঙ্গলবারে পুনরায় আসিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা পরবর্তী শনিবারেই আসিয়া উপস্থিত হইলে ঠাকুর তাঁহাদিগকে শিবমন্দিরের সিঁড়িতে লইয়া যান, এবং অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহাদের জিহ্বায় কিছু লিখিয়া, বুকে ও মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া, তাঁহাদিগকে ধ্যান করিতে বলেন। সুবোধের ধ্যান অতি গভীর হয় ও সেই অবস্থায় তিনি নানা দেবদেবীর মূর্তি দেখিতে পান; ক্ষীরোদের ধ্যান তত গভীর হয় নাই। 'তুই কি বাড়ীতে ধ্যান করতিস?' ঠাকুরের এই প্রশ্নের উত্তরে সুবোধ বলিয়াছিলেন, বাড়ীতে মায়ের নিকট ঠাকুর-

১ 'শ্রীশ্রীস্বামী সুবোধানন্দের জীবনী ও পত্র' নামক পুস্তকে আছে, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের রথযাত্রার দিন সুবোধ দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। কথামৃতকারের মতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে। 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি'-১ম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে।

দেবতার বিষয় যা শুনেছিলুম তাই একটু আধটু ভাবতুম। 'তাই তোর এত শীগ্‌গির হল।' ঠাকুর কহিলেন।

কথামৃতকার শ্রীমকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন: দুটি ছেলে এসেছিল—শঙ্কর ঘোষের নাতির ছেলে, আর একটি তাদের পাড়ার ছেলে। বেশ ছেলে দুটি। তাদের বল্লুম, আমার এখন অসুখ, তোমার কাছে গিয়ে উপদেশ নিতে। তুমি একটু যত্ন কোরো।

সুবোধের ডাক নাম ছিল খোকা। আবাল্য ঈশ্বরানুরাগী খোকা-মহারাজ সন্ন্যাসাশ্রমে স্বামী সুবোধানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

হরিপ্রসন্ন

১২৯০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে হরিপ্রসন্ন ঠাকুরকে দর্শন করেন তাঁহার কলেজের সহপাঠী শরচ্চন্দ্রের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া। হরিপ্রসন্নের বয়স তখন পনর বৎসর মাত্র, ঠাকুরের ত্যাগী পার্ষদদের মধ্যে তিনিই বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। ইহার পূর্ববর্তী মাঘ মাসে তিনি একদিন ঠাকুরকে দেখিয়াছিলেন বেলঘরিয়ার গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে; ঠাকুর সেখানে নরেন্দ্র, বাবুরাম, রাম ও অন্যান্য ভক্তদের সহিত মিলিয়া সংকীর্তন করিয়াছিলেন। প্রতিবেশীদের সহিত হরিপ্রসন্নও সংকীর্তন শুনিতে আসিয়াছিলেন, বেলঘরিয়ায় তাঁহার বাড়ী ছিল।

হরিপ্রসন্নের জন্ম হইয়াছিল উত্তর প্রদেশের এটোয়া শহরে। তাঁহার পিতা তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় তখন এটোয়াতে থাকিতেন। তারকনাথ ইংরাজ সরকারের কমিশারিয়েটে কাজ করিতেন, দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সময় কোয়েটাতে তাঁহার মৃত্যু হয় (১৮৮১)।

ঠাকুরকে হরিপ্রসন্ন কয়েকবার মাত্র দর্শন করেন দক্ষিণেশ্বরে। দুই বার তাঁহার কাছে রাত্রিবাসও করিয়াছিলেন সেখানে। হরিপ্রসন্নের সবল শরীর, তিনি ব্যায়াম করেন, কুস্তি লড়েন। ঠাকুর একদিন ক্রীড়াচ্ছলে তাঁহার সহিত কুস্তি লড়িয়াছিলেন! হরিপ্রসন্নের দুইহাত নিজের দুই হাত দিয়া ধরিয়া ঠাকুর তাঁহাকে ঠেলিতে আরম্ভ করিলে হরিপ্রসন্ন তাঁহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে পিছাইয়া নিয়া ঘরের দেয়ালে চাপিয়া ধরেন। 'কেমন,

হারিয়েছিস তো?' মৃদু হাসিয়া ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন। এক অপরিজ্ঞাত অলৌকিক শক্তি তখন হরিপ্রসন্নের দেহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে স্তব্ধপ্রায় করিয়াছে, আর তাঁহার মনে জাগিয়াছে এক অননুভূতপূর্ব আনন্দের অনুভূতি।

একদিন হরিপ্রসন্নের জিহ্বায় কিছু লিখিয়া দিয়া ঠাকুর তাঁহাকে পঞ্চবটীতে গিয়া ধ্যান করিতে বলিলেন। হরিপ্রসন্নের তখন পা টলিতেছে, কোনরূপে পঞ্চবটীতে গিয়া বসিবামাত্র তিনি বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলেন। হুঁশ হইতে দেখেন, ঠাকুর পাশে বসিয়া তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতেছেন। সেদিন তাঁহাকে সাধন সম্বন্ধে বহু উপদেশও ঠাকুর দিয়াছিলেন।[১]

একদিন ঠাকুর গোপীদের কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসার কথা, দেহ-মন-প্রাণ সর্বস্ব কৃষ্ণকে সমর্পণ করার কথা বলিতে বলিতে—তাঁহাদের ভালবাসা যে সাধারণ মানবিক ভালবাসা নয়, ঠিক ঠিক ভগবৎপ্রেম, একথা বলিতে বলিতে—কৃষ্ণের জন্য গোপীদের প্রেমোন্মাদ হওয়ার কথা বলিতে বলিতে—ভাবে বিভোর হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন। শুনিতে শুনিতে হরিপ্রসন্নও ভাবে বিভোর হইয়া পড়েন। ঠাকুরের ভিতর হইতে একটি শক্তি নিঃসৃত হইয়া রাসমণ্ডলের মত পরিবেশ সৃষ্টি করে। হরিপ্রসন্ন বলিতেন, সেই পরিবেশের—সেই শক্তিসীমারেখার মধ্যে থাকায়, রাসলীলা সম্বন্ধে তাঁহার যে অজ্ঞানের আবরণ ছিল তাহা চিরতরে ছিন্ন হইয়া যায়।

হরিপ্রসন্ন অতঃপর বি-এ পড়িবার জন্য চলিয়া গিয়াছিলেন বাঁকিপুরে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিষ্ণাত হরিপ্রসন্ন-মহারাজ—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—স্বাবলম্বী

১ লেখককে হরিপ্রসন্ন মহারাজ বলিয়াছিলেন তাঁহার এলাহাবাদ-স্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে, তাঁহার মহাসমাধির মাত্র দুইমাস পূর্বে: 'তুমি যেমন আমার সামনে বসে আছ তেমনি সামনে বসে ঠাকুর আমাকে মন্ত্র দিয়েছেন।' ঠাকুরের অন্যান্য ত্যাগী পার্ষদদের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন: 'প্রায় সকলকেই তিনি মন্ত্র দিয়েছিলেন বলে জানি; দুইএক জনকে না দিয়ে থাকতে পারেন।'

এবং নির্জনতাপ্রিয় হইয়াও আজীবন কর্ম করিয়া গিয়াছেন ; প্রভুর কাজের জন্য আহ্বান আসিলে তিনি কখনও তাহা উপেক্ষা করিতেন না।

তুলসী

সতর-আঠার বৎসর বয়সে তুলসীদাস ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন বাগবাজারে, বলরাম বসুর বাড়ীতে (১২৮৮)। 'পরমহংস'-দর্শনে উৎসুক হইয়া তিনি দোতলার বৈঠকখানা-ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন দেয়ালে ঠেস দিয়া ; আর অন্দরমহল হইতে বৈঠকখানায় যাইতে যাইতে ভাবাবিষ্ট ঠাকুর তাঁহার দিকে তাকাইয়াছিলেন প্রায় আধমিনিট ধরিয়া। তিনি তখন অনুভব করিয়াছিলেন তাঁহার দেহমধ্যে কী-একটা যেন সুড়সুড় করিয়া উপরে উঠিতেছে ও সমস্ত শরীর অবশ হইয়া যাইতেছে। এই অনুভূতি কিছুটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেই তিনি ছুটিয়া নিজের বাড়ীতে চলিয়া যান।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে প্রতিবেশী ও বাল্যবন্ধু হরিনাথের সহিত তুলসী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন নৌকায় করিয়া ; কিন্তু ঠাকুর তখন মন্দিরে ছিলেন না, কলিকাতায় গিয়াছিলেন। কয়েকদিন পরে তুলসী আবার দক্ষিণেশ্বরে আসেন একাকী, পায়ে হাঁটিয়া। ঠাকুর তখন আহার করিতেছিলেন, আর তুলসী ঘরে ঢুকিয়া ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মেজেতে তাঁহার কাছেই বসিয়া পড়িয়াছিলেন। আহারের সময়ে কাহাকেও প্রণাম করা বা তাঁহার পাশে বসা যে শিষ্টাচারবিরুদ্ধ, একথা তিনি জানিতেন না।

আহারান্তে খাটে বসিয়া পান-তামাক খাইতে খাইতে তুলসীকে ঠাকুর পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপরে কহিলেন, 'দেখ, সেদিন তোমার মত দেখতে একটি ছেলে এসে জিজ্ঞাসা করলে, আমি তার ঘটক হতে পারি কি না।' একথায় অবাক হইয়া তুলসী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন দেখিয়া আবার কহিলেন, 'ঘটক—যিনি প্রিয়তম প্রভুর সাথে ভক্তের মিলন করিয়ে দেন ; তিনি গুরু, তিনি আর ঈশ্বর অভিন্ন।'

কিছুক্ষণ পরে খাট হইতে নামিয়া, তাঁহার বাঁ হাত তুলসীর কাঁধে রাখিয়া ঠাকুর ঘরের বাহিরে আসিলেন এবং ধীরে ধীরে পঞ্চবটীর দিকে

যাইতে যাইতে স্নেহভরে কহিলেন, এখানে মাঝে মাঝে এসো। তুলসীর হৃদয় তখন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে। পঞ্চবটীতে আসিয়া, নিজের তপস্যার স্থানটিতে প্রণাম করিয়া ঠাকুর নীচের সিঁড়িতে বসিলেন ও অর্ধস্ফুটস্বরে জগন্মাতার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। তারপরে তিনি নিজের ঘরে ফিরিয়া গেলে তুলসী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ইহার পরেও তুলসী মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন, কখনও হরিনাথের সঙ্গে, কখনও একাকী।

বাগবাজারের অধিবাসী দেবনাথ দত্ত সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। কাশীর গণেশ মহল্লাতেও তাঁহার একখানি বড় বাড়ী ছিল, প্রতিবর্ষে একবার তিনি কাশীতে যাইতেন। দেবনাথের ছয়পুত্রের মধ্যে তুলসীদাস সর্বকনিষ্ঠ। দশ বৎসর বয়সে মাতৃহারা ও চৌদ্দ বৎসর বয়সে পিতৃহারা হইয়া তুলসী বড় ভাইদের স্নেহযত্নে প্রতিপালিত হন। এগার বৎসর বয়সে তিনি কাশীর বাঙ্গালীটোলা উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়িতে আরম্ভ করেন। তিনি এতই মেধাবী ছিলেন যে, দুই বৎসরের পড়া এক বৎসরে পড়িয়া শেষ করিতেন। সংস্কৃত ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন গৃহে অধ্যয়ন করিয়া। উচ্চশিক্ষালাভের জন্য কাশী হইতে কলিকাতায় আসিয়া তিনি ঠাকুরের দর্শনলাভে কৃতার্থ হন। কাশীতে হরিপ্রসন্ন তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন।

তুলসী-মহারাজের—স্বামী নির্মলানন্দের—তেজস্বিতা, বাগ্মিতা ও কর্মকুশলতা বিশেষভাবে কার্যকর হইয়াছিল ঠাকুরের ভাবধারার প্রচারে, দক্ষিণ দেশে।

মিলনলীলার আসরে অন্যান্য গৃহী ভক্তেরা

কেদার

প্রেমিক ভকত এক আইলা আসরে ॥
অদ্যাবধি ব্রাহ্মধর্মে ছিল তাঁর টান।
পণ্ডিত, বয়স বেশী, ব্রাহ্মণসন্তান ॥
রসাল বয়ানখানি পরাণ উদাস।
হুগলীর কাছে হালিশহরেতে বাস ॥
কোম্পানির ঘরে কাজ বালক-অবধি।
নাম শ্রীকেদারচন্দ্র, চাটুজ্যে উপাধি ॥
শতদরে মাহিয়ানা, শ্যামল বরণ।
রক্তপদ্ম-সম দুটি রক্তিম নয়ন ॥

কেদার ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াছিলেন, কর্তাভজা, নবরসিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সাধকদের সহিতও মিশিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার আধ্যাত্মিক ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতে পারেন নাই। অবশেষে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া, ঠাকুরের দর্শন ও সঙ্গ-লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, অন্য জায়গায় খেতেই পাই না, এখানে এসে পেট্‌ভরা পেলুম! ঠাকুরের সঙ্গগুণে কেদারের স্ব-ভাব জাগ্রত হয়, এবং স্ব-ভাবে—ব্রজগোপীর ভাবে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া তিনি আপ্তকাম হন। তাঁহার অবস্থা তখন—

দেখিলেই প্রভুদেবে প্রায় বাক্যহারা।
অবিরত বিগলিত দুনয়নে ধারা ॥
ভাবেতে বিহ্বল হেতু এত চোখে পানি।
জাহ্নবী যমুনা যেন নয়ন দুখানি ॥

এক বৈরাগী গোপীযন্ত্র লইয়া ঠাকুরের ঘরে গাহিতেছেন:

কার ভাবে নদে এসে, কাঙ্গাল বেশে, হরি হয়ে বলছ হরি।
কার ভাবে ধরেছ ভাব, এমন স্বভাব, তাও তো কিছু বুঝতে নারি ॥

ঠাকুর গান শুনিতেছেন এমন সময়ে কেদার আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও গান ধরিলেন:

সখি! সে বন কতদূর, যথা আমার শ্যামসুন্দর ?
আর চলিতে যে নারি!

শ্রীরাধার ভাবে গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার চোখের দুই কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল।

কাজের খাতিরে কেদারকে কিছুকাল ঢাকায় থাকিতে হইয়াছিল। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও তখন ঢাকায় থাকিতেন, তাঁহার সঙ্গে কেদার সর্বদাই ঠাকুরের কথা কহিতেন। যাহারাই সেখানে তাঁহার সঙ্গলাভ করিতে আসিত তাহাদিগকেই কেদার ঠাকুরের কথা শুনাইতেন। সেই সময়ে একদিন (আশ্বিন, ১২৯১) কলিকাতায় ভক্ত অধর সেনের বাটীতে ঠাকুরের সহিত তাঁহার নিম্নোক্তরূপ কথাবার্তা হয় :

'লোকে অনেকে খাওয়াতে আসে, কী করব প্রভু, হুকুম করুন।'

'ভক্ত হলে চণ্ডালের অন্ন খাওয়া যায়।...'

'প্রভু, আপনি শক্তি সঞ্চার করুন। অনেক লোক আসে, আমি কী জানি?'

'হয়ে যাবে গো, আন্তরিক ঈশ্বরে মতি থাকলে হয়ে যায়।' [কথামৃত]

ভবনাথ

জুটিলেন ভবনাথ পরম সুন্দর।
বরাহনগর কাছে গঙ্গাতীরে ঘর॥
নবীন বয়স তেঁহ ব্রাহ্মণের ছেলে।
উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠ হয় এই কালে॥
আত্মবন্ধু প্রতিবাসী করে উপহাস।
শুনিয়া প্রভুর পদে তাঁহার বিশ্বাস॥

... ...

প্রভু-ভক্ত ভবনাথ সৎবুদ্ধিগুণে।
পরের ব্যঙ্গোক্তি কানে আদতে না শুনে॥

ভবনাথের পুরা নাম ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁহার সম্বন্ধে লীলামৃতকার লিখিয়াছেন: "এমন প্রেমিক আর কোথাও দেখেছি বলে মনে

হয় না। ব্রাহ্মণতনয় হইলেও আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মজ্ঞানী…। অঙ্গকান্তি যেমন গৌর, অন্তরও সেইরূপ। পড়িবার সময়ই প্রভুর বিশেষ স্নেহভাজন হন। ঠাকুরের প্রতি ইঁহার যেরূপ ভালবাসা, তার কণামাত্র পেলে আমরা কৃতার্থ হই। ভগবানের ভজনসময় ইনি এমন রোদন করিতেন, তাতে পাড়ার লোক জমা হয়ে যেত।…'তুমি বন্ধু তুমি নাথ নিশিদিন তুমি আমার' তাঁর এই গীতটিতে প্রভু সমাধিস্থ হইতেন।…ভাবাবস্থায় অঙ্গবৈকল্য ঘটিলে শ্রীমতীর অংশ বাবুরাম এবং বিবাহিত ভবনাথ ভিন্ন অন্য কোন ভক্ত প্রভুকে স্পর্শ করিতে সাহস পাইত না। ইহাতে বুঝা যায়, ইঁহারা অসাধারণ পবিত্রাত্মা।

"মাতাপিতার আগ্রহে বিবাহ, পত্নী যাতে ধর্মচর্যায় সহায়ক হয় এই অভিপ্রায়ে তাকে দক্ষিণেশ্বরে আনিলে ঠাকুর নবদম্পতীকে শুভাশীষ করেন। প্রভুর যে গভীর সমাধিস্থ প্রতিকৃতি, অধুনা যাহা ঘরে ঘরে পূজিত, ভবনাথেরই আগ্রহে ঠাকুরবাড়ীর বিষ্ণুমন্দিরের রোয়াকে গৃহীত হয়; এজন্য ভক্তমাত্রেই ভবনাথের নিকট ঋণী।"

কথামৃতে আছে, ঠাকুর বলিতেছেন: ভবনাথ নরেন্দ্রের জুড়ি—দুজনে যেন স্ত্রী-পুরুষ। তাই ভবনাথকে নরেন্দ্রের কাছে বাসা করতে বল্লুম। ওরা দুজনেই অরূপের ঘর।

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ঠাকুরের জন্ম-মহোৎসব (১২৯১)। নরেন্দ্রের গান শুনিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, অনেকক্ষণ পরে সমাধিভঙ্গ হইলে ভক্তেরা তাঁহাকে আহারের জন্য আসনে বসাইলেন। কিন্তু তখনও ভাবের আবেশ রহিয়াছে, ভাত খাইতেছেন দুই হাতে। ভবনাথকে বলিলেন, তুই দে খাইয়ে। ভবনাথ খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন।

বলরাম

খুব সম্ভবতঃ ১২৮৮ সালের কোন সময়ে ঠাকুরের অন্যতম রসদ্দার ও অন্তরঙ্গ পার্ষদ বলরাম বসু ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁহার বয়স তখন ঊনচল্লিশ বৎসর হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গের সংকীর্তনদলের ভিতর ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন।

মনোহর ভক্তবর বসু বলরাম।
শহর অঞ্চলে বাগবাজারেতে ধাম॥

... ...

সরল আকৃতি অতি পাতলা গড়ন॥
গৌউর-বরণ অঙ্গ অকুঞ্চিত ঠাম।
সুন্দর বক্ষেতে ঝুলে দাড়ি লম্বমান॥
বাঙ্গালীর রীতি-ছাড়া উচ্চ পাগ শিরে।
বিনয়েতে সদা নত ভূমির উপরে॥
হাসিমাখা ধীরি কথা কভু উচ্চ নয়!
নানাগুণে অলঙ্কৃত হৃদয়নিলয়॥

... ...

অন্তর-বারতা বিৎ শ্রীপ্রভু আমার।
জিজ্ঞাসিলা তাঁরে, কিবা জিজ্ঞাস্য তোমার॥
বলরাম বলিলেন, এক নিবেদন।
দেখুন আমার পিতা পিতামহগণ॥
ভকত-স্বভাব সবে বৈষ্ণব-আচারী।
কাটিলা জীবন শুধু হরি হরি করি॥
অদ্যাবধি আমিও তাঁদের পিছু যাই।
কিন্তু হরি কেহ কেন দেখিতে না পাই॥
প্রভুদেব করিলেন তাহার উত্তর।
ধনপুত্রে যেইরূপ করহ কদর॥
সেইমত প্রিয়ভাব হরিতে কি আছে।
থাকিলে অবশ্য হরি আসিতেন কাছে॥

... ...

প্রভুরে বড়ই মিষ্টি লেগেছে বসুর।
এক দরশনে শুন কাণ্ড কতদূর॥
ভাবে, কত করিয়াছি তীর্থেতে পয়ান।
দেখিয়াছি শত শত সাধকপ্রধান॥
যোগী ত্যাগী জটাধারী মহান্ত সজ্জন।
শৈব শাক্ত বৈদান্তিক বৈষ্ণব-লক্ষণ॥

শুনেছি ঈশ্বরকথা বিস্তর বিস্তর ॥
কিন্তু কোথা না দেখিনু এমন সুন্দর ॥
যেমন মূরতিখানি স্বভাব তেমন।
ভক্তিমাখা উক্তি, মুখে সুধাবরিষণ ॥
সঙ্গীতে বাঁশরি-কণ্ঠ অতি মিষ্টি গান।
শুনে প্রাণ ফুলে ধরে আনন্দে উজান ॥
মহাজ্ঞানে বাল্যভাব অঙ্গ-আভরণ।
রসভাষে কেবা দোষে কিছু নহে কম ॥

... ...

পুনরায় যাব তাঁরে করিতে প্রণতি।
পোহাইলে একবার আজিকার রাতি ॥

হুগলী জেলার আঁটপুর-তড়া গ্রাম বলরামের পৈত্রিক নিবাস। শ্রুতকীর্তি, স্বনামধন্য কৃষ্ণরাম বসু তাঁহার প্রপিতামহ। পিতামহ গুরুপ্রসাদ কলিকাতাস্থ স্বগৃহে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামচাঁদ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন; এই বিগ্রহের নামানুসারেই পল্লীর নাম হইয়াছিল শ্যামবাজার। গুরুপ্রসাদ শ্রীবৃন্দাবনেও শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মনোরম কুঞ্জবাটীতে, যমুনাতীরে। সেই কুঞ্জবাটী পরে 'কালাবাবুর কুঞ্জ' নামে পরিচিত হয়। বলরামের পিতা রাধামোহন সেখানে সাধনভজন ও বিগ্রহসেবা লইয়া থাকিতেন।

বলরামের জেঠতুতো ভাই, কটকের প্রসিদ্ধ উকিল হরিবল্লভ বসু বাগবাজারে রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে এক দুইমহল দ্বিতলবাড়ী ক্রয় করেন। উড়িষ্যার নানাস্থানে এই বসু-পরিবারের জমিদারি ছিল, কোঠার মৌজাকে কেন্দ্র করিয়া। জমিদারির কাজকর্ম বলরামের ধাতে সহ্য হইত না; তিনি একাদিক্রমে এগার বৎসর পুরীধামে বাস করিয়াছিলেন, নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধার করিবেন বলিয়া। নিজাংশ বিষয়সম্পত্তি দেখার ভার অপর জেঠতুতো ভাই নিমাইচরণকে দিয়া বলরাম কলিকাতায় বাস করিতে আসেন, দুইশত টাকা মাসোহারা লইয়া। এখানে আসিবার পরেই তিনি ঠাকুরকে দর্শন করিতে যান। তাঁহার

পুরোহিতপুত্র **রামদয়াল** চক্রবর্তী আগেই তাঁহাকে ঠাকুরের কথা লিখিয়া জানাইয়াছিলেন।

প্রথম দর্শনের পরদিন প্রত্যূষে দীর্ঘপথ পায়ে হাঁটিয়া বলরাম দক্ষিণেশ্বরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তাঁহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন: 'ওগো, মা বলেচেন তুমি আপনার জন, তুমি মার একজন রসদ্দার; তোমার ঘরে এখানকার অনেক জমা আছে, কিছু কিনে পাঠিয়ে দিয়ো। বলরাম "সেই দিন হইতে ঠাকুরের অদর্শন-দিন পর্যন্ত ঠাকুরের নিজের যাহা কিছু আহার্যের প্রয়োজন হইত প্রায় সে সমস্তই যোগাইতেন—চাল, মিছরি, সুজি, সাগু, বার্লি, ভার্মিসেলি, টেপিওকা ইত্যাদি।"

ঠাকুর অ-ব্রাহ্মণ ভক্তের বাড়ীতে কাঁচা অন্ন বা ভাত সাধারণতঃ খাইতেন না, কিন্তু বলরামের বাড়ীতে খাইতেন। বলরামের শুদ্ধ অন্ন, তিনি বলিতেন। বলরাম-গৃহে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিত্যসেবা ছিল।

ঠাকুর কলিকাতায় আসিলে সেইদিনই দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া যাইতেন, ফিরিতে রাত যতই হউক না কেন। ক্বচিৎ রাত্রে থাকার প্রয়োজন হইলে তিনি বলরাম-গৃহে রাত্রিযাপন করিতেন; বিশেষতঃ রথযাত্রা উপলক্ষে আসিয়া দুইএক দিন তিনি এখানে থাকিতেন। বহির্বাটীর চকমিলানো বারান্দায় ৺জগন্নাথের ছোট রথখানি টানা হইত; একটি কীর্তনের দল আসিত, আর রথাগ্রে ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া কীর্তন ও নৃত্য করিতে করিতে মুহুর্মুহু ভাবাবিষ্ট হইতেন।

ঠাকুর বলরাম-গৃহে আসিয়াছেন জানিতে পারিলেই—জানাজানিও হইয়া যাইত আপনা হইতে—ছোটবড় অনেক ভক্ত আসিয়া এখানে মিলিত হইতেন। কাহাকেও ঠাকুর নিজে ডাকিয়া পাঠাইতেন, কাহাকেও বা বলরামের দ্বারা নিমন্ত্রণ করাইতেন। বাড়ীতে তখন 'প্রেমের বাজারে আনন্দের মেলা' বসিত। বলরামের একটা রীতি ছিল, পঞ্জিকার মার্জিনে বিশেষ বিশেষ দিনের ঘটনা লিখিয়া রাখা; তাহা হইতে জানা যায় ঠাকুর শতাধিক বার শুভাগমন করিয়াছেন তাঁহার ঘরে।

বলরামের পরিবারস্থ সকলেই ছিলেন ভগবদ্ভক্ত। সকালে কিছুক্ষণ ভগবানের নামজপ না করিয়া জলগ্রহণের রীতি ছিল না এই সংসারে। সমগ্র পরিবারটি যেন বাঁধা ছিল একসুরে। ভক্ত-ভগবানের সেবায় বলরাম ছিলেন মুক্তহস্ত, যদিও তাঁহার সম্বল যথেষ্ট ছিল না। শ্রীমকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন : বলরামের কী স্বভাব! আমার জন্যে ওদেশে (কোঠারে) যায় না। ভাই মাসোহারা বন্ধ করেছিল, আর বলে পাঠিয়েছিল, তুমি এখানে এসে থাক, মিছামিছি কেন অত টাকা খরচ কর। তা সে শুনে নাই আমাকে দেখবে বলে। কী স্বভাব! রাতদিন কেবল ঠাকুর লয়ে। মালীরা ফুলের মালাই গাঁথচে! টাকা বাঁচবে বলে বৃন্দাবনে চার মাস থাকবে।

বলরাম যখন দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন তাঁহার সঙ্গে তখন পরিবারস্থ লোকজন, আত্মীয়স্বজন, এমনকি প্রতিবেশী দুইএক জনও থাকিতেন। বৃন্দাবন হইতে নিজের পিতাকে তিনি কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছিলেন, ঠাকুরকে দর্শন করাইবেন বলিয়া।

ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তদের প্রতি বলরামের ভক্তি ও ভালবাসা যেমন গভীর ছিল, বলরাম ও তাঁহার পরিবারের প্রতি ঠাকুরের দয়াও ছিল তেমনি সীমাহারা। ভক্তদের মধ্যে বলরামবাবু বড়, মাতাঠাকুরাণী বলিতেন।

মাষ্টার

১২৮৮ সালে, ফাল্গুন মাসের এক সায়াহ্নে বন্ধু-সঙ্গে বেড়াইতে আসিয়া মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ঠাকুরের দর্শনলাভ করেন দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে। তাঁহার বয়স তখন কিঞ্চিদধিক সাতাশ বৎসর। ঠাকুর তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গের সংকীর্তনদলে দেখিয়াছিলেন।

মাষ্টারি বা শিক্ষকতা করিতেন বলিয়া কৃতবিদ্য মহেন্দ্রনাথ 'মাষ্টার' নামে অভিহিত হইতেন। রসিকতা করিয়া প্রবীণ গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে 'ছেলেধরা মাষ্টার' বলিতেন ; অনেক ছাত্র-ছেলেকে তিনি ঠাকুরের কাছে লইয়া গিয়াছিলেন। স্বরচিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে নিজের মাষ্টার-নামের

ভূরি ব্যবহার তিনি নিজেই করিয়াছেন। কথামৃতের সর্বত্র তাঁহার মাষ্টারির ছাপ বিদ্যমান।

মহেন্দ্রনাথের জন্ম হইয়াছিল কলিকাতার শিমলা পল্লীতে। তাঁহার জন্মের কিছুকাল পরে তাঁহার পিতা মধুসূদন গুপ্ত গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে একটি বাড়ী ক্রয় করেন। এই বসত বাড়ীটিকে মাষ্টার মহাশয় ঠাকুরবাড়ী বলিতেন; পরে উহার নাম হইয়াছে 'কথামৃত-ভবন'। যখন ঠাকুরের কাছে যান সেই সময়ে তিনি শ্যামবাজারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ, এবং পারিবারিক অশান্তির জন্য বরাহনগরে ভগিনীপতির বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন।

১২৯০ সালের শীতকালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে একাদিক্রমে তেইশ দিন শ্রীগুরুর পদছায়ায় বাস করেন। সেই সময়ে ঠাকুর তাঁহাকে নিম্নোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন:

'তোমায় চিনেচি তোমার চৈতন্য-ভাগবত পড়া শুনে [মুরারিগুপ্ত ?] তুমি আপনার জন—এক সত্তা—যেমন পিতা আর পুত্র। এখানে সব আসচে, যেন কলমির দল, এক জায়গায় টানলে সবটা এসে পড়ে। পরস্পর সব আত্মীয়—যেমন ভাই ভাই।...

'যতদিন এখানে আস নাই ততদিন ভুলে ছিলে; এখন আপনাকে চিনতে পারবে। তিনি গুরুরূপে এসে জানিয়ে দেন।

'তুমি প্রথম আসতে মাত্র তোমায় তো আমি বলেছিলুম তোমার ঘর। ...তোমার ঘর, তুমি কে, তোমার অন্তর বাহির, তোমার আগেকার কথা, তোমার পরে কী হবে—এ সব তো আমি জানি ?

'ছেলে হয়েচে শুনে বকেছিলুম। এখন গিয়ে বাড়ীতে থাক। তাদের জানিয়ো যেন তুমি তাদের আপনার। ভিতরে জানবে, তুমিও তাদের আপনার নও, তারাও তোমার আপনার নয়। আর বাপের সঙ্গে প্রীতি কোরো।'

দিনলিপি রাখার অভ্যাস ছিল মাষ্টার মহাশয়ের। সেই অভ্যাস চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে সন-তারিখ ও পরিবেশ-সমন্বিত করিয়া ঠাকুরের

শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীসমূহের সংরক্ষণে। শ্রীরামকৃষ্ণ-কল্পতরুর গলিত ফল 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' অধ্যাত্মমার্গে বিচরণকারীদের পরম পাথেয়।

গিরিশ

খুব সম্ভবতঃ ১২৮৪ সালের কোন সময়ে, জাতীয় রঙ্গমঞ্চের জনক, প্রথিতযশা নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন বাগবাজারে, প্রতিবেশী দীননাথ বসুর বাড়ীতে। তাঁহার বয়স তখন প্রায় চৌত্রিশ বৎসর হইবে। সেদিন ঠাকুরকে দেখিয়া কোন শ্রদ্ধারই উদয় হয় নাই তাঁহার মনে। তখন সন্ধ্যাকাল, ভাবাবস্থা হইতে ব্যুত্থিত হওয়ার মুখে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সন্ধ্যা হইয়াছে কি না। ঠাকুরের সম্মুখে তখন শেজ জ্বলিতেছিল; তাঁহার কথাটাকে তাই একটা ঢং-মাত্র মনে করিয়া গিরিশ তখনই চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে তিনি দ্বিতীয়বার ঠাকুরকে দর্শন করেন বলরাম-গৃহে। ঠাকুরের দীনতা—তিনি অগ্রেই সকলকে নমস্কার করিতেন—ও তাঁহার ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে মাতোয়ারা ভাব গিরিশকে সেদিন আকৃষ্ট করিয়াছিল, এবং তিনি আরও কিছু শুনিতে ইচ্ছাও করিয়াছিলেন, কিন্তু অমৃতবাজার-পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ 'চল, আর কী দেখবে ?'—এই কথা বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া যান।

হেলায় শ্রদ্ধায় দুইবারের এই নামমাত্র দর্শনও মহৎফল প্রসব করিল। ১২৯১ সালে গিরিশের 'চৈতন্যলীলা' নাটক রচিত ও মঞ্চস্থ হইয়া রঙ্গালয়ে ভক্তির প্লাবন আনিয়া দিল। ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুর একদিন অভিনয় দেখিতে আসিলেন ও গিরিশ তাঁহাকে একটি বাক্সে বসাইয়া হাওয়া করিবার জন্য একটি ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ইহার পরে বলরাম-গৃহে আবার ঠাকুরের সহিত দেখা হইতে গিরিশ প্রশ্ন করিলেন, 'মহাশয়, গুরু কী ?' 'গুরু কী জান—যেমন ঘটক। তোমার গুরু হয়ে গেছে।' ঠাকুর উত্তর দিলেন। 'মন্ত্র কী ?' 'ঈশ্বরের নাম।' গুরু হইয়া গিয়াছে শুনিয়া গিরিশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন; কোন মানুষকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে তিনি পারিতেছিলেন না। গিরিশের

তীক্ষ্ণবুদ্ধি নরবিগ্রহধারী জগদ্‌গুরুকে দেখাইয়া দিল; পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত তিনি শ্রীগুরুপদে আত্মসমর্পণ করিলেন সর্বতোভাবে।

গিরিশের পিতা নীলকমল ঘোষের বাড়ী ছিল বাগবাজার বসুপাড়া লেনে। সওদাগরী আপিসে কাজ করিতেন তিনি। দশ বছর বয়সে মাতৃহীন হইয়া পিতার আদরের দুলাল গিরিশ স্বেচ্ছাচারে বর্ধিত হইয়াছিলেন। ইহার চারি বৎসর পরে পিতাও পরলোক গমন করিলে তিনি একপ্রকার অভিভাবকশূন্য হইয়া পড়েন। পিতার দূরদর্শিতায় ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী কৃষ্ণকিশোরীর চেষ্টায় বিষয়সম্পত্তি রক্ষা পায়; কিন্তু গিরিশকে রক্ষা করা যাইতেছে না দেখিয়া কৃষ্ণকিশোরী তাড়াতাড়ি তাহাকে বিবাহিত করেন, পিতার মৃত্যুর এক বৎসর পরেই।

ভাল ও মন্দ লইয়া, ভাল ও মন্দের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া, সকল মানুষেরই জীবন গড়িয়া উঠে। আর যখন কোন বৃহৎব্যক্তিত্বসম্পন্ন আধারে সেই দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে তীব্র আবেগ লইয়া, তখন তাহা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যদি সেই প্রকাশে ভাল অপেক্ষা মন্দের ভাগ হয় অত্যন্ত বেশী, যাহা প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার ধ্বংসকারক, তাহা হইলে সমাজে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সমাজ কখনও এমন ব্যক্তিকে বরদাস্ত করিতে পারে না, ভালবাসা তো দূরের কথা, যতই মহৎ কোন গুণের বা শক্তির অধিকারী সে হউক না কেন। বহুর মধ্যে থাকিয়াও প্রকৃতপক্ষে সে হইয়া পড়ে নিঃসঙ্গ, আর তাহার অন্তরে তখন বিরাজ করে এক অপূরণীয় শূন্যতার হাহাকার। ক্রমবর্ধমান দুষ্কর্মের ভারে তমিস্রার অতল গহ্বরে সে এমনভাবে তলাইয়া যাইতে থাকে যে, নিজের সামর্থ্যে নিজেকে আর উদ্ধার করিতে পারিবে না বুঝিয়া যে-কোনও রূপে আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিতে সে চেষ্টা করে।

জীবহৃদয়ের নৈরাশ্যপূর্ণ এই হাহাকার শ্রীভগবানের করুণায় উত্তেজনার সঞ্চার করে; ছুটিয়া আসেন তিনি পতিতকে তুলিয়া নিতে বাহুপাশে জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার সমুদয় পাপতাপের জ্বালা নিঃশেষে নিজাঙ্গে গ্রহণ করিয়া। যুগে যুগে দয়াময়ের এই পতিতোদ্ধার-লীলার অভিনয় হইয়াছে, যেমন হইয়াছিল শ্রীচৈতন্যাবতারে জগাই-মাধাইকে নিমিত্ত করিয়া।

দুষ্কর্মের ভারে গিরিশও নিজের জীবনকে এইরূপ দুর্বহ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। জগাই-মাধাই কোন বিশেষ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন কি-না, জানা যায় না ; কিন্তু গিরিশের অসাধারণ নাট্যপ্রতিভা সুবিদিত। তাঁহার মনের মত সূক্ষ্মসংবেদনশীল মনের জ্বালার অনুভূতি যে অতি তীব্র হইবে ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। তাঁহার এই অন্তর্দাহের জ্বালা জুড়াইবার জন্যই ঠাকুর বারবার রঙ্গালয়ে ছুটিয়া যাইতেন, অভিনয় দেখার ছল করিয়া। প্রাণে প্রাণে ইহা বুঝিতে পারিয়াই গিরিশ বলিয়াছিলেন, 'প্রভু, তুমিই ঈশ্বর, মানুষদেহ ধারণ করে এসেচ আমার পরিত্রাণের জন্যে।' 'গিরিশের পাপ নিয়ে এই ব্যাধি।' ঠাকুর একথা বলিয়াছিলেন তাঁহার গলরোগের বিশেষ কারণ সম্বন্ধে, মাতাঠাকুরাণীকে। আর কেন তিনি এই পাপ গ্রহণ করিতে গেলেন সেই সম্বন্ধে ভক্তবৎসল ঠাকুর বলিয়াছিলেন, সে অত কষ্ট সহ্য করতে পারবে না। ঠাকুরের করুণার স্বরূপ প্রকটিত করিবার জন্য 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'-শীর্ষক স্বলিখিত স্তবের নিম্নোক্ত পদটিতে গিরিশ নিজের বিগত জীবনটাকেই যেন তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছেন বলিয়া মনে হয় ঃ

> ভাবান্তর নাহি মাত্র তব করুণায়, হে দীনশরণ!
> মাগে বা না মাগে কৃপা বিলাও ধরায়—বরিষার বারি বরিষণ।
> বিধবার ধনাপহরণ, ভ্রূণহত্যা-কুলস্ত্রীগমন,
> ত্যজি কন্যাপুত্রনারী পানাসক্ত অত্যাচারী,
> লোকত্যজ্য ঘৃণিতজীবন—
> তব দ্বার মুক্ত তার, পতিতপাবন!

ঠাকুরকে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া গিরিশ জানিতে চাহিয়াছিলেন অতঃপর তাঁহার করণীয় কী হইবে। ঠাকুর উত্তর দেন ঃ "যা করচ তাই করে যাও। এখন এদিক ওদিক দুদিক রেখে চল, তারপর যখন একদিক ভাঙ্গবে তখন যা হয় হবে। তবে সকালে বিকালে তাঁর স্মরণমননটা রেখো।...

"গিরিশ শুনিয়া বিষণ্ণ মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার যে কাজ তাহাতে স্নান-আহার-নিদ্রা প্রভৃতি নিত্যকর্মেরই একটা নিয়মিত সময়

রাখিতে পারি না, সকালে বিকালে স্মরণমনন করিতে নিশ্চয়ই ভুলিয়া যাইব ; তাহা হইলে ত মুশকিল—শ্রীগুরুর আজ্ঞালঙ্ঘনে মহা দোষ ও অনিষ্ট হইবে।···আপনার একান্ত বহির্মুখ অবস্থা ঠিক ঠিক দেখিতে পাইয়াই বুঝিতেছিলেন যে, ধর্মকর্মের অতটুকুও প্রতিদিন করা যেন তাঁহার সামর্থ্যের অতীত!···আপনার নিতান্ত অপারক ও অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিতে করিতে কাতর হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন—'করিব' বা 'করিব না' কোন কথাই বলিতে পারিলেন না!···

"ঠাকুর·· তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তা যদি না পার ত খাবার শোবার আগে তাঁর একবার স্মরণ করে নিও।

"গিরিশ নীরব। ভাবিলেন উহাই কি করিতে পারিবেন! দেখিলেন—কোনদিন খান বেলা দশটায়, আর কোনদিন বৈকালে পাঁচটায় ; রাত্রির খাওয়া সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম।···তাঁহার 'প্রাণের ভিতরে যেন একটা চিন্তা, ভয় ও নৈরাশ্যের ঝড় বহিতে লাগিল। ঠাকুর···হাসিতে হাসিতে এইবার বলিলেন —তুই বলবি, 'তাও যদি না পারি', আচ্ছা, তবে আমায় বকলমা দে। ঠাকুরের তখন অর্ধবাহ্যদশা।

"কথাটি মনের মত হইল। গিরিশের প্রাণ ঠাণ্ডা হইল। শুধু ঠাণ্ডা হইল না, ঠাকুরের অপার দয়ার কথা ভাবিয়া তাঁহার উপর ভালবাসা ও বিশ্বাস একেবারে অনন্তধারে উছলিয়া উঠিল। গিরিশ ভাবিলেন, যাক্—নিয়মবন্ধনগুলিকে বাঘ মনে হয়, তাহার ভিতর আর পড়িতে হইল না।···কিন্তু নিয়মের বন্ধন গলায় পরা অসহ্য বোধ করিয়া তাহার পরিবর্তে যে তদপেক্ষা শতগুণে অধিক ভালবাসার বন্ধন স্বেচ্ছায় গলায় তুলিয়া লইলেন তাহা তখন বুঝিতে পারিলেন না। ভাল মন্দ যে অবস্থায় পড়ুন না কেন, যশ অপযশ যাহাই আসুক না কেন, দুঃখকষ্ট যতই উপস্থিত হউক না কেন, নিঃশব্দে তাহা সহ্য করা ভিন্ন তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার যে আর বলিবার বা করিবার কিছুই রহিল না, সেকথা তখন আর তলাইয়া দেখিলেন না ; দেখিবার শক্তিও হইল না। অন্য সকল চিন্তা মন হইতে সরিয়া যাইয়া কেবল দেখিতে লাগিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অপার

করুণা। আর বাড়িয়া উঠিল শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরিয়া শতগুণে অহঙ্কার। মনে হইল, সংসারে যে যা বলে বলুক, যতই ঘৃণা করুক, ইনি তো সকল সময়ে সকল অবস্থায় আমার—তবে আর কি? কাহাকে ডরাই? ভক্তিশাস্ত্র এ অহঙ্কারকে যে সাধনের মধ্যে গণ্য করেন এবং মানবের বহুভাগ্যে আসে বলেন, তাহাই বা তখন কেমন করিয়া জানিবেন? যাহাই হউক, শ্রীযুত গিরিশ এখন নিশ্চিন্ত, এবং খাইতে শুইতে বসিতে ঐ এক চিন্তা—'শ্রীরামকৃষ্ণ আমার সম্পূর্ণ ভার লইয়াছেন'—সর্বদা মনে উদিত থাকিয়া তাঁহাকে যে ঠাকুরের ধ্যান করাইয়া লইতেছে এবং তাঁহার সকল কর্ম ও মনোভাবের উপর একটা ছাপ দিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়া আমূল পরিবর্তন আনিয়া দিতেছে তাহা বুঝিতে না পারিলেও সুখী—কারণ তিনি যে তাঁহাকে ভালবাসেন এবং আপনার হইতেও আপনার!"

খুব সম্ভবতঃ গিরিশের বকলমা-দানের পূর্বেকার ঘটনা। রাম লিখিয়াছেন: "পরমহংসদেব একদিন থিয়েটারে অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। অভিনয়ান্তে গিরিশবাবু···কথায় কথায় তাঁহাকে এপ্রকার কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, তাহা লেখায় প্রকাশ করা যায় না। বরং মাধাই কর্তৃক নিত্যানন্দের কলসীর কাণার আঘাত সহস্রগুণে ভাল ছিল, কিন্তু গিরিশবাবুর সেইদিনের গালাগালির তুলনা নাই।···কবির মুখের খেউড়···। এই গালাগালিতে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরমহংসদেবের অপূর্ব মানসিক ভাব দেখিয়া সকলেই মনের আবেগ সংবরণ করিয়াছিলেন। তিনি···হাসিতে হাসিতে যথাসময়ে দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন।···

"অতঃপর পরমহংসদেব একদিন [ঘটনার পরদিন?] অন্যান্য ভক্ত-দিগের সহিত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে আমরা যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা যাইবামাত্র তিনি কহিলেন, গিরিশ আমায় গালি দিয়াছে। আমরা কহিলাম, কি করিবেন? তিনি পুনরায় কহিলেন, আমায় যদি মারে? আমরা কহিলাম, 'মার খাইবেন।···গিরিশের অপরাধ কি? কালিয় সর্পের বিষে রাখাল বালকগণের মৃত্যু হইলে শ্রীকৃষ্ণ কালিয়ের যথাবিহিত শাস্তি

প্রদানপূর্বক কহিয়াছিলেন, তুমি কিজন্য বিষ উদ্‌গীরণ কর? কালিয় সানুনয়ে কহিয়াছিল, প্রভু যাহাকে অমৃত দিয়াছেন সে তাহাই দিতে পারে, কিন্তু ঠাকুর আমায় বিষ দিয়াছেন, আমি অমৃত কোথায় পাইব? গিরিশের ভিতরে যাহা ছিল, যেসকল পদার্থ দ্বারা তাহার হৃদয়ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ছিল, সেই কালকূটসম বাক্যগুলি ফেলিয়া দিবার আর স্থান কোথায়? ···আমাদের বলিলে হয়ত এতক্ষণ তাহার নামে রাজদ্বারে অভিযোগ করা হইত। এই সকল বুঝিয়া, প্রভু, আপনি নিজে অঞ্জলি পাতিয়া লইয়া আসিয়াছেন।'···অমনি তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল, তাঁহার অক্ষিদ্বয়ে জল আসিল এবং তখনই তিনি গিরিশের বাটীতে গমন করিবার নিমিত্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন।···সেই দুই প্রহরের সূর্যোত্তাপে···গিরিশের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে গিরিশ তাঁহার নিজ কীর্তি স্মরণ করিয়া আপনাকে আপনি সহস্র লাঞ্ছনা করিতেছিলেন, তিনি কেমন করিয়া ভদ্রসমাজে মুখ দেখাইবেন ভাবিতেছিলেন। সে ভাবনা দূরীকৃত হইল। পরমহংসদেব এমনভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং ভক্ত সহ হরিনাম-সংকীর্তন করিলেন যে, গিরিশবাবুর মনে যেসকল দুঃখ এবং লজ্জা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল। সেই গিরিশ আজ পরমহংসদেবের পরাক্রমে পরাজিত হইলেন।"

গিরিশের কথায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন: ওরা থাক্ আলাদা—যোগও আছে, ভোগও আছে। যেমন রাবণের ভাব—নাগকন্যা দেবকন্যাও নেবে, রামকেও লাভ করবে।

কালীপদ

প্রিয়ভক্ত শ্রীপ্রভুর কালীপদ নাম।
কায়স্থ, উপাধি ঘোষ মহাভাগ্যবান॥
স্থূলকায় লম্বাচৌড়া প্রমাণ আকার।
··· ···
উজ্জ্বল শ্যামলবর্ণ বিশাল নয়ন।
স্বভাবতঃ অবিরত প্রফুল্ল বদন॥

উপার্জনে টাকাকড়ি যাহা হয় আয়।
বেশ্যা-সুরাপ্রিয় হেতু সকল খুয়ায়॥
গিরিশের সঙ্গে তাঁর বড়ই পিরীতি।
রঙ্গালয়ে আগমন প্রায় নিতি নিতি॥
প্রভুর মহিমা তথা করিয়া শ্রবণ।
দিনেক দক্ষিণেশ্বরে উপনীত হন॥
ভক্তি সহ নহে এবে নাহিক বিশ্বাস।
ব্যাপারে রহস্য কিবা দেখিবার আশ॥

… …

ভক্ত-ভগবানে রঙ্গ মধুর আখ্যান।
কালীপদ করিল না শ্রীপদে প্রণাম॥
শ্রীমন্দিরে অবস্থিতি করি কিছুক্ষণ।
সে'দিন ফিরিল তেঁহ আপন ভবন॥
উচাটন ঘরে মন নাহি রহে আর।
প্রভুর মূরতি মনে উঠে অনিবার॥

… …

পুনঃ দরশনহেতু ভক্তগণ সাথে।
তরীযোগে আগমন হয় জলপথে॥

কালীপদের বাড়ী ছিল কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লীতে। ১২৯১ সালে যখন তিনি ঠাকুরের কাছে আসেন তখন তাহার বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর হইবে। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য তাঁহার লেখাপড়া বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। পিতা গুরুপ্রসাদ ঘোষের চেষ্টায় তিনি কাগজ-ব্যবসায়ী জন ডিকিন্‌সন কোম্পানির কার্যে নিযুক্ত হন ও অসাধারণ কর্মকুশলতা-গুণে ক্রমশঃ উহার সর্বময় কর্তা হইয়া উঠেন। গিরিশের তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহচর ছিলেন। তাঁহাকে স্বরচিত 'শঙ্করাচার্য' নাটক উৎসর্গ করিতে গিয়া গিরিশ লিখিয়াছেন: 'ভাই, আমরা উভয়ে একত্রে বহুবার শ্রীদক্ষিণেশ্বরে মূর্তিমান বেদান্ত দর্শন করেছি।…' উভয়ের চরিত্রগত বিশেষ সাদৃশ্য থাকায় রহস্য করিয়া ভক্তদের কেহ কেহ তাঁহাদিগকে জগাই-মাধাই বলিতেন।

দ্বিতীয়বার দেখা হইতেই আত্মীয়বৎ সম্ভাষণ করিয়া ঠাকুর কালীপদকে গ্রহণ করিলেন ও তাঁহার কাছে কলিকাতা-গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নৌকা ঘাটেই বাঁধা ছিল, মহা আনন্দিত হইয়া কালীপদ তাঁহাকে তখনই লইয়া যাইতে চাহিলে ঠাকুর নৌকায় গিয়া উঠিলেন লাটুকে সঙ্গে লইয়া। যাইতে যাইতে—

কালীকে প্রভুর প্রশ্ন প্রথম প্রথম।
কোন্ দেবদেবী-মূর্তি মনের মতন ॥
উত্তর করিল ভক্ত মুখে মন্দ হাসি।
যার নামে নাম মোর তাঁরে ভালবাসি ॥
কালী ভালবাসে কালী শুনি প্রভুরায়।
মহাতোষে ঘোষে প্রশ্ন কৈলা পুনরায় ॥
গুরুর নিকটে মন্ত্র লইয়াছ কি-না।
উত্তর—লইব দিলে করিয়া করুণা ॥
বরাবর দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা তাহার।
যিনি সেই গুরু ভবসিন্ধুকর্ণধার ॥
তিনি যদি দেন মন্ত্র নিজে কানে প্রাণে।
লইব, নতুবা নয় শরীর-ধারণে ॥

... ...

অতঃপর ভক্তবরে শ্রীআজ্ঞা তখন।
রসনা বাহির কর দেখিব কেমন ॥
অঙ্গুলির অগ্র দিয়া জিহ্বার উপর।
কিবা লিখিলেন প্রভু তাঁহার গোচর ॥
শ্রীপ্রভুর উচ্চ কৃপা তাহার লক্ষণ ॥
অঙ্গুলির অগ্র দিয়া জিহ্বায় লিখন ॥

... ...

শহরে আসিতে আজি প্রভুর বাসনা।
কোথায় যাবেন তার নাহিক ঠিকানা ॥
ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার তরে।
কালীকে কহেন তুমি লয়ে চল ঘরে ॥

কালীপদ সুগায়ক ছিলেন, বেহালা ও বাঁশী বাজাইতে পারিতেন। ঠাকুর একদিন সমাধিস্থ হইয়াছিলেন তাঁহার বাঁশী শুনিয়া। ঠাকুরের সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি সুন্দর গান রচনা করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্র

প্রেমিক ভকত এক জুটে হেন কালে।
দেবেন্দ্র মজুমদার ব্রাহ্মণের ছেলে॥
মাঝামাঝি বয়স খর্ব বরণ সুন্দর।
শহরে চাকরি মাত্র, যশোহরে ঘর॥

দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার যখন ঠাকুরের কাছে আসেন দক্ষিণেশ্বরে (মাঘ, ১২৯০) তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর। নড়াইল মহকুমার জগন্নাথপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম। পিতা প্রসন্ননাথ দেহত্যাগ করেন তাঁহার জন্মের দুইমাস পূর্বে। জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন সুকবি, দেবেন্দ্রের মধ্যেও এই কাব্যপ্রতিভার স্ফুরণ হইয়াছিল। তাঁহার লেখাপড়া বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই, কিন্তু তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল এবং তিনি দলিলপত্রাদি-লেখায় দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি সুন্দর সেতার বাজাইতেও পারিতেন।

সুরেন্দ্রনাথ যোগাভ্যাস করিতেন, তাঁহার প্রেরণায় দেবেন্দ্রও যোগাভ্যাস করেন প্রায় এগার বৎসর ধরিয়া। এই সময়ে তিনি নানা দেবদেবী দর্শন করিতেন, জ্যোতি দর্শন করিতেন, অশ্রুতপূর্ব ধ্বনি শ্রবণ করিতেন। কিন্তু এত দর্শন-শ্রবণ করিয়াও তাঁহার প্রাণে শান্তি হইত না। মাতুল হরীশচন্দ্র মুস্তফীর সহিত তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাইতে আরম্ভ করিলেন, কেশব সেনের বক্তৃতায় এবং উপাসনায়ও যোগ দিলেন, কিন্তু তাহাতেও প্রাণের পরিতৃপ্তি হইল না। অবশেষে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের কথা জানিতে পারিয়া তিনি সেখানে যাইয়া উপস্থিত হন। গুরুলাভের জন্য এই সময়ে তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়াছিল।

'কোথা থেকে আসচ?' ঠাকুর তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, এবং উত্তর শুনিয়া, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধারী বঙ্কিম ঠাম অনুকরণ করিয়া কহিলেন, কি

এমনি এমনি দেখতে? 'আজ্ঞে না, আপনাকে দেখতে এসেচি।' দেবেন্দ্র উত্তর দিলেন। ঈষৎ ক্রন্দনের সুরে ঠাকুর বলিতে লাগিলেন: আর আমায় কী দেখবে বল? পড়ে গিয়ে আমার হাত ভেঙ্গে গেছে। হাত দিয়ে দেখ না এই জায়গাটি, হাড় ভেঙ্গে গেছে কি-না। বড় যন্ত্রণা, কী করি? 'কী করে ভেঙ্গেচে?' দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতেই ঠাকুর কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন: ও একটা অবস্থা হয় তাইতে পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেছে। ওষুধ দিলে বাড়ে। অধর সেন ওষুধ দিয়েছিল, তাতে আবার ফুলে গেল; তাই আর কিছু দিই নি। হাঁগা, সারবে তো? 'আজ্ঞে সেরে যাবে বইকি।' দেবেন্দ্র উত্তর দিলেন। বালকের মত আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইয়া ঠাকুর সকলকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, ওগো, ইনি বলচেন আমার হাত সেরে যাবে, ইনি কলকাতা থেকে এসেচেন।[১]

অনন্তর ঈশ্বরীয় কথা হইতে লাগিল। ঠাকুর কহিলেন: প্রেম কাকে বলে জান? যখন ভগবানের নামে সমস্ত জগৎ ভুল হয়ে যাবে, নিজেকে ভুল হয়ে যাবে—ঝড় উঠলে যেমন গাছপালা সব চেনা যায় না, সব এক রকম দেখায়, তেমনি ভগবৎপ্রেমের উদয় হলে সব ভেদবুদ্ধি চলে যায়। মধ্যাহ্নে বিষ্ণুঘরের প্রসাদ আনাইয়া ঠাকুর দেবেন্দ্রকে ভোজন করাইলেন। অপরাহ্নকালে দেবেন্দ্র অসুস্থতা বোধ করিতেছেন জানিতে পারিয়া—পূর্ব হইতেই তাঁহার ম্যালেরিয়া জ্বর হইত মাঝে মাঝে—বিষম চিন্তিত হইয়া ঠাকুর তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন নৌকায় করিয়া, বাবুরামকে সঙ্গে দিয়া। একচল্লিশ দিন পরে এই সাংঘাতিক জ্বরের বিরাম হইল।

ইহার পরে বেশ কিছুদিন তিনি আর ঠাকুরের কাছে যান নাই। দক্ষিণেশ্বরের নামে তাঁহার কেমন একটা আতঙ্ক হইত। তিনি গায়ত্রীজপে মন দিলেন; জপ করিতে করিতে একএক দিন রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইতে লাগিল। ঠাকুরের নামের জাদু আবার একদিন তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল বাগবাজারে, বলরাম বসুর বাড়ীতে। 'সুলভ সমাচার'-পাঠে

১ রেলের উপর পড়িয়া গিয়া ঠাকুরের বাঁ হাতের কব্জির হাড় স্থানচ্যুত হইয়াছিল, মধুসূদন ডাক্তার বাড় বাঁধিয়া দেন ও হাতটি সারিয়া যায়।

তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন ঠাকুর সেখানে আসিবেন। প্রণাম করিবামাত্র ঠাকুর তাঁহার পিঠে হাত রাখিয়া বলিলেন, কিগো, কেমন আছ? এতদিন ওখানকে যাও নি কেন? আমি যে তোমার কথা প্রায়ই ভাবি। ইহার পর হইতে দেবেন্দ্র ঠাকুরের কাছে যাইতেন নিয়মিতভাবে।

দেবেন্দ্রের ইচ্ছা হইল গুরুসেবা করিবেন; ঠাকুর ঝাউতলায় শৌচে যাইতেছিলেন, দেবেন্দ্র তাঁহার অনুগমন করিলেন গাড়ু হাতে নিয়া। পঞ্চবটীর কাছে যাইয়া পিছন ফিরিয়া ঠাকুর দেখিতে পাইলেন ও জিভ কাটিয়া কহিলেন, অ্যাঁ, তুমি কেন নিয়ে আসচ? তোমার সঙ্গে যে আমার ও-ভাব লয়—তোমার সঙ্গে যে আমার ও-ভাব লয় গো। ঠাকুরের কথায় চিন্তাকুল হইয়া দেবেন্দ্র ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন, পঞ্চবটীমূলে বসিয়া। ধ্যানভঙ্গে দেখিলেন ঠাকুর প্রসন্নমুখে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। মধুরবাক্যে কহিলেন ঠাকুর: দেখ, তোমায় কিছু করতে হবেক নি, তুমি সকালে আর সন্ধ্যায় হাততালি দিয়ে হরিনাম কোরো, তা হলেই হবেক। হরিনাম চৈতন্যদেব প্রচার করেছিলেন, বড় সিদ্ধ নাম। আর এখানকে আনাগোনা করলে সব হয়ে যাবেক। তুমি অনেক করেচ বটে, কিন্তু খাপে খাপে লাগে নি; কি জান, যে ঘরের যে।

কালীপ্রসাদকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, তোমাদের পাড়ায় দেবেন্দ্র থাকে, তার সঙ্গে আলাপ কোরো; সে বড় প্রেমিক ভক্তলোক, সে কেমন শ্রীকৃষ্ণের গান বেঁধেচে শোনো। ঠাকুর স্বয়ং সেই গানটি শুনিয়া ভাবস্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার ভাইঝি লক্ষ্মী গানটি শিখিয়াছিলেন।

একদিন দেবেন্দ্র এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন—তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের পত্নী হইয়াছেন! স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া ঠাকুর গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন: এই রকম স্বপ্ন দেখা বড় ভাগ্যের কথা। (একটু থামিয়া) তোমার গোপীভাব কিনা, তাই অমন দেখেচ; ওরকম স্বপ্ন হলে কামটামগুলো ক্রমে মন থেকে চলে যায়।

দেবেন্দ্র এতদিনে নিজের ঘর জানিতে পারিলেন ও স্ব-ভাবে স্থিত হইয়া চিরতরে নিশ্চিন্ত হইলেন।

সংস্কৃত ভাষার তোটকচ্ছন্দে বাঙ্গলা ভাষায় তিনি অপূর্ব 'শ্রীগুরু-স্তবাষ্টক' রচনা করিয়াছিলেন। ইহার বহুল প্রচার হইয়াছে সকল গুরুভক্ত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে। অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গানও তিনি লিখিয়াছিলেন।

অধর

প্রভুর শরণাপন্ন ভক্ত একজন।
গুণবান পণ্ডিত শহরে নিকেতন॥
সুবর্ণবণিক জেতে মহাভাগ্যধর।
উপাধি তাঁহার সেন, নাম শ্রীঅধর॥
হাকিমী চাকরি করে কোম্পানির ঘরে।
সরলস্বভাব সবে সমাদর করে॥
দেবভাষা সংস্কৃত বিশেষিয়া জানা।
...
শ্রীমহিম চক্রবর্তী কাশীপুরে ঘর।
জমিদার তদুপরি পণ্ডিতপ্রবর॥
শাস্ত্রালাপে অনুরাগ নানা শাস্ত্র পড়ে।
রাখিয়া পণ্ডিত এক আপনার ঘরে॥
একদিন অধর তথায় উপনীত।
সে সময়ে তন্ত্রপাঠ করেন পণ্ডিত॥
যেন তাঁহাদের ধারা ব্যাখ্যা সহকারে।
ব্যাখ্যায় অধরচন্দ্র প্রতিবাদ করে॥
মহিম তাহাতে কৈল অন্যবিধ মানে।
এইরূপে বিবাদে পড়িল তিন জনে॥
... ...
মীমাংসার হেতু সবে সেইক্ষণে ছুটে।
দক্ষিণশহরে শ্রীপ্রভুর সন্নিকটে॥
... ...
প্রভুকে জিজ্ঞাসা প্রশ্ন করিবার পূর্বে।
আপনি করেন ব্যাখ্যা আপনার ভাবে॥
অবাক হইয়া শুনে দ্বন্দ্বী তিনজন।
সে অংশে প্রভুর ব্যাখ্যা চতুর্থ রকম॥

প্রাণে প্রাণে সেই অর্থ পশিল সবার।
ফুটিল আলোক গেল গরিমা বিস্থার ॥
অধরের মহাভ্রান্তি একেবারে দূর।
চৌগুণ বিশ্বাস বাড়ে চরণে প্রভুর ॥

খুব সম্ভবতঃ ১২৮৯ সালের শেষাশেষি অধরলাল সেন ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। তাঁহার বয়স তখন আটাশ বৎসর হইবে। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট-রূপে তিন বৎসর কলিকাতার বাহিরে, চট্টগ্রামে ও যশোহরে, কার্য করিয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া।

অধরের জন্ম হইয়াছিল কলিকাতায়, আহিরীটোলার শঙ্কর হালদার লেনে, পিতৃগৃহে। তাঁহার পিতা রামগোপাল পরে বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীটে নূতন বাড়ী নির্মাণ করিয়া সপরিবার সেখানে বাস করিতেন। ৯৭ নম্বর এই বাড়ীতে ঠাকুর বহুবার শুভাগমন করিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, ভাবে দেখলুম অধরের বাড়ী, বলরামের বাড়ী, সুরেন্দরের বাড়ী, এসব আমার আড্ডা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র অধরলাল কবি ও পুরাতত্ত্ব-গবেষক ছিলেন। ছাত্রজীবনেই তাঁহার কয়েকখানি কবিতার বই প্রকাশিত হয়। ভারত সরকার তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত করেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার সহাধ্যায়ী।

জাগতিক অভ্যুদয়ের কামনা ছিল অধরের মনে; কিন্তু ঠাকুরের সহিত মিলনের সময় হইতেই দেখা যায় ঠাকুর তাঁহাকে নিবৃত্তির পথে পরিচালিত করিতেছেন, ভালবাসায় আপন করিয়া লইয়া। 'তুমি আমার আত্মীয়'—ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন:

'তুমি ডিপুটি। এ পদও ঈশ্বরের অনুগ্রহে হয়েচে, তাঁকে ভুলো না। কিন্তু জেনো, সকলের একপথে যেতে হবে। এখানে দুদিনের জন্যে।

'সংসার কর্মভূমি, এখানে কর্ম করতে আসা। যেমন দেশে বাড়ী, কলকাতায় গিয়ে কর্ম করে।

'কিছু কর্ম করা দরকার—সাধন। তাড়াতাড়ি কর্মগুলি শেষ করে নিতে হয়।' [কথামৃত]

ঠাকুর একদিন অধরের জিহ্বায় অঙ্গুলি দ্বারা মন্ত্রবর্ণ লিখিয়া দিয়াছিলেন। কার্যান্তে আপিস হইতে ফিরিয়া অধর দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাইতেন গাড়ীতে করিয়া। ক্লান্তিবশতঃ সেখানেই ঘুমাইয়া পড়িতেন ঠাকুরের ঘরে। ঠাকুরকে বাড়ীতে আনিয়া তিনি মাঝে মাঝে আনন্দোৎসব করিতেন, ভক্তগণকে লইয়া। ঐরূপ এক উৎসবের দিনে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ঠাকুরকে দর্শন করেন।

১২৯১ সালের ২রা মাঘ অধর দেহত্যাগ করেন অকালে। তিনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। সহসা ইষ্টদর্শন হওয়ায় নিজেকে তিনি সামলাইতে পারেন নাই, ঠাকুর বলিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে ঘোড়ায় চড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন; তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া কাঁদিয়াছিলেন।

ভূপতি

জটিল ভূপতি ভাই ব্রাহ্মণকুমার।
ভাষার ভাণ্ডার নাই গুণ গাইবার॥
বয়স বিশের মধ্যে সুন্দর বরণ।
নহে লম্বা নহে বেঁটে দোহারা গড়ন॥
অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সময়।
বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা কথা কহিবার নয়॥
ধীর শান্ত বিনয়ী মধুর মিষ্টভাষী।
চারুশীল চিন্তাশীল বিজন-প্রয়াসী॥
গুণাদির মধ্যে এক অত্যন্ত প্রবল।
দুনিয়ায় নাহি কেহ এমন সরল॥

... ...

কুতদার এইখানে বসতি শহরে।
ধর্মচর্চা হয় ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে॥
বিবেক-প্রাপ্তির হেতু ধর্ম-আলোচনা।
বিবেক অত্যুচ্চ বস্তু হৃদয়ে ধারণা॥

শুনিয়া প্রভুর নাম-মাহাত্ম্য-ভারতী।
দরশনে উপনীত হইল ভূপতি ॥
আশ্বাসিয়া আশ্বাসবাক্যেতে ভগবান।
চরণে শরণাপন্ন জনে দিলা স্থান ॥

... ...

একদিন মন্দিরের দুয়ারের ধারে।
বিহ্বল হইয়া গায় অনুরাগ-ভরে ॥
হৃদয়বিভেদী ভাবে মরমের গান।
গণ্ড বেয়ে ঝরে অশ্রু ধারার সমান ॥

... ...

হরি কাণ্ডারী যেমন এমন কি আর আছে নেয়ে।
পার করেন দীন জনে অভয় চরণতরী দিয়ে ॥

হৃদয়বিহারী প্রভু ভক্তহৃদে বাস।
দেখিয়া ভক্তের ভক্তিভাবের উচ্ছ্বাস ॥
দ্রুতগতি-প্রকৃতি বিজলী যেন ছুটে।
উপনীত ভাবাবেশে ভক্তের নিকটে ॥
এই লহ বলিয়া দক্ষিণ শ্রীচরণ।
ভক্তের কোমল বক্ষে করিলা অর্পণ ॥

... ...

একদিন প্রভুর সম্মুখে ভক্তবর।
পাতিয়া নয়ন দুটি প্রভুর উপর ॥
উপবিষ্ট যুক্তকরে স্বভাবে মগন।
হেন কালে বলিলেন প্রভু নারায়ণ ॥
দাঁড়াইয়া ভাবাবেশে ভাবের বিহ্বলে।
দেখিতে এতই সাধ দেখ আঁখি মেলে ॥
দেবেশবাঞ্ছিত দৃশ্য দেখে ভক্তবর।
বিরাজিত দেবত্রয় অঙ্গের ভিতর ॥

... ...

আর দিন প্রভুদেব কল্পতরুবেশে।
দাঁড়াইয়া ভূপতির সম্মুখপ্রদেশে ॥

ভাবেতে বিভোর অঙ্গ করে টলটল।
বলিলেন ভক্তবরে কি মাগিস বল্॥
বিবেক সর্বোচ্চ বস্ত ভূপতির জানা।
তাহাই প্রভুর কাছে করিল প্রার্থনা॥
মৌন থাকি কিছুক্ষণ গৌণে কন তাঁরে।
এত সাধ, থাক তবে সপ্তমের ঘরে॥

'তাই ভূপতি'র জ্ঞানীর ভাব। কলিকাতার বাড়ীতে একদিন তাঁহাকে দেখাইয়া মাতাঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন: ঠাকুর বলেছিলেন, 'ভূপতি, আমার কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে দাও তো।' ভূপতি ঠাকুরকে দেখিয়ে নিজের কপালে ফোঁটাটি নিলে!

নবগোপাল

সমুদিত আসরে হইল এ সময়।
প্রভুর পরম ভক্ত শুন পরিচয়॥
বাদুড়বাগানে বাড়ী শহরের মাঝে।
আপিসেতে উচ্চপদে অভিষিক্ত নিজে॥

... ...

বারে বারে এইবার বিয়া তিন বার।
পুরাণে নূতনে ছেলে গণ্ডা দুই তাঁর॥
হাতে যিনি সর্বশেষ অতি ভক্তিমতী।
শ্রীপ্রভুর শ্রীচরণে অচলা ভকতি॥
প্রকৃতি সুন্দর, যদি জাতিতে কামিনী।
শিরে ধরে পরাভক্তি সমুজ্জ্বল মণি॥
পর-উপকারে স্বামী বড়ই সন্তোষ।
নাম নবগোপাল উপাধি তাঁর ঘোষ॥

... ...

প্রথম দর্শন-দিনে বেশী রঙ্গ নয়।
নাম ধাম এটা সেটা বাহ্য পরিচয়॥
এক আজ্ঞা করিলেন প্রভু নারায়ণ।
করিবারে নিত্য নিত্য ঘরে সংকীর্তন॥

বয়সে নবগোপাল ঠাকুরের অপেক্ষা চারি বৎসর বড় ছিলেন। তাঁহার ভক্তিমতী স্ত্রীর নাম শ্রীমতী নিস্তারিণী। কৃষ্ণনগরের কিশোরীমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁহারা আসিয়াছিলেন ঠাকুরকে দর্শন করিতে।

কিশোরী ভক্তের মধ্যে বড়ই বিটল।
গড়ন যেমন তেন অন্তর সরল॥
জোরে জোরে কয় কথা প্রভুর সদনে।
সর্বদা মেলানি করে প্রভু-দরশনে॥
রাখিয়া যুবতী ভার্যা শ্বশুরের ঘরে।
যামিনী কাটায় হেথা প্রভুর মন্দিরে॥
শ্বশুর-ঘরের লোক পাইয়া সন্ধান।
তাড়া করে শ্রীমন্দিরে যেথা ভগবান॥
লোকবশীকরণের দিয়া নিন্দাবাদ।
প্রভুর সঙ্গেতে করে তুমুল বিবাদ॥
তার সঙ্গে শত শত কটু কথা কয়।
সর্বসহ প্রভুদেব তাই তাঁর সয়॥
সংগোপনে কিশোরীকে কন প্রভুরায়।
এখানে আসিতে করি নিষেধ তোমায়॥
অভিমানে যায় মাত্র থাকিতে না পারে।
পুনঃ উপনীত দুইতিন দিন পরে॥

এদিকে ঠাকুরের আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া নবগোপাল নিষ্ঠার সহিত প্রতিদিন হরি-সংকীর্তন করিতে লাগিলেন পুত্র-কন্যাদিগকে সঙ্গে নিয়া, নিজের ঘরে বসিয়া। এইরূপে এক এক করিয়া তিন বৎসর গত হইল দেখিতে দেখিতে। কাল পূর্ণ হইতে ঠাকুরই তাঁহাকে আকর্ষণ করিলেন, কিশোরীকে দিয়া একটিবার দেখা করিবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন।

সন্দেশ পশিবামাত্র গোপালের কানে।
বিস্ময়ে আবিষ্ট-চিত্ত চমকিত প্রাণে॥
মনে মনে ভাবে এ কি করুণা অপার।
তিন বর্ষ পূর্বে সঙ্গে দেখা একবার॥

কত লোক দিন দিন আসে যায় কাছে।
তথাপি অদ্যাপি মোরে মনে তাঁর আছে॥

... ...

আনন্দের সীমা নাই রবিবার দিনে।
শুভযাত্রা করিলেন প্রভু-দরশনে॥
সঙ্গে ভক্তিমতী সহধর্মিণী তাঁহার।
ছোট বড় যতগুলি কুমারী কুমার॥
উতরিয়া শ্রীমন্দিরে শ্রীপ্রভুর পায়।
জনে জনে শ্রীচরণে গড়াগড়ি যায়॥
এতদিন কেন আর নাহি ছিল আসা।
স্নেহভরে গোপালেরে করিলা জিজ্ঞাসা॥
গোপাল শ্রীপ্রভুদেবে করিল উত্তর।
স্বর-যোগে গেল মোর এ তিন বচ্ছর॥
শ্রীপ্রভু বলেন যোগ্য সাধনভজন।
করিবার তোমার নাহিক প্রয়োজন॥
বারত্রয় মাত্র তুমি আসিও হেথায়।
বাসনা হইবে পূর্ণ মায়ের কৃপায়॥

... ...

কেমন লাগিল চক্ষে প্রভুগুণধরে।
গোপাল থাকিতে আর নাহি পারে ঘরে॥
প্রভুর মূরতি চিন্তা দিবসযামিনী।
অবসর পাইলেই গোচরে মেলানি॥

... ...

কুমারদিগের মধ্যে সুরেশ যে জন।
পাঁচছয় বর্ষমাত্র মোটে বয়ঃক্রম॥
আশ্চর্য বালক কিবা হেন বয়ঃক্রমে।
খোলেতে সঙ্গত করে কীর্তনের গানে॥
জন্মাবধি তাল-বোধ ভক্তিভরা ঘট।
শিশুর আদর বড় প্রভুর নিকট॥

নবগোপালের ইচ্ছা, এক রবিবারে বাড়ীতে মহোৎসব করিবেন ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তগণকে লইয়া। ঠাকুর সানন্দে সম্মতি দিলেন, ভক্তেরা আহূত হইলেন। পুঁথিকার লিখিয়াছেন স্বচক্ষে এই মহোৎসবলীলা সন্দর্শন করিয়া :

এই মহোৎসবে যাহা করিলা গোসাঁই।
এমন কোথাও আমি চক্ষে দেখি নাই ॥
কথা তার বলিবার শক্তি মম কিবা।
বলিতে করিলে চেষ্টা আগে হই বোবা ॥

বহিঃপ্রাঙ্গণে উৎসবের স্থান হইয়াছে। শত শত লোকে বাড়ীখানি হইয়াছে পরিপূর্ণ। পথের দুই ধারের বাড়ীগুলির ছাদেও বহু লোক জমা হইয়াছে, ঠাকুরকে দর্শন করিবে। এক কথক ব্রাহ্মণ ভাগবত-পাঠ করিতেছিলেন, ঠাকুরের আসার পরেই তিনি পাঠ সমাপ্ত করিলেন ও বনোয়ারী নামে এক বৈষ্ণব মাথুর কীর্তন ধরিলেন।

কীর্তনে আখর-যোগ শ্রীপ্রভুর ধারা।
যাহে ক্রমে প্রভু হন নিজে মাতোয়ারা ॥
ঘন ঘন ভাবাবেশ সমাধি গভীর।
ইন্দ্রিয়াদি সহ দেহ একেবারে স্থির ॥
... ...
বিষম লাটুর ভাব উদয় প্রবল।
নখ দিয়া বিদারণ করে রক্ষঃস্থল ॥
কৃষ্ণেতে মধুরভাব দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
উপলক্ষ-গুরু মোর আরাধ্যচরণ ॥
সখী নামে জানা তিনি ভক্তের ভিতরে।
মগন হইলা ভাবে কালিয়া-পাথারে ॥
অল্পবয়ঃ মণিগুপ্ত[1] বালক-বয়েস।
বাহ্যহীন শ্যাম-কুণ্ডে করিল প্রবেশ ॥
আর কেহ কাঁদে কেহ ভাবোন্মত্তপ্রায়।
তিলেকে তুমুল কাণ্ড ঘটাইলা রায় ॥

---

১ মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত কবি ঈশ্বর গুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের দৌহিত্র।

... ...

আপনার ভাবে নিজে হইয়া মোহিত।
ধরিলেন একখানি কীর্তনের গীত॥
বড়ই মধুর প্রাণ-মাতানিয়া গান।
একত্রে ভক্তেরা তাহে কৈল যোগদান॥

... ...

গীতের সহিত নৃত্য সিংহের বিক্রম।
সঙ্গে ধরা কম্পমান ভীষণ গর্জন॥
তাহার মধ্যেতে কভু কলেবর স্থির।
বাহ্যিক গিয়ানশূন্য সমাধি গভীর॥
কভু কান্তিময় মুখ চন্দ্রিমার পারা।
কখন নয়নে বহে বরিষার ধারা॥
কখন সঘনে পাণি কাঁপে ঘন ঘন।
কখন খসিয়া পড়ে কটির বসন॥
স্বরের জড়তা কভু বাক্য নাহি ফুটে।
কখন বা উচ্চরব রসনায় উঠে॥

... ...

আর ভক্তেরা—

কেহ বা অচলপদ বাহ্য নাহি পায়।
কেহ বা অর্ধেক বাঁকা ধনুকের প্রায়॥
কেহ বা উন্মুক্ত-আঁখি স্থির আঁখি-তারা।
দাঁড়াইয়া একধারে বুদ্ধিবলহারা॥
কেহ পাগলের পারা ভীম হাস্য করে।
সরোদনে লুটে কেহ ধরার উপরে॥
নাচিয়া নাচিয়া কেহ বলে হরি হরি।
কেহ শ্রীচরণতলে যায় গড়াগড়ি॥

... ...

ভক্তগণ অনেকে অধীর-কলেবর।
দলে দলে ঢালি পড়ে ভূমির উপর॥

কদলীর ঝাড় যেইরূপ উপমায়।
একমুখে ধরাসাৎ হয় ঝঞ্ঝাবায় ॥
প্রভুরায় কি করিলা শুন বিবরণ।
যেখানে ভক্তের মালা ধূলায় পতন ॥
প্রসারি দক্ষিণপদ সেব্য কমলার।
তদুপরি সমাধিস্থ হইলা আবার ॥
প্রত্যাকৃতি ছবিখানি কি কহিব লিখে।
যেমন দক্ষিণা কালী মহেশ্বর-বুকে ॥
শ্রীঅঙ্গ পশ্চাতে হেলা পাছে পড়ে ভুঁয়ে।
সেহেতু দুজন ভক্ত ধরিলেন গিয়ে ॥
এবে অপরূপ কিবা শ্রীমুখ প্রভুর।
ঢলঢল ঝলমল যেমন মুকুর ॥
কোমল প্রশান্ত মূর্তি ধীরে ধীরে খেলে।
নয়নের মনোলোভা দেখিলেই ভুলে ॥
অন্তরালে ভক্তিমতী কুলবতীগণ।
করিতে লাগিল শঙ্খনাদ ঘন ঘন ॥
বাহিরে কাঁসর-ঘণ্টা তার সঙ্গে বাজে।
গোলোকের ছবি আজি অবনীর মাঝে ॥

ক্রমে ঠাকুরের সমাধি-ভঙ্গ হইল, তিনি নিজের আসনে গিয়া বসিলেন। রাত্রি তখন প্রায় একপ্রহর হইয়াছে। ভোজনের জন্য ঠাকুরকে লইয়া যাওয়া হইল অন্তঃপুরে, দ্বিতলের একটি ঘরে।

এত কুলবতী আজি গোপালের ঘরে।
সুবৃহৎ অন্তঃপুর তাহাতে না ধরে ॥
... ...
যদি পরশন-আশে কেহ কাছে যায়।
মা বলিয়া সমাধিস্থ তখনই রায় ॥
গুটাইয়া পদদ্বয় কোলের ভিতরে।
শঙ্কায় সান্নিধ্যে কেহ যাইতে না পারে ॥
ব্যাপার দেখিয়া তবে গোপাল-ঘরণী।
প্রার্থনা করেন মনে জুড়ি দুই পাণি ॥

কৃপাসিন্ধু দীনের ঠাকুর তুমি রায়।
শ্রীচরণরেণু আজি কাঙ্গালিনী চায়॥
ভক্তিমতী ভাগ্যবতী সরল-অন্তরা।
পদরজ-হেতু ভক্তে দেখিয়া কাতরা॥
অন্তরে অন্তরে প্রভু দিলা তাঁরে সায়।
গ্রহণ করহ রজ ইচ্ছা যেন যায়॥

... ...

অটল বিশ্বাসভক্তি পাইয়া এখন।
প্রকাশ্যে প্রার্থনা করে প্রভুর সদন॥
পূরাইয়া দেহ সাধ বড় মনে মনে।
নিজ হাতে দিব ভোজ্য তুলিয়া বদনে॥
বচনে উত্তর কিছু নাহি দিলা রায়।
অন্তরে প্রদান কৈলা অনুমতি তাঁয়॥
তখন গৃহিণী দেবী মহানন্দ-মনে।
স্বহস্তে তুলিয়া ভোজ্য দিলেন বদনে॥

... ...

শুনি গৃহিণীর ভক্তি প্রভুর বদনে।
নমস্কার উদ্দেশে করেন ভক্তগণে॥

... ...

চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় চতুর্বিধ রসে।
গোপাল করিল তুষ্ট ভক্তগণে শেষে॥

দুর্গাচরণ

গুরু হতে লঘু কিসে অতি গুরুতর।
ক্ষুদ্রাকার শিলা কিসে শৈলের উপর॥
বলীর অপেক্ষা বলী, বলহীন কিসে।
কিসে হারে অহঙ্কারী দীনের সকাশে॥
প্রভুর অপেক্ষা কিসে দাস বলবান।
উন্নতের চেয়ে কিসে পতিতের মান॥
দেখিবার বাসনা যগুপি থাকে মন।
আইল ভকত এক কর দরশন॥

কৃষ্ণবর্ণ সে পুরুষ মাংস নাহি গায়।
আছে খালি অস্থিগুলি সব গণা যায়॥
স্বভাবেতে যুক্তকর ধীর ধীর চলা।
বক্র দেহ মাথাখানি মাটিপানে হেলা॥
আঁখি দুটি পরিপাটি অতি দীপ্তিমান।
দৃষ্টিশক্তি পায় স্ফূর্তি শিখার সমান॥
মূর্তিমান বহ্নি যেন ছাই মাখা গায়।
উত্তপ্ত সমস্ত গাত্র কাছে ঘেঁষা দায়॥
অঙ্গরাগে উদাসীন রুক্ষ চুল শিরে।
লজ্জা-আবরণ বাস তাঁহার বিচারে॥
... ...
বঙ্গদেশে দেওভোগ গ্রামে জন্মস্থান।
নারায়ণগঞ্জ তার অতি সন্নিধান॥
... ...
নাম দুর্গাচরণ উপাধি নাগ তাঁর।
কায়স্থ কুলের আলো গোটা বাঙ্গলার॥

খুব সম্ভবতঃ ১২৮৯ সালে দুর্গাচরণ নাগ ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন দক্ষিণেশ্বরে, তাঁহার ব্রাহ্মবন্ধু সুরেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে যাইয়া। তাঁহার বয়স তখন ছত্রিশ বৎসর হইবে।

সুরেশ কলিকাতার অন্তঃপাতী হাটখোলার দত্ত বংশের সন্তান। প্রথম জীবনে নিরাকারবাদী হইলেও ঠাকুরের সহিত মিশিবার ফলে তিনি পরে সাকারে বিশ্বাসী হন ও 'পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি' নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন (১২৯১)। এই পুস্তিকা ক্রমশঃ বর্ধিতকলেবর হইয়া অবশেষে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ' নামে বৃহদাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সুরেশ অপেক্ষা দুর্গাচরণ চারি বৎসর বড় ছিলেন, সুরেশ তাঁহাকে মামা বলিয়া ডাকিতেন।

দুর্গাচরণের পিতা দীনদয়াল কলিকাতায় কুমারটুলীর এক খোলার ঘরে থাকিয়া পালচৌধুরী-বাবুদের গদীতে কাজ করিতেন। আট বছর

বয়সে মাতৃহারা হইয়া দুর্গাচরণ তাঁহার বিধবা পিসীমার দ্বারা প্রতিপালিত হন। পিসীমাকেই তিনি মাতৃসম্বোধন করিতেন, পিসীমার মুখে পুরাণের গল্প শুনিয়া রাত্রে দেবদেবীর স্বপ্ন দেখিতেন।

নারায়ণগঞ্জে বঙ্গ বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করিয়া তিনি ঢাকার নর্ম্যাল স্কুলে পড়াশুনা করেন দেড়বৎসর ধরিয়া। এই সময়ে তাঁহাকে দশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে হইত প্রতিদিনের যাতায়াতে, পায়ে হাঁটিয়া। তিনি বাঙ্গলা রচনায় পটু হইয়াছিলেন, এবং ঐকালে লিখিত প্রবন্ধগুলি 'বালকদিগের প্রতি উপদেশ' নামে মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন, কলিকাতায় আসিবার পরে। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল।

কলিকাতায় আসিবার পূর্বেই পিসীমার পীড়াপীড়িতে তাঁহাকে বিবাহ করিতে হয়। তাঁহার ও তাঁহার ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল একই দিনে। বিবাহিত হইয়াও তিনি স্ত্রীর সহিত এক ঘরে শয়ন করেন নাই একদিনও! অল্পদিন পরে স্ত্রীও মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কলিকাতায় তিনি ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ীর কাছে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করেন, ডাক্তারের সঙ্গে রোগীদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। হোমিওপ্যাথি শিখিবার আগে কিছুদিন তিনি ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলেও পড়িয়াছিলেন। ছাত্রাবস্থা হইতেই ছোট একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স কিনিয়া তিনি গরীবদের চিকিৎসা করিতেন পারিশ্রমিক না নিয়া।

সুরেশের সঙ্গে দুর্গাচরণ মাঝে মাঝে ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। কেশবের বক্তৃতা তাঁহার ভাল লাগিত, কিন্তু সমাজের আচারাদি মনঃপূত হইত না। সাধুসন্ন্যাসীদের সহিত তিনি মিশিতেন, গঙ্গাতীরে বা শ্মশানঘাটে আপন মনে বসিয়া থাকিতেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া। শ্মশানে মহানিশায় জপ করিয়া তিনি এক শুভ্রজ্যোতি দর্শন করেন ও ইহার ফলে তাঁহার জপনিষ্ঠা বাড়িয়া যায়।

পুত্রের স্বভাব লক্ষ্য করিয়া দীনদয়াল উদ্বিগ্ন হইলেন, একটি পাত্রী ঠিক করিয়া বিবাহ করিবার জন্য তাঁহাকে দেশে যাইতে বলিলেন, এবং বিবাহে

সম্মত করাইবার জন্য অন্নজল ত্যাগ করিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলেন। দুর্গাচরণকে আবার বিবাহ করিতে হইল সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও। ইহাতে সংসারের খরচ বাড়িল ও যৎসামান্য দর্শনী নিয়া তিনি চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার চিকিৎসায় ব্যাধিমুক্ত হইয়া কেহ অধিক টাকা দিতে চাহিলেও তিনি নিতে পারিতেন না; পালবাবুরা তাঁহাকে গৃহ-চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে কিছুই লইতেন না। অসহায় গরীব রোগীরা ঔষধ, পথ্য, পরিচর্যা ও প্রয়োজনীয় সব কিছুই পাইত তাঁহার নিকট হইতে।

মাতৃকল্পা পিসীমার অসুখের সংবাদ পাইয়া দুর্গাচরণ দেশে গেলেন ও যথাশক্তি তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিলেন। পিসীমার মৃত্যুতে তাঁহার স্বাভাবিক বৈরাগ্য চরমে উঠিল। ঘরে না থাকিয়া তিনি শ্মশানেই অনেক সময় কাটাইতেছেন শুনিয়া পিতা দেশে গিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন।

দীনদয়াল পাচক রাখিতেন না, নিজেই রান্না করিতেন, তাঁহার পুত্র চাহিতেন পিতাকে রান্না করিয়া খাওয়াইবেন। এই বিষয় নিয়া উভয়ের মধ্যে রাগারাগি ও বচসা লাগিয়াই থাকিত। পিতার পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্য দুর্গাচরণ সহধর্মিণীকে দেশ হইতে আনাইলেন এবং সুরেশের বাটীর নিকটে একটি দ্বিতল গৃহ ভাড়া নিয়া সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই পিতা তাঁহাকে সংসারে লিপ্ত করিতে পারিলেন না। ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া ও পিতাকে পড়িয়া শুনাইয়া তাঁহার অবসরকাল কাটিতে লাগিল।

কয়েকজন ব্রাহ্মভক্তের সহিত মিলিত হইয়া সুরেশ উপাসনা করিতেন গঙ্গাতীরে। উপাসনার পরে কীর্তন হইত। উপাসনাকালে দুর্গাচরণ ধ্যানমগ্ন হইতেন, কোনদিন বা বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেন। কীর্তনকালে ভাবাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে করিতে একদিন তিনি গঙ্গাগর্ভে পড়িয়া গিয়াছিলেন।

দীনদয়ালদের কুলগুরু রঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য দেশ হইতে আসিয়া দুর্গাচরণ ও তাঁহার সহধর্মিণীকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। কুলগুরু কৌলসন্ন্যাসী

ছিলেন, স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া দীক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন ; দুর্গাচরণও দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছিলেন এই সময়ে, প্রাণে প্রাণে। ইহার পর হইতে তাঁহার সাধননিষ্ঠা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল, জপধ্যানে রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইতে লাগিল। ধ্যানমগ্ন সাধক একদিন জোয়ারের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিলেন, হুঁশ হইলে সাঁতার কাটিয়া তীরে উঠিয়া আসেন। এইকালে তিনি অনেকগুলি শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেন।

'এই হাড়-মাসের খাঁচায় বদ্ধ হইও না, কায়িক সম্বন্ধ চিরস্থায়ী হয় না। আমাকে ছাড়িয়া মহামায়ার শরণ লও, তোমার ইহকাল পরকাল ভাল হইবে।' দুর্গাচরণ একথা বলিয়াছিলেন নিজের পত্নীকে। অতঃপর বৃদ্ধ পিতার কার্যভার নিজের উপরে লইয়া—দীনদয়াল পালবাবুদের অধীনে কুতের কাজ করিতেন—দুর্গাচরণ পিতাকে ও পিতার সেবার জন্য পত্নীকে দেশে পাঠাইয়া দেন, এবং দ্বিতল বাড়ী ত্যাগ করিয়া আগেকার খোলার ঘরটিতে চলিয়া আসেন। এই সময়ে ঠাকুরের সহিত তাঁহার মিলন সংঘটিত হয়।

প্রথম মিলনের দিন ঠাকুর সুরেশ ও দুর্গাচরণকে পাঁকাল মাছের মত নির্লিপ্তভাবে সংসারে থাকিতে বলিয়াছিলেন এবং স্বয়ং সঙ্গে করিয়া মন্দিরগুলি'ত লইয়া গিয়াছিলেন। এক সপ্তাহ পরে যখন তাঁহারা আবার গেলেন দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুর তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, এসেচ, তা বেশ করেচ ; আমি যে তোমাদের জন্যে এতদিন হেথায় বসে আছি। তারপরে দুর্গাচরণকে কাছে বসাইয়া বলিলেন, ভয় কী ? তোমার তো খুব উচ্চ অবস্থা। ঠাকুরের আজ্ঞায় তাঁহারা পঞ্চবটীতে গিয়া কিছুক্ষণ ধ্যান করিলেন, প্রথমদিনও করিয়াছিলেন, তারপরে সেবাকাঙ্ক্ষী দুর্গাচরণকে তামাক সাজিতে পাঠাইয়া সুরেশকে বলিলেন, দেখচ, এ লোকটা যেন আগুন—জ্বলন্ত আগুন !

তৃতীয়বার দুর্গাচরণ একাই যান দক্ষিণেশ্বরে। বিড়বিড় করিয়া কী বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঠাকুর কহিলেন, 'ওগো, তুমি না ডাক্তার, দেখ দিকি আমার পায়ে কী হয়েচে। ডাক্তার কিছুই দেখিতে পাইলেন না

পরীক্ষা করিয়া। 'ভাল করে দেখ না, কী হয়েচে!' ঠাকুর আবার কহিলেন। প্রাণের সাধ মিটাইয়া পায়ে হাত বুলাইয়া দুর্গাচরণ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। প্রথমদিন ঠাকুর তাঁহাকে পদস্পর্শ করিতে দেন নাই; সম্ভবতঃ সেই কারণেই দ্বিতীয় দিনও তিনি পদস্পর্শ করিবার চেষ্টা করেন নাই।

'তোমার এটা কী বোধ হয়?' নিজের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, আর কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া দুর্গাচরণ উত্তর দিলেন, 'প্রভু, আর আমায় বলতে হবে না, আপনারই কৃপায় আমি জানতে পেরেচি, আপনি সেই!' অমনি সমাধিস্থ হইয়া ঠাকুর স্বীয় দক্ষিণচরণ তাঁহার বুকে সংস্থাপিত করিলেন, আর দিব্যচক্ষে দুর্গাচরণ দেখিলেন, চরাচর বিশ্ব ব্রহ্মজ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত।

জ্যৈষ্ঠমাসের এক দুপুরে দুর্গাচরণের হাতে পাখাটি দিয়া ঠাকুর ঘুমাইলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া বাতাস করিতে করিতে তাঁহার হাত ভারী হইয়া উঠিল। ক্রমে যখন এমন হইল যে, হাত আর চলে না, অমনি ঠাকুর তাঁহার হাত ধরিয়া পাখা বন্ধ করিলেন। দুর্গাচরণ বলিতেন, ঠাকুরের নিদ্রাবস্থা সাধারণের মত নয়, তিনি সদাজাগ্রত।

দুর্গাচরণ একদিন শুনিলেন, ঠাকুর কোন ভক্তকে বলিতেছেন: দেখ, ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, দালাল—এদের ঠিক ঠিক ধর্মলাভ হওয়া কঠিন। এতটুকু ঔষধে মন পড়ে থাকলে কিরূপে বিরাট ব্রহ্মের ধারণা হবে? সেইদিনই দুর্গাচরণ ঔষধের বাক্স ও পুস্তকাদি গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন, বাসা হইতে লইয়া গিয়া। পূর্ব হইতেই তিনি অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন, রোগীদের চিন্তা তাঁহার ইষ্টধ্যানের প্রতিকূল।

তীব্র বৈরাগ্যের প্রেরণায় সংসারত্যাগের সংকল্প করিয়া তিনি ঠাকুরের অনুমতি লইতে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। গিয়াই শুনিলেন ঠাকুর বলিতেছেন: সংসারে দোষ কী? তাঁতে মন থাকলেই হল। সংসারে থাকলেও তোমাকে দোষ স্পর্শ করতে পারবে না। তুমি জনকের মত গৃহস্থাশ্রমে থাকবে, তোমাকে দেখে গৃহীরা যথার্থ গৃহস্থের ধর্ম শিখবে।

কেবল ঠাকুরের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই নাগ মহাশয় সংসারে থাকিয়া গিয়াছিলেন। অতুলন, অশ্রুতপূর্ব তাঁহার এই গার্হস্থ্য-জীবন। আমরণ তিনি কেবল মানুষেরই নহে, সকলপ্রকার প্রাণীরই সেবা করিয়াছেন, অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া, নিজেকে সকল ভোগসুখে বঞ্চিত রাখিয়া। 'সর্বদা হাত জোড় করিয়া থাকেন কেন?' এই প্রশ্নের উত্তরে অহিংসা ও দীনতার প্রতিমূর্তি এই মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, এক ভগবানই সকলের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, ভূতে ভূতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই!

পূর্ণ

সকলের শেষে যাঁর লীলাসরে আগুসার, কথা তাঁর অপূর্ব ভারতী।
চৌদ্দ বৎসরের ছেলে, জনম কায়স্থ কুলে, কলিকাতা শহরে বসতি॥
তাঁরে লয়ে কাণ্ড পূর্ণ, তাই তাঁর নাম পূর্ণ, মহাপুণ্য নাম-উচ্চারণে।

শিমলা পল্লীর প্রসিদ্ধ ঘোষ-বংশে পূর্ণচন্দ্রের জন্ম। তাঁহার পিতার নাম দীননাথ ঘোষ। লীলাপ্রসঙ্গকার লিখিয়াছেন:

"পূর্ণ যখন ঠাকুরের নিকটে প্রথম আগমন করে তখন তাহাকে নিতান্ত বালক বলিলেই হয়। বোধ হয়, তাহার বয়স তখন সবেমাত্র তের বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। তখন ঠাকুরের পরমভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র [মাষ্টার] বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা সংস্থাপিত শ্যামবাজারের বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন এবং বালকদিগের মধ্যে কাহাকেও স্বভাবতঃ ঈশ্বরানুরাগী দেখিতে পাইলে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে লইয়া আসিতেছিলেন।...পূর্ণের সুন্দর ও মধুর আলাপে তাঁহার চিত্ত একদিন আকৃষ্ট হইল,...তিনি ঠাকুরের সহিত বালকের পরিচয় করাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিলেন।...যথাসময়ে বিদ্যালয়ে আসিয়া পূর্ণ গাড়ী ভাড়া করিয়া দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাইয়া স্কুলের ছুটি হইবার পূর্বেই প্রত্যাগমনপূর্বক অন্যদিনের ন্যায় বাটীতে ফিরিয়া গিয়াছিল।

"পূর্ণকে দেখিয়া ঠাকুর সেদিন বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং পরম স্নেহে তাহাকে উপদেশ প্রদান ও জলযোগাদি করাইয়া ফিরিবার কালে বলিয়া দিয়াছিলেন, তোর যখনই সুবিধা হইবে চলিয়া আসিবি,

গাড়ী করিয়া আসিবি, যাতায়াতের ভাড়া এখান হইতে দিবার বন্দোবস্ত থাকিবে। পরে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'পূর্ণ নারায়ণের অংশ, সত্ত্বগুণী আধার, নরেন্দ্রের নীচেই পূর্ণের ঐ বিষয়ে স্থান বলা যাইতে পারে! এখানে আসিয়া ধর্মলাভ করিবে বলিয়া যাহাদিগকে বহুপূর্বে দেখিয়াছিলাম, পূর্ণের আগমনে সেই থাকের ভক্তসকলের আগমন পূর্ণ হইল।'...

"পূর্ণেরও সেদিন অপূর্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুরের সহিত সম্বন্ধবিষয়ক পূর্বস্মৃতি জাগরিত হইয়া তাহাকে এককালে স্থির ও অন্তর্মুখী করিয়া দিয়াছিল, এবং তাহার দুনয়নে অজস্র আনন্দধারা বিগলিত হইয়াছিল।...তদবধি পূর্ণকে দেখিবার এবং খাওয়াইবার জন্য ঠাকুরের প্রাণে বিষম আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। সুবিধা পাইলেই তিনি নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য তাহাকে পাঠাইয়া দিতেন এবং যে ব্যক্তি উহা লইয়া যাইত তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেন, সে যেন লুকাইয়া ঐসকল তাহার হস্তে দিয়া আসে—কারণ, বাটীতে ঐকথা প্রকাশ হইলে তাহার উপর অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা।

"পূর্ণের সহিত দেখা করিবার আগ্রহে আমরা ঠাকুরকে সময়ে সময়ে দরদরিতধারে চক্ষের জল ফেলিতে দেখিয়াছি।...পূর্ণকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেই ঠাকুর এখন হইতে মধ্যাহ্নে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং বাগবাজারে বলরাম বসুর ভবনে অথবা তদঞ্চলের অন্য কোন ব্যক্তির বাটীতে উপস্থিত হইয়া সংবাদ প্রেরণপূর্বক তাহাকে বিদ্যালয় হইতে ডাকাইয়া আনিতেন। ঐরূপ কোন স্থলেই পূর্ণ ঠাকুরের পুণ্যদর্শন দ্বিতীয়বার লাভ করিয়াছিল এবং সেদিন সে এককালে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। ঠাকুর সেদিন স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাহাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমাকে তোর কি মনে হয় বল্ দেখি? ভক্তিগদ্গদ হৃদয়ের অপূর্ব প্রেরণায় অবশ হইয়া পূর্ণ উহাতে বলিয়া উঠিয়াছিল, 'আপনি ভগবান—সাক্ষাৎ ঈশ্বর!'

"বালক পূর্ণ দর্শনমাত্রেই যে তাঁহাকে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারিয়াছে, একথা জানিয়া ঠাকুরের সেদিন বিস্ময় ও

আনন্দের অবধি ছিল না। তিনি তাহাকে সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদপূর্বক শক্তিপূত মন্ত্রসহিত সাধনরহস্যের উপদেশ করিয়াছিলেন।..."

'বেদপাঠী ব্রহ্মচারী লক্ষ যজ্ঞসূত্রধারী বাস করে পূর্ণের বদনে।'—ঠাকুর বলিয়াছিলেন। ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে স্বহস্তে বিবিধ অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া মাতাঠাকুরাণী একদিন পূর্ণকে ভোজন করাইয়াছিলেন কাছে বসিয়া, এবং ভোজনান্তে তাঁহাকে ষোল আনা অর্থাৎ একটাকা দক্ষিণাও দিয়াছিলেন।

"ঘটনাচক্রে পূর্ণকে দারপরিগ্রহ করিয়া সাধারণের ন্যায় সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে যাহারা সম্বদ্ধ হইয়াছিল তাহারা সকলেই তাহার অলৌকিক বিশ্বাস, ঈশ্বরনির্ভরতা, সাধনপ্রিয়তা, নিরভিমানতা ও সর্বপ্রকারে আত্মত্যাগের সম্বন্ধে একবাক্যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে।"

আরও অনেকে

ঠাকুরের গৃহস্থ ভক্তেরা অসংখ্যেয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের লীলাবর্ণনার মধ্যে তাঁহাদের অনেকের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের পরিচায়ক সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না, অনেকের সম্পূর্ণ নামটিও জানা যায় না।

আইলা রামের মামাশ্বশুর সম্পর্কে।
উপেন্দ্র মজুমদার দণ্ডবৎ তাঁকে॥
ধীর নম্র বিনয়ী বদনে মাখা রস।
শ্রবণে করেন কাজ, রসনা অবশ॥
দায়ে যদি কন কথা ফাঁকে না বেরায়
অধরে ফুটিয়া ভাষা অধরে মিশায়॥

জনায়ের **প্রাণকৃষ্ণ** শহরেতে বাড়ী।
বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ তেঁহ পরম আচারী॥

... ...

সময়ে সময়ে প্রায় এখন তখন।
তাঁহার ভবনে শ্রীপ্রভুর নিমন্ত্রণ॥

ভোজনের পরিপাটী হেন নাহি শুনি।
সন্তুষ্ট যাহাতে অতি অখিলের স্বামী॥
ভক্তিভরে দ্বিজবর আতপ তণ্ডুল।
অতি মিহি অন্ন তার যেন জুঁই ফুল॥
আনাতেন দেশ থেকে করিয়া যোগাড়।
স্বদেশে সঙ্গতি খুব নিজে জমিদার॥
... ...
স্বধর্মে আচারী যেবা তাঁরে ভগবান।
দেখিলাম বরাবর বড় কৃপাবান॥

জনাই হুগলী জেলার একটি গ্রাম। প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সেখানকার অন্যতম জমিদার ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে 'মোটা বামুন' বলিতেন।

পরম সুন্দর ভক্তবর একজন।
নব্যবয়দের সঙ্গে করে অধ্যয়ন॥
জুটিলেন এ সময়ে কায়স্থ-কুমার।
নাম **হরমোহন** উপাধি মিত্র তাঁর॥

হরমোহন নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী।

ধার্মিক সাহেব এক আসে এসময়।
ভকতির কথা তাঁর কহিবার নয়॥
... ...
নাম **উইলিয়ম্** পণ্ডিত বাইবেলে।
ধীর নম্র বিনয়ী জনম উচ্চকুলে॥

খ্রীষ্টানধর্মাবলম্বী উইলিয়মস্ ঠাকুরের কাছে কয়েকবার যাতায়াত করিবার পরেই তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার—"নিত্যচিন্ময়বিগ্রহ ঈশ্বরপুত্র ঈশামসি"—বলিয়া জানিতে পারেন। ঠাকুরের উপদেশে সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি হিমালয়ে তপস্যা করিতে চলিয়া যান।

জুটিল এখন এক সুন্দর বালক।
বেলঘরিয়ায় ঘর মুখুজ্যে তারক॥

বেলঘরিয়ার তারক উচ্চকোটির ভক্ত ছিলেন। 'বেলঘরের তারককে মাছের মধ্যে মৃগেল বলা যায়', ঠাকুর বলিয়াছিলেন ও সমাধিস্থ হইয়া একদিন তাঁহার বুকে পা দিয়াছিলেন।

মাষ্টার মহাশয়ের প্রেরণায় তাঁহার অনেকগুলি ঈশ্বরানুরাগী ছাত্র—নারায়ণ, তেজচন্দ্র, হরিপদ, বিনোদ, নরেন (ছোট), পল্টু প্রভৃতি—ঠাকুরের কাছে আসিয়াছিলেন। উত্তর কলিকাতায় ইঁহাদের বাড়ী।

নারায়ণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণঘরের সন্তান। ঠাকুরের কাছে আসিতেন বলিয়া বাড়ীতে মার খাইতেন, তথাপি আসিতে বিরত হইতেন না। 'তুই একটা চামড়ার জামা কর্, তা হলে মারলে বেশী লাগবে না।' ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন হাসিতে হাসিতে।

আসিলে নারাণচন্দ্র প্রভু নারায়ণ।
পুলকে বিকল বপু না যায় বর্ণন॥
সর্ব-অগ্রে করাইয়া ভোজন তাঁহায়।
পাথেয় সম্বল দিয়া করেন বিদায়॥

তেজচন্দ্রের পুরা নাম **তেজচন্দ্র মিত্র**। কয়েকবার যাতায়াত করিবার পরে ঠাকুর তাঁহাকে মন্ত্রদীক্ষিত করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকায় **হরিপদ** জাতিতে ব্রাহ্মণ।
ইজারা আছিল যাঁর প্রভুর চরণ॥
পদ যদি সেবে পদ প্রভু তুষ্ট তায়।
কেহ নহে হেন পটু চরণসেবায়॥
জুটিয়া **নরেন্দ্র-ছোট** এবে দিল দেখা।
কায়স্থ-কুমার অঙ্গে সরলতা-মাখা॥
গড়নে সরল যেন অন্তর সরল।
ভিতরের ভাব বাহ্যে ব্যক্ত সমুজ্জ্বল॥

ছোট নরেনের পুরা নাম নরেন্দ্রনাথ মিত্র। তাঁহার কথায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন: "ছেলেবেলায় স্কুল থেকে এসে ঈশ্বরের জন্যে কাঁদত। কান্না কি কমেতে হয়! আবার বুদ্ধি খুব!...আর আমার উপর সব মনটা। গিরিশ ঘোষ বল্লে, নবগোপালের বাড়ী যেদিন কীর্তন হয়েছিল সেদিন

গিছিল, কিন্তু 'তিনি কই' বলে আর হুশ নাই—লোকের গায়ের উপর দিয়েই চলে যায়! আবার ভয় নাই যে বাড়ীতে বকবে, দক্ষিণেশ্বরে তিনরাত্রি সমানে থাকে।" [কথামৃত]

"তেলিপাড়ায় বাড়ী। ভগবানের ধ্যানে সমাধি হইত। ঠাকুর বলেন, এর খুব উচ্চ অবস্থা, যদি কামিনীকাঞ্চনে ছোব না দেয় তা হলে এ একজন মহাযোগী হবে। বিধিনির্বন্ধে বিবাহ হইলে দাম্পত্যজীবন তেমন সুখকর হয় নাই, এবং উকিল হইলেও সেরূপ অর্থাগম হয় নাই।" [লীলামৃত]

হরিশ মুস্তফী নামে ভক্ত একজন।
জুটিলেন এসময়ে প্রভুর সদন॥
গোউর বরণ বয়ঃ চল্লিশের পার।
লাটের আপিসে উচ্চপদে কাজ তাঁর॥
জাতিতে ব্রাহ্মণ তেঁহ দেবেন্দ্রের মামা।
ধীর শান্ত নাহি হৃদে তিলার্ধ গরিমা॥
পাছু জুটে পুত্র তাঁর দণ্ডবৎ তাঁকে।
মূল নাম হরিপদ, **পল্টু** নামে ডাকে॥
দশ বরষের বয়ঃ ভক্তি বিলক্ষণ।
প্রভুরে দেখিলে করে অশ্রু বিসর্জন॥
বসাইয়া বিছানায় প্রভু গুণমণি।
বদনে মিষ্টান্ন তুলে দিতেন আপনি॥
জুটিল যুবক এক সাণ্ডেল বামুন।
ভিতরেতে ভরা অনুরাগের আগুন॥

... ...

প্রকৃতি দেখিয়া বড় আনন্দ প্রভুর।
অচিরে করিলা কৃপা দয়াল ঠাকুর॥

'সাণ্ডেল বামুন' বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল। তাঁহার বাড়ী ছিল নদীয়া জেলায়। কার্যগতিকে কলিকাতায় থাকিতেন, পরে বোসপাড়ায় নিজস্ব বাড়ী করেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত' তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা।

হুটকো গোপালের পুরা নাম **গোপালচন্দ্র ঘোষ**। "রামলালদাদা ভিন্ন যখন ঠাকুরের দ্বিতীয় পরিচারক ছিল না, তখন কৃপাবিভোর গোপাল প্রভুর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন; কিন্তু বালকস্বভাববশতঃ মাঝে মাঝে পলায়ন করায় ঠাকুর ইঁহাকে হুটকো বলিতেন। স্বভাবে সরল এবং প্রভুর অনুগত দেখিয়া শ্রীমাতৃদেবী ইঁহাকে স্নেহ করিতেন এবং ইঁহার আবদার সহিতেন।" [লীলামৃত]

দমদমার মাষ্টার জুটিল **যজ্ঞেশ্বর**।
বাঁকুড়া জেলার মধ্যে কাকিটায় ঘর॥

যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র ঠাকুরের কৃপাধন্য ভক্তগণের অন্যতম। দমদমার কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন বলিয়া তিনি 'দমদম মাষ্টার' নামে অভিহিত হইতেন।

কৃষ্ণনগরের **যোগীন্দ্র সেন** সরকারী ছাপাখানার সহকারী কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। লীলামৃতকার লিখিয়াছেন: "যোগীন যেদিন প্রভুর কৃপালাভ করে, আমি উপস্থিত। আত্মীয়বোধে পার্শ্বে বসায়ে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন, ভগবানের কোন্ রূপ দেখে আনন্দ হয়? যোগীন বলে, তা ত জানি না, তবে বারোয়ারী পূজায় চতুর্ভুজ নারায়ণ দেখে খানিকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়ি; আজ কিন্তু আপনাতেই সেই রূপ দেখছি।...অতিশয় ধ্যাননিষ্ঠ ও সরলপ্রকৃতি এবং রাখাল মহারাজের অনুরক্ত।

"ঠাকুরের জন্য সরভাজা ও সরপুরিয়া দেশ হইতে আনিলেও বাপের ভয়ে নিজে না গিয়া দ্বারবান দ্বারা পাঠায়ে দেন।...মিষ্টান্ন-পরশে প্রভু কহেন—কোন ভক্ত হয়ত পাঠিয়েছে, নইলে ছুঁতে পারব কেন?"

... ... মুখুয্যে ঈশান।
ঠনঠনিয়ায় যাঁর আবাসের স্থান॥
তিনশতাধিক টাকা মাসে মাসে আয়।
দরিদ্র অনাথে দিতে তাহে না কুলায়॥
ফুরাইলে অর্থ করে পরাণ বিকলি।
অবশেষে বাঁধা যায় গৃহিণীর কলি॥

পরদুঃখবিমোচন-খ্যাতি সাধারণে।
দুয়ারে দুঃখীর মেলা থাকে রেতে দিনে॥

... ...

দুর্গানামে অপার বিশ্বাস ভরা ঘটে।
বড়ই আদর তাঁর প্রভুর নিকটে॥
বারে বারে ঈশানের ঘরে আগমন
করিলেন প্রভুদেব ভক্তবিনোদন॥

জুটিলেন ভাগ্যবান বসু চুনিলাল।
তার পাছে কবিরাজ শ্রীনবগোপাল॥
উভয়ে বয়সপ্রাপ্ত উভয়ে সংসারী।
নন্দন-নন্দিনী ঘরে শহরেতে বাড়ী॥

চুনিলাল বসু বলরামের নিকট প্রতিবেশী।

সুন্দর বালক এক জুটে এইকালে।
উপেন্দ্র মুখুয্যে দুঃখী ব্রাহ্মণের ছেলে॥
অর্থ-আশে আসা শুনি প্রভু ভগবান।
সময়ে করিলা তার পূর্ণ মনস্কাম॥

'তোমার ছোট দরজা শীঘ্রি বড় হবে।' এই বলিয়া উপেন্দ্রকে ঠাকুর আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'বসুমতী সাহিত্য-মন্দিরে'র প্রতিষ্ঠাতা।

আর এক যুবাবয়ঃ জুটে এইকালে।
উপাধি তাঁহার দাস কৈবর্তের ছেলে॥
কুলের তিলক গর্ব অতি ভক্তিমান॥
চিরভক্ত প্রভুর হারাণচন্দ্র নাম॥

একদিন ঠাকুর গিরিশের ঘরে ভক্ত-বেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে গিরিশের ভাই অতুলকৃষ্ণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতুল ওকালতি করিতেন।

গিরিশ পাইয়া এবে সুযোগ সময়।
হাস্যসহ সম্বোধিয়া প্রভুদেবে কয়॥

অতুল গোদর এই হাজির গোচরে।
রাজহংস দিয়া নাম উপহাস করে॥
রসিকের চূড়ামণি কহিলা গোসাঁই।
এমন সুন্দর নাম কেহ দেয় নাই॥
পরিহরি জলভাগ দুধ যেবা খায়।
এই গুণযুক্ত যাতে হংস বলি তায়॥
হেন হংসদেব রাজা সবার উপর।
অতি উচ্চতম আখ্যা বড়ই সুন্দর॥
লজ্জা-অবনত মুখ উচ্চ করি তবে।
উকিল অতুলকৃষ্ণ কহে প্রভুদেবে॥
চাইয়া শ্রীমুখপানে হাসিয়া হাসিয়া।
আপনার কিবা নাম ডাকি কি বলিয়া॥
সুন্দর উত্তর প্রভু করিলেন তাঁয়
যে নামে ডাকিবে তুমি তাহে পাবে সায়।

ঠাকুরের দয়ায়, অনেক কিছু দেখিবার পরে, অতুল বুঝিতে পারিলেন—

দীন দুঃখী দ্বিজ-সাজে নর-কলেবর।
নামময় নামরূপ পরম ঈশ্বর॥

ঠাকুরের ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের বাড়ীর জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করিতেন। তাঁহার সঙ্গগুণে অক্ষয়কুমার সেন ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হন; ঠাকুরদের বাড়ীতে থাকিয়া **অক্ষয় মাষ্টার** উঁহাদের ছোট ছেলেদিগকে পড়াইতেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে যাইয়া ঠাকুরের দিব্যভাবময় রূপ তিনি প্রথম দর্শন করেন এক মহোৎসবের দিনে, মহিম চক্রবর্তীর বাড়ীতে। অক্ষয় মাষ্টারের বাড়ী ছিল বাঁকুড়া জেলার বাজে-ময়নাপুর গ্রামে; তিনি মাতাঠাকুরাণীর বিশেষ আশীর্বাদ-ভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তি-বৃক্ষের পরিপক্ক ফল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে।

বলরামের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহার পুরোহিতবংশজ **ফকির** বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও আশ্রয়দাতার একমাত্র শিশুপুত্র রামকৃষ্ণের গৃহশিক্ষকের কাজ

করিতেন। "ঠাকুর কখন কখন ইহার মুখ হইতে স্তোত্রাদি শুনিতে ভালবাসিতেন এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যকৃত কালীস্তোত্র কিরূপে ধীরে ধীরে প্রত্যেক কথাগুলি সম্পূর্ণ উচ্চারণ করিয়া আবৃত্তি করিতে হয় তাহা একদিন ইহাকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন।"

ঠাকুরের দিব্য সঙ্গ লাভ করিয়া, এমনকি তাঁহাকে একবারমাত্র দর্শন করিয়াও, বহুলোক কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকেই ঠাকুরের ভক্ত বলিয়া পরিচিত ছিলেন না; লোকের কাছে ঠাকুরের ভক্ত বলিয়া নিজেদের পরিচিত করিতে তাঁহারা চাহিতেন না। ঐরূপ এক ভক্তের কথা বলিয়া অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছি।

কলিকাতার জগদীশনাথ রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধানাথ রায় বরিশালে স্পেশ্যাল সাব্‌রেজিষ্ট্রার ছিলেন। ঢাকার তারকনাথ রায়চৌধুরী তাঁহার কাছে গিয়াছিলেন কর্মপ্রার্থী হইয়া (১৮৯৬)। তারকনাথকে তিনি বলিয়াছিলেন: আমি আর কেশববাবুর সহোদর কৃষ্ণবিহারী সেন এম্‌-এ পাশ করি এক সঙ্গে ১৮৭১ সালে। সে সময় আমাদের দেখতে লোক আসত। আমরা পরমহংস নাম শুনে ঠাট্টা করে বলতুম—রাজহংস, পাতিহংস, আবার পরমহংস কী রে বাবা! একদিন বুটজুতা পায়ে দিয়ে, টেরী কেটে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখতে যাই। গিয়ে দেখি, একঘর লোক! ভগবান আমার দিকে চক্ষু চেয়েছিলেন, সে অবধি আমি তাঁর দাসানুদাস।

তারকনাথ বলিয়াছেন: রাধানাথ কলিকাতা হইতে বরিশালে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, আমি দেখা করিতে গেলাম। তিনি তখন জ্বরে শয্যাগত, জ্বর ১০৫ ডিগ্রির কম হইবে বলিয়া মনে হইল না। কম্পিত হস্তে চাবি খুলিয়া রাধানাথ বাক্‌স হইতে ঠাকুরের একখানি ফটো বাহির করিলেন এবং মাথার উপরে রাখিয়া উদ্দাম নৃত্য করিতে লাগিলেন। আমি অবাক হইয়া দেখিতেছি আর ভাবিতেছি, জ্বরের বিকার নাকি? ক্ষণকাল পরেই শান্ত হইয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, কী, ভয় পেয়েচেন? আমি ভগবানকে দেখেচি, আমার আর জ্বর হবে না, বিকালে

ভাত খাব। আমি বিকালে গিয়া দেখি সত্যই তাঁহার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে, তিনি ভাত খাইতে বসিয়াছেন! ঠাকুরের ফটোখানি দেখিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে তিনি আমাকে দেখাইলেন বটে, কিন্তু হাতে নিয়া দেখিতে দিলেন না; আলগা দেখাইয়া ও আবার বাক্সে রাখিয়া চাবি দিলেন।

ঠাকুরের স্ত্রীভক্তেরা

পুরুষ-ভক্তদের সহিত তুলনায় ঠাকুরের স্ত্রীভক্তদের কথা কমই জানিতে পারা গিয়াছে। লোকচক্ষুর অন্তরালে তাঁহাদের অবস্থিতি, হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে তাঁহাদের সাধনা। বিশ্বাস-ভক্তির বলে স্বল্পায়াসে তাঁহারা গন্তব্য লক্ষ্যে পৌঁছিয়া গিয়াছেন।

স্ত্রীভক্তদের মধ্যে ঠাকুরের ভাইঝি লক্ষ্মীর কথা আগেই বলা হইয়াছে, বাবুরাম-জননী মাতঙ্গিনীর এবং নবগোপাল-গৃহিণী নিস্তারিণীর কথাও সামান্যভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীগদাধরে স্বতই প্রীতিসম্পন্না কামারপুকুরাদি স্থানের মহাসৌভাগ্যবতী ললনাদিগকেও তাঁহার স্ত্রীভক্তদের মধ্যে গণনা করিতে হইবে। তাঁহাদের হৃদয়োত্থ ভালবাসা ও তজ্জনিত অবিস্মৃতি আপনা হইতেই সাধনার সমূহ ফল তাঁহাদের করায়ত্ত করিয়া দিয়াছে। কামারপুকুরের **প্রসন্নময়ী** ও **ধনী** এবং জয়রামবাটীর **ভানুপিসী** যে জপতপপরায়ণা তপস্বিনী ছিলেন ইহা সুবিদিত।

যদু মল্লিকের মাসী

ধনী এবং বিষয়ী হইয়াও যদুলাল মল্লিক ছিলেন একজন ভক্ত মানুষ। তিনি ও তাঁহার মাসীমাতা ঠাকুরকে ভক্তি করিতেন সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ জ্ঞান করিয়া।

মাসীর ভক্তির কথা কহিতে নাহি যোগ্যতা, অনুরাগে ব্যাকুলতা এত।
যেই প্রভু ত্রিভুবনে ইঙ্গিতে সকলে টানে, তাঁরে টেনে ভবনে আনিত॥
পুরীর অত্যন্ত কাছে যদু মল্লিকের আছে উদ্যানভবন মনোরম।
তথায় ভকতিভাবে লয়ে যেত প্রভুদেবে তারা সবে করি নিমন্ত্রণ॥
নানা দ্রব্য সুরসাল পরিপূর্ণ করি থাল মাসী দিত খেতে পরমেশে।
আপনি বিউনি-করে ধীরে ধীরে পাখা করে প্রভু-অঙ্গে পরম হরিষে॥

মাসী নিত্য শিবপূজা করিতেন। উদ্যানবাটীর নির্জন কক্ষে পূজা করিতে বসিয়া একদিন এমন হইল যে, কিছুতেই তিনি শিবের মূর্তি মনে করিতে পারিলেন না। শিবের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্যাদি উপচার নিবেদন করিতে

যান, আর ঠাকুরকে মনে পড়ে। তিনি ঠাকুরের মূর্তিই চিন্তা করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে ঠাকুরও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, জনৈক স্ত্রীভক্তকে সঙ্গে করিয়া!

আনন্দে মগন মন অতীব কৌতুকে ॥
ধরিল নৈবেদ্য-থাল প্রভুর সম্মুখে ॥

মণি মল্লিকের কন্যা নন্দিনী

শ্রীমণি মল্লিক এক মহাভাগ্যবান।
বড়ই সদয় যাঁরে প্রভু ভগবান ॥
নন্দিনী **নন্দিনী** নামে ঘটে ভক্তিভরা।
প্রভুর কৃপায় হয় ধ্যানে বাহ্যহারা ॥
... ...
প্রভুর গমন যাঁর ঘরে বারে বারে ॥

নন্দিনী একদিন কাতরভাবে ঠাকুরকে জানাইলেন যে, ভগবানের ধ্যান করিতে বসিলেই এর কথা, তার মুখ ইত্যাদি মনে পড়িয়া বড়ই অশান্তি আসে। 'কার মুখ মনে পড়ে গো?—সংসারে কাকে ভালবাস তুমি?' ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন। 'একটি ছোট ভাইপোকে।' নন্দিনী উত্তর দিলেন। ঠাকুর কহিলেন: বেশ তো, তার জন্যে যা কিছু করবে—তাকে খাওয়ানো পরানো ইত্যাদি সব—গোপাল ভেবে কোরো। যেন গোপাল-রূপী ভগবান তার ভিতরে রয়েচেন, তুমি তাঁকেই খাওয়াচ্চ, পরাচ্চ, সেবা করচ—এইরকম ভাব নিয়ে কোরো। মানুষের করচি ভাববে কেন গো? যেমন ভাব তেমন লাভ।

ঠাকুরের উপদেশানুসারে চলিয়া নন্দিনীর বিশেষ মানসিক উন্নতি, এমনকি ভাবসমাধি পর্যন্ত হইয়াছিল।

মনোমোহনের মাতা শ্যামাসুন্দরী

মনোমোহন মিত্রের মাতা শ্যামাসুন্দরী সম্বন্ধে রাম তাঁহার 'পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন: "তাঁহার ন্যায় পতিপরায়ণা স্ত্রী এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেখিতে পাওয়া অতি দুর্লভ। বৈধব্যদশায় তিনি লালপেড়ে ধুতি পরিধান এবং স্বর্ণবলয় হস্তে ধারণ করিতেন

আহারে সম্পূর্ণ সন্ন্যাসিনীর ভাব ছিল।...অনেকে অনেক কথাই কহিত, কিন্তু তিনি সেসকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না। একদিন... পরমহংসদেব বলিলেন, 'স্ত্রীজাতির পতিই একমাত্র ধর্ম, ইহা শাস্ত্রের অভিপ্রায়। পতিসেবায় শান্ত-দাস্যাদি সকল ভাব আছে। পতি· ·মরিয়া যাইলেও সেভাব থাকা উচিত। অনেকে পতির জীবদ্দশার পর শ্রীকৃষ্ণকে পতি জ্ঞান করিয়া থাকে। কোন রাজমহিষী স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করিতেন না, তিনি সধবার ভাব রক্ষার জন্য রুলি পরিতেন। কালসহকারে রাজার মৃত্যু হইল। রাণী তাড়াতাড়ি রুলিগুলি ভাঙ্গিয়া সোনার বালা পরিলেন। কহিলেন—এতদিন আমার পতি নশ্বর ছিলেন, তাই নশ্বর পদার্থের লক্ষণ রাখিয়াছিলাম; এখন আমার পতি অক্ষয়, সেইজন্য অক্ষয় সোনার বালা পরিয়াছি। এঁর [শ্যামাসুন্দরীর] বালা পরা সেইরূপ। ভিতরকার ভাব অতি উচ্চ এবং সুন্দর। লোকের কথায় কি কেহ ভাব পরিবর্তন করিতে পারে? যে ভাব পরিবর্তন করিতে পারে তাহার তখনও প্রাণে সেভাব হয় নাই বলিতে হইবে।'

"মনোমোহনবাবুর মাতার ··তৃতীয় জামাতা [রাখাল] পরমহংসদেবের উপাসক হওয়ায় পাড়ার স্ত্রীলোকেরা আক্ষেপ করিত। তিনি এই কথায় বলিতেন, 'আমার কি এমন সৌভাগ্য হইবে যে, আমার জামাই সন্ন্যাসী হইয়া সাধুসেবায় জীবন উৎসর্গ করিবে?' "

নির্মল চিত্তমুকুরে সত্যের রূপ প্রতিফলিত হয় আপনা হইতে। ঠাকুরকে না দেখিয়াই, পুত্রের মুখে ঠাকুরের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকারের আনুপূর্বিক বিবরণ শুনিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিয়াছিলেন—'এ নহে অপর কেহ ভগবান বিনে।' তাঁহার অপত্যরা—এক পুত্র ও চারি কন্যা—সকলেই ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। একাধিকবার ঠাকুর তাঁহাদের কলিকাতার ও কোন্নগরের বাড়ীতে শুভাগমন করিয়াছেন।

ঠাকুরের আমন্ত্রণে একদিন শ্যামাসুন্দরী ও তাঁহার ছেলেমেয়েরা মন্দিরে প্রসাদ পাইতে আসিয়াছেন। ঘরের ভিতরে খাইতে বসিয়াছেন ঠাকুর, আর বাহিরে, ঈষৎ ব্যবধানে, এইসকল ভক্তেরা।

প্রভুর কি হৈল ভাব ভোজনের কালে।
থালায় মাছের মুড়া, লইলেন তুলে॥
সত্বর ফেলিয়া তাহা দিলা গুণমণি।
যে পাতে ভোজন করে মিত্রের জননী॥
মহাভাগ্যবতী তবে অসঙ্কোচ-মন।
গোটা মুড়া সেই ক্ষণে করিলা ভোজন॥
নন্দন পালটি পরে আসিলে ভবনে।
মায়ে জিজ্ঞাসিল মুড়া খাইলে কেমনে॥
শুনিয়া জননী সবে করিল উত্তর।
প্রসাদ না হয় কভু দ্রব্যের ভিতর॥
প্রসাদ প্রসাদ মাত্র, প্রসাদ জিনিস।
ফল নয় মিষ্টি নয় না অন্ন আমিষ॥

শ্রীশ্রীমার সঙ্গিনী-সেবিকা যোগীন্দ্রমোহিনী ও অন্নপূর্ণা

যোগীন্দ্রমোহিনী যেকালে ঠাকুরকে দর্শন করেন, তখন তিনি পিত্রালয়ে বাস করিতেছিলেন স্বীয় জননীর সঙ্গে, বাগবাজারে। ইহার পূর্বেই তাঁহার একমাত্র কন্যা গণুর বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। সুরাবেশ্যাসক্ত স্বামীকে সংশোধন করার আপ্রাণ চেষ্টায় নিরাশ হইয়া যোগীন্দ্রমোহিনী পিত্রালয়ে চলিয়া আসিতে বাধ্য হন। ডাক্তার প্রসন্নকুমার মিত্রের আদরের কন্যা ছিলেন তিনি ; সাধ করিয়া পিতা তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন বড় ঘরে, খড়দহের প্রসিদ্ধ জমিদার বিশ্বাসবাবুদের সংসারে। যোগীন-মা —এই নামেই ঠাকুরের ভক্তসংঘে তিনি সুপরিচিতা—বলিয়াছেন :

'বলরামবাবু সম্পর্কে আমার মামাশ্বশুর হতেন। ···ঠাকুর একদিন বলরামবাবুর বাড়ীতে এসেচেন, আমরা দেখতে গেলুম। সেই আমার প্রথম দেখা। হলঘরে একধারে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, ভাবে ভরপুর,··· বাহ্যজ্ঞান নেই। দূর থেকে সবাই পেন্নাম করচে,···আমরাও দূর থেকে পেন্নাম করলুম। সমাধি টমাধি তো আর তখন জানি না, বুঝিও না ; কেবল বোধ হল, ইনি কালীভক্ত। যেন মাতাল! ··ছাঁৎ করে মনে

উঠল—বাবা, এক মাতালের পাল্লায় পড়ে পারিবারিক জীবন উৎখাত, ধর্মজীবনও কি আবার আর এক মাতালের আওতায় নষ্ট হবে ?…

'তাঁকে দুচার বার প্রথম প্রথম বলরামবাবুর সঙ্গে, বা নিজেরা নৌকো করে গিয়ে, দেখে এসে ক্রমে ক্রমে একটা টান বোধ করলুম। …হয়তো দুপুর বেলায় যাব, সকাল থেকেই তাড়াতাড়ি সব কাজকর্ম সেরে সুরে নিচ্ছি। …তাঁর ঘরে, কাছে কিছুক্ষণ বসলে সব ভুল হয়ে যেত! তাঁর ঘন ঘন সমাধি হচ্চে, আর আমরা অবাক হয়ে হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে বসে আছি। কী দয়া! …হয়তো সামান্য কিছু নিয়ে গেছি, ছোট ছেলের মত কত আনন্দ করে…খেয়েচেন। ফেরবার সময় বলেচেন—আবার আসিস গো।

'দেখে ফিরে এলে, তারপর প্রায় এক সপ্তাহকাল একটা যেন নেশার ঘোরে থাকতুম। তাঁতে আত্মীয়বোধ পাকা হয়ে গিয়েছিল। কত যে আনন্দ, কী আর বলব ? সংসারের সব কাজকর্ম করচি,…মন যেন তাঁর পাদপদ্মে আনন্দে মত্ত। তারপর যেই সেই ভাবটা ·ফিকে হয়ে যাচ্চে, অমনি প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠত। …আমার মা-টা সবাই মিলে একসঙ্গে যেতুম—রামের মা [বলরামবাবুর স্ত্রী], অসীমের-মা [চুনিবাবুর স্ত্রী], ইত্যাদি।…

'আমার দিদিমা প্রথম আমাদের মধ্যে তাঁর দেখা পান। ·· গিয়ে তাঁর সঙ্গেই প্রথম দেখা। …তাঁকেই জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁগা, এখানে কোথায় পরমহংস আছেন বলতে পার ? …ঠাকুর বল্লেন—কি জানি বাপু! কেউ বলে পরমহংস, কেউ বলে ছোট ভট্‌চাজ, কেউ বলে গদাধর চাটুজ্যে। দেখ জিজ্ঞাসা পড়া করে, কোথাও হবে! দিদিমা সেদিন ঐ পর্যন্ত হয়ে ফিরে এলেন।

'একদিন আমায় বলেছিলেন—দেখ, তোমার যে ইষ্ট তা (নিজের শরীর দেখাইয়া) এর ভিতরেই আছে, একে ভাবলেই তাঁকে মনে পড়বে। …এখন দেখচি, ধ্যান করতে বসলেই তিনি চোখের সামনে এসে দাঁড়ান।

'কেমন করে জপ করতে হয়, তিনি আমায় একবার দেখিয়ে দিয়েছিলেন। সব আঙ্গুলগুলো একবারে পাশাপাশিভাবে জুড়ে রাখতে হয়, যেন একটুও ফাঁক কোন আঙ্গুলের মাঝখানে না থাকে। ...একবার বল্লেন—দেখ, কলিতে গোপাল আর কালীমন্ত্র শীগ্‌গির শীগ্‌গির সিদ্ধ হয়।

'মা [সারদামাতা] সে সময় দক্ষিণেশ্বরে নবতে সীতে-ঠাকরুণের মত থাকতেন। পরণে কস্তাপেড়ে লাল শাড়ী, সিঁথেয় সিঁদুর, কালো ভরাট মাথার চুল প্রায় পা পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেচে, গলায় সোনার কণ্ঠিহার, নাকে মস্ত বড় নথ, কানে মাকড়ি, হাতে চুড়ি। ...তাঁকে দর্শন করে, তাঁর কাছে থেকে বড় আনন্দ হত। আমার চুল বাঁধা তাঁর বড় পছন্দ ছিল, গেলেই বাঁধিয়ে নিতেন। আমিও তাতে ভারী খুশী হতুম।...

'একবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে জানলুম যে, মা জয়রামবাটী সেইদিনই যাচ্চেন। তাঁকে বেশীক্ষণ কাছে পেলুম না বলে মন ভারি খারাপ হয়ে গেল। মা চলে গেলেন, বসে কাঁদচি। ঠাকুর টের পেয়ে ডাকিয়ে বল্লেন —কেন গো, কাঁদচিস কেন? আবার আসবে।...

'তিনি বলেছিলেন ভক্তিগ্রন্থ পড়তে। তাঁর দয়াতেই শিখেচি। আবার ঠাকুর গোচ্ছার বই পড়বারও পক্ষপাতী ছিলেন না, বলতেন—নাক মুখ টিপে গোচ্ছার বই পড়লে কী হবে?

'একবার বলেছিলুম, আমাদের কী হবে? তাতে তিনি বল্লেন—তোমাদের আর কী চাই? দেখলে, খাওয়ালে, সেবা করলে—আর কী হবে? তুমি উতলা হয়ো নি, মৃত্যুকালে তোমার সহস্রার ফুটবে।'[১]

এক কালে অন্নপূর্ণা দেবীর জীবনও ছিল যোগীন্দ্রমোহিনীর জীবনেরই মত দুঃখপূর্ণ। তিনি অকালে বিধবা হইয়াছিলেন। একটি পুত্র ও একটি কন্যা তাঁহার জন্মিয়াছিল, শৈশবেই পুত্রটি মারা যায়। রূপবতী কন্যা চণ্ডীর তিনি বিবাহ দিয়াছিলেন পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ এক জমিদারের সঙ্গে, সেই কন্যাটিও দেহত্যাগ করে, একটি পুত্র সন্তান রাখিয়া। শোকে

১ নির্লেপানন্দ-কৃত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতি' হইতে।

তাপে ব্রাহ্মণীর যখন পাগল হওয়ার উপক্রম, সেই সময়ে তাঁহার প্রতিবেশিনী, যোগীন্দ্রমোহিনীই তাঁহাকে ঠাকুরের কাছে লইয়া যান সঙ্গে করিয়া।

ঠাকুরকে প্রথম দিন দর্শন করিয়া শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর কী মনে হইয়াছিল জানি না, কিন্তু দেখা গেল তিনি ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, কোনদিন বা সেখানে রাত্রিবাসও করিতেছেন। মাতাঠাকুরাণীকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, তুমি ওকে খুব পেট ভরে খেতে দিবে, পেটে অন্ন পড়লে শোক কমে। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে ব্রাহ্মণী একদিন ঠাকুরকে আমন্ত্রণ করিলেন পদধূলি দিয়া তাঁহার বাসগৃহখানি পবিত্র করিবার জন্য। ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন, ঐদিন বিকালে তিনি নন্দলাল বসুর বাড়ীতে যাইবেন ও সেখান হইতে ব্রাহ্মণীর বাড়ীতে আসিবেন।[১]

ব্রাহ্মণীরা দুই ভগিনী, দুইজনেই বিধবা। বাড়ীতে ইঁহাদের ভাইরাও সপরিবার বাস করিতেন। বাড়ীর ছাদের উপরে ঠাকুরকে বসাইবার জায়গা হইয়াছিল।

"ঠাকুর ভক্তসঙ্গে আসিয়া···আসন গ্রহণ করিলেন। কাছে মাদুরের উপর মাষ্টার, নারাণ, যোগীন সেন, দেবেন্দ্র, যোগীন। কিয়ৎক্ষণ পরে ছোট নরেন প্রভৃতি অনেক ভক্তেরা আসিয়া জুটিলেন। ব্রাহ্মণীর ভগ্নী ছাদের উপর আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন, দিদি এই গেলেন নন্দ বোসের বাড়ী খবর নিতে—কেন এত দেরী হচ্চে।···

"ঠাকুর সহাস্যবদন, ভক্তপরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন।···ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কি বলিবেন, কি করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। ব্রাহ্মণী অধীর হইয়া বলিতেছেনঃ ওগো, আমি যে আহ্লাদে আর বাঁচি না গো! তোমরা সব বল গো আমি কেমন করে বাঁচি! ওগো, আমার চণ্ডী যখন এসেছিল সেপাই সান্ত্রী সঙ্গে করে, আর রাস্তায় তারা পাহারা দিচ্ছিল, তখন যে এত আহ্লাদ হয় নি গো!

১ নন্দলাল বসুর বাড়ীতে দেবদেবীদের সুন্দর ও বৃহৎ চিত্রসমূহ আছে শুনিয়া ঠাকুর দেখিতে গিয়াছিলেন।

ওগো, চণ্ডীর শোক এখন একটুও আমার নাই। মনে করেছিলাম, তিনি যেকালে এলেন না, যা আয়োজন কল্লুম সব গঙ্গার জলে ফেলে দেব; আর ওঁর সঙ্গে আলাপ করব না—যেখানে আসবেন একবার যাব, অন্তর থেকে দেখব, দেখে চলে আসব। যাই, সকলকে বলি—আয় রে আমার সুখ দেখে যা! যাই, যোগীনকে বলিগে—আমার ভাগ্যি দেখে যা!...ওগো, খেলাতে একটা টাকা দিয়ে মুটে একলাখ টাকা পেয়েছিল; সে যাই শুনলে, একলাখ টাকা পেয়েচে, অমনি আহ্লাদে মরে গিছল—সত্য সত্য মরে গিছল! ওগো, আমার যে তাই হল গো! তোমরা সকলে আশীর্বাদ কর, না হলে আমি সত্য সত্য মরে যাব।" [কথামৃত]

ব্রাহ্মণী ক্রমে শান্ত হইলেন। তাঁহার ভগিনী আসিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিলেন: দিদি, এস না। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হয়? নীচে এস, আমরা কি একলা পারি? ব্রাহ্মণী তখন আনন্দে বিভোর হইয়া ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তদিগকে দেখিতেছিলেন তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছিলেন না।

ঠাকুরকে ব্রাহ্মনী মিষ্টান্নদি নিবেদন করিলেন এক ঘরে লইয়া গিয়া; ভক্তেরাও মিষ্টিমুখ করিলেন ছাদে বসিয়া।

ব্রাহ্মণীর শোকদীর্ণ হৃদয় আবার জোড়া লাগিল অপার্থিব এক শান্তির প্রলেপে। তিনি অন্তর্মুখী হইলেন। ঠাকুরের যৎসামান্য সেবার কাজও তিনি করিয়াছিলেন ক্রমাগত কিছুদিন ধরিয়া, মন্দিরে বাস করিয়া। 'এঁকে কী বলে ডাকব?' নিরঞ্জন একদিন এই প্রশ্ন করিলে ঠাকুর কহেন, 'কী বলে ডাকবি?—গোলাপদিদি।' সেইদিন হইতে অন্নপূর্ণা-নামের পরিবর্তে গোলাপ-নামটিই চালু হইয়া গেল ঠাকুরের ভক্ত-সংসারে। গোলাপ-মার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছিলেন মাতাঠাকুরাণীকে, 'এই বামুনের মেয়েটি বরাবর তোমার সঙ্গে থাকবে।'

'গোপালের মা' অঘোরমণি

লীলাপ্রসঙ্গকার লিখিয়াছেন: "১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ। ...এই নাতিশীতোষ্ণ হেমন্তেই বোধ হয় গোপালের মা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-

দেবের প্রথম দর্শনলাভ করেন। পটলডাঙ্গার ৺গোবিন্দচন্দ্র দত্তের কামারহাটিতে গঙ্গাতীরে যে ঠাকুরবাটী ও বাগান আছে, সেখান হইতেই নৌকায় করিয়া তাঁহারা ঠাকুরকে দেখিতে আসেন। তাঁহারা বলিতেছি—কারণ, গোপালের মা সেদিন একাকী আসেন নাই; উক্ত উদ্যানস্বামীর বিধবা পত্নী কামিনী-নাম্নী তাঁহার একটি দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়ার সহিত গোপালের মার সঙ্গে আসিয়াছিলেন।···ঠাকুর সেদিন ইঁহাদের সাদরে স্বগৃহে বসাইয়া ভক্তিতত্ত্বের অনেক উপদেশ দেন ও ভজন গাহিয়া শুনান এবং পুনরায় আসিতে বলিয়া বিদায় দেন।···ঠাকুর সেদিন গিন্নীর ও গোপালের মার অনেক প্রশংসা করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'আহা চোখ-মুখের কি ভাব--ভক্তিপ্রেমে যেন ভাসচে—প্রেমময় চক্ষু! নাকের তিলকটি পর্যন্ত সুন্দর!'···

"কামারহাটির ঠাকুরবাড়ীর অতি নিকটেই গোবিন্দবাবুর পুরোহিত-বংশের বাস! পুরোহিত নীলমাধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েও একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন। 'গোপালের মাতা' ইঁহারই ভগ্নী—পূর্বনাম অঘোরমণি দেবী—বালিকাবয়সে বিধবা হওয়ায় পিত্রালয়েই চিরকাল বাস।···গোবিন্দবাবুর পত্নীর সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হওয়া অবধি অঘোরমণির ঠাকুরবাড়ীতে ঠাকুরসেবাতেই কাল কাটিতে থাকে।···গঙ্গাতীরে ঠাকুরবাড়ীতেই বাস করিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় তিনি গিন্নীর অনুমতি লইয়া মেয়েমহলের একটি ঘরে আসিয়াই বসবাস করিলেন···।

"অঘোরমণি কড়ে রাড়ী—স্বামীর সুখ কোনদিনই জানেন নাই। মেয়েরা বলে, 'ওরা সব যত্নী রাঁড়ী, নুনটুকু পর্যন্ত ধুয়ে খায়।' অঘোরমণিও বয়স প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তাহাই। বেজায় আচার-বিচার। আমরা জানি, একদিন তিনি রন্ধন করিয়া বোক্‌নো হইতে ভাত তুলিয়া পরমহংসদেবের পাতে পরিবেষণ করিতেছেন, এমন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কোনপ্রকারে ভাতের কাঠিটি ছুঁইয়া ফেলেন। অঘোরমণির সে ভাত আর খাওয়া হইল না এবং ভাতের কাঠিটিও গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল।··

"'কামারহাটির ব্রাহ্মণী' আবার ছেলেবেলা হইতে বড় অভিমানিনী। কাহারও কথা এতটুকু সহ্য করিতে পারিতেন না, অর্থসাহায্যের জন্য হাত পাতা তো দূরের কথা। তাহার উপর আবার অন্যায় দেখিলেই লোকের মুখের উপর বলিয়া দিতে কিছুমাত্র চক্ষুলজ্জা ছিল না—কাজেই খুব অল্প লোকের সহিত তাঁহার বনিবনাও হইত। গিন্নী যে ঘরখানিতে তাঁহাকে থাকিতে দিয়াছিলেন তাহা একেবারে বাগানের দক্ষিণপ্রান্তে। ঘরের দক্ষিণের তিনটি জানালা দিয়া সুন্দর গঙ্গাদর্শন হইত এবং উত্তরে ও পশ্চিমে দুইটি দরজা ছিল। ব্রাহ্মণী ঐ ঘরে বসিয়া গঙ্গাদর্শন করিতেন ও দিবারাত্রি জপ করিতেন। এইরূপে ঐঘরে ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল ব্রাহ্মণীর সুখে-দুঃখে কাটিয়া যাইবার পর তবে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম দর্শন তিনি লাভ করেন।

"...প্রথম দর্শনের অল্পদিন পরে জপ করিতে করিতে...দুইতিন পয়সার দেদো সন্দেশ কিনিয়া লইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, 'এসেচ, আমার জন্যে কি এনেচ দাও।' গোপালের মা বলেন, 'আমি তো একেবারে ভেবে অজ্ঞান, কেমন করে সে রোঘো (খারাপ) সন্দেশ বার করি—এঁকে কত লোকে কত কি ভাল ভাল জিনিস এনে খাওয়াচ্চে—আবার তাই ছাই কি আমি আসবামাত্র খেতে চাওয়া!' ভয়ে লজ্জায় কিছু না বলিতে পারিয়া সেই সন্দেশগুলি বাহির করিয়া দিলেন। ঠাকুরও উহা মহা আনন্দ করিয়া খাইতে খাইতে বলিতে লাগিলেন, 'তুমি পয়সা খরচ করে সন্দেশ আন কেন? নারকেল-নাড়ু করে রাখবে, তাই দুটো একটা আসবার সময় আনবে। না হয়, যা তুমি নিজের হাতে রাঁধবে—লাউশাক-চচ্চড়ি, আলু-বেগুন-বড়ি দিয়ে সজনে খাড়ার তরকারি—তাই নিয়ে আসবে। তোমার হাতের রান্না খেতে বড় সাধ হয়!' গোপালের মা বলেন, 'ধর্মকর্মের কথা দূরে গেল, এইরূপে কেবল খাবার কথাই হতে লাগল! আমি ভাবতে লাগলুম, ভাল সাধু দেখতে এসেচি—কেবল খাই খাই, কেবল খাই খাই; আমি গরীব কাঙ্গাল লোক, কোথায় এত খাওয়াতে পাব? দূর হোক,

আর আসব না। কিন্তু যাবার সময় দক্ষিণেশ্বরের বাগানের চৌকাঠ যেমন পেরিয়েছি, অমনি যেন পেছন থেকে তিনি টানতে লাগলেন। কোন মতে এগুতে আর পারি না। কত করে মনকে বুঝিয়ে টেনে হিঁচড়ে তবে কামারহাটি ফিরি।' ইহার কয়েক দিন পরেই আবার কামারহাটির ব্রাহ্মণী চচ্চড়ি হাতে করিয়া তিন মাইল হাঁটিয়া পরমহংসদেবের দর্শনে উপস্থিত। ঠাকুরও পূর্বের ন্যায় আসিবামাত্র উহা চাহিয়া খাইয়া, 'আহা কি রান্না, যেন সুধা, সুধা' বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। গোপালের মার সে আনন্দ দেখিয়া চোখে জল আসিল। ভাবিলেন, তিনি গরীব কাঙ্গাল বলিয়া তাঁহার এই সামান্য জিনিসের ঠাকুর এত বড়াই করিতেছেন।

"এইরূপে দুইচারি মাস ঘন ঘন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত হইতে লাগিল। যেদিন যা রাঁধেন, ভাল লাগিলেই তাহা পরের বারে ঠাকুরকে দেখিতে আসিবার সময় ব্রাহ্মণী কামারহাটি হইতে লইয়া আসেন। ঠাকুরও তাহা কত আনন্দ করিয়া খান, আবার কখন বা কোন সামান্য জিনিস—যেমন সুষনিশাক সস্‌সড়ি, কলমিশাক চচ্চড়ি ইত্যাদি আনিবার জন্য অনুরোধ করেন।...

"১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ—শীত ঋতু অপগত হইয়া কুসুমাকর সরস বসন্ত আসিয়া উপস্থিত।... এই সময় কামারহাটির ব্রাহ্মণী একদিন রাত্রি তিনটার সময় জপে বসিয়াছেন। জপ সাঙ্গ হইলে ইষ্টদেবতাকে জপ সমর্পণ করিবার অগ্রে প্রাণায়াম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এমন সময় দেখেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিকটে বাম দিকে বসিয়া রহিয়াছেন এবং ঠাকুরের দক্ষিণ হস্তটি মুঠো করার মত দেখা যাইতেছে। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে যেমন দর্শন করেন এখানেও ঠিক সেইরূপ স্পষ্ট জীবন্ত! ভাবিলেন, একি? এমন সময়ে ইনি কোথা থেকে কেমন করে হেথায় এলেন? গোপালের মা বলেন, 'আমি অবাক হয়ে তাঁকে দেখচি, আর ঐকথা ভাবচি—এদিকে গোপাল (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি গোপাল বলিতেন) বসে মুচকে মুচকে হাসচে! তারপর সাহসে ভর করে বাঁ হাত দিয়ে যেমন গোপালের বাঁ হাতখানি ধরেচি, অমনি সে মূর্তি কোথায় গেল, আর তার ভিতর থেকে

দশমাসের সত্যকার গোপাল, (হাত দিয়া দেখাইয়া) এতবড় ছেলে, বেরিয়ে হামা দিয়ে এক হাত তুলে আমার মুখপানে চেয়ে—সে কি রূপ, আর কি চাউনি!—বল্লে, মা, ননী দাও। আমি তো দেখে শুনে একেবারে অজ্ঞান, সে এক চমৎকার কারখানা। চীৎকার করে কেঁদে উঠলুম—সে তো এমন চীৎকার নয়, বাড়ীতে জনমানব নেই তাই, নইলে লোক জড় হত! কেঁদে বল্লুম, বাবা, আমি দুঃখিনী কাঙ্গালিনী, আমি তোমায় কি খাওয়াব, ননী ক্ষীর কোথা পাব, বাবা? কিন্তু সে অদ্ভুত গোপাল কি তা শোনে, কেবল খেতে দাও বলে! কি করি, কাঁদতে কাঁদতে উঠে সিকে থেকে শুখনো নারকেল-নাড়ু পেড়ে হাতে দিলুম আর বল্লুম, বাবা গোপাল, আমি তোমাকে এই কদর্য জিনিস খেতে দিলুম বলে আমাকে যেন ঐরূপ খেতে দিও না। তারপর জপ সেদিন আর কে করে? গোপাল এসে কোলে বসে, মালা কেড়ে নেয়, কাঁধে চড়ে, ঘরময় ঘুরে বেড়ায়! যেমন সকাল হল অমনি পাগলিনীর মত ছুটে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পড়লুম। গোপালও কোলে উঠে চল্ল—কাঁধে মাথা রেখে। এক হাত গোপালের পাছায়, এক হাত পিঠে দিয়ে বুকে ধরে সমস্ত পথ চল্লুম। স্পষ্ট দেখতে লাগলুম গোপালের লাল টুকটুকে পা-দুখানি আমার বুকের উপর ঝুলচে।'

"অঘোরমণি যেদিন ঐরূপে সহসা নিজ উপাস্যদেবতার দর্শনলাভে ভাবে প্রেমে উন্মত্তা হইয়া···দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন সেদিন সেখানে আমাদের পরিচিতা অন্য একটি স্ত্রীভক্তও [গোলাপ-মা] উপস্থিত ছিলেন।···তিনি বলেন: আমি তখন ঠাকুরের ঘরটি ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করচি, বেলা সাতটা কি সাড়ে সাতটা হবে। এমন সময় শুনতে পেলুম বাইরে কে গোপাল-গোপাল বলে ডাকতে ডাকতে ঠাকুরের ঘরের দিকে আসচে। গলার আওয়াজটা পরিচিত···। চেয়ে দেখি গোপালের মা!—এলোথেলো পাগলের মত, দুই চক্ষু যেন কপালে উঠেচে, আঁচলটা ভুঁয়ে লুটুচ্চে, কিছুতেই যেন ভ্রূক্ষেপ নাই—এমনি ভাবে ঠাকুরের ঘরে পূব দিক্‌কার দরজাটি দিয়ে ঢুকচে।···গোপালের মাকে ঐরূপ দেখে আমি তো একেবারে হাঁ হয়ে গেছি, এমন সময় তাঁকে দেখে

ঠাকুরেরও ভাব হয়ে গেল।...গোপালের মা এসে ঠাকুরের কাছে বসে পড়ল এবং ঠাকুরও ছেলের মত তার কোলে গিয়ে বসলেন। গোপালের মার দুই চক্ষে তখন দরদর করে জল পড়চে, আর যে ক্ষীর-সর-ননী এনেছিল তাই ঠাকুরের মুখে তুলে খাইয়ে দিচ্চে।...গোপালের মার ঐ অবস্থা আর ঠাকুরের ভাব দেখে আমি তো একেবারে আড়ষ্ট! কতক্ষণ পরে ঠাকুরের সে ভাব থামল,...আপনার চৌকিতে উঠে বসলেন। গোপালের মার কিন্তু সেভাব আর থামে না! আনন্দে আটখানা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে 'ব্রহ্মা নাচে বিষ্ণু নাচে' ইত্যাদি পাগলের মত বলে আর ঘরময় নেচে নেচে বেড়ায়। ঠাকুর তাই দেখে হেসে আমাকে বল্লেন, 'দেখ দেখ, আনন্দে ভরে গেছে—ওর মনটা এখন গোপাল-লোকে চলে গেছে!'...আমি আমাদের সমান ঘরে মেয়ের বিয়ে দি নাই বলে আমায় মনে মনে একটু ঘেন্না করত, সেদিন তার জন্তেই বা গোপালের মার কত অনুনয়-বিনয়! বল্লে, 'আমি কি আগে জানি যে তোর ভিতরে এতখানি ভক্তিবিশ্বাস! যে গোপাল ভাবের সময় প্রায় কাউকে ছুঁতে পারে না, সে কিনা আজ ভাবাবেশে তোর পিঠের উপর গিয়ে বসল! তুই কি সামান্তি!'

"বাস্তবিকই সেদিন ঠাকুর গোপালের মাকে দেখিয়া সহসা গোপাল-ভাবাবিষ্ট হইয়া প্রথম এই স্ত্রীভক্তটির পৃষ্ঠদেশে এবং পরে গোপালের মার ক্রোড়ে কিছুক্ষণের জন্য উপবেশন করিয়াছিলেন।

"অঘোরমণি...অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে সেদিন কত কি কথাই না বলিলেন! 'এই যে গোপাল আমার কোলে', 'ঐ তোমার ভিতর ঢুকে গেল', 'ঐ আবার বেরিয়ে এল', 'আয় বাবা, দুঃখিনী মার কাছে আয়'—ইত্যাদি বলিতে বলিতে দেখিলেন চপল গোপাল কখন বা ঠাকুরের অঙ্গে মিশাইয়া গেল, আবার কখন বা উজ্জ্বল বালকমূর্তিতে তাঁহার নিকটে আসিয়া অদৃষ্টপূর্ব বাল্যলীলা-তরঙ্গ-তুফান তুলিয়া তাঁহাকে বাহ্য জগতের কঠোর শাসন, নিয়ম প্রভৃতি সমস্ত ভুলাইয়া দিয়া একেবারে আত্মহারা করিয়া ফেলিল! সে প্রবল ভাবতরঙ্গে পড়িয়া কেই বা আপনাকে সামলাইতে পারে!

"অদ্য হইতে অঘোরমণি বাস্তবিকই 'গোপালের মা' হইলেন এবং ঠাকুরও তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিতে থাকিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গোপালের মার ঐরূপ অপরূপ অবস্থা দেখিয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিলেন, শান্ত করিবার জন্য তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিলেন এবং ঘরে যত কিছু ভাল ভাল খাদ্যসামগ্রী ছিল সে সব আনিয়া তাঁহাকে খাওয়াইলেন। খাইতে খাইতেও ভাবের ঘোরে ব্রাহ্মণী বলিতে লাগিল, 'বাবা গোপাল, তোমার দুঃখিনী মা এজন্মে বড় কষ্টে কাল কাটিয়েচে, টেকো ঘুরিয়ে সূতো কেটে পৈতে করে বেচে দিন কাটিয়েচে, তাই বুঝি এত যত্ন আজ করচ।'

"সমস্ত দিন কাছে রাখিয়া স্নানাহার করাইয়া কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গোপালের মাকে কামারহাটি পাঠাইয়া দিলেন। ফিরিবার সময় ভাবদৃষ্ট বালক গোপালও পূর্বের ন্যায় ব্রাহ্মণীর কোলে চাপিয়া চলিল। ঘরে ফিরিয়া গোপালের মা পূর্বাভ্যাসে জপ করিতে বসিলেন, কিন্তু সেদিন আর কি জপ করা যায়? যাঁহার জন্য জপ, যাঁহাকে এতকাল ধরিয়া ভাবা, সে যে সম্মুখে নানা রঙ্গ, নানা আবদার করিতেছে! ব্রাহ্মণী শেষে উঠিয়া গোপালকে কাছে লইয়া তক্তাপোশের উপর বিছানায় শয়ন করিল। ব্রাহ্মণীর যাহাতে তাহাতে শয়ন—মাথায় দিবার একটা বালিশও ছিল না। এখন শয়ন করিয়াও নিষ্কৃতি নাই—গোপাল শুধুমাথায় শুইয়া খুঁৎখুঁৎ করে! অগত্যা ব্রাহ্মণী আপনার বাম বাহূপরি গোপালের মাথা রাখিয়া তাহাকে কোলের গোড়ায় শোয়াইয়া কত কি বলিয়া ভুলাইতে লাগিল···।

"···গোপালের মা নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া গোপালকে উদ্দেশ্যে খাওয়াইয়া পরে নিজে খাইতেন। পূর্বোক্ত ঘটনার পরদিন সকাল সকাল রন্ধন করিয়া সাক্ষাৎ গোপালকে খাওয়াইবার জন্য বাগান হইতে শুষ্ক কাঠ কুড়াইতে গেলেন, দেখেন, গোপালও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া কাঠ কুড়াইতেছে ও রান্নাঘরে আনিয়া জমা করিয়া রাখিতেছে। এইরূপে মায়ে পোয়ে কাঠকুড়ান হইল—তাহার পর রান্না। রান্নার সময়ও দুরন্ত গোপাল কখন

কাছে বসিয়া, কখন পিঠের উপর পড়িয়া সব দেখিতে লাগিল, কত কি বলিতে লাগিল, কত কি আবদার করিতে লাগিল! ব্রাহ্মণীও কখন মিষ্টকথায় তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে লাগিলেন, কখন বকিতে লাগিলেন।

"...কিছুদিন পরে গোপালের মা একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন। ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নহবতে...যাইয়া জপ করিতে বসিলেন। নিয়মিত জপ সাঙ্গ করিয়া প্রণাম করিয়া উঠিতেছেন এমন সময়ে...ঠাকুর... ঐস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।...বলিলেন, 'তুমি এখনও অত জপ কর কেন? তোমার তো খুব হয়েচে।' গোপালের মা—'জপ করব না? আমার কি সব হয়েচে?...ঠাকুর—'হাঁ, তোমার আপনার জন্মে জপতপ সব করা হয়ে গেছে, তবে (নিজের শরীর দেখাইয়া) এই শরীরটা ভাল থাকবে বলে ইচ্ছা হয় তো করতে পার।' গোপালের মা—'তবে এখন থেকে যা কিছু করব সব তোমার, তোমার, তোমার।'...

"এখন হইতে গোপালের মার জপতপ সব শেষ হইল। দক্ষিণেশ্বরে... আসা যাওয়া বাড়িয়া গেল। ইতঃপূর্বে তাঁহার যে এত খাওয়া দাওয়ার আচারনিষ্ঠা ছিল সে সবও এই মহাভাবতরঙ্গে পড়িয়া দিন দিন কোথায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল।...আর নিষ্ঠাই বা রাখেন কি করিয়া? গোপাল যে যখন তখন খাইতে চায়, আবার নিজে খাইতে খাইতে মার মুখে গুঁজিয়া দেয়! তাহা কি ফেলিয়া দেওয়া যায়? আর ফেলিয়া দিলে সে যে কাঁদে! ব্রাহ্মণী এই অপূর্ব ভাবতরঙ্গে পড়িয়া অবধি বুঝিয়াছিলেন যে, উহা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবেরই খেলা এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবই তাঁহার 'নবীন-নীরদশ্যাম নীলেন্দীবরলোচন গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণ।' কাজেই তাঁহাকে রাঁধিয়া খাওয়ান, তাঁহার প্রসাদ খাওয়া ইত্যাদিতে আর দ্বিধা রহিল না।

"এইরূপে অনবরত দুইমাস কাল কামারহাটির ব্রাহ্মণী গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণকে দিবারাত্রি বুকে পিঠে করিয়া এক সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন।... দুই মাসের পর...দর্শনাদি পূর্বাপেক্ষা অনেকটা কমিয়া গেল। তবে একটু স্থির হইয়া বসিয়া গোপালের চিন্তা করিলেই পূর্বের ন্যায় দর্শন পাইতে লাগিলেন।"

ঠাকুর গোপালের মাকে খাওয়াইতে ভালবাসিতেন, দক্ষিণেশ্বরে আসিলেই তাঁহাকে ভাল ভাল জিনিস খাওয়াইতেন। 'গোপাল, তুমি আমায় অত খাওয়াতে ভালবাস কেন?' গোপালের মা একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন। 'তুমি যে আমায় আগে কত খাইয়েচ।' ঠাকুর উত্তর দিলেন। 'আগে কবে খাইয়েচি?' 'জন্মান্তরে।'

ঠাকুর বলিয়াছিলেন, কৃষ্ণাবতারে এই ব্রাহ্মণী ব্রজের ফলওয়ালী ছিলেন, গোপালকে ভাল ভাল ফল খাওয়াইতেন।

কামারহাটির ঠাকুরবাড়ীতে ঠাকুর দুইবার গিয়াছিলেন—একবার দত্ত-গিন্নীর ও একবার গোপালের মার আমন্ত্রণে।

গৌরদাসী

ভবানীপুরের ব্রাহ্মণকন্যা মৃড়ানীর বৈষ্ণবগুরু-দত্ত নাম গৌরদাসী। ঠাকুর ও মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে গৌরদাসী বলিয়াই ডাকিতেন। ভক্ত-সমাজে আগে তিনি গৌর-মা নামে পরিচিতা ছিলেন, ইদানীং গৌরী-মা বলিয়া অভিহিতা হইতেছেন। বিচিত্র ঘটনাবলীর সংঘাতে গঠিত হইয়াছিল এই বৈষ্ণবী সন্ন্যাসিনীর জীবন ও চরিত্র।

বৃন্দাবনে গিয়া বলরাম যখন নিজের বৃদ্ধ পিতাকে ঠাকুরের কথা বলেন, গৌরদাসী সেই সময়ে তাঁহার পিতার কাছেই অবস্থান করিতেছিলেন। বলরামের পিতাকে তিনি ধর্মপিতা বলিতেন, সেই সুবাদে বলরামও তাঁহাকে গৌরদিদি বলিয়া ডাকিতেন।

> বয়সে নবীনা তিনি ব্রাহ্মণের মেয়ে।
> সন্ন্যাসিনীসম বেশ কৃষ্ণের লাগিয়ে॥
> বন্ধুর নিকটে শুনি প্রভুর কাহিনী।
> তাঁহারে দেখিতে নেচে উঠে সন্ন্যাসিনী॥
>
> ... ...
>
> সঙ্গে পিতা গৌরমাতা ভক্ত বলরাম।
> উতরিলা ত্বরা করি কলিকাতা-ধাম॥
> বন্ধুর আছিল এই রীতি বরাবর।

যেই দিনে যাইতেন দক্ষিণশহর ॥
মেয়ে-ছেলে গোষ্ঠীবর্গ প্রতিবাসী যত।
বিচারবিহীনে সঙ্গে অনেক থাকিত ॥
আজি তরীযোগে হয় তাঁহার গমন।
বিরাজেন যেথা প্রভু ভক্তের জীবন ॥
ঘোমটার মধ্যে ঢাকা যতেক রমণী।
প্রভুদেবে বন্দে সবে লুটায়ে অবনী ॥
... ...
অঙ্গুলিনির্দেশে দেখাইয়া গৌরমায়।
বলরামে পুছিলেন প্রভুদেবরায় ॥
কেবা এই ভক্তিমতী কহ পরিচয়।
গুপ্ত-উপযুক্ত মুখ ইহার ত নয় ॥
লজ্জা-ঘৃণা-ভয়হারা ঘরবাড়ী-ছাড়া।
কৃষ্ণ-হেতু বিদেশিনী অনুরাগে ভরা ॥
হবিসহযোগে যেন জলন্ত পাবক।
শতাধিক পরিমাণে হয় উদ্দীপক ॥
সেই মত গৌরমার অনুরাগাগুনে।
বহুগুণে কৈল বৃদ্ধি প্রভুর বচনে ॥
সেই কালে সঙ্গে জুটে উচ্ছ্বাস-পবন।
উড়াইল একদিকে মুখের বসন ॥
ভক্ত-ভগবানে আছে স্বতন্ত্র ভাব।
তাহে সন্ন্যাসিনী করে বেদনা প্রকাশ ॥
প্রভুদেব শান্ত কৈলা শান্তিবারি দিয়া।
দেখে ভক্ত বলরাম অবাক হইয়া ॥
সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁর শ্রীপ্রভুর স্থানে।
বলরাম রাখে তাঁয় নিজ নিকেতনে ॥

মাঝে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া গৌরদাসী ঠাকুরকে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতেন। 'গৌরীমার সম্বন্ধে ঠাকুর কী বলতেন?' এক শিষ্যের সাগ্রহ জিজ্ঞাসার উত্তরে মাতাঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুর বলতেন, গৌরদাসী সিদ্ধগোপিনী।'

অন্যান্য

ঠাকুরের অন্যান্য স্ত্রীভক্তদের মধ্যে বলরাম-গৃহিণী কৃষ্ণভাবিনী, ভাবিনী-ঠাকরুণ (ব্রাহ্মণকন্যা), শ্রীম-গৃহিণী, রামের সহধর্মিণী এবং দেবেন্দ্রের মাতা ও স্ত্রীর কথা কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষ্ণভাবিনী সম্বন্ধে লীলামৃতকার লিখিয়াছেন : "বিত্তবানের তনয়া ও ও জায়া বলিয়া কোন দিনও গরিমা হয় নাই। বসনভূষণে তেমন স্পৃহা না থাকায় এমন সাদাসিদে ভাবে থাকতেন, তাতে জমিদারের ঘরণী বলে বোধ হত না; এত শান্তপ্রকৃতি যে, পরিজনমধ্যে সহসা তাঁহার অস্তিত্ব অনুমিত হত না; এতই দাতা যে, হস্তস্থিত বলয়-দানে এক প্রতিবেশিনীর কন্যাদায় উদ্ধার করেন।···রামের মা সদাই অমানি।···

"রামের মা সন্ধ্যাবেলা দুধ জ্বাল দিতে দিতে কাঁদছেন আর সঙ্গিনী যোগেন-মাকে বলছেন—ছাখ্ দিদি, এমন দুধ প্রাণভরে ভগবানকে খাওয়াতে পারলাম না, কেবল বাড়ীর লোকদের পেটপূজা হবে। তুই যদি পারিস দুধ নিয়ে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যেতে, তা হলে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরকে দুধ খাইয়ে আসি। রাতও হয়েছে, কেউ টেরও পাবে না।···একটা ঘটিতে আধসেরটাক দুধ একটা বাটি ঢাকা দিয়ে গামছা জড়ায়ে দক্ষিণেশ্বরে যান। ঘরে প্রবেশ করিতেই প্রভু কহেন—তোমরা বুঝি আমার জন্যে দুধ এনেছ? বিকেল থেকে মনে হচ্ছে, একটু ধোবো ধোবো মেটো মেটো খাঁটি দুধ খাই।···দুজনে কাছে বসে, নন্দরাণী যেমন গোপালকে খাওয়াতেন তেমনি ভাবে ঠাকুরকে দুধ খাওয়ান এবং আচমন-কল্পনায় আঁখিবারি বর্ষিতে থাকেন।··· [ঠাকুর] রামলালদাদাকে দিয়ে একখানা গাড়ী আনায়ে পাঠাবার কালে বলে দেন—বলরামকে চুপি চুপি বলবি, এরা আমার কাছকে এসেছিল, যেন রাগ না করে।···যোগেন-মাও এ গল্পটি করেছেন।"

বলরাম জন্ম 'লয় ভক্ত অবতারে।
অন্নভিক্ষা শ্রীপ্রভুর তাই তাঁর ঘরে॥

প্রভুর গমনে বহু আড়ম্বর তথা।
অন্নব্যঞ্জনাদি রাঁধে ভামিনীর মাতা॥
মহাভাগ্যবতী এই ব্রাহ্মণের মেয়ে।
বড় খুসি প্রভুদেব তাঁর রান্না খেয়ে॥

এই ভামিনীর মাতাই ভাবিনী-ঠাকরুণ।

শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয়ের কথা-প্রসঙ্গে লীলামৃতকার লিখিয়াছেন :

"দেখিয়াছি, ইঁহার সহধর্মিণীকে ঠাকুর যেরূপ স্নেহাদর করিতেন, তাহা অপর স্ত্রীভক্তদের ভাগ্যে ঘটেছে কি-না সন্দেহ। প্রভুর লীলাবসানে শ্রীমাতৃদেবী যখন বৃন্দাবন যান, ইনি শিশুকন্যা ফেলে প্রাণের টানে শ্রীমার সঙ্গে যান, পরে কালীভায়ার সঙ্গে শ্রীমা ইঁহাকে ঘরে পাঠাইয়া দেন।" মাষ্টার মহাশয়ের সহধর্মিণীর নাম নিকুঞ্জদেবী।

রামের ভক্তসেবা-প্রসঙ্গে পুঁথিকার লিখিয়াছেন :

ভবনে ভক্তের মেলা আছে অনিবার।
সেবা-আয়োজন তেন প্রীতি যাহে যাঁর॥
ভক্তিমতী বিদ্যাশক্তি ভবনে ঘরণী।
উচ্চমতি সেইমত যেইমত স্বামী॥
পতির পশ্চাতে সদা ছায়ার মতন।
আহারার্থী প্রভুভক্তে মায়ের যতন॥

এক বৎসর জন্মমহোৎসবের দিনে ভক্তেরা ঠাকুরকে যে নবীন বসন পরাইয়াছিলেন—

অতি মিহি দেশী ধুতি···লাল পাড় তায়।
সুন্দর চাঁপার বর্ণে ছোবান সেখানি।
ছোবাইয়া দিয়াছেন রামের ঘরণী॥

প্রতি বৎসরই ঠাকুরকে ঐরূপ বসন পরাইতেন তাঁহার ভক্তেরা, আর প্রতিবৎসরই রামের ঘরণী উহা সুন্দর চাঁপার বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিতেন, নিজের মনোমত করিয়া। এই ভক্তিমতী বিদ্যাশক্তির নাম কৃষ্ণপ্রেয়সী।

আহিরীটোলায় নিমুগোস্বামী লেনের বাসায় দেবেন্দ্র একদিন ঠাকুর ও তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে লইয়া মহোৎসব করেন। দ্বিতলের অন্তঃপুরে সেদিন—

দেবেন্দ্র-ঘরণী যিনি পতিসেবাপরায়ণী পবিত্রচরিতা পতিব্রতা।

… …

বস্ত্রাবৃতা গোটা গায়, প্রণমিলে রাঙা পায় তখন জানিলা অন্তর্যামী।
স্বরূপমূরতি তাঁর— চিরদাসী আপনার, লীলাপুরে দেবেন্দ্র-ঘরণী॥
ভক্তিভরে নিজকন্ধে করেছে প্রভুর জন্যে নানাবিধ দ্রব্য ভোজনের।
যাহে দিলা পরিচয়, এ কন্যা সামান্যা নয় এসময় ঘরে মানুষের॥
খাইতে খাইতে ভোজ্য বিধিবিষ্ণুশিবপূজ্য ষড়ৈশ্বর্যবান গুণমণি।
দেবেন্দ্রে ডাকিয়া কন, এ যে বাউলে ধরণ ভক্তিমতী তোমার ঘরণী॥
আহা কি সরলান্তরা, হৃদয় খোলার পারা, ভোগ-আশা নাহি হৃদিপুরে।
দিনেক সঙ্গেতে করি লয়ে যেও কালীপুরী শ্রীমন্দিরে দক্ষিণশহরে॥

ঠাকুরের আজ্ঞানুসারে দেবেন্দ্র একদিন নিজের মাতা, স্ত্রী ও বিহারী মুখুজ্যে নামক একটি ভক্তকে সঙ্গে নিয়া দক্ষিণেশ্বরে যান, নৌকায় করিয়া।

বিহারী গরীব বড় বাহারিতে ঘর।
অর্থ-উপার্জনে আসে শহর-ভিতর॥
দৈবযোগে দেবেন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়।
সন্তানের মত গণি দিলেন আশ্রয়॥
পাত্র দেখি পুত্রাপেক্ষা করেন যতন।
চাকরি করিয়া দিলা মনের মতন॥

… …

প্রভুদেব একদিন দেবেন্দ্রকে কন।
বিহারী প্রকৃত সিদ্ধকৌল একজন॥

দেবেন্দ্রের মাতা বামাসুন্দরী কিছু গুড়ের বাতাসা সঙ্গে আনিয়াছিলেন পুঁটুলিতে বাঁধিয়া। মন্দিরে অনেক দেবতা আছেন, তিনি শুনিয়াছিলেন। দেবেন্দ্র সেই বাতাসার খবর জানিতেন না, ঠাকুরের জন্য তিনি অন্য মিষ্টান্ন আনিয়াছিলেন। একে একে সকলেই ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধা প্রণাম না করিয়া ঠাকুরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

বাৎসল্য উদয় হৈল প্রভুর উপরে।
অকল্যাণ হবে তাই প্রণমিতে নারে॥

অন্তর বুঝিয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঠাকুর বালকের মত বুড়ীর হাত ধরিলেন, এবং মাতৃসম্বোধন করিয়া তাঁহাকে নিজের খাটে বসাইলেন।

শিশুসম একপাশে আপনি বসিয়ে।
কথোপকথন কত যেন মায়ে পোয়ে॥
বুড়ীর আনন্দ এত নাহি লেখাজোখা।
বাতাসার পুঁটুলি বগলে রাখে ঢাকা॥
শিশুসম ভাবে প্রভু কহেন তখন।
বাতাসা খাইতে মোর হয় বড় মন॥

দেবেন্দ্র তখন বিহারীর হাতে পয়সা দিলেন বাতাসা আনিবার জন্য; ঊর্ধ্বশ্বাসে বিহারী ছুটিলেন আলমবাজারে।

বাতাসা বাতাসা প্রভু ক্ষণে ক্ষণে কন।
অবিকল অল্পবয়ঃ শিশুর মতন॥
মায়ের নিকটে যেন অতি শিশু ছেলে।
দ্রব্যের কারণে টানে ধরিয়া আঁচলে॥
ঠিক তেন প্রভুদেব করি আলিগুলি।
বাহির করিলা ঢাকা বুড়ীর পুঁটুলি॥

তাড়াতাড়ি পুঁটুলি খুলিয়া দেখেন তাহাতে বাতাসা রহিয়াছে! অমনি মহা আনন্দিত হইয়া সেই বাতাসা মুখে দিলেন।

১২৯২ সালের পুনর্যাত্রার দিন সকালে ঠাকুর বলরাম বসুর বাড়ীতে শুভাগমন করেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য বহু স্ত্রীভক্ত সেখানে সমবেত হইয়াছিলেন। "এই সকল সতী সাধ্বী ভক্তিমতী-স্ত্রীলোকদের সহিত কামগন্ধহীন ঠাকুরের যে কি-এক মধুর সম্বন্ধ ছিল তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। ইঁহাদের অনেকেই ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতা বলিয়া তখনি জানেন।...কোন কোন ভাগ্যবতী উহা গোপালের মার ন্যায় দর্শনাদি দ্বারা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কাজেই...তাঁহার নিকট কোনরূপ ভয়ডর বা সঙ্কোচ অনুভব করেন না। ঘরে কোনরূপ ভাল খাবারদাবার তৈয়ার করিলে তাহা পতিপুত্রদের আগে না দিয়া ইঁহারা ঠাকুরের জন্য আগে পাঠান বা স্বয়ং লইয়া যান। ঠাকুর থাকিতে এইসকল

ভদ্রমহিলারা কতদিন যে পায়ে হাঁটিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় নিজেদের বাটীতে গতায়াত করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। কোনদিন··· উৎসব-কীর্তনাদি সাঙ্গ হইতে ও দক্ষিণেশ্বর হইতে ফিরিতে রাত দুই প্রহরেরও অধিক হইয়া গিয়াছে!' ইঁহাদের কাহাকেও ঠাকুর ছেলেমানুষের মত কত আগ্রহের সহিত নিজের পেটের অসুখ প্রভৃতি রোগের ঔষধ জিজ্ঞাসা করিতেন; কেহ তাঁহাকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিতে দেখিয়া হাসিলে বলিতেন, 'তুই কি জানিস? ও কত বড় ডাক্তারের স্ত্রী—ও দুচারটে ঔষধ জানেই জানে।' কাহারও ভাবপ্রেম দেখিয়া বলিতেন, 'ও কৃপাসিদ্ধ গোপী।' কাহারও মধুর রান্না খাইয়া বলিতেন, 'ও বৈকুণ্ঠের রাঁধুনী, সুক্তোয় সিদ্ধহস্ত!'[১]

১ কৃপাসিদ্ধ গোপী—যোগীন-মা; বৈকুণ্ঠের রাঁধুনী—ভাবিনী-ঠাকরুণ।

যাঁহারা ঠাকুরকে দেখিয়াছেন

১২৮৮ সাল হইতে তিনচারি বৎসরের মধ্যে ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছেন এমন কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তির কথা—ঠাকুরের সহিত তাঁহাদের মিলন ও কথাবার্তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ—এখানে দেওয়া হইল।

অশ্বিনীকুমার দত্ত

বরিশালের প্রসিদ্ধ জননেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত ঠাকুরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের বিবরণ স্বয়ং লিখিয়া গিয়াছেন। উহার কিয়দংশ এইরূপ :

"বোধ হয় ১৮৮১ [১২৮৮] সালের শারদীয় অবকাশের সময় প্রথম দর্শন।...আমি নৌকায় দক্ষিণেশ্বর গিয়া...একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পরমহংস কোথায়?' তিনি উত্তরদিকের বারান্দায় তাকিয়া ঠেসান দেওয়া এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে বল্লেন, 'এই পরমহংস।' কালাপেড়ে ধুতি-পরা আর তাকিয়া ঠেসান দেওয়া দেখে ভাবলাম, এ আবার কিরকম পরমহংস? কিন্তু দেখলাম, দুটি ঠ্যাং উঁচু করে, আবার তাই দুহাত দিয়ে বেষ্টন করে আধাচিৎ হয়ে তাকিয়ায় ঠেসান দেওয়া হয়েছে। মনে হল, এঁর কখনও বাবুদের মত তাকিয়া ঠেসান দেওয়া অভ্যাস নাই, তবে বোধ হয় ইনিই পরমহংস হবেন। তাকিয়ার অতি নিকটে তাঁহার ডান পাশে একটি বাবু বসে আছেন। শুনলাম তাঁর নাম রাজেন্দ্র মিত্র, যিনি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী হয়েছিলেন। আরও ডান দিকে কয়েকটি লোক বসে আছেন।...বল্লেন, দেখ দিকিন কেশব আসছে কি না? একজন একটু এগিয়ে ফিরে এসে বল্লেন,—না। আবার একটু শব্দ হতে বল্লেন, দেখ—আবার দেখ। এবারও একজন দেখে এসে বল্লেন, —না। অমনি পরমহংসদেব হাসতে হাসতে বল্লেন, 'পাতের উপর পড়ে পাত, রাই বলে—ওই বুঝি এল প্রাণনাথ।...কেশবের চিরকালই কি এই রীত—আসে আসে, আসে না!...সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় কেশব দলবলসহ এসে উপস্থিত।

"এসে যেমন ভূমিষ্ঠ হয়ে ওঁকে প্রণাম করলেন, উনিও ঠিক তদ্রূপ ক'রে একটু পরে মাথা তুল্লেন। তখন সমাধিস্থ, বলছেন—'রাজ্যের লোক জুটিয়ে নিয়ে এসেছেন, আমি কিনা বক্তৃতা করব। তা আমি পারব টারব নি। করতে হয় তুমি কর, আমি ওসব পারব নি।' ঐ অবস্থায় একটু দিব্য হাসি হেসে বলছেন—'আমি তোমার খাবদাব থাকব, আমি তোমার খাব শোব আর বাহ্যে যাব। আমি ওসব পারব নি।' কেশববাবু দেখছেন আর ভাবে ভরপূর হয়ে যাচ্ছেন, একএকবার ভাবের ভরে 'আঃ আঃ' করছেন। আমি ঠাকুরের অবস্থা দেখে ভাবছি, এ কি ঢং?···

"···কীর্তন আরম্ভ হল। তখন যা দেখলাম তা বোধ হয় জন্মজন্মান্তরেও ভুলব না। সকলে নাচতে লাগলেন,···মাঝখানে ঠাকুর, আর সবাই তাঁকে ঘিরে নাচছেন। নাচতে নাচতে একেবারে স্থির—সমাধিস্থ। অনেকক্ষণ এইভাবে গেল। শুনতে শুনতে দেখতে দেখতে বুঝলাম, এ পরমহংস বটে।···

"আর একদিন গেছি। প্রণাম করে বসেছি, বল্লেন—সেই যে কাক খুল্লে ফস্‌ফস্ করে উঠে, একটু টক একটু মিষ্টি, তার একটা এনে দিতে পার? আমি বল্লাম—লেমনেড? ঠাকুর বল্লেন—আন না?···এদিন যতদূর মনে পড়ে আর কেউ ছিল না। কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম—'আপনার কি জাতিভেদ আছে?' ঠাকুর—কই আর আছে? কেশব সেনের বাড়ী চড়চড়ি খেয়েছি। তবু একদিনের কথা বলছি। একটা লোক লম্বা দাড়িওয়ালা বরফ নিয়ে এসেছিল, তা কেমন খেতে ইচ্ছা হল না; আবার একটু পরে একজন তারই কাছ থেকে বরফ নিয়ে এল, ক্যাচর ম্যাচর করে চিবিয়ে খেয়ে ফেল্লাম। তা জান, জাতিভেদ আপনি খসে যায়। যেমন নারিকেলগাছ তালগাছ বড় হয়, বেল্লো তো আপনি খসে পড়ে। জাতিভেদ তেমনি খসে যায়। টেনে ছিঁড়ো না, ঐ শালাদের মত।···

"আমি—হিন্দুতে ও ব্রাহ্মতে তফাৎ কি? বল্লেন—তফাৎ আর কি? এইখানে রোশনচৌকি বাজে, একজন সানাইয়ের ভোঁ ধরে থাকে, আর

একজন তারই ভিতর 'রাধা আমার মান করেছে' ইত্যাদি রংপরং তুলে নেয়। ব্রাহ্মেরা নিরাকার ভোঁ ধরে বসে আছে, আর হিন্দুরা রংপরং তুলে নিচ্ছে! জল আর বরফ—নিরাকার আর সাকার। যা জল তাই ঠাণ্ডায় বরফ হয়, জ্ঞানের গরমিতে বরফ জল হয়, ভক্তির হিমে জল বরফ হয়।…

"বরিশালে অচলানন্দ তীর্থাবধূতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল বলাতে বল্লেন, 'সেই কোতরঙের রাজকুমার তো?…তাকে কেমন লাগল?' আমি—খুব ভাল লাগল। ঠাকুর—আচ্ছা, সে ভাল, না আমি ভাল? আমি—তাঁর সঙ্গে কি আপনার তুলনা হয়? তিনি পণ্ডিত, বিদ্বান লোক আর আপনি কি পণ্ডিত জ্ঞানী? উত্তর শুনে একটু অবাক হয়ে চুপ করে রইলেন।… আমি বল্লাম, 'তা তিনি পণ্ডিত হতে পারেন, আপনি মজার লোক—আপনার কাছে খুব মজা।' এইবার হেসে বল্লেন, 'বেশ বলেছ, ঠিক বলেছ।'…

"আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁকে পাব কি করে? উত্তর—ওগো, সে তো চুম্বক লোহাকে যেমন টানে তেমনি আমাদের টানতেই আছে। লোহার গায়ে কাদা মাখা থাকলেই লাগতে পারে না। কাঁদতে কাঁদতে যেমন কাদাটুকু ধুয়ে যায় অমনি টুক করে লেগে যায়।…তোমরা তো সংসারে থাকবে, তা একটু গোলাপী নেশা করে থেকো। কাজকর্ম করছ অথচ নেশাটি লেগে আছে। তোমরা তো আর শুকদেবের মত হতে পারবে না—যে খেয়ে খেয়ে ন্যাংটো-ভাংটো হয়ে পড়ে থাকবে।…একখানি আম্মোক্তারনামা লিখে দাও—বকলমা দিয়ে দাও, উনি যা হয় করবেন। তুমি থাকবে বড়লোকের বাড়ীর ঝির মত।…

"এতক্ষণ মেঝেয় বসে কথা হচ্ছিল, এখন তক্তাপোশের উপরে উঠে লম্বা হয়ে শুলেন। আমায় বল্লেন, হাওয়া কর। আমি হাওয়া করতে থাকলাম।…একটু পরে বল্লেন, বড্ড গরম গো, পাখাখানা একটু জলে ভিজিয়ে নাও। আমি বল্লাম, 'আবার শৌক তো আছে দেখছি।' হেসে বল্লেন, 'কেন থাকবে নি? ক্যা—নো থাকবে নি?'…সেদিন কাছে বসে যে সুখ পেয়েছি সে আর বলবার নয়।

"শেষবার···আমার স্কুলের হেডমাষ্টারকে [জগদীশ মুখোপাধ্যায়] নিয়ে গেছলাম।···দেখেই বল্লেন, 'আবার ইটি পেলে কোথায়? বেড়ে তো! ওগো, তুমি তো উকিল, উঃ বড় বুদ্ধি। আমায় একটু বুদ্ধি দিতে পার? তোমার বাবা যে সেদিন এসেছিলেন, এখানে তিনদিন ছিলেন।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাঁকে কেমন দেখলেন?' বল্লেন, 'বেশ লোক, তবে মাঝে মাঝে হিজিবিজি বকে।' আমি বল্লাম, 'আবার দেখা হলে হিজিবিজি ছাড়িয়ে দেবেন।' একটু হাসলেন।

"আমি বল্লাম 'আমাদের গোটা কতক কথা শুনান।'···ঠাকুর—হৃদে বলত, মামা, তোমার বুলিগুলি সব এক সময়ে বলে ফেল না। ফিবার এক বুলি কেন বলবে? আমি বলতাম, তা তোর কিরে শালা? আমার বুলি আমি লক্ষবার ঐ এক কথা বলব, তোর কিরে?···

"কিঞ্চিৎ পরে বসে ওঁ ওঁ করতে করতে গান ধরলেন—

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।

দুইএক পদ গাইতে গাইতে ডুব্ ডুব্ বল্‌তে বলতে ডুব। সমাধি ভঙ্গ হল, পায়চারি করতে লাগলেন। ধুতি যা পরা ছিল তা দুই হাত দিয়ে টানতে টানতে একেবারে কোমরের উপর তুলেছেন, এদিক দিয়ে খানিকটে মেঝে ঝেঁটিয়ে যাচ্ছে, ওদিক দিয়ে খানিকটে অমনি পড়েছে।···একটু পরেই 'দূর শালার ধুতি' বলে ধুতিটা ফেলে দিলেন। দিগম্বর হয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। উত্তরদিক থেকে কার যেন ছাতা ও লাঠি···এনে জিজ্ঞাসা করলেন, এ ছাতা লাঠি তোমাদের? আমি বল্লাম,—না। অমনি বল্লেন, 'আমি আগেই বুঝেছি, এ তোমাদের নয়। আমি ছাতা লাঠি দেখেই মানুষ বুঝতে পারি। সেই একটা লোক হাঁউমাউ করে কতকগুলো গিলে গেল, এ তারই নিশ্চয়।'

"কিছুকাল পরে ঐ ভাবেই খাটের উত্তরপাশে পশ্চিমমুখো হয়ে বসে পড়লেন। বসেই আমায় জিজ্ঞাসা—ওগো আমায় কি অসভ্য মনে করছ? আমি বল্লাম,—না, আপনি খুব সভ্য, আবার এ জিজ্ঞাসা করছেন কেন? ঠাকুর—আরে শিবনাথ-টিবনাথ অসভ্য মনে করে। ওরা এলে কোন

রকমে একটা ধুতি-টুতি জড়িয়ে বসতে হয়।...আজ রাম দত্তের বাড়ী কীর্তন হবে,...সন্ধ্যার সময় সেইখানে যেও।...

"ঘরে ছবি ক'খানা দেখালেন, পরে জিজ্ঞাসা করলেন, বুদ্ধদেবের ছবি পাওয়া যায়? আমি—শুনতে পাই পাওয়া যায়। ঠাকুর—সেই ছবি একখানি তুমি আমায় দিও। আমি—যে আজ্ঞা, যখন এবার আসব, নিয়ে আসব।

"আর দেখা হল না। আর সে শ্রীচরণপ্রান্তে বসতে ভাগ্যে ঘটে নাই।" [কথামৃত]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১২৮৯ সালের ২১শে শ্রাবণ শনিবার বিকালে ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দেখিতে আসেন বাদুড় বাগানে তাঁহার বাড়ীতে। ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন মাষ্টার, ভবনাথ ও হাজরা। মাষ্টার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন, ঠাকুর তাঁহার কাছে বিদ্যাসাগরকে দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দ্বিতলের ঘরে বসিয়া বিদ্যাসাগর তখন দুইএকটি বন্ধুর সহিত কথা কহিতেছিলেন, ঠাকুর গৃহপ্রবেশ করিবামাত্র দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। বিদ্যাসাগরকে দেখিতে দেখিতে ঠাকুর ভাবে হাসিতে লাগিলেন ও ভাব সম্বরণ করিবার জন্য বলিলেন, জল খাব। বিদ্যাসাগর তাঁহাকে সযত্নে মিষ্টিমুখ করাইলেন। দেখিতে দেখিতে ঘরটি লোকে ভরিয়া গেল ও কথাবার্তা সুরু হইল।

ঠাকুর।...এতদিন খাল, বিল, হদ্দ নদী দেখেচি; এইবার সাগর দেখচি। (সকলের হাস্য)।

বিদ্যাসাগর। তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান। (হাস্য)।

ঠাকুর। নাগো, নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর—তুমি ক্ষীরসমুদ্র। (সকলের হাস্য)।

বিদ্যাসাগর। তা বলতে পারেন বটে।

ঠাকুর। তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্যে যে কর্ম করা যায় সে রাজসিক কর্ম বটে, কিন্তু এ

রজোগুণ—সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই! শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্যে দয়া রেখেছিলেন—ঈশ্বর-বিষয় শিক্ষা দিবার জন্যে। তুমি বিদ্যাদান অন্নদান করচ, এও ভাল। নিষ্কাম করতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়।···আর সিদ্ধ তুমি তো আছই।

বিদ্যাসাগর। মহাশয়, কেমন করে?

ঠাকুর। আলু পটল সিদ্ধ হলে নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম! তোমার অত দয়া!

বিদ্যাসাগর। কলাই-বাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয়! (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর। তুমি তা নও গো। শুধু পণ্ডিতগুলো দরকচা পড়া। না এদিক, না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, তার নজর ভাগাড়ে।··· আসক্তি অবিদ্যার সংসারে। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য। ব্রহ্ম বিদ্যা-অবিদ্যার পার। তিনি মায়াতীত।

এই জগতে বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া দুইই আছে; জ্ঞান-ভক্তি আছে, আবার কামিনীকাঞ্চনও আছে; সৎও আছে অসৎও আছে; ভালও আছে, আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভাল-মন্দ জীবের পক্ষে, সৎ-অসৎ জীবের পক্ষে, তাঁর ওতে কিছু হয় না। যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ ভাগবত পড়চে; আর কেউ বা জাল করচে। প্রদীপ নির্লিপ্ত। সূর্য শিষ্টের উপর আলো দিচ্চে, আবার দুষ্টের উপর দিচ্চে।

যদি বল দুঃখ, পাপ, অশান্তি এসকল তবে কী? তার উত্তর এই যে, ওসব জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায়; সাপের কিন্তু কিছু হয় না।

ব্রহ্ম যে কী, মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে; বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়্দর্শন—সব এঁটো হয়ে গেছে! মুখে পড়া হয়েচে, মুখে উচ্চারণ হয়েচে, তাই এঁটো হয়েচে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কী, আজ পর্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারে নাই।

বিদ্যাসাগর। বা! এটি তো বেশ কথা! আজ একটি নূতন কথা শিখলাম। ঠাকুর।...মানুষ মনে করে, আমরা তাঁকে জেনে ফেলেচি। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিছল। এক দানা খেয়ে পেট ভরে গেল, আর এক দানা মুখে করে বাসায় যেতে লাগল। যাবার সময় ভাবচে, এবার এসে সব পাহাড়টি লয়ে যাব। ক্ষুদ্র জীবেরা এই সব মনে করে। জানে না, ব্রহ্ম বাক্যমনের অতীত।...

তবে বেদে-পুরাণে যা বলেচে, সে কিরকম বলা জান? একজন সাগর দেখে এলে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখলে, সে লোক মুখ হাঁ করে বলে—'ও! কী দেখলুম! কী হিল্লোল কল্লোল!' ব্রহ্মের কথাও সেইরকম। বেদে আছে—তিনি আনন্দস্বরূপ, সচ্চিদানন্দ, শুকদেবাদি এই ব্রহ্মসাগর-তটে দাঁড়িয়ে দর্শন স্পর্শন করেছিলেন। একমতে আছে—তাঁরা এ সাগরে নামেন নাই, এ সাগরে নামলে আর ফিরবার জো নাই।

সমাধিস্থ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়—ব্রহ্মদর্শন হয়। সে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, মানুষ চুপ হয়ে যায়। ব্রহ্ম কী বস্তু মুখে বলবার শক্তি থাকে না। লুণের ছবি (লবণ-পুত্তলিকা) সমুদ্র মাপতে গিছল! কত গভীর জল তাই খপর দেবে! খপর দেওয়া আর হল না, যাই নামা অমনি গলে যাওয়া! কে আর খপর দিবেক?...

ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল। বিষয়বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ঋষিরা কত খাটত! সকালবেলা আশ্রম থেকে চলে যেত। একলা সমস্ত দিন ধ্যানচিন্তা করত, রাত্রে আশ্রমে ফিরে এসে কিছু ফলমূল খেত। দেখা, শুনা, ছোঁয়া, এসবের বিষয় থেকে মনকে আলাদা রাখত। তবে ব্রহ্মকে বোধে বোধ করত।

কলিতে অন্নগতপ্রাণ, দেহবুদ্ধি যায় না। এ অবস্থায় সোঽহং বলা ভাল নয়। সবই করা যাচ্চে, আবার 'আমিই ব্রহ্ম' বলা ঠিক নয়। যারা বিষয় ত্যাগ করতে পারে না, যাদের 'আমি' কোন মতে যাচ্চে না, তাদের 'আমি দাস' 'আমি ভক্ত' এ অভিমান ভাল। ভক্তিপথে থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়।

জ্ঞানী 'নেতি নেতি' করে, বিষয়বুদ্ধি সব ত্যাগ করে, তবে ব্রহ্মকে জানতে পারে। যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ছাদে পৌঁছান যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী যিনি বিশেষরূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন, তিনি আরও কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন, ছাদ যে জিনিসে তৈয়ারি সেই ইট-চুন-সুরকিতেই সিঁড়িও তৈয়ারি। 'নেতি নেতি' করে যাঁকে ব্রহ্ম বলে বোধ হয়েচে, তিনিই জীব-জগৎ হয়েচেন। বিজ্ঞানী দেখে, যিনি নির্গুণ তিনিই সগুণ।

ছাদে অনেকক্ষণ লোকে থাকতে পারে না, আবার নেমে আসে। যাঁরা সমাধিস্থ হয়ে ব্রহ্মদর্শন করেচেন তাঁরাও নেমে এসে দেখেন যে, জীব-জগৎ তিনিই হয়েচেন।···তখন দেখে, তিনিই আমি, তিনিই জীব-জগৎ সব। এরই নাম বিজ্ঞান।

জ্ঞানীর পথও পথ, জ্ঞান-ভক্তির পথও পথ, আবার ভক্তির পথও পথ। জ্ঞানযোগও সত্য, ভক্তিপথও সত্য; সব পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া যায়। তিনি যতক্ষণ 'আমি' রেখে দেন ততক্ষণ ভক্তিপথই সোজা।···

বিজ্ঞানী দেখে যিনিই ব্রহ্ম তিনিই ভগবান; যিনি গুণাতীত তিনিই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান। এই জীব, জগৎ, মন, বুদ্ধি, ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞান—এসব তাঁর ঐশ্বর্য।···

দেখ না, এই জগৎ কী চমৎকার। কত রকম জিনিস—চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র। কত রকম জীব। বড় ছোট, ভাল মন্দ; কারু বেশী শক্তি, কারু কম শক্তি।

বিদ্যাসাগর। তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েচেন?

ঠাকুর। তিনি বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন, পিঁপড়েতে পর্যন্ত; কিন্তু শক্তিবিশেষ। তা না হলে একজন লোকে দশজনকে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়। আর তা না হলে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েচে দুটো? তোমার দয়া তোমার বিদ্যা আছে—অন্যের চেয়ে। তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে। তুমি একথা মান কি-না? (বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন)।

শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু নাই। তাঁকে পাবার উপায় জানবার জন্যেই বই পড়া।···

বিজ্ঞানী কেন ভক্তি লয়ে থাকে? এর উত্তর এই যে, 'আমি' যায় না। সমাধি-অবস্থায় যায় বটে, কিন্তু আবার এসে পড়ে। আর সাধারণ জীবের অহং যায় না। অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও, আবার তার পরদিন ফেকড়ি বেরিয়েচে। (সকলের হাস্য)।···সেব্য-সেবক ভাবই ভাল। আমি তো যাবার নয়, তবে থাক্ শালা 'দাস-আমি' হয়ে।

'আমি ও আমার' এই দুটি অজ্ঞান। আমার বাড়ী, আমার টাকা, আমার বিদ্যা, আমার এই সব ঐশ্বর্য—এই যে ভাব এটি অজ্ঞান থেকে হয়। 'হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর এসব তোমার জিনিস—বাড়ী, পরিবার, ছেলেপুলে, লোকজন, বন্ধুবান্ধব, এসব তোমার জিনিস—এভাব জ্ঞান থেকে হয়।

মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখা উচিত। মরবার পর কিছুই থাকবে না। এখানে কতকগুলি কর্ম করতে আসা। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, কলকাতায় কর্ম করতে আসা।···

তাঁকে কি বিচার করে জানা যায়? তাঁর দাস হয়ে, তাঁর শরণাগত হয়ে তাঁকে ডাক। (বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে) আচ্ছা, তোমার কী ভাব?

বিদ্যাসাগর (মৃদু হাসিয়া)। আচ্ছা, সেকথা আপনাকে একলা একলা একদিন বলব। (সকলের হাস্য)।···

ঠাকুর। যদি তাঁতে বিশ্বাস থাকে তা হলে পাপ করুক, আর মহাপাতকই করুক, কিছুতেই ভয় নাই।···

বিশ্বাস আর ভক্তি। তাঁকে ভক্তিতে সহজে পাওয়া যায়।···

ভাব ভক্তি, এর মানে—তাঁকে ভালবাসা। যিনিই ব্রহ্ম তাঁকেই মা বলে ডাকচে। 'প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে। সেটা চাতরে কি ভাঙব হাঁড়ি, বোঝ না রে মন ঠারেঠোরে॥' রামপ্রসাদ মনকে বলচে ঠারেঠোরে বুঝতে। এই বুঝতে বলচে যে, বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলেচে

তাঁকেই আমি মা বলে ডাকচি।…মা বড় ভালবাসার জিনিস কিনা। ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়।…যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে তা হলে আর এসব কর্মের বেশী দরকার নাই।…

তুমি যে কর্ম করচ এসব সৎকর্ম। যদি 'আমি কর্তা' এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে করতে পার তা হলে খুব ভাল। এই নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ঈশ্বরেতে ভক্তিভালবাসা আসে।…কিন্তু যত তাঁর উপর ভক্তিভালবাসা আসবে, ততই তোমার কর্ম কমে যাবে।…

তুমি যেসব কর্ম করচ, এতে তোমার নিজের উপকার।…জগতের উপকার মানুষ করে না, তিনিই করচেন, যিনি চন্দ্র-সূর্য করেচেন, যিনি মা-বাপের স্নেহ, যিনি মহতের ভিতর দয়া, যিনি সাধু-ভক্তের ভিতর ভক্তি দিয়েচেন। যে লোক কামনাশূন্য হয়ে কর্ম করবে সে নিজেরই মঙ্গল করবে।

অন্তরে সোনা আছে, এখনও খপর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে। গৃহস্থের বৌর ছেলে হলে ছেলেটিকেই নিয়ে থাকে, ঐটিকে নিয়েই নাড়াচাড়া; আর সংসারের কাজ শাশুড়ী করতে দেয় না।…

নিষ্কাম কর্ম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়; ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কইচি!

(সহাস্যে) এ যা বল্লুম, বলা বাহুল্য, আপনি সব জানেন; তবে খপর নাই। (সকলের হাস্য)। বরুণের ভাণ্ডারে কত কী রত্ন আছে, বরুণ রাজার খপর নাই।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)। তা আপনি বলতে পারেন।

ঠাকুর (সহাস্যে)। হাঁ গো, অনেক বাবু জানে না চাকর বাকরের নাম (সকলের হাস্য), বা বাড়ীর কোথায় কী দামী জিনিস আছে।

"কথাবার্তা শুনিয়া সকলে আনন্দিত।…ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন ভক্তসঙ্গে। বিদ্যাসাগর আত্মীয়গণ-সঙ্গে দাঁড়াইয়াছেন, ঠাকুরকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন কেন? মূলমন্ত্র করে জপিতেছেন, জপিতে জপিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। অহেতুক কৃপাসিন্ধু! বুঝি যাইবার সময় মহাত্মা বিদ্যাসাগরের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য মারে কাছে প্রার্থনা করিতেছেন।" [কথামৃত]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১২৯১ সালের ২২শে অগ্রহায়ণ ঠাকুর অধরলাল সেনের বেনেটোলার বাড়ীতে শুভাগমন করেন ভক্তসঙ্গে। অধর সেদিন তাঁহার কয়েকটি বন্ধু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহারা ঠাকুরকে দেখিয়া বলিবেন তিনি যথার্থ মহাপুরুষ কি-না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম; অধর বঙ্কিমের পরিচয় দিলেন।

ঠাকুর (সহাস্যে)। বঙ্কিম! তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো!

বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে)। আর মহাশয়, জুতোর চোটে। (সকলের হাস্য)। সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।

ঠাকুর। না গো, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বঙ্কিম হয়েছিলেন, শ্রীমতীর প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন। কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যা কেউ কেউ করে, শ্রীরাধার প্রেমে ত্রিভঙ্গ। কালো কেন জান? আর চৌদ্দপো, অত ছোট কেন? যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে, ততক্ষণ কালো দেখায়; যেমন সমুদ্রের জল দূর থেকে নীলবর্ণ দেখায়।...সূর্য দূরে বলে খুব ছোট দেখায়।...ঈশ্বরের স্বরূপ ঠিক জানতে পারলে আর কালোও থাকে না, ছোটও থাকে না।...

শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, শ্রীমতী তাঁর শক্তি—আদ্যাশক্তি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যুগলমূর্তির মানে কী? পুরুষ আর প্রকৃতি অভেদ...। পুরুষ, প্রকৃতি না হলে থাকতে পারে না; প্রকৃতিও পুরুষ না হলে থাকতে পারে না।... যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি। দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নিকে ভাবা যায় না, আর অগ্নি ছাড়া দাহিকা শক্তি ভাবা যায় না। তাই যুগলমূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি শ্রীমতীর দিকে, শ্রীমতীর দৃষ্টি কৃষ্ণের দিকে। শ্রীমতীর গৌরবর্ণ বিদ্যুতের মত, শ্রীমতী নীলাম্বর পরেচেন। আর শ্রীমতী নীলকান্ত

মণি দিয়ে অঙ্গ সাজিয়েছেন। শ্রীমতীর পায়ে নূপুর তাই শ্রীকৃষ্ণ নূপুর পরেছেন; অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের অন্তরে বাহিরে মিল।

(অধরের বঙ্কিমাদি বন্ধুগণ ইংরাজীতে আস্তে আস্তে কথা কহিতেছেন দেখিয়া সহাস্যে) কিগো, আপনারা ইংরাজীতে কী কথাবার্তা করচ? (সকলের হাস্য)।

অধর। আজ্ঞে, এই বিষয় একটু কথা হচ্ছিল—কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যার কথা।

ঠাকুর। একটা কথা মনে পড়ে আমার হাসি পাচ্চে।...একজন নাপিত ...একজন ভদ্রলোককে কামাচ্ছিল। এখন কামাতে কামাতে তার একটু লেগেছিল, আর সে লোকটি ড্যাম বলে উঠেছিল। নাপিত...ক্ষুর টুর সব সেখানে রেখে, শীতকাল, জামার আস্তিন গুটিয়ে বলে—তুমি আমায় ড্যাম বল্লে, এর মানে কী, এখন বল। সে লোকটি বল্লে—আরে তুই কামা না, ওর মানে এমন কিছু নয়, তবে একটু সাবধানে কামাস। নাপিত...বলতে লাগল—ড্যাম মানে যদি ভাল হয়, তা হলে আমি ড্যাম, আমার বাপ ড্যাম, আমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম; আর ড্যাম মানে যদি খারাপ হয়, তা হলে তুমি ড্যাম, তোমার বাবা ড্যাম, তোমার চৌদ্দপুরুষ ড্যাম। আর শুধু ড্যাম নয়, ড্যাম ড্যাম ড্যাম ড্যা ড্যাম ড্যাম। (সকলের উচ্চহাস্য)।

বঙ্কিম। মহাশয়, আপনি প্রচার করেন না কেন?

ঠাকুর। প্রচার! ওগুলো অভিমানের কথা। মানুষ তো ক্ষুদ্র জীব। প্রচার তিনিই করবেন, যিনি চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করে এই জগৎ প্রকাশ করেছেন।... তিনি সাক্ষাৎকার হয়ে আদেশ না দিলে প্রচার হয় না।... আর সাধন করে নিজের শক্তি বাড়াতে হয়, তা না হলে প্রচার হয় না। 'আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করাকে ডাকে!' ...

(বঙ্কিমের প্রতি) আচ্ছা, আপনি তো খুব পণ্ডিত, আর কত বই লিখেচ; আপনি কী বল, মানুষের কর্তব্য কী? কী সঙ্গে যাবে? পরকাল তো আছে?

বঙ্কিম। পরকাল—সে আবার কী?

ঠাকুর। হাঁ, জ্ঞানের পর আর অন্য লোকে যেতে হয় না, পুনর্জন্ম হয় না। কিন্তু যতক্ষণ না জ্ঞান হয়, ঈশ্বরলাভ হয়, ততক্ষণ সংসারে ফিরে আসতে হয়, কোনমতে নিস্তার নাই। ততক্ষণ পরকালও আছে। জ্ঞান-লাভ হলে, ঈশ্বরদর্শন হলে মুক্তি হয়ে যায়, আর আসতে হয় না। সিধোনো ধান পুতলে আর গাছ হয় না।...

বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে)। মহাশয়, তা আগাছাতেও কোন গাছের কাজ হয় না।

ঠাকুর। জ্ঞানী তা বলে আগাছা নয়। যে ঈশ্বরদর্শন করেচে সে অমৃতফল লাভ করেচে—লাউ-কুমড়া ফল নয়। তার পুনর্জন্ম হয় না। পৃথিবী বল, সূর্যলোক বল, চন্দ্রলোক—কোনও জায়গায় তার আসতে হয় না। উপমা একদেশী। তুমি তো পণ্ডিত, ন্যায় পড় নাই? বাঘের মত ভয়ানক বল্লে যে বাঘের মত একটা ভয়ানক ন্যাজ কি হাড়ীমুখ থাকবে তা নয়।...

তবে কারুকে কারুকে তিনি রেখে দেন মায়ার সংসারে, লোকশিক্ষার জন্যে।...জ্ঞানী বিদ্যামায়া আশ্রয় করে থাকে। সে তাঁর কাজের জন্যে তিনিই রেখে দেন—যেমন, শুকদেব, শঙ্করাচার্য।

(বঙ্কিমের প্রতি) আচ্ছা, আপনি কী বল, মানুষের কর্তব্য কী?

বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে)। আজ্ঞা, তা যদি বলেন, তা হলে আহার নিদ্রা আর মৈথুন।

ঠাকুর (বিরক্ত হইয়া)। এঃ! তুমি তো বড় ছ্যাচড়া! তুমি যা রাতদিন কর, তাই তোমার মুখে বেরুচ্চে। লোক যা খায় তার ঢেকুর উঠে—মূলো খেলে মূলোর ঢেকুর উঠে, ডাব খেলে ডাবের ঢেকুর উঠে। কামিনীকাঞ্চনের ভিতর রাতদিন রয়েচ, আর ঐ কথাই মুখ দিয়ে বেরুচ্চে! কেবল বিষয়চিন্তা করলে পাটোয়ারি স্বভাব হয়, মানুষ কপট হয়। ঈশ্বর-চিন্তা করলে সরল হয়, ঈশ্বরসাক্ষাৎকার হলে ওকথা কেউ বলবে না।

(বঙ্কিমের প্রতি) শুধু পাণ্ডিত্য হলে কী হবে, যদি ঈশ্বরচিন্তা না থাকে? যদি বিবেক-বৈরাগ্য না থাকে? পাণ্ডিত্যে কী হবে, যদি কামিনী-

কাঞ্চনে মন থাকে? চিল শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, কিন্তু ভাগাড়ের দিকে কেবল নজর।...

কেউ কেউ মনে করে, এরা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করচে—পাগলা। এরা খেহেড হয়েচে; আমরা কেমন স্যায়না, কেমন সুখভোগ করচি—টাকা, মান, ইন্দ্রিয়সুখ। কাকও মনে করে, আমি বড় স্যায়না, কিন্তু সকালবেলা উঠেই পরের গু খেয়ে মরে!... (সকলে স্তব্ধ)।...যাদের বিষয়রস তেঁতো লাগে, হরি-পাদপদ্মের সুধা বই আর কিছু ভাল লাগে না, তাদের... হাঁসের স্বভাব। হাঁসের সুমুখে দুধে-জলে দাও, জল ত্যাগ করে দুধ খাবে। আর হাঁসের গতি দেখেচ? একদিকে সোজা চলে যাবে। শুদ্ধ ভক্তের গতিও কেবল ঈশ্বরের দিকে।...

(বঙ্কিমের প্রতি কোমলভাবে) আপনি কিছু মনে কোরো না।

বঙ্কিম। আজ্ঞা, মিষ্টি শুনতে আসি নি।

ঠাকুর। কামিনীকাঞ্চনই সংসার। এরই নাম মায়া। ঈশ্বরকে দেখতে, চিন্তা করতে দেয় না। দুএকটি ছেলে হলে স্ত্রীর সঙ্গে ভাইভগ্নীর মত থাকতে হয়, আর তার সঙ্গে সর্বদা ঈশ্বরের কথা কইতে হয়। তা হলে দু'জনেরই মন ঈশ্বরের দিকে যাবে আর স্ত্রী ধর্মের সহায় হবে।...

আর—কাঞ্চন। আমি...গঙ্গার ধারে বসে 'টাকা মাটি, টাকা মাটি, মাটিই টাকা, টাকাই মাটি' বলে জলে ফেলে দিছলুম!

বঙ্কিম। টাকা মাটি! মহাশয়, চারটা পয়সা থাকলে গরীবকে দেওয়া যায়। টাকা যদি মাটি, তা হলে দয়া পরোপকার করা হবে না?

ঠাকুর। দয়া! পরোপকার! তোমার সাধ্য কী যে তুমি পরোপকার কর? মানুষের এত নপর চপর, কিন্তু যখন ঘুমোয় তখন যদি কেউ দাঁড়িয়ে মুখে মুতে দেয় তো টের পায় না, মুখ ভেসে যায়। তখন অহঙ্কার ...কোথায় যায়?

সন্ন্যাসীর কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করতে হয়।... সংসারী লোকের টাকার দরকার, পরিবার ভরণপোষণ করতে হয়। সংসারী লোক শুদ্ধভক্ত হলে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করে। কর্মের ফল—লাভ লোকসান, সুখদুঃখ ঈশ্বরকে

সমর্পণ করে। আর তাঁর কাছে রাতদিন ভক্তি প্রার্থনা করে।··· এরই নাম নিষ্কাম কর্ম।···

সংসারী ব্যক্তি নিষ্কামভাবে যদি কাউকে দান করে সে নিজের উপকারের জন্যে, পরোপকারের জন্যে নয়। সর্বভূতে হরি আছেন, তাঁরই সেবা করা হয়। হরিসেবা হলে নিজেরই উপকার হল।···এরই নাম কর্মযোগ। এই কর্মযোগও ঈশ্বরলাভের একটি পথ ; কিন্তু বড় কঠিন, কলিযুগের পক্ষে নয়। ···পরের উপকার, পরের মঙ্গল, সে ঈশ্বর করেন—যিনি চন্দ্র-সূর্য, বাপ-মা, ফল-ফুল-শস্য জীবের জন্যে করেচেন। বাপ-মার ভিতর যা স্নেহ দেখ সে তাঁরই স্নেহ ···। দয়ালুর ভিতর যা দয়া দেখ সে তাঁরই দয়া ···। তুমি দয়া কর আর না কর, তিনি কোন না কোনও সূত্রে তাঁর কাজ করবেন। তাঁর কাজ আটকে থাকে না।

তাই জীবের কর্তব্য···তাঁর শরণাগত হওয়া, আর তাঁকে যাতে লাভ হয়, দর্শন হয়, সেইজন্যে ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা।

···জনকাদি প্রত্যাদিষ্ট হয়ে কর্ম করেচেন।

কেউ কেউ মনে করে, শাস্ত্র না পড়লে, বই না পড়লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তারা মনে করে···আগে সায়েন্স পড়তে হয়। (সকলের হাস্য)। তারা বলে, ঈশ্বরের সৃষ্টি এসব না বুঝলে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তুমি কী বল ? আগে সায়েন্স না আগে ঈশ্বর ?

বঙ্কিম। হাঁ, আগে পাঁচটা জানতে হয়, জগতের বিষয়। একটু এদিককার জ্ঞান না হলে ঈশ্বর জানব কেমন করে ? আগে পড়াশুনা করে জানতে হয়।

ঠাকুর। ঐ তোমাদের এক। আগে ঈশ্বর, তারপর সৃষ্টি। তাঁকে লাভ করলে, দরকার হয় তো সবই জানতে পারবে।···তাঁকে জানলে সব জানা যায়, কিন্তু সামান্য বিষয় জানবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। বেদেও একথা আছে।···১-এর পর যদি পঞ্চাশটা শূন্য থাকে, অনেক হয়ে যায়। ১-কে পুছে ফেল্লে কিছু থাকে না। ১-কে নিয়েই অনেক। এক আগে, তারপর অনেক ; আগে ঈশ্বর, তারপর জীবজগৎ।···তোমার আম খাবার

দরকার। বাগানে কতশ আমগাছ, কত হাজার ডাল, কত লক্ষকোটি পাতা, এসব খবরে তোমার কাজ কী?

বঙ্কিম। আম পাই কই?

ঠাকুর। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, আন্তরিক হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। হয়তো এমন কোনও সৎসঙ্গ জুটিয়ে দিলেন যাতে সুবিধা হয়ে গেল। কেউ হয়তো বলে দেয়. এমনি এমনি কর তা হলে ঈশ্বরকে পাবে।

বঙ্কিম। কে—গুরু? তিনি আপনি ভাল আম খেয়ে আমায় খারাপ আম দেন। (হাস্য)।

ঠাকুর। কেন গো, যার যা পেটে সয়।…বাড়ীতে মাছ এলে মা সব ছেলেকে পলুয়া-কালিয়া দেন না।…যার পেটের অসুখ তাকে মাছের ঝোল দেন; তা বলে কি মা সে ছেলেকে কম ভালবাসেন?

গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। গুরুই সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দই গুরু, তাঁর কথা বিশ্বাস করলে—বালকের মত বিশ্বাস করলে—ঈশ্বর লাভ হয়।…বালক যেমন মাকে না দেখলে দিশেহারা হয়,…সেইরকম ঈশ্বরের জন্যে ব্যাকুলতা চাই।…যে পথেই যাও, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শাক্ত, ব্রহ্মজ্ঞানী—যে পথেই যাও, ঐ ব্যাকুলতা নিয়েই কথা। তিনি তো অন্তর্যামী, ভুলপথে গিয়ে পড়লেও দোষ নাই, যদি ব্যাকুলতা থাকে। তিনিই আবার ভালপথে তুলে লন। আর সব পথেই ভুল আছে।…

বঙ্কিম। মহাশয়, ভক্তি কেমন করে হয়?

ঠাকুর। ব্যাকুলতা।…ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরের জন্যে কাঁদলে ঈশ্বরকে লাভ করা পর্যন্ত যায়। অরুণোদয় হলে পূর্বদিক লাল হয়, তখন বোঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের আর দেরি নাই।…

তোমায় বলি, উপরে ভাসলে কী হবে? একটু ডুব দাও।…ঠিক মাণিক ভারী হয়, জলে ভাসে না; তলিয়ে গিয়ে জলের নীচে থাকে।…

বঙ্কিম। মহাশয়, কী করি, পেছনে শোলা বাঁধা আছে। (সকলের হাস্য)। ডুবতে দেয় না।

ঠাকুর। তাঁকে স্মরণ করলে সব পাপ কেটে যায়। তাঁর নামেতে কালপাশ কাটে।…একটা গান শোন—

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেমরত্নধন॥

… …

ঠাকুরের দেবদুর্লভ কণ্ঠের মধুবর্ষী গান সকলে তন্ময় হইয়া শ্রবণ করিলেন। এইবার বঙ্কিম ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন, বিদায় গ্রহণ করিবেন।

বঙ্কিম। মহাশয়, যত আহাম্মক আমাকে ঠাওরেচেন তত নয়। একটি প্রার্থনা আছে, অনুগ্রহ করে কুটিরে একবার পায়ের ধূলা—

ঠাকুর। তা বেশ তো, ঈশ্বরের ইচ্ছা।

বঙ্কিম। সেখানেও দেখবেন ভক্ত আছে।

ঠাকুর (সহাস্যে)। কিগো, কিরকম সব ভক্ত সেখানে? যারা গোপাল গোপাল, কেশব কেশব বলেছিল, তাদের মত কি?…(হাসিতে হাসিতে) তবে গল্পটি বলি শোন। এক জায়গায় একটি স্যাকরার দোকান আছে। তারা পরম বৈষ্ণব—গলায় মালা, তিলক সেবা, প্রায় হাতে হরিনামের ঝুলি আর মুখে সর্বদাই হরিনাম।…পরম বৈষ্ণব, এই কথা শুনে অনেক খরিদ্দার তাদেরই দোকানে আসে,…তারা জানে যে, এদের দোকানে সোনারূপা গোলমাল হবে না। খরিদ্দার দোকানে গিয়ে দেখে যে মুখে হরিনাম করচে আর বসে বসে কাজকর্ম করচে। খরিদ্দার যাই গিয়ে বসল, একজন বলে উঠল, 'কেশব কেশব কেশব!' খানিকক্ষণ পরে আর একজন বলে উঠল, 'গোপাল গোপাল গোপাল!' আবার একটু কথাবার্তা হতে না হতেই আর একজন বলে উঠল, 'হরি হরি হরি!' গয়না গড়বার কথা যখন একরকম ফুরিয়ে এল তখন আর একজন বলে উঠল, 'হর হর হর হর!'…এত ভক্তিপ্রেম দেখে তারা স্যাকরাদের কাছে টাকাকড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত হল…।

কিন্তু কথা কী জান? খরিদ্দার আসবার পর যে বলেছিল, 'কেশব কেশব' তার মানে এই—এরা সব কে?…যে বল্লে, 'গোপাল গোপাল'

তার মানে এই—এরা দেখচি গোরুর পাল…। যে বল্লে 'হরি হরি' তার মানে এই—যেকালে দেখচি গোরুর পাল সে স্থলে তবে 'হরি' অর্থাৎ হরণ করি। আর যে বল্লে 'হর হর' তার মানে এই—যেকালে গোরুর পাল দেখচ সেকালে সর্বস্ব হরণ কর। এই তারা পরমভক্ত সাধু! (সকলের হাস্য)।

"বঙ্কিম বিদায় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু একাগ্র হইয়া কী ভাবিতেছিলেন। ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দেখেন, চাদর ফেলিয়া আসিয়াছেন।…একটি বাবু চাদরখানি কুড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হস্তে দিলেন…।

"…শ্রীযুক্ত বঙ্কিম শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁহার বাটীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করাতে তিনি কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত গিরিশ ও মাস্টারকে তাঁহার সানকিভাঙ্গার বাসায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। ঠাকুরকে আবার দর্শন করিতে আসিবার ইচ্ছা বঙ্কিম প্রকাশ করেন, কিন্তু কার্যগতিকে আর আসা হয় নাই।" [কথামৃত]

শশধর তর্কচূড়ামণি

"নববিধান ব্রহ্মসমাজে ঠাকুরের সঙ্গলাভ করিয়া যখন খুব জমজমাট চলিয়াছে, সেই সময়েই পণ্ডিত শশধরের হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা করিতে কলিকাতা-আগমন ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের দিক দিয়া হিন্দুদিগের নিত্যকর্তব্য অনুষ্ঠানগুলি বুঝাইবার চেষ্টা; 'নানা মুনির নানা মত' কথাটি সর্ববিষয়ে সকল সময়েই সত্য; পণ্ডিতজীর বৈজ্ঞানিক ধর্মব্যাখ্যা সম্বন্ধেও ঐ কথা মিথ্যা হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রোতার হুড়াহুড়ির অভাব ছিল না। আপিসের ফেরতা বাবু-ভায়া ও স্কুল-কলেজের ছাত্রদিগের ভিড় লাগিয়া যাইত।…কলিকাতার অনেক স্থলেই তখন ঐ এক আলোচনা—পণ্ডিত শশধরের ধর্মব্যাখ্যা।

"…ভক্তদিগেরই কেহ কেহ আসিয়া ঠাকুরের নিকট গল্প করিতে লাগিলেন, 'খুব পণ্ডিত, বলেনও বেশ। বত্রিশাক্ষরী হরিনামের সেদিন দেবীপক্ষে অর্থ করিলেন, শুনিয়া সকলে বাহবা বাহবা করিতে লাগিল।…'

'বটে ? ঐটি বাবু একবার শুনতে ইচ্ছা করে।' এই বলিয়া ঠাকুর পণ্ডিতকে দেখিবার ইচ্ছা ভক্তদিগের নিকট প্রকাশ করেন।"

১২৯২ (১৮৮৫) সালের রথযাত্রার দিন সকালে ঠাকুর ঠনঠনিয়ায় ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে আসিয়া ভাটপাড়ার কতকগুলি ভট্টাচার্যের সহিত ধর্মবিষয়ক নানা প্রসঙ্গ করেন। সেখান হইতে অপরাহ্ণে তিনি পণ্ডিত শশধরের সহিত দেখা করিতে যান, পণ্ডিতজীর বাসা নিকটেই ছিল।

"...ঠাকুর সেদিন পণ্ডিতজীকে নানা অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট হইতে চাপরাস বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া ধর্মপ্রচার করিতে যাইলে উহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় এবং কখন কখন প্রচারকের অভিমান-অহঙ্কার বাড়াইয়া তুলিয়া তাহার সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়, এসকল কথা ঠাকুর পণ্ডিতজীকে এই প্রথম দর্শনকালেই বলিয়াছিলেন। এই সকল জ্বলন্ত শক্তিপূর্ণ মহাবাক্যের ফলেই যে পণ্ডিতজী কিছুকাল পরে প্রচারকার্য ছাড়িয়া ৺কামাখ্যাপীঠে তপস্যায় গমন করেন, ইহা আর বলিতে হইবে না।"

এই ঘটনার তিনচারি দিন পরে পণ্ডিত ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন দক্ষিণেশ্বরে। বিশেষ কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি দেখা করিতে আসিবেন শুনিলেই বালকস্বভাব ঠাকুর ভয় পাইতেন। পণ্ডিত দেখা করিতে আসিবেন শুনিয়াও অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং যোগীন, ছোট নরেন ও অন্যান্য অনেককে বলিয়াছিলেন, 'ওরে তোরা তখন থাকিস।' কিন্তু পণ্ডিত শশধর যখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন ঠাকুর যেন আর এক মানুষ হইয়া গেলেন। "হাস্যপ্রস্ফুল্লিতাধরে স্থিরদৃষ্টিতে...দেখিতে দেখিতে তাঁহার অর্ধবাহ্যদশার মত অবস্থা হইল এবং পণ্ডিত শশধরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ওগো, তুমি পণ্ডিত, তুমি কিছু বল।'

"শশধর—মহাশয়, দর্শনশাস্ত্র পড়িয়া আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাই আপনার নিকটে আসিয়াছি ভক্তিরস পাইব বলিয়া। অতএব আমি শুনি, আপনি কিছু বলুন।

"ঠাকুর—আমি আর কী বলব বাবু, সচ্চিদানন্দ যে কী, তা কেউ বলতে পারে না। তাই তিনি প্রথম হলেন অর্ধনারীশ্বর। কেন?—না দেখাবেন বলে যে, পুরুষ-প্রকৃতি দুইই আমি। তারপর তা থেকে আরও এক থাক নেবে আলাদা আলাদা পুরুষ আর আলাদা আলাদা প্রকৃতি হলেন।

"ঐরূপে আরম্ভ করিয়া আধ্যাত্মিক নিগূঢ় কথাসকল বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া ঠাকুর দাঁড়াইয়া উঠিয়া পণ্ডিত শশধরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন: সচ্চিদানন্দে যতদিন মন না লীন হয় ততদিন তাঁকে ডাকা ও সংসারের কাজ করা দুইই থাকে। তারপর তাঁতে মন লীন হলে আর কোনও কাজ করবার প্রয়োজন থাকে না। যেমন ধর কীর্তন গাইচে—'নিতাই আমার মাতা হাতী।' যখন প্রথম গান ধরেচে তখন গানের কথা সুর তাল মান লয়—সকল দিকে মন রেখে ঠিক গাইচে। তারপর যেই গানের ভাবে মন একটু লীন হয়েচে তখন কেবল বলচে—'মাতা হাতী, মাতা হাতী।' পরে যেই আরও মন ভাবে লীন হল অমনি খালি বলচে—'হাতী, হাতী।' আর যেই মন আরও ভাবে লীন হল অমনি 'হাতী' বলতে গিয়ে 'হা—'।

"ঠাকুর ঐরূপে 'হা—' পর্যন্ত বলিয়াই ভাবাবেশে একেবারে নির্বাক নিঃস্পন্দ হইয়া গেলেন এবং···প্রায় পনর মিনিট কাল প্রসন্নোজ্জ্বলবদনে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভাবাবসানে আবার শশধরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন: ওগো পণ্ডিত, তোমায় দেখলুম। তুমি বেশ লোক। গিন্নী যেমন রেঁধে বেড়ে সকলকে খাইয়ে দাইয়ে গামছাখানা কাঁধে ফেলে পুকুরঘাটে গা ধুতে কাপড় কাচতে যায়, আর হেঁসেল-ঘরে ফেরে না, তুমিও তেমনি সকলকে তাঁর কথা বলে কয়ে যে যাবে, আর ফিরবে না।

"পণ্ডিত শশধর ঠাকুরের ঐকথা শুনিয়া 'সে আপনাদের অনুগ্রহ' বলিয়া ঠাকুরের পদধূলি বারংবার গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং··· ভগবদ্‌বস্তু জীবনে লাভ হইল না ভাবিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।"

পণ্ডিত শশধর ইহার পরেও কয়েকবার ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়

সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণযাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারীর ছাত্র ছিলেন নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়। নীলকণ্ঠের বাড়ী বীরভূম জেলায়।

ব্রাহ্মণসন্তান ভক্তি ঘটে বিলক্ষণ।
বড়ই সদয় তাঁরে প্রভু নারায়ণ॥
তোলপাড় করে বঙ্গ কৃষ্ণলীলাগানে।
আগোটা বঙ্গেতে নাম সকলেই জানে॥

ঠাকুর একদিন সকালে তাঁহার গান শুনিতে গিয়াছিলেন কলিকাতায়, হাটখোলার বারোয়ারি মেলায়। ঠাকুরের আগমনবার্তা পাইয়াই ভক্তিমান গায়ক প্রথমতঃ তাঁহার বসিবার জন্য সুন্দর আসন রচনা করেন, তারপরে, তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকটে আসিয়া ও ভক্তিভরে তাঁহাকে বন্দনা করিয়া—

ভক্তসহ প্রভুরায় আসরে লইয়া যায় নিজে করি বাট পরিষ্কার।
এখন প্রভুর দশা, কিঞ্চিৎ ঈষৎ নেশা, মৃদুমন্দ আবেশ-সঞ্চার॥
নিজাসনে উপবিষ্ট প্রভুদেব রামকৃষ্ণ, দুইধারে ভকতনিকর।
ধরণী পরম সুখে ধরিল নিজের বুকে গোলোকের ছবি মনোহর॥
ভাগ্যবান অগণন উপস্থিত লোকজন দরশন অনিমেষে করে।
পতিতপাবন হরি, ভবজলধিকাণ্ডারী দেহ ধরি ধরার আসরে॥
পুরাণগ্রন্থেতে কয় পুনর্জন্ম নাহি হয় বারেক ঈশ্বর-দরশনে।
হাজার হাজার আজি জিনিল জন্মের বাজি নিরখিয়া রাজীবচরণে॥

... ...

গায়ক সাধক-ভক্ত, প্রেমেতে হইয়া মত্ত সম্মুখে পাইয়া প্রভুবরে।
ভক্তিমাখা স্বরচিত গায় কৃষ্ণলীলাগীত শ্রবণে মোহিত চিত্ত করে॥
নিজাসনে উপবিষ্ট ছিলা প্রভু রামকৃষ্ণ, কৃষ্ণকথা করিয়া শ্রবণ।
আবেশে অবশ হৈয়া উঠিলেন দাঁড়াইয়া অঙ্গে নাহি বাহ্যিক চেতন॥
ননীর পুতলি জিনি তখন শ্রীতনুখানি চরণ ধরিতে নারে আর।
কাছে ভক্ত দুইজনে ধরিলেন সযতনে ভাবে মত্ত প্রভুরে আমার॥

আ মরি কি মনোহর সমাধিস্থ কলেবর, নিশাকর বদনমণ্ডলে।
অপরূপ শোভা পায় কিরণহিল্লোল তায় ঝলকে ঝলকে যবে খেলে ॥
... ...
আজি এই যাত্রাশালে সেই ভাতি মুখে খেলে, দেখিতে লোলুপ লোকজনে।
মুখে মুখে কলরব করিয়া দাঁড়ায় সব পতিতপাবন-দরশনে ॥
দেখিবার গোলযোগে যাত্রা যায় প্রায় ভেঙ্গে, ভক্তিমান গায়কপ্রধান।
আপনার দলেবলে সহ খোল-করতালে গায় যুগ্ম রাধাকৃষ্ণ নাম ॥
শুনিয়া যুগল নাম নিম্নদেশে ভগবান নামিতে লাগিলা ক্রমে ক্রমে।
ভক্তগণে পুনরায় বসাইয়া দিল তাঁয় পূর্ববৎ নিজের আসনে ॥
যাত্রারম্ভ হলে পুনঃ আজিকার লীলা শুন, ছনো বলে পুনশ্চ আবেশ।
কৃষ্ণপ্রেম গাঢ়তর, বিকলাঙ্গ গুরুতর হইলেন প্রভু পরমেশ ॥
... ...
অতুল মূরতিখানি ভক্তের জীবন-প্রাণী পাছে তাহে হানি কিছু হয়।
সেহেতু লইয়া তাঁয় সত্বর বাহিরে যায় ভক্তগণে ভীত অতিশয় ॥
সেবাশুশ্রূষার পরে সুস্থ করি প্রভুবরে পলাইল শকটারোহণে।
বাগবাজারেতে ধাম ভক্ত বসু-বলরাম, ভাগ্যবান তাঁহার ভবনে ॥

১২৯১ সালের আশ্বিন মাস। সকালে ঠাকুর নীলকণ্ঠের যাত্রা শুনিয়াছিলেন দক্ষিণেশ্বরে, নবীন নিয়োগীর বাড়ীতে। বিকালে নীলকণ্ঠ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন তাঁহার ঘরে; তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেই ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।

ভাবের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে ঠাকুর মেজেতে মাদুরের উপর বসিলেন—তাঁহার সম্মুখে নীলকণ্ঠ; মাষ্টার, বাবুরাম প্রভৃতি ভক্তেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া। কথাবার্তা হইতে লাগিল।

ঠাকুর (আবিষ্ট হইয়া)। আমি ভাল আছি।

নীলকণ্ঠ (কৃতাঞ্জলি হইয়া)। আমায়ও ভাল করুন।

ঠাকুর (সহাস্যে)। তুমি তো ভাল আছ। 'ক'য়ে আকার 'কা'; আবার আকার দিয়ে কী হবে? 'কা' এর উপর আবার আকার দিলে সেই 'কা'ই থাকে। (সকলের হাস্য)।

নীলকণ্ঠ। আজ্ঞা, এই সংসারে পড়ে রয়েছি।

ঠাকুর। তোমায় সংসারে রেখেচেন পাঁচজনের জন্তে।·· দুএকটা পাশ তিনি রেখে দেন লোকশিক্ষার জন্তে। তুমি যাত্রাটি করেচ, তোমার ভক্তি দেখে কত লোকের উপকার হচ্চে। আর তুমি সব ছেড়ে দিলে এঁরা (যাত্রাওয়ালারা) কোথায় যাবেন? তিনি তোমার দ্বারা কাজ করিয়ে নিচ্চেন। কাজ শেষ হলে তুমি আর ফিরবে না।···

নীলকণ্ঠ। আমায় আশীর্বাদ করুন।

ঠাকুর। কৃষ্ণের বিরহে যশোদা উন্মাদিনী, শ্রীমতীর কাছে গিয়েচেন। শ্রীমতী তখন ধ্যান কচ্ছিলেন, তিনি আবিষ্ট হয়ে যশোদাকে বল্লেন—আমি সেই মূলপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি, তুমি আমার কাছে বর নাও। যশোদা বল্লেন—আর কী বর দেবে। এই বল, যেন কায়মনোবাক্যে তাঁর চিন্তা তার সেবা করতে পারি; কর্ণেতে যেন তাঁর নামগুণগান শুনতে পাই; হাতে যেন তাঁর ও তাঁর ভক্তের সেবা করতে পারি; চক্ষে যেন তাঁর রূপ, তাঁর ভক্ত দর্শন করতে পারি।

তোমার যেকালে তাঁর নাম করতে চক্ষু জলে ভেসে যায়, সেকালে আর তোমার ভাবনা কী? তাঁর উপর তোমার ভালবাসা এসেচে।··· তুমি সকালে অতো গাইলে, আবার এখানে এসেচ কষ্ট করে। এখানে কিন্তু অনারারী।

নীলকণ্ঠ। কেন? অমূল্য রতন নিয়ে যাব।

ঠাকুর। সে অমূল্য রতন আপনার কাছে।···না হলে তোমার গান অতো ভাল লাগে কেন? রামপ্রসাদ সিদ্ধ, তাই তার গান ভাল লাগে। সাধারণ জীবকে বলে মানুষ। যার চৈতন্ত হয়েচে সেই মানহুঁশ। তুমি তাই মানহুঁশ। তোমার গান হবে শুনে আমি আপনি যাচ্ছিলাম, তা নিয়োগীও বলতে এসেছিল।

ঠাকুর ছোট তক্তাপোশের উপর নিজের আসনে গিয়া বসিয়াছেন। নীলকণ্ঠকে বলিতেছেন, একটু মায়ের নাম শুনব। নীলকণ্ঠ দলবল লইয়া গাহিতেছেন—

গান—শ্যামাপদে আশ, নদীর তীরে বাস।
গান—মহিষমর্দিনী।

এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ। নীলকণ্ঠ গানে বলিতেছেন, যাঁর জটায় গঙ্গা, তিনি রাজরাজেশ্বরীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আছেন!

ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন, নীলকণ্ঠ ও ভক্তগণ তাঁহাকে বেড়িয়া গান গাইতেছেন ও নৃত্য করিতেছেন।···

ঠাকুর নীলকণ্ঠকে বলিলেন, আমি আপনার সেই গানটি শুনব, কলকাতায় যা শুনেছিলুম। নীলকণ্ঠ গাহিলেন—

গৌরাঙ্গসুন্দর নব নটবর তপতকাঞ্চনকায়।
করে স্বরূপ বিভিন্ন লুকাইয়ে চিহ্ন অবতীর্ণ নদীয়ায়॥

'প্রেমের বন্যে ভেসে যায়'—এই ধুয়া ধরিয়া ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্ত-সঙ্গে আবার নাচিতে লাগিলেন।···ঘর লোকে পরিপূর্ণ, সকলেই উন্মত্ত-প্রায়। ··· মনোমোহন ভাবাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার বাটীর কয়েকটি মেয়ে উত্তরের বারান্দা হইতে দর্শন করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও একজনের ভাব হইয়াছিল।

ঠাকুর আবার গান ধরিলেন—'যাদের হরি বলতে নয়ন ঝুরে তারা—তারা দুভাই এসেছে রে!' সংকীর্তন করিতে করিতে ঠাকুর নীলকণ্ঠাদি ভক্তসঙ্গে নৃত্য করিতেছেন ও আখর দিতেছেন, 'রাধার প্রেমে মাতোয়ারা তারা—তারা দুভাই এসেছে রে!' উচ্চ সংকীর্তন শুনিয়া চতুর্দিকের লোক আসিয়া জমিয়াছে।···

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে পশ্চিমের গোল বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছেন। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে,···চতুর্দিকে চাঁদের আলো।···

নীলকণ্ঠ। আপনিই সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ!

ঠাকুর। ওগুনো কী! আমি সকলের দাসের দাস। গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউএর কখন গঙ্গা হয়?

নীলকণ্ঠ। আপনি যা বলুন, আমরা আপনাকে তাই দেখচি!

ঠাকুর (কিঞ্চিৎ ভাবাবিষ্ট হইয়া করুণস্বরে)। বাপু, আমার 'আমি' খুঁজতে যাই, কিন্তু খুঁজে পাই না!···

নীলকণ্ঠ। আর কী বলব, আমাদের কৃপা করবেন।

ঠাকুর। তুমি কত লোককে পার করচ, তোমার গান শুনে কত লোকের উদ্দীপন হচ্চে!

নীলকণ্ঠ। পার করচি বলচেন, আশীর্বাদ করুন যেন নিজে ডুবি না!

ঠাকুর (সহাস্যে)। যদি ডোব তো ঐ সুধাহ্রদে! [কথামৃত]

যেসব সন্নিহিত স্থানে ঠাকুর গিয়াছেন

প্রভুর যতেক কর্ম সকলেই গূঢ়মর্ম, লীলাধর্ম তাহার ভিতরে।
সহজে না বুঝা যায় কিহেতু কি কৈলা রায় ভক্তসঙ্গে লীলার আসরে॥
... ...
মাহেশ-বল্লভপুরে রথযাত্রা দেখিবারে ফিবৎসরে প্রায় আগমন।
ভক্তি-শ্রদ্ধা-অনুরাগে পেনেটির চিঁড়াভোগে যেইখানে মহাসংকীর্তন॥

মাহেশে, চানকে, খড়দহে

সুরেন্দ্রের ভাই গিরীন্দ্র মিত্রকে সঙ্গে নিয়া মনোমোহন ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন একদিন সকালে, নৌকায় করিয়া। গিরীন্দ্র সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন না, তিনি কেশবের ব্রাহ্মসমাজে মিশিতেন। ঠাকুর তাঁহাদের কাছে মাহেশে গিয়া ৺জগন্নাথ দর্শনের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন।

শ্রীমনোমোহন কন ঘাটে বাঁধা তরী।
শ্রীপ্রভু বলেন তবে কেন আর দেরী॥
যেন কথা তেন কর্ম প্রভুর আমার।
করিব বলিলে পরে রক্ষা নাই আর॥
ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল, ভক্তদ্বয় সাথে।
দ্রুতগতি চলে তরী অনুকূল বাতে॥

মাহেশ গঙ্গার পশ্চিম পারে, শ্রীরামপুরের দক্ষিণে। মন্দিরে ৺জগন্নাথ-বিগ্রহ দর্শন করিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন ও বল্লভপুরে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ-জীউ দর্শন করিতে চলিলেন। বিগ্রহের নামানুসারে মাহেশের উত্তরাংশ বল্লভপুর নামে খ্যাত হইয়াছে। বল্লভপুরে দর্শনাদি করিবার পরেই ঠাকুরের চানকে যাইয়া ৺অন্নপূর্ণা দর্শন করিবার ইচ্ছা হইল। রাসমণি-দুহিতা, মথুরামোহনের পত্নী, ভক্তিমতী জগদম্বা দাসী এই অন্নপূর্ণা-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবাপূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চানক বারাকপুরের দক্ষিণে, গঙ্গার পূর্বপারে।

নামিয়া গঙ্গার ঘাটে প্রভু পরমেশ।
ভাবাবেশে করিলেন পুরীতে প্রবেশ॥
আনন্দিত পুরীতে সকল লোকজন।

ত্বরান্বিতে সেবার করয়ে আয়োজন ॥
ভোজন-আসন করি নিরজন স্থানে।
প্রভুদেবে যায় লয়ে পুরীর ব্রাহ্মণে ॥
হেথা এক দানা মুখে না উঠে প্রভুর।
কারণ জিজ্ঞাসে তাঁরে হইয়া আতুর ॥
শ্রীপ্রভু বলেন দেখ বাহিরেতে গিয়া।
চাঁদমুখ বাছা তিন আছয়ে বসিয়া ॥
গোটা দিন কাটে, আছে সবে অনশনে।
সেহেতু ভোজন মোর না উঠে বদনে ॥

এই কথা শুনিয়া পুরীর ব্রাহ্মণ তখনই চাঁদমুখ বাছাদের ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন।

উদর পুরিয়া সেবা করেন সবাই।
শুনিয়া দেখিয়া তুষ্ট হইলা গোসাঁই ॥

এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ঠাকুর নৌকায় উঠিলেন, দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবেন।

দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পথে পর পর দুইটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান পড়ে—একটি খড়দহ ও অন্যটি পানিহাটি। খড়দহকে কেন্দ্র করিয়াই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু বঙ্গদেশে সনাতন হিন্দুধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এখানে শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামসুন্দরজীউর মন্দিরে নিত্যানন্দ-পূজিত সিদ্ধ প্রতীকত্রয়—৺ত্রিপুরা-সুন্দরীযন্ত্র, মরকতমণিময় ৺নীলকণ্ঠশিব ও চতুর্দশচক্রযুক্ত ৺অনন্তদেব শালগ্রাম অদ্যাবধি পূজা পাইতেছেন। এই যাত্রায় না হইলেও অন্য কোনও সময়ে ঠাকুর খড়দহে শুভাগমন করিয়াছিলেন নিত্যানন্দবংশীয় পণ্ডিত যাদবকিশোর গোস্বামীর সাথে, দক্ষিণেশ্বর হইতে। ৺শ্যামসুন্দরের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া যাদবকিশোরকে তিনি বলিয়াছিলেন, 'তুই আমাকে শ্যাম দেখাতে এনে কালী দেখালি!' আর শ্রীবিগ্রহের প্রসাদান্ন ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, 'তুই একশ টাকা দামের ভোগ খাওয়ালি!'

খড়দহ ছাড়িয়া নৌকা যখন পানিহাটির সন্নিকটে আসিল—

করজোড়ে মস্তক নুয়ায়ে ভগবান।
উদ্দেশেতে করিলেন গোউরে প্রণাম॥
তাহা দেখি শ্রীমনোমোহন হাস্য করে।
হাসির কারণ প্রভু পুছিলা তাঁহারে॥

... ...

হাসিয়া হাসিয়া ভক্ত কহিলেন তাঁয়।
প্রণাম করিলা যাঁরে সে হেথা কোথায়॥
স্থান মাত্র আছে, বস্তু নাই এইখানে।
ইহাই বিশ্বাস মোর ষোল আনা মনে॥
পুনঃ তাঁরে বলিলেন শ্রীপ্রভু গোসাঁই॥
বল তবে কোথা আছে কোথা তিনি নাই॥
প্রত্যুত্তর করিলেন ভকত ধীমান।
সর্বত্র সমানভাবে তাঁর অধিষ্ঠান॥
তাই যদি, প্রভুদেব কহিলেন পরে।
নাই কেন দেবদেবী-মূর্তির ভিতরে॥

... ...

সর্বত্র সমান তিনি অতি সত্য কথা॥
কিন্তু যেথা যে মূর্তিতে বহু ভক্তজনা।
ভক্তিভরে করে পূজা সেবা আরাধনা॥
সেইখানে বিশেষিয়া তাঁর নিত্য পাট।
উপমায় সেইরূপ পীঠ কালীঘাট।

... ...

ভক্তির মহিমা কথা কি কব তোমাকে।
তিনি তথা মূর্তিমান ভক্তে যেথা ডাকে॥
তীর্থের মাহাত্ম্য তাই এত পরিমাণে।
জাগরিত রহে তীর্থ ভক্ত-সমাগমে॥
শতবর্ষ যে মূর্তিতে সেবা-আরাধনা।
সেই তীর্থ বিশেষ করিবে বিবেচনা॥

পানিহাটির দক্ষিণে, দক্ষিণেশ্বরের উত্তরে, আড়িয়াদহ। সেখানে বৈষ্ণবদের এক পাটবাড়ী আছে ও সেই পাটবাড়ীতে গৌর-নিতাই বিগ্রহদ্বয় বিরাজমান। বিগ্রহ-দর্শনে অভিলাষী হইয়া ঠাকুর নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন।

যবে প্রভু উপনীত মন্দির-প্রাঙ্গণে।
পাছু পাছু ধাবমান ভক্ত দুইজনে॥
ভাবেতে আবেশ-দেহ হইলা গোসাঁই।
নেহারিয়া মূর্তিদ্বয় গৌউর-নিতাই॥
দুঁহু জনে কি করিলা শুনহ কাহিনী
সাষ্টাঙ্গ প্রণামসহ লুটায় অবনী॥

ভদ্রকালী গ্রামে

রামলাল একদিন সকালে আলমবাজারে শিবু আচার্যের পাঁচালি-গান শুনিতে যান, ঠাকুরের অনুমতি লইয়া। গানের বিষয় ছিল, অশোকবনে হনুমানের সীতা-অন্বেষণ। সীতার সন্ধান পাইয়া হৃষ্টমনে হনুমান রামনাম করিতেছিলেন অলক্ষ্যে থাকিয়া।

সুধামাখা রামনাম অশোকের বনে।
শ্রবণে সীতার ভাব বাখানিছে গানে॥

গান শুনিয়া রামলাল মুগ্ধ হইলেন ও মন্দিরে ফিরিয়া ঠাকুরকে সেকথা কহিলেন। গানের কিয়দংশ মাত্র তিনি মনে রাখিতে পারিয়াছিলেন। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, 'বটে ? আমি শুনতে পেলুম নি!' ইহার পরে একদিন শিবু মন্দিরে জগন্মাতাকে দর্শন করিতে আসিলে রামলাল তাঁহাকে ঠাকুরের কাছে লইয়া গেলেন। 'তোমার গান শুনে এসে রামলাল বল্লে, আহা কী গান! একবার ঐটে গাও না, শুনি।' ঠাকুর কহিলেন। শিবু গান ধরিলেন—

এমন অমূল্য শ্রীরামনাম কে শুনালে আমার কর্ণে।
আজ কে এমন শোক-নিবারণ করলে অশোক-অরণ্যে॥
বিনে সে ধন, মনের বেদন কে জানিবে অন্যে।
সে ধন বিনে এ দুর্দিনে হয়ে আছি দৈন্যে॥

বলে কি জানাব আমি, জানেন সব অন্তর্যামী,
শ্রীরামচন্দ্র স্বামী পেয়েছিলাম অনেক পুণ্যে।
আমি দাসী বনে আসি দুটি চরণ সেবার জন্যে,
তাহে বিধি হয় বিবাদী, হারাই নিধি সে নীলবর্ণে॥

গান শুনিয়া ঠাকুর নয়নজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন ও রাম-রাম বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আদেশে রামলাল গানটি লিখিয়া লইলেন।

শিবু পরে একদিন ঠাকুরকে পাঁচালি-গান শুনাইয়াছিলেন সদলবলে আসিয়া, ও তারপরে ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, 'মহাশয়, একবার আমাদের শ্বশুরবাড়ী ওপারে ভদ্রকালীতে যদি দয়া করে পায়ের ধূলো দেন তো বড় ভাল হয়।' ঠাকুর উত্তর দেন, 'বেশ তো হবে আখুন।'

উত্তরপাড়ার কাছে ভদ্রকালী গ্রামে।
গায়ক চলিল তথা শ্বশুরের ধামে॥
শ্বশুর সরলমতি মহাভাগ্যবান।
জামাতা কহিল তাঁকে প্রভুর আখ্যান॥

শ্বশুর একদিন ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন জামাতাকে সঙ্গে নিয়া। তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার শ্রীমুখের বাণী শুনিয়া ব্রাহ্মণ মোহিত হইলেন ও বারবার তাঁহার কাছে যাওয়া-আসা করিতে লাগিলেন।

জামাতার চেয়ে হৈল শ্রীচরণে টান।
বড়ই সদয় তাঁরে হৈলা ভগবান॥
... ...
বর্ণের ব্রাহ্মণ তিনি লোকমুখে শুনি।
ফুলের মুকুটি চেয়ে মুই তারে গণি॥
... ...
প্রশস্ত অবস্থা নয়, গরীব ব্রাহ্মণ।
বিষয়সম্পত্তি ঘরে অতিশয় কম॥
ছোট ছোট মেটে ঘর মাত্র কয়খানি।
মাটির দেয়াল গোলপাতার ছাউনি॥

বহির্দেশে আছে এক পূজার দালান।
সেটিও মাটির, নীচে সামান্য উঠান ॥

সপার্ষদ ঠাকুরকে একদিন স্বগৃহে লইয়া গিয়া ভিক্ষা দিবার সাধ জাগিল ব্রাহ্মণের মনে। অতিশয় সঙ্কোচের সহিত ঠাকুরের কাছে তিনি মনের বাসনা ব্যক্ত করিলেন; ঠাকুর সম্মত হইয়া গেলেন। নির্ধারিত দিনে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য শিবু চারিখানি পানসি নৌকা লইয়া আসিলেন। নৌকাগুলি পতাকা-সজ্জিত করা হইয়াছিল।

দারুণ নিদাঘকাল তপন প্রচণ্ড।
বিশেষ মধ্যাহ্নে করে প্রলয়ের কাণ্ড ॥
সেই হেতু প্রভুদেবে করে নিবেদন।
যাহাতে সভক্তে হয় সত্বর গমন ॥
আনিয়া দিলেন রামলাল তাঁর জন্যে।
পরিধেয় বসন ছোপান পীতবর্ণে ॥

শিঙ্গা ও খোল-করতাল লইয়া হরিনাম-কীর্তন করিতে করিতে যাত্রা করা হইল।

ভদ্রকালীর ঘাটের উপরে সুন্দর ফটক বাঁধা হইয়াছিল; বহু সমুৎসুক নরনারী সেখানে সমবেত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া ভক্তগণের সহিত ঠাকুর ঘাটের উপরে আসিলেন। তাঁহাকে সুন্দর সুগন্ধি ফুলের মালা পরানো হইল, তিনি ভাবাবিষ্ট হইলেন।

কীর্তনিয়াগণের মাঝারে প্রভুরায়।
লোকজনে শ্রীচরণে বাতাসা ছড়ায় ॥
ধামায় ধামায় ভরা, ধরা আছে হাতে।
চৌদিক আনন্দময় সবে গেছে মেতে ॥

ভাবাবেশে টলিতে টলিতে ঠাকুর ক্রমে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পূর্বে বলিয়াছি ভিটা কত পরিসর।
দালানের সম্মুখেতে উঠানে আসর ॥
ভক্তসহ শ্রীপ্রভুর চরণ-পরশে।
হাসিয়া উঠিল যেন পরম উল্লাসে ॥

ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী নামে একজন।
পরম পণ্ডিত শাস্ত্রে পটু বিলক্ষণ॥
তার্কিকের শিরোমণি শাস্ত্রপাঠ-বলে।
সেইখানে উপনীত হৈল হেনকালে॥
শ্রীপ্রভুর সঙ্গে তাঁর মনের বাসনা।
কিছুক্ষণ করিবেন শাস্ত্র-আলাপনা॥

ঠাকুর তাঁহার সঙ্গে আগত মহিম চক্রবর্তীকে সামাধ্যায়ীর সহিত শাস্ত্রালাপ করিতে বলিলেন। চক্রবর্তীও পণ্ডিতলোক, কিন্তু তিনি যত কথা বলেন সেই সকল কথাই সামাধ্যায়ী তর্ক করিয়া উড়াইয়া দেন। আধঘণ্টার উপর বাদ-প্রতিবাদ হইল, মহিম নিরুত্তর হইলেন। ঠাকুর তখন মহিমের পক্ষ লইয়া কথা কহিতে লাগিলেন।

অধিক রুষিয়া তবে তার্কিক তখন।
তর্কবলে করে নিজ পক্ষ সমর্থন॥
তর্কে সুকৌশল তেঁহ তর্কে কেবা আঁটে।
যত কথা কন প্রভু তর্ক দিয়া কাটে॥

ঠাকুর তখন মূত্রত্যাগের ছলে আসর ত্যাগ করিলেন ও ঝারি লইয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতে রামলালকে আদেশ করিলেন।

মূত্রত্যাগে বসিয়া কহেন নিজে রায়।
'ওমা, ই শালা তো দেখি তার্কিক বেজায়'॥

অতঃপর আবেশভরে আসরে আসিয়া, খপ্ করিয়া তার্কিকের ডান হাঁটু ধরিয়া বলিলেন, 'হ্যা হ্যাঁ, এতক্ষণ কী বলছিলে আবার বল তো?'

শ্রীপ্রভুর পরশনে বলবুদ্ধিহারা।
তর্ক করা দূরে থাক মুখে নাহি সাড়া॥
অবাক হইয়া যেন করে দরশন।
কি দেখান প্রভু তাঁরে করি পরশন॥
দেখিতে দেখিতে বস্তু কহেন তার্কিক।
কি বলিব, বলিলেন যাহা তাই ঠিক॥

এই তার্কিক পণ্ডিতের কথায় ঠাকুর পরে বলিয়াছিলেন: সামাধ্যায়ী··· বলে,—ঈশ্বর বাক্যমনের অতীত; তাঁতে কোন রস নাই, তোমরা প্রেমভক্তি-

রূপ রস দিয়ে তাঁর ভজনা কর। যিনি রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, তাঁকে এইরূপ বলচে! এ লেকচারে কী হবে? এতে কি লোকশিক্ষা হয়?

তত্ত্বালাপ সমাপন তার্কিকের সনে।
রঙ্গরসে অন্য কথা কথোপকথনে ॥
পরে দ্বিজোত্তম করি ভোজন আসন।
ভিক্ষা দিলা ভগবানে সহ ভক্তগণ ॥

পুরাণকথা, যাত্রাগান, হরিসভায় অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষ্য করিয়া ঠাকুর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করিতেন। বালীর হরিসভা দেখিবার জন্য তিনি কালাচাঁদ মুখুজ্যের বাড়ীতে গিয়াছিলেন।

দুয়ারে দুয়ারে ভ্রাম্যমাণ নানাস্থানে।
একমাত্র ভক্তি-উদ্দীপনার কারণে ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়

ঠাকুরের গলায় বেদনানুভব ও পানিহাটির মহোৎসবে যোগদান

লীলাপ্রসঙ্গকার লিখিয়াছেন ঃ

"১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের [১২৯১ সালের] গ্রীষ্মাতিশয়ে ঠাকুরকে বিশেষ কষ্ট পাইতে দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে বরফ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বরফ খাইয়া তাঁহাকে স্বচ্ছন্দ বোধ করিতে দেখিয়া অনেকে এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে বরফ লইয়া যাইতে লাগিল এবং সরবৎপানীয়াদির সহিত উহা সর্বদা ব্যবহার করিয়া তিনি বালকের ন্যায় আনন্দ করিতে লাগিলেন।"

১২৯১ সালের ২৫শে চৈত্র দেবেন্দ্র নিজের বাসাবাড়ীতে ঠাকুরকে লইয়া গিয়া মহোৎসব করেন। দেবেন্দ্র প্রচুর পরিমাণে কুলপি বরফ আনিয়া রাখিয়াছিলেন এবং ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তেরা সেই বরফ খাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পরদিন, অর্থাৎ ২৬শে চৈত্র হইতে ঠাকুর গলদেশে একটা বেদনা অনুভব করিতে থাকেন।

"মাসাবধিকাল অতীত হইলেও ঐ বেদনার উপশম হইল না এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের অর্ধেক যাইতে না যাইতে উহা এক নূতন আকার ধারণ করিল---অধিক কথা কহিলে এবং সমাধিস্থ হইবার পরে উহার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার কণ্ঠতালুদেশ ঈষৎ স্ফীত হইয়াছে ভাবিয়া প্রথমে সামান্য প্রলেপের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু কয়েক দিবস ঔষধ প্রয়োগেও ফল পাওয়া গেল না দেখিয়া জনৈক ভক্ত [শরচ্চন্দ্র] বহুবাজারে রাখাল ডাক্তারের ঐরূপ ব্যাধি আরোগ্য করিবার দক্ষতার কথা শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার···গলার ভিতরে এবং বাহিরে লাগাইবার জন্য ঔষধ ও মালিশের বন্দোবস্ত করিলেন এবং ঠাকুর যাহাতে কয়েক দিন অধিক কথা না বলেন ও বারংবার সমাধিস্থ না হয়েন তদ্বিষয়ে আমাদিগকে যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখিতে বলিলেন।"

বেদনার প্রথমাবস্থায় সামান্য প্রলেপের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ডাক্তার দুর্গাচরণ। পুঁথিকার লিখিয়াছেন ঃ

গলায় বেদনা এই প্রথম প্রথম।
কোনদিন বাড়ে আর কোনদিন কম॥
একদিন বলিল গোলাপ-ঠাকুরাণী।
অনেক ডাক্তার আছে আমি তাঁরে জানি॥

… …

সরল প্রভুর ধারা বালকের ন্যায়।
বলিলেন, ভাল কালি যাইব তথায়॥
পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া গুণমণি।
সঙ্গে লাটু, কালী ও গোলাপ-ঠাকুরাণী॥
চলিলেন শহরেতে তরী-আরোহণে।

… …

কুমারটুলির ঘাটে উত্তরিল তরী।
নামিলেন এইখানে করিবারে গাড়ী॥

… …

ডাক্তারের যশোরাশি জানা সবাকার।
সুবিখ্যাত নাম দুর্গাচরণ ডাক্তার॥[১]

… …

বিচক্ষণ চিকিৎসক মনে বিচারিয়ে।
ঔষধ প্রদান কৈল একটাকা লয়ে॥
পালুটিলা প্রভুদেব ভক্তদের সনে।
পথে পথে উপনীত বিচন বাগানে॥

… …

রকমারি বৃক্ষলতা ইহার ভিতরে।
সিমেণ্টে তিলক-চিত্র আঁকা চারিধারে॥

---

১ দুর্গাচরণ ডাক্তার পূর্ব হইতে ঠাকুরকে জানিতেন। "দুর্গাচরণ ডাক্তার রাত্রি দশটার সময় এসে 'হৃদে হৃদে' করে ডাকত। ঠাকুর তখনই হৃদেকে বলতেন—ওরে দোর খুলে দে।…ডাক্তারবাবু ঠাকুরকে আপাদমস্তক দেখে একটি কথাও না বলে চলে যেতন। আর হৃদেকে বলে যেতেন—ওখানে যেও। অর্থাৎ কিছু দেবেন। ডাক্তারই জানেন তিনি ঠাকুরকে কি চোখে দেখেছিলেন।"

[লাটু মহারাজের 'সৎকথা']।

একে একে নিরখিতে তিলকের মালা।
ক্রমশঃ গগনে হৈল অতিশয় বেলা ॥
ধীরে ধীরে গঙ্গাতীরে যবে অগ্রসর।
তখন অতীত প্রায় আড়াই প্রহর ॥

ঠাকুর নৌকারোহণ করিলেন, দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবেন; কিন্তু সকলেই তখন ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন।

ভক্তদের পানে চেয়ে কন প্রভুরায়।
বড়ই পেয়েছে ক্ষুধা পেট জ্বলে যায় ॥
সহিতে না পারি আর ভকতবৎসল।
জিজ্ঞাসিলা কার কাছে কি আছে সম্বল ॥

বিশুষ্ককণ্ঠে গোলাপ-মা কহিলেন, তাঁহার কাছে তখন মাত্র এক আনা পয়সা আছে।

বরানগরের ঘাটে বাঁধিয়া তরণী।
গ্রামের ভিতরে কালী চলিল অমনি ॥
ক্ষুধায় না চলে পদ লাগে পায় পায়।
কিছুপরে রসমুণ্ডি আনিল ঠোঙ্গায় ॥
গুণ্তিতে অনেকগুলি প্রায় চারি গণ্ডা।
দেখিয়াই সবাকার প্রাণ হৈল ঠাণ্ডা ॥
প্রসাদ পাবার আশা সকলের মনে।
মিষ্টিমুখে উদর পুরাবে জলপানে ॥

... ...

শ্রীকরে ধরিয়া ঠোঙ্গা মুদিয়া নয়ন।
একে একে সব প্রভু করিলা ভোজন ॥

পাতার ঠোঙ্গাটি গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া গোলাপ-মা অঞ্জলিপুটে ঠাকুরকে জল পান করাইলেন।

জলপানে শ্রীপ্রভুর ভরিল উদর ॥
প্রভুর তৃপ্তিতে পূর্ণ তৃপ্ত ভক্তগণ।
দেখিয়া রঙ্গের কাণ্ড হাসে তিন জন ॥
পরস্পর মুখপানে চায় বারে বারে।
আনন্দ উথলে পড়ে হৃদয়-আধারে ॥

"ক্রমে জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী আগতপ্রায় হইল। ...গঙ্গাতীরবর্তী পানিহাটি গ্রামে প্রতি বৎসর ঐ দিবসে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ মেলা হইয়া থাকে। ...ঠাকুর ইতিপূর্বে পানিহাটির মহোৎসবে অনেকবার যোগদান করিয়াছিলেন। ...আমাদিগকে বলিলেন, 'সেখানে ঐদিন আনন্দের মেলা, হরিনামের হাটবাজার বসে; তোরা সব ইয়ং বেঙ্গল, কখন ঐরূপ দেখিস নাই, চল্ দেখিয়া আসিবি।' রামচন্দ্র দত্ত-প্রমুখ ভক্তদিগের মধ্যে একদল ঐ কথায় বিশেষ আনন্দিত হইলেও কেহ কেহ তাঁহার গলদেশে বেদনার কথা ভাবিয়া তাঁহাকে...নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিল। ...তিনি বলিলেন, এখান হইতে সকাল সকাল দুইটি খাইয়া যাইব এবং দুইএক ঘণ্টাকাল তথায় থাকিয়া ফিরিব, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে না; ভাবসমাধি অধিক হইলে গলার ব্যথাটা বাড়িতে পারে বটে, ঐ বিষয়ে একটু সামলাইয়া চলিলেই হইবে।...

"...আজ পানিহাটির মহোৎসব। প্রায় পঁচিশ জন ভক্ত দুইখানি নৌকা ভাড়া করিয়া...দক্ষিণেশ্বরে সমাগত হইল। কেহ কেহ পদব্রজে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুরের নিমিত্ত একখানি পৃথক নৌকা ভাড়া হইয়া ঘাটে বাঁধা রহিয়াছে দেখা গেল। কয়েকজন স্ত্রীভক্ত অতি প্রত্যূষে আসিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারা ঠাকুরের ও ভক্তগণের আহারের বন্দোবস্ত করিলন। বেলা দশটার ভিতরে সকলে ভোজন করিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। ...শ্রীশ্রীমা...দুইতিন জন স্ত্রীভক্ত যাঁহারা যাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া ঠাকুরের নৌকায় গমন করিতে আদেশ করিলেন।

"বেলা দ্বিতীয় প্রহর আন্দাজ পানিহাটিতে পৌঁছিয়া দেখা গেল, গঙ্গাতীরে প্রাচীন অশ্বত্থগাছের চতুষ্পার্শ্বে অনেক লোক সমাগত হইয়াছে এবং বৈষ্ণব ভক্তগণ স্থানে স্থানে সংকীর্তনে আনন্দ করিতেছেন। ...কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ভগবৎ-নামগানে যথার্থ মগ্ন হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না। সর্বত্র একটা অভাব ও প্রাণহীনতা চক্ষে পড়িতে লাগিল।...

"নৌকা হইতে নামিয়া ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বরাবর শ্রীযুক্ত মণি সেনের বাটীতে যাইয়া উঠিলেন। তাঁহার আগমনে আনন্দিত হইয়া মণিবাবুর বাটীর সকলে তাঁহাকে প্রণামপুরঃসর বৈঠকখানায় লইয়া যাইয়া বসাইলেন। ঘরখানি···ইংরাজী ধরনে সুসজ্জিত। এখানে দশপনর মিনিট বিশ্রাম করিয়াই তিনি সকলকে সঙ্গে লইয়া ইঁহাদিগের ঠাকুরবাটীতে ৺রাধাকান্ত-জীকে দর্শন করিবার মানসে উঠিলেন।

"বৈঠকখানা-গৃহের পার্শ্বেই ঠাকুরবাটী। পার্শ্বের দরজা দিয়া আমরা একেবারে মন্দিরসংলগ্ন নাটমন্দিরে উপস্থিত হইয়া যুগলবিগ্রহ-মূর্তির দর্শন লাভ করিলাম। মূর্তি দুইটি সুন্দর। কিছুক্ষণ দর্শনান্তে ঠাকুর অর্ধবাহ্য অবস্থায় প্রণাম করিতে লাগিলেন। নাটমন্দিরের মধ্যভাগ হইতে পাঁচ-সাতটি ধাপ নামিয়া ঠাকুরবাটীর চকমিলান প্রশস্ত উঠান ও সদর ফটক। ফটকটি এমন স্থানে বিদ্যমান যে, ঠাকুরবাটীতে প্রবেশমাত্র বিগ্রহমূর্তির দর্শন লাভ হয়।···একদল কীর্তনিয়া উক্ত ফটক দিয়া উঠানে প্রবেশপূর্বক গান আরম্ভ করিল।···শিখাসূত্রধারী, তিলক-চক্রাঙ্কিতদীর্ঘস্থূলবপুঃ, গৌরবর্ণ, প্রৌঢ়বয়স্ক এক পুরুষ ঝুলিতে মালা জপিতে জপিতে ঐ সময়ে উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার স্কন্ধে উত্তরীয়, পরিধানে ধোপদস্ত রেলির উনপঞ্চাশের থানধুতি সুন্দরভাবে গুছাইয়া পরা, এবং ট্যাঁকে একগোছা পয়সা···। তিনি আসিয়াই কীর্তনদলের সহিত মিলিত হইয়া ভাবাবিষ্টের ন্যায় অঙ্গভঙ্গী, হুঙ্কার ও নৃত্য করিতে লাগিলেন।

"প্রণামান্তে ঠাকুর নাটমন্দিরের একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কীর্তন শুনিতেছিলেন। গোস্বামীজীর বেশভূষার পারিপাট্য ও ভাবাবেশের ভান দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া তিনি নরেন্দ্র-প্রমুখ পার্শ্বস্থ ভক্তগণকে মৃদুস্বরে বলিলেন, 'ঢং দেখ্!' তাঁহার ঐরূপ পরিহাসে সকলের মুখে হাস্যের রেখা দেখা দিল, এবং তিনি কিছুমাত্র ভাবাবিষ্ট না হইয়া আপনাকে বেশ সামলাইয়া চলিতেছেন ভাবিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল, ঠাকুর কেমন করিয়া তাহারা বুঝিবার পূর্বে চক্ষের নিমেষে··· এক লম্ফে কীর্তনদলের মধ্যভাগে সহসা অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ভাবাবেশে

তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞার লোপ হইয়াছে। ভক্তগণ তখন শশব্যস্তে নাটমন্দির হইতে নামিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল এবং তিনি কখন অর্ধবাহ্য-দশা লাভপূর্বক সিংহবিক্রমে নৃত্য করিতে এবং কখন সংজ্ঞা হারাইয়া স্থির হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

"ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে যখন তিনি দ্রুতপদে তালে তালে কখন অগ্রসর হইতে এবং কখন পশ্চাতে পিছাইয়া আসিতে লাগিলেন, তখন মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন 'সুখময় সায়রে' মীনের ন্যায় মহানন্দে সন্তরণ ও ছুটাছুটি করিতেছেন। প্রতি অঙ্গের গতি ও চালনাতে ঐভাব পরিস্ফুট হইয়া তাঁহাতে যে অদৃষ্টপূর্ব কোমলতা ও মাধুর্যমিশ্রিত উদ্দাম উল্লাসময় শক্তির প্রকাশ উপস্থিত করিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। স্ত্রী-পুরুষের হাবভাবময় মনোমুগ্ধকারী নৃত্য অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু দিব্য ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া তাণ্ডবনৃত্য করিবার কালে ঠাকুরের দেহে যেরূপ রুদ্রমধুর সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিত, তাহার আংশিক ছায়াপাতও ঐসকলে আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই। প্রবল ভাবোল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া তাঁহার দেহ যখন হেলিতে দুলিতে ছুটিতে থাকিত তখন ভ্রম হইত উহা বুঝি কঠিন জড় উপাদানে নির্মিত নহে—বুঝি আনন্দসাগরে উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়া প্রচণ্ডবেগে সম্মুখস্থ সকল পদার্থকে ভাসাইয়া অগ্রসর হইতেছে, এখনই আবার গলিয়া তরল হইয়া উহার ঐ আকার লোকদৃষ্টির অগোচর হইবে। আসল ও নকল পদার্থের মধ্যে কত প্রভেদ কাহাকেও বুঝাইতে হইল না, কীর্তনসম্প্রদায় গোস্বামীজীর দিকে আর দৃষ্টিপাত না করিয়া ঠাকুরকে বেষ্টনপূর্বক শতগুণ উৎসাহ-আনন্দে গান গাহিতে লাগিল।

"প্রায় অর্ধঘণ্টাকাল এইরূপে অতীত হইলে ঠাকুরকে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে কীর্তনসম্প্রদায়ের মধ্য হইতে সরাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। স্থির হইল,···মহাপ্রভুর পার্ষদ রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে যাইয়া তিনি যে যুগলবিগ্রহ ও শালগ্রামশিলার নিত্যসেবা করিতেন তাহা দর্শনপূর্বক নৌকায় ফিরা যাইবে। ঠাকুর ঐকথায় সম্মত হইয়া ভক্তবৃন্দ-সঙ্গে মণি সেনের ঠাকুরবাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

কীর্তনসম্প্রদায় কিন্তু তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না, মহোৎসাহে নামগান করিতে করিতে পশ্চাতে আসিতে লাগিল। ঠাকুর উহাতে দুইচারি পদ অগ্রসর হইয়াই ভাবাবেশে স্থির হইয়া রহিলেন। অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলে ভক্তগণ তাঁহাকে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিল, তিনিও দুইচারি পদ চলিয়া পুনরায় ভাবাবিষ্ট হইলেন। পুনঃপুনঃ ঐরূপ হওয়াতে ভক্তগণ অতি ধীরে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইল।

"ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের শরীরে সেইদিন যে দিব্যোজ্জ্বল সৌন্দর্য দর্শন করিয়াছি সেইরূপ আর কখনও নয়নগোচর হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। দেবদেহের সেই অপূর্ব শ্রী যথাযথ বর্ণনা করা মনুষ্যশক্তির পক্ষে অসম্ভব। ভাবাবেশে দেহের অতদূর পরিবর্তন নিমেষে উপস্থিত হইতে পারে একথা আমরা ইতিপূর্বে কখনও কল্পনা করি নাই। তাঁহার উন্নতবপুঃ প্রতিদিন যেমন দেখিয়াছি তদপেক্ষা অনেক দীর্ঘ এবং স্বপ্নদৃষ্ট শরীরের ন্যায় লঘু বলিয়া প্রতীত হইতেছিল, শ্যামবর্ণ উজ্জ্বল হইয়া গৌরবর্ণে পরিণত হইয়াছিল, ভাবপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল অপূর্ব জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত করিয়াছিল, এবং মহিমা করুণা শান্তি ও আনন্দপূর্ণ মুখের সেই অনুপম হাসি দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় জনসাধারণকে কিছুক্ষণের জন্য সকল কথা ভুলাইয়া তাঁহার পদানুসরণ করাইয়াছিল। উজ্জ্বল গৈরিক বর্ণের পরিধেয় গরদখানি ঐ অপূর্ব অঙ্গকান্তির সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্যে মিলিত হইয়া তাঁহাকে অগ্নিশিখাপরিব্যাপ্ত বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছিল।

"মণিবাবুর ঠাকুরবাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজপথে আসিবামাত্র কীর্তনসম্প্রদায় তাঁহার দিব্যোজ্জ্বল শ্রী, মনোহর নৃত্য ও পুনঃপুনঃ গম্ভীর ভাবাবেশ দর্শনে নবীন উৎসাহে পূর্ণ হইয়া গান ধরিল—

সুরধুনীর তীরে হরি বলে কে রে, বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
ওরে হরি বলে কে রে, জয় রাধে বলে কে রে,
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে—(আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।
নিতাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে—(এই আমাদের) প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।

"শেষ ছত্রটি গাহিবার কালে তাহারা ঠাকুরের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বক বারংবার 'এই আমাদের প্রেমদাতা' বলিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাদিগের ঐ উৎসাহ উৎসবস্থলে সমাগত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক তাহাদিগকে তথায় আনয়ন করিতে লাগিল, এবং যাহারা আসিয়া একবার ঠাকুরকে দর্শন করিল তাহারা মোহিত হইয়া মহোল্লাসে কীর্তনে যোগদান করিল, অথবা প্রাণে অনির্বচনীয় দিব্যভাবোদয়ে স্তব্ধ হইয়া নীরবে ঠাকুরকে অনিমেষে দেখিতে দেখিতে সঙ্গে যাইতে লাগিল। জনসাধারণের উৎসাহ ক্রমে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, এবং অন্য কয়েকটি কীর্তনসম্প্রদায় আসিয়া পূর্বোক্ত দলের সহিত যোগদান করিল। ঐরূপে এক বিরাট জনসঙ্ঘ ভাবাবিষ্ট ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া রাঘব পণ্ডিতের কুটিরাভিমুখে ধীরপদে অগ্রসর হইতে লাগিল।

"গঙ্গাতীরবর্তী অশ্বত্থবৃক্ষের নিম্নে শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়ের উদ্দেশে কয়েক মালসা ফলাহার উৎসর্গ করাইয়া স্ত্রীভক্তেরা ঠাকুরের নিমিত্ত আনয়ন করিতেছিলেন। রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে উপস্থিত হইবার কিছু পূর্বে একজন ভেকধারী কুৎসিত কদাকার বাবাজী সহসা কোথা হইতে আসিয়া এক মালসা প্রসাদ জনৈক স্ত্রীভক্তের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইল এবং যেন ভাবে-প্রেমে গদগদ হইয়া উহার কিয়দংশ ঠাকুরের মুখে স্বহস্তে প্রদান করিল। ঠাকুর তখন ভাবাবেশে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, ...তাঁহার সর্বাঙ্গ সহসা শিহরিয়া উঠিয়া ভাবভঙ্গ হইল, এবং মুখে প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্য থু থু করিয়া নিক্ষেপপূর্বক মুখ ধৌত করিলেন। ঐ ঘটনায় বাবাজীকে ভণ্ড বলিয়া বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না,...সে দূরে পলায়ন করিল। ঠাকুর তখন অন্য এক ভক্তের নিকট হইতে প্রসাদকণিকা গ্রহণ-পূর্বক ভক্তগণকে অবশিষ্টাংশ খাইতে দিলেন।

"...রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে পৌঁছিতে প্রায় তিনঘণ্টা কাল লাগিল।... মন্দির-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দর্শন, স্পর্শন ও বিশ্রামাদি করিতে ঠাকুরের অর্ধঘণ্টা কাল অতীত হইল এবং সঙ্গের সেই বিরাট জনসঙ্ঘ ধীরে ধীরে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল। ভিড় কমিয়াছে দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে

নৌকায় লইয়া আসিল। কিন্তু এখানেও এক অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত হইল। কোন্নগরনিবাসী নবচৈতন্য মিত্র উৎসবস্থলে ঠাকুর আসিয়াছেন শুনিয়া দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিতেছিল।...সে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে আছাড় খাইয়া পড়িল এবং 'কৃপা করুন' বলিয়া প্রাণের আবেগে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ঠাকুর... তাহাকে ভাবাবেশে স্পর্শ করিলেন। ... তাহার ব্যাকুল ক্রন্দন নিমেষের মধ্যে অসীম উল্লাসে পরিণত হইল, এবং বাহ্যজ্ঞানশূন্যের ন্যায় সে নৌকার উপরে তাণ্ডব নৃত্য ও ঠাকুরকে নানারূপে স্তবস্তুতিপূর্বক বারংবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে লাগিল।...ঠাকুর তাহার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া...শান্ত করিলেন। নবচৈতন্য...সংসারের ভার পুত্রের উপর অর্পণপূর্বক নিজগ্রামে গঙ্গাতীরে পর্ণকুটিরে জীবনের অবশিষ্ট কাল বানপ্রস্থের ন্যায় সাধনভজন ও ঠাকুরের নামগুণগানে অতীত করিয়াছিল। এখন হইতে সংকীর্তনকালে বৃদ্ধ নবচৈতন্যের ভাবাবেশ উপস্থিত হইত...। নবচৈতন্য ঠাকুরের কৃপায় পরজীবনে বহুব্যক্তির হৃদয়ে ভগবদ্‌ভক্তি-উদ্দীপনে সমর্থ হইয়াছিল।

"নবচৈতন্য বিদায় গ্রহণ করিলে ঠাকুর নৌকা ছাড়িতে আদেশ করিলেন। কিছুদূর আসিতে না আসিতে সন্ধ্যা হইল, এবং রাত্রি সাড়ে আটটা আন্দাজ আমরা দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হইলাম।"

গাত্রদাহ হইয়া সেইরাত্রে ঠাকুরের ঘুম হইল না; উৎসবক্ষেত্রে নানাপ্রকার চরিত্রের লোক সকামভাবে তাঁহার দেবদেহ স্পর্শ করিয়াছিল; তাঁহার গলার বেদনাও বৃদ্ধি পাইল; তিনি বৃষ্টিতে ভিজিয়াছিলেন এবং ভিজা-পায়ে ভাবাবেশে বহুক্ষণ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ডাক্তার তজ্জন্য অনুযোগ করিয়া কহিলেন, ভবিষ্যতে এইজাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইলে রোগ কঠিনাকার ধারণ করিবে। ভক্তেরা সাবধান থাকিবেন বলিয়া সংকল্পবদ্ধ হইলেন।

দিন কয়েক পরে জনৈক ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে গিয়া দেখিলেন, গলায় প্রলেপ লাগাইয়া ঠাকুর ছোট তক্তাখানির উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বালককে কোন কার্য করিতে নিষেধ করিয়া একস্থানে আবদ্ধ রাখিলে সে

যেমন বিষণ্ণ হয়, ঠাকুরের মুখের ভাবটি তখন অবিকল সেইরূপ। ভক্তটির সহিত তাঁহার নিম্নোক্তরূপ কথাবার্তা হইল: 'কী হয়েচে?' '(গলার প্রলেপ দেখাইয়া মৃদুস্বরে) এই দেখ না, ব্যথা বেড়েচে. ডাক্তার বেশী কথা কইতে মানা করেচে।' 'তাই তো মশায়, শুনলুম সেদিন আপনি পেনেটি গিয়েছিলেন, বোধ হয় সেজন্যেই ব্যথাটা বেড়েচে।' '(অভিমানভরে) হাঁ, দেখ্ দিকি, এই উপরে জল নীচে জল, আকাশে বৃষ্টি—পথে কাদা, আর রাম কিনা আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে সমস্ত দিন নাচিয়ে নিয়ে এল! সে পাস-করা ডাক্তার, যদি ভাল করে বারণ করত তা হলে কি আমি সেখানে যাই!' 'তাই তো মশায়, রামের ভারি অন্যায়। যা হবার হয়ে গেছে, এখন কয়েকটা দিন একটু সাবধানে থাকুন, তা হলেই সেরে যাবে।' '(খুশী হইয়া) তা বলে একেবারে কথা বন্ধ করে কি থাকা যায়? এই দেখ্ দিকি, তুই কতদূর থেকে এলি, আর আমি তোর সঙ্গে একটিও কথা কইব না, তা কি হয়?' 'আপনাকে দেখলেই আনন্দ হয়, কথা নাই বা কইলেন, আমাদের কোন কষ্ট হবে না; ভাল হোন, আবার কত কথা শুনব।'

ভক্তটির আপত্তি না শুনিয়া, ঠাকুর পূর্বের ন্যায় তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন, ডাক্তারের নিষেধ ও নিজের দেহকষ্ট ভুলিয়া।

কলিকাতায় আগমন ও শ্যামপুকুরে অবস্থান

ডাক্তার রাখালদাস ঘোষ মাসাধিক কাল ঠাকুরের গলার বেদনার চিকিৎসা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। অতঃপর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার চিকিৎসা করেন দীর্ঘকাল ধরিয়া। মাঝে একদিন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে দেখানো হইয়াছিল, তাঁহার শাঁখারিটোলার বাড়ীতে ঠাকুরকে লইয়া গিয়া। ডাক্তার ভগবান রুদ্র একদিন পরীক্ষা করিয়াছিলেন দক্ষিণেশ্বরে।

"ডাক্তারেরা পরীক্ষাপূর্বক স্থির করিলেন,...লোককে দিবারাত্র ধর্মোপদেশ-প্রদানে বাগ্‌যন্ত্রের অত্যধিক ব্যবহার হইয়া গলদেশে ক্ষত হইবার উপক্রম হইয়াছে; ধর্মপ্রচারকদিগের ঐরূপ ব্যাধি হইবার কথা চিকিৎসাশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে।...ডাক্তারেরা ঔষধপথ্যাদির যেরূপ ব্যবস্থা করিলেন, ঠাকুর তাহা সম্যক মানিয়া চলিলেও তুইটি বিষয়ে উঁহার ব্যতিক্রম হইতে লাগিল। প্রগাঢ় ঈশ্বরপ্রেম এবং সংসারতপ্ত জনগণের প্রতি অপার করুণায় অবশ হইয়া, তিনি সমাধি ও বাক্যসংযমের দিকে যথাযথ লক্ষ্য রাখিতে সমর্থ হইলেন না।...ঠাকুরের নিকটে এখন ধর্মপিপাসু ব্যক্তি সকলের আগমন বড় স্বল্প হইতেছিল না। পুরাতন ভক্তসকল ভিন্ন, পাঁচ, সাত বা ততোধিক নূতন ব্যক্তিকে...তাঁহার দ্বারে এখন নিত্য উপস্থিত হইতে দেখা যাইত।...

"অত্যধিক পরিশ্রমে তাঁহার শরীর যে ক্রমে অবসন্ন হইতেছিল...উহার পরিচয় শ্রীশ্রীজগদম্বার সহিত তাঁহার প্রেমের কলহে আমরা কখন কখন পাইতাম, কিন্তু সম্যক বুঝিতে পারিতাম না।...'যত সব এঁদো লোককে এখানে আনবি, একসের তুধে একেবারে পাঁচসের জল, ফুঁ দিয়ে জ্বাল ঠেলতে ঠেলতে আমার চোখ গেল, হাড় মাটি হল,—অত করতে আমি পারব না, তোর শখ থাকে তুই করগে যা। ভাল লোক সব নিয়ে আয়, যাদের তুইএক কথা বলে দিলেই (চৈতন্য) হবে।'...গলদেশে প্রথম বেদনা অনুভবের কয়েকদিন পরে একদিবস ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে

বলিয়াছিলেন, 'এত লোক কি আনতে হয়? একেবারে ভিড় লাগিয়ে দিয়েচিস! লোকের ভিড়ে নাইবার-খাবার সময় পাই না! একটা তো এই ফুটো ঢাক, রাতদিন এটাকে বাজালে আর কয়দিন টিকবে?'

"...১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ঠাকুরের কণ্ঠপীড়া [প্রবল] হইবার পূর্বে ঐরূপে কত লোক তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল তাহার পরিমাণ হওয়া সুকঠিন। কারণ, এক স্থানে একই দিনে তাহাদিগের সকলের একত্রিত হইবার সুযোগ কখনও উপস্থিত হয় নাই।...ভালই হইয়াছিল, নতুবা, আমার পূজ্য দেশপূজ্য হইতেছেন, আমার প্রিয়তমকে সকলে ভালবাসিতেছে ভাবিয়া ঠাকুরের অন্তরঙ্গগণ তাঁহার ভক্তসংখ্যার বৃদ্ধিতে এতদিন যে আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন তাহা ঐ সংখ্যার বাহুল্য-দর্শনে বহু পূর্বে বিষাদ ও ভীতিতে পরিণত হইত; কারণ, তাঁহার নিজমুখে তাঁহারা বারংবার শ্রবণ করিয়াছিলেন, 'অধিক লোক যখন (আমাকে) দেবজ্ঞানে মানিবে, শ্রদ্ধাভক্তি করিবে, তখনই ইহার (শরীরের) অন্তর্ধান হইবে।'... শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে বলিয়াছিলেন, 'যখন যাহার তাহার হস্তে ভোজন করিব, কলিকাতায় রাত্রি যাপন করিব এবং খাদ্যের অগ্রভাগ কাহাকেও প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিব, তখন জানিবে, দেহরক্ষা করিবার অধিক বিলম্ব নাই।' কণ্ঠরোগ হইবার কিছুকাল পূর্ব হইতে ঘটনাও বাস্তবিক ঐরূপ হইয়া আসিতেছিল। কলিকাতার নানাস্থানে নানালোকের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া ঠাকুর অন্ন-ভিন্ন অপর সকল ভোজ্য পদার্থ যাহার-তাহার হস্তে ভোজন করিতেছিলেন, কলিকাতায় আগমন-পূর্বক ঘটনাচক্রে শ্রীযুত বলরামের বাটীতে ইতিপূর্বে রাত্রিবাসও মধ্যে মধ্যে করিয়া গিয়াছিলেন, এবং অজীর্ণরোগে আক্রান্ত হইয়া নরেন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে এক সময়ে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে পথ্যের বন্দোবস্ত হইবে না বলিয়া বহুদিবস না আসিলে, ঠাকুর একদিন তাঁহাকে প্রাতঃকালে আনাইয়া আপনার জন্য প্রস্তুত ঝোলভাতের অগ্রভাগ নরেন্দ্রনাথকে সকাল সকাল ভোজন করাইয়া অবশিষ্টাংশ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী...পুনরায় রন্ধন করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তিনি

বলিয়াছিলেন, 'নরেন্দ্রকে অগ্রভাগ-প্রদানে মন সঙ্কুচিত হইতেছে না, তোমার পুনরায় রাঁধিবার প্রয়োজন নাই।' শ্রীশ্রীমা বলিতেন, 'ঠাকুর ঐরূপে বুঝাইলেও তাঁহার পূর্বকথা স্মরণ করিয়া আমার মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল।'

"লোকশিক্ষা-প্রদানের অত্যধিক পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন হইলেও ঠাকুরের মনের উৎসাহ ঐবিষয়ে কখনও স্বল্প দেখা যায় নাই। অধিকারী ব্যক্তি উপস্থিত হইবামাত্র তিনি কেমন করিয়া প্রাণে প্রাণে উহা বুঝিতে পারিতেন এবং কোন্ এক দৈবশক্তির আবেশে আত্মহারা হইয়া তাহাকে উপদেশ প্রদান এবং স্পর্শাদি করিয়া তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেন।...তাহার পথের বাধাসকল সরাইয়া তাহাকে উচ্চতর ভাব-ভূমিতে আরূঢ় করাইতেন। ঐরূপে দেহপাতের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তিনি 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র সর্বদা অনুষ্ঠান করিয়াছেন,...অভয় পদবীর দিব্য জ্যোতিতে অভিষিক্ত করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতার জন্মজন্মাগত বাসনাপিপাসা চিরকালের মত মিটাইয়া দিয়াছেন।

"লোকের মনের নিগূঢ়ভাব ও সংস্কারসমূহ ধরিবার ক্ষমতা আমরা তাঁহাতে চিরকাল সমুজ্জ্বল দেখিয়াছি। শরীরের সুস্থতা বা অসুস্থতা তাঁহার মনকে যে কখন স্পর্শ করিত না, উহা তদ্বিষয়ের এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিতে পারা যায়।...ঠাকুরের কণ্ঠের বেদনা বৃদ্ধি হইয়াছে শুনিয়া ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের শ্রাবণের শেষে আমাদিগের সুপরিচিতা জনৈকা তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছিলেন। পল্লীবাসিনী অন্য এক রমণী...তাঁহাকে বলিলেন, ঠাকুরকে দিবার মত আজ বাটীতে দুধ ভিন্ন অন্য কিছু নাই...,এক ঘটী দুধ লইয়া যাইবি?' পূর্বোক্ত রমণী...বলিলেন, দক্ষিণেশ্বরে ভাল দুধের অভাব নাই, তাঁহার জন্য দুধ বরাদ্দও আছে জানি এবং উহা লইয়া যাওয়াও হাঙ্গাম, অতএব দুধ লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই।

"দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিয়া তিনি দেখিলেন, গলার ব্যথার জন্য দুধভাত ভিন্ন কোনরূপ তরিতরকারি ঠাকুরের খাওয়া চলিতেছে না, এবং...গয়লানী সেদিন নিত্য-বরাদ্দ দুধ দিতে না পারায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বিশেষ চিন্তিতা

রহিয়াছেন।...পাড়ায় কোন স্থানে দুধ পাওয়া যায় কি না সন্ধান করিতে করিতে জানিতে পারিলেন,...এক হিন্দুস্থানী রমণীর গাভী আছে এবং সে দুগ্ধ বিক্রয়ও করিয়া থাকে,...তাহার সকল দুগ্ধ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, কেবল দেড়পোয়া আন্দাজ উদ্বৃত্ত থাকায় সে উহা জ্বাল দিয়া রাখিয়াছে।... তিনি উহা লইয়া আসিলে ঠাকুর উহার সাহায্যেই সেদিন ভাত খাইলেন। আহারান্তে আচমন করিতে উঠিলে তিনি তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দিলেন। অনন্তর ঠাকুর তাঁহাকে সহসা একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, 'ওগো, গলাটায় বড় বেদনা হয়েছে, তুমি রোগ আরাম করিবার যে মন্ত্রটি জান তাহা উচ্চারণ করিয়া একবার হাত বুলাইয়া দাও তো।' রমণী...তাঁহার গলদেশে হাত বুলাইয়া দিবার পরে শ্রীশ্রীমার নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমি যে ঐ মন্ত্র জানি, উনি একথা কিরূপে জানিতে পারিলেন? ঘোষপাড়ার সম্প্রদায়ভুক্তা কোন রমণীর নিকটে আমি উহা বহু...পূর্বে শিখিয়া লইয়াছিলাম, পরে নিষ্কাম হইয়া ঈশ্বরকে ডাকাই জীবনের কর্তব্য জানিয়া উহা ত্যাগ করিয়াছি। জীবনের সকল কথাই ঠাকুরকে বলিয়াছি, কিন্তু কর্তাভজা-মন্ত্র গ্রহণের কথা শুনিলে পাছে উনি ঘৃণা করেন ভাবিয়া ঐ বিষয় তাঁহার নিকটে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম...।' শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী.. হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'ওগো, উনি সকল কথা জানিতে পারেন, অথচ মনমুখ এক করিয়া সদুদ্দেশ্যে যে যাহা করিয়াছে তাহার নিমিত্ত তাহাকে কখন ঘৃণা করেন না; তোমার ভয় নাই। আমিও...পূর্বে ঐমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া ঐকথা উঁহাকে বলায় উনি বলিয়াছিলেন—মন্ত্র লইয়াছ তাহাতে ক্ষতি নাই, এখন উহা ইষ্টপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া দাও।'

"শ্রাবণ যাইয়া ক্রমে ভাদ্রেরও কিছুদিন গত হইল, কিন্তু ঠাকুরের গলার বেদনার ক্রমে বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস দেখা গেল না। ভক্তগণ ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, এমন সময়ে সহসা একদিন এক ঘটনার উদয় হইয়া তাঁহাদিগকে কর্তব্যের পথ স্পষ্ট দেখাইয়া দিল। বাগবাজারবাসিনী জনৈকা রমণী সেদিন তাঁহার বাটীতে ভক্তগণকে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরকে আনিবার তাঁহার বিশেষ

আকিঞ্চন ছিল, কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ জানিয়া সেই আশা একপ্রকার ত্যাগ করিয়াছিলেন। তথাপি যদি তিনি কোনরূপে কিছুক্ষণের জন্ত একবার বেড়াইয়া যাইতে পারেন ভাবিয়া জনৈক ভক্তকে অনুরোধ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ··· সে সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিল—ঠাকুরের কণ্ঠতালুদেশ হইতে আজ রুধির নির্গত হইয়াছে, সেইজন্ত আসিতে পারিলেন না। নরেন্দ্রনাথ, রাম, গিরিশ, দেবেন্দ্র, মাষ্টার প্রভৃতি উপস্থিত সকলে বিশেষ চিন্তিত হইলেন এবং পরামর্শে স্থির হইল, কলিকাতায় একখানি বাটী ভাড়া লইয়া অচিরে ঠাকুরকে আনয়নপূর্বক চিকিৎসা করাইতে হইবে।···

"পরদিবস ভক্তদিগের মধ্যে প্রবীণ কয়েকজন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরকে কলিকাতায় থাকিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্ত অনুরোধ করিলে তিনি সম্মত হইলেন। বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখার্জী ষ্ট্রীটের ক্ষুদ্র একখানি বাটীর ছাদ হইতে গঙ্গাদর্শন হয় দেখিয়া ভক্তগণ উহা ভাড়া লইয়া·· তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। ··· ঠাকুর ঐ স্বল্পপরিসর বাটীতে প্রবেশ করিয়াই ঐ স্থানে বাস করিতে পারিবেন না বলিয়া তৎক্ষণাৎ পদব্রজে··· বলরাম বসুর ভবনে চলিয়া আসিলেন। বলরাম তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন·· ।

"বাটীর অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। ··· ভক্তগণ ইতিমধ্যে এক দিবস কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বৈদ্যগণকে আনয়ন করিয়া ঠাকুরের ব্যাধি সম্বন্ধে মতামত গ্রহণ করিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ, গোপীমোহন, দ্বারকানাথ, নবগোপাল প্রভৃতি অনেকগুলি কবিরাজ···ঠাকুরকে পরীক্ষা করিলেন এবং তাঁহার রোহিণী নামক দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি হইয়াছে বলিয়া স্থির করিলেন। ···'ডাক্তারেরা যাহাকে ক্যান্সার বলে, রোহিণী তাহাই।' ·· সপ্তাহকালের মধ্যেই শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে অবস্থিত গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্যের বৈঠকখানা ভবনটি ···ভাড়া লওয়া হইল এবং কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ [হোমিওপ্যাথিক] ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসাধীনে কিছুদিন তাঁহাকে রাখা সর্ববাদিসম্মত হইল।

"...ঠাকুরের কলিকাতা আগমন শহরের সর্বত্র লোকমুখে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং পরিচিত-অপরিচিত বহুব্যক্তি...যখন তখন দলে দলে উপস্থিত হইয়া বলরামের ভবনকে উৎসবস্থলের ন্যায় আনন্দময় করিয়া তুলিল। ডাক্তারের নিষেধ ও ভক্তগণের সকরুণ প্রার্থনায় সময়ে সময়ে নীরব থাকিলেও ঠাকুর যেরূপ উৎসাহে তাহাদিগের সহিত ধর্মালাপে প্রবৃত্ত হইলেন তাহাতে বোধ হইল, তিনি যেন ঐ উদ্দেশ্যেই এখানে আগমন করিয়াছেন, যেন দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাওয়া যাঁহাদের পক্ষে সুগম নহে তাহাদিগকে ধর্মালোক প্রদানের জন্যই তিনি কিছুকালের জন্য তাহাদের দ্বারে উপনীত হইয়াছেন! প্রাতঃকাল হইতে ভোজনকাল পর্যন্ত, এবং ভোজনান্তে ঘণ্টা দুই আন্দাজ বিশ্রামের পরেই রাত্রির আহার এবং শয়নকাল পর্যন্ত প্রতিদিন তিনি ঐ সপ্তাহকাল-মধ্যে বহুলোকের ব্যক্তিগত জীবনের জটিল প্রশ্নসকল সমাধান করিয়া দিয়াছিলেন, নানাভাবে ঈশ্বরীয় কথার আলোচনায় বহু ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক পথে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, এবং ভজনসঙ্গীতাদি-শ্রবণে গভীর সমাধি-রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহু পিপাসুর প্রাণ শান্তি ও আনন্দের প্লাবনে পূর্ণ ও উচ্ছলিত করিয়াছিলেন।"

"ঠাকুরের জন্য যে বাটীখানি এখন ভাড়া লওয়া হইল উহা ...শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের উত্তরপার্শ্বে অবস্থিত। ... সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াই দক্ষিণভাগে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ঘরগুলিতে যাইবার পথ। উক্ত পথ দিয়া প্রথমেই 'বৈঠকখানা' নামে অভিহিত সুপ্রশস্ত ঘরখানিতে ঢুকিবার দ্বার—এই ঘরে ঠাকুর থাকিতেন। উহার...পশ্চিমে ছোট ছোট দুইখানি ঘর—একখানিতে ভক্তদিগের কেহ কেহ রাত্রিতে শয়ন করিত এবং অপরখানি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর রাত্রিবাসের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ...ঠাকুরের ঘরে যাইবার পথের পূর্বপার্শ্বে ছাদে উঠিবার সিঁড়ি, এবং ছাদে যাইবার দরজার পার্শ্বে চারিহাত আন্দাজ লম্বা ও ঐরূপ প্রশস্ত একটি আচ্ছাদনযুক্ত চাতাল ছিল। ... ভাদ্রমাসের শেষার্ধের কোন সময়ে, ইংরাজী ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভে, ঠাকুর বলরামের বাটী হইতে এখানে আসিয়া কিঞ্চিদধিক তিনমাস কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং অগ্রহায়ণ শেষ হইবার দুই-

এক দিন থাকিতে [২৭শে অগ্রহায়ণ] কাশীপুরের বাগানবাটীতে উঠিয়া গিয়াছিলেন।”[১]

রাম লিখিয়াছেন : “পরমহংসদেব কলিকাতায় আসিয়াছেন, এই কথা প্রচার হইয়া গেল। তাহাতে লোকের সমাগম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বলরামবাবুর বাটী যেন উৎসবক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। ···তিনি ইংরাজ ডাক্তার দেখাইতে আপত্তি করিলেন ; সুতরাং প্রতাপবাবুই ঔষধ বিধান করিতে লাগিলেন। ···প্রতাপবাবুর অনুরোধে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়কে আনয়ন করিবার জন্ম মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে প্রেরণ করা হয়। ডাক্তার সরকার পরমহংসদেবকে মথুরবাবুর সময় হইতে জানিতেন এবং এই ব্যাধির চিকিৎসার জন্য একদা তাঁহার শাঁখারিটোলার

---

১ চিকিৎসার জন্ম ঠাকুর কখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, কথামৃতে ইহার উল্লেখ নাই। কথামৃতের চতুর্থভাগে দেখা যায়, ঠাকুর ১২৯২ সালের ১৮ই ভাদ্র বুধবার নন্দোৎসবের দিন পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে আছেন। ইহার দ্বারা লীলাপ্রসঙ্গকারের অভিমতই সমর্থিত হয়। কিন্তু কথামৃত-পঞ্চমভাগের দুইটি ছোট পরিচ্ছেদ ঐ বিষয়ে এক বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছে, ঐ পরিচ্ছেদ-দুইটিতে ঠাকুর ৫ই ও ৯ই আশ্বিন দক্ষিণেশ্বরেই আছেন বলা হইয়াছে। লীলাপ্রসঙ্গকারের মতে ঠাকুর কিঞ্চিদধিক তিনমাস শ্যামপুকুরের বাড়ীতে ছিলেন। 'পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' গ্রন্থে রাম লিখিয়াছেন, 'শ্যামপুকুরের বাটীতে তিনি তিনমাস অতিবাহিত করেন।' মাতাঠাকুরাণীর জীবনলীলাগ্রন্থ প্রণয়ন করিবার কালে একাধিকবার শ্রীম-গৃহিণী শ্রীমতী নিকুঞ্জদেবীর সঙ্গে দেখা করিয়া নানা বিষয় জানিয়া লইয়াছিলাম ; সেই সময়ে তিনিও বলিয়াছিলেন, শ্যামপুকুরে ঠাকুর তিনমাস ছিলেন। আশ্বিনের মাঝামাঝি সময়ে কলিকাতায় আসিয়া ও বসু-ভবনে কিছুদিন থাকিয়া ঠাকুর যদি শ্যামপুকুরে গিয়া থাকেন তাহা হইলে মাত্র দুই মাস বা কিঞ্চিদধিক দুইমাস মাত্র তাঁহার শ্যামপুকুরে বাস হইয়াছিল বলিতে হয়। কথামৃত-পঞ্চমভাগে ৫ই আশ্বিনের বর্ণনার মধ্যে আছে : 'বহুবাজারের রাখাল ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত ; ডাক্তারকে ঠাকুরের অসুখ দেখাইবেন।' রাখাল ডাক্তার যে ঠাকুরের অসুখের প্রাথমিক অবস্থা হইতেই চিকিৎসা করিয়া আসিতেছিলেন, এই বিষয়ে লীলাপ্রসঙ্গকার ও জীবনবৃত্তান্তকার একমত। কথামৃত-পঞ্চমভাগ গ্রন্থকার শ্রীমর দেহত্যাগের কিছুদিন পরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাটীতে পরমহংসদেবকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ডাক্তার সরকারকে প্রতাপবাবু পরামর্শের জন্য আনাইয়াছেন, এইভাবেই ডাকা হয় এবং তাঁহার ষোল টাকা দর্শনীও সংস্থান করিয়া রাখা হইয়াছিল।

"পরমহংসদেবকে দেখিয়া ডাক্তার সরকার কহিলেন, 'তুমি যে এখানে?' চিকিৎসার জন্য এরা এখানে আনিয়াছে' বলিয়া পরমহংসদেব উত্তর করিলেন। ডাক্তার সরকার···ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। তাঁহাকে···দর্শনীর টাকা দেওয়া হইল। তিনি টাকা না লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ বাটী কাহার?' মহেন্দ্রবাবু কহিলেন, 'পরমহংসদেবের ভক্তেরা ভাড়া লইয়াছে।' ডাক্তার সরকার···বলিলেন, 'ওঁর আবার ভক্ত কি?' তিনি তখন পর্যন্ত জানিতেন যে, ইনি মথুরবাবুর পরমহংস,···। তিনি অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ভক্তদিগের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। ··· ডাক্তার সরকারের পূর্ব সংস্কার দূরীভূত হইয়া আরও উৎসাহবৃদ্ধি হইল। তিনি যদিও একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তি বটেন, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রাদি ও দেবদেবী এবং সাধু-মহাত্মাদিগের অদ্ভুত শক্তি আদৌ বিশ্বাস করিতেন না এবং বোধ হয় আজও করেন না। বর্তমান শতাব্দীর যেপ্রকার পরিমার্জিত ধর্মভাব অর্থাৎ জীবের হিতসাধন করা, তাহা ডাক্তার সরকারের ধারণা ছিল এবং আছে। সে যাহা হউক, তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের নাম শুনিয়া বাস্তবিক আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন। পরমহংসদেব কর্তৃক গিরিশ প্রভৃতির পরিবর্তন হইয়াছে শুনিয়া যারপরনাই বিমোহিত হইয়া কহিলেন, 'ইহা অপেক্ষা হিতসাধন আর কি হইতে পারে? ···পরমহংসদেব সাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি, অতএব আমি টাকা লইব না।' মহেন্দ্রবাবু···বলিলেন, 'পরমহংসদেবের ভক্তেরা ধনী না হইলেও কেহ অক্ষম নহেন, তাঁহারা অর্থব্যয় করিবার জন্যই তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়াছেন; আপনি সেজন্য কিছু মনে না করিয়া টাকা গ্রহণ করুন।' ডাক্তার সরকার হাসিয়া কহিলেন, 'আমাকে সেই পাঁচজনের মধ্যে পরিগণিত করিয়া লউন। আমি বিশেষ যত্নপূর্বক চিকিৎসা করিব। যতবার প্রয়োজন হইবে, আমি আপনি আসিব। আপনারা মনে করিবেন

না যে, আপনাদের সন্তুষ্ট করিতে আসিব, আমার নিজের প্রয়োজন আছে জানিবেন।'

"পরদিন ডাক্তার সরকার সন্ধ্যার সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন তথায় লোকারণ্য হইয়াছিল এবং গিরিশবাবু প্রভৃতি যাবতীয় ভক্তগণও উপস্থিত ছিলেন। ...গিরিশবাবু এবং অন্যান্য ভক্তদিগের সহিত আলাপ করিয়া ডাক্তার সরকার যথেষ্ট আনন্দিত হইয়াছিলেন। সেদিন প্রায় দুইতিন ঘণ্টা তথায় বসিয়া ছিলেন।

"ডাক্তার সরকার প্রত্যহ দুই প্রহরের পর পরমহংসদেবকে দেখিতে আসিতেন। ব্যাধি সম্বন্ধে কথা কহিয়া ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং গিরিশবাবুর সহিত নানাবিধ তর্কবিতর্ক করিয়া কোনদিন সন্ধ্যার পর চলিয়া যাইতেন।...ডাক্তার সরকারের মত এই যে,—মনুষ্য গুরু হইতে পারে না; কেহ কাহারও চরণধূলি লইতে পারে না; ভাব, সমাধি মস্তিষ্কের বিকার; সাকার রূপাদি বা অবতার কখন হইতে পারে না; এবং ঈশ্বর অসীম, তিনি কদাচ সীমাবিশিষ্ট নহেন। ...যেদিন এইসকল কথা হইল তাহার পরদিন সন্ধ্যার সময় ডাক্তার সরকার প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন। এমন সময়ে ভাবের কথা উঠিল; ...কথা চলিতে চলিতে একজন অচৈতন্য হইলেন। ডাক্তার সরকার তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছেন, এমন সময় আর একটি ভক্ত ঢলিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দেখিতেছেন, তৃতীয় ব্যক্তির ভাব হইল। এইরূপে এক সময়ে কয়েকটি ব্যক্তি ভাবাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার সরকার বিমুগ্ধ হইয়া কোন কারণ নির্দেশ করিতে পারিলেন না। ...বোধ হয় সে ঘটনার কিছুই বুঝিতে পারেন নাই।

"চরণধূলি গ্রহণ করা সম্বন্ধে গিরিশবাবুর সহিত...তর্কে ডাক্তার সরকার এতদূর উৎসাহিত হইয়াছিলেন যে, তিনি পরমহংসদেবের চরণধূলি লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার দিন দিন শ্রদ্ধা ও ভক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, 'এতদিনের পর আমি হৃদয়গ্রাহী বন্ধু পাইয়াছি।'...

"একদিন পরমহংসদেব ডাক্তার সরকারের পুত্রটিকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। ডাক্তার সরকার পরদিন তাহাকে সঙ্গে লইয়া যান। পুত্রটি যাইবামাত্র পরমহংসদেব তাহার হস্তধারণপূর্বক স্বতন্ত্র কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিয়াছিলেন, 'বাবা, আমি তোমার জন্য এখানে আসিয়াছি।' ...তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন।"

সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের সহায়তা লাভ করিয়াও ভক্তগণ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, বিশেষ সতর্কতার সহিত পথ্য প্রস্তুত করিবার এবং দিবসের ন্যায় রাত্রিকালেও ঠাকুরের আবশ্যক মত সেবা করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করা প্রয়োজন। তাঁহারা প্রথমেই শ্রীশ্রীমাকে দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্যামপুকুরে আনয়ন করিবার পরামর্শ করিলেন। কিন্তু বাড়ীতে অন্দরমহল না থাকায় অতিলজ্জাশীলা মা এখানে অপরিচিত পুরুষসকলের মধ্যে কিরূপে বাস করিবেন তাহা এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। লজ্জাপটে চিরকাল আবৃত থাকিলেও দেশ-কাল-পাত্রভেদে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিতে মা জানিতেন. কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়াই তিনি শ্যামপুকুরে চলিয়া আসিলেন এবং ঠাকুরকে রোগমুক্ত করিবার আশায় বুক বাঁধিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

এখানে একমহল বাড়ীতে সকলের স্নানাদির জন্য একটিমাত্র স্থান নির্দিষ্ট থাকায় শ্রীশ্রীমা রাত্রি তিনটার পূর্বে শয্যাত্যাগ করিতেন এবং কখন যে ঐসকল কাজ শেষ করিয়া ত্রিতলে ছাদের সিঁড়ির পার্শ্বস্থ চাতালে উঠিয়া যাইতেন তাহা কেহই জানিতে পারিত না। সমস্ত দিন সেই সঙ্কীর্ণ চাতালে থাকিয়া তিনি পথ্যাদি প্রস্তুত করিতেন, প্রস্তুত হওয়ার পরে লোকজন সরাইয়া দেওয়া হইলে নামিয়া আসিয়া নিজেই ঠাকুরকে খাওয়াইয়া যাইতেন। রাত্রি এগারটার পর সকলে নিদ্রিত হইলে তিনি দ্বিতলে তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে বড় জোর তিনঘণ্টা শুইয়া থাকিতেন। দিনের পর দিন ঐরূপে তিনি ঠাকুরের প্রধান সেবাকার্যটি করিয়া যাইতেন, কিন্তু যাহারা নিত্য এখানে

আসাযাওয়া করিত তাহাদের অনেকেও উহা কিছুমাত্র জানিতে পারিত না।

এই সময়ে যুবকভক্তগণের চারিপাঁচ জন—শরৎ শশী, কালী, ছোট গোপাল প্রভৃতি—শ্রীগুরুর প্রতি প্রেমে জীবনোৎসর্গ করিয়া তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহারা বাড়ী হইতে আহার করিয়া আসিতেন, কিন্তু ঠাকুরের অসুখবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁহারা কলেজে অধ্যয়ন ও বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন তাঁহাদের অভিভাবকেরা ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ছেলেদিগকে ফিরাইবার জন্য তাঁহারা ন্যায্য অন্যায্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত ও অনুপ্রাণনা যুবকদিগকে কর্তব্যে অবিচল করিয়া রাখিল, এবং ঠাকুরের সেবা, সাহচর্য ও সাধনভজন ক্রমশঃ তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য ও গতিপথ সুনির্দিষ্ট করিয়া দিল।

কলিকাতায় আসিবার পরে ঠাকুরের গলার অসুখ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছিল। ইহারই মধ্যে কয়েকদিন হয়তো তিনি একটু ভাল বোধ করিতেন, কিন্তু তাহার পরেই অবস্থার অধিকতর অবনতি ঘটিত। তাঁহার শরীর যতই পড়িয়া যাইতে লাগিল, দিব্যভাবের প্রকাশ ততই বাড়িয়া চলিল, আর ঐ প্রকাশ সময়ে সময়ে দেখিতে পাইয়াই তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সমধিক উৎসাহ-সহকারে তাঁহার সেবা করিয়া যাইতে লাগিলেন। ঐ প্রকাশ কখনো ভাগ্যবান ব্যক্তিবিশেষের জন্য তাঁহার প্রতি করুণায়, কখনো বা সকল ভক্তদেরই জন্য তাঁহাদের প্রতি অহেতুক ভালবাসায়, আসিয়া উপস্থিত হইত। শেষোক্তপ্রকার প্রকাশের দুইটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

শারদীয়া মহাপূজা। দেবীভক্ত সুরেন্দ্র তাঁহার নিজবাটীতে পূজা আনিয়াছেন ঠাকুরের সম্মতি গ্রহণ করিয়া। মহাষ্টমীর দিন অনেকগুলি ভক্ত সমবেত হইয়াছেন শ্যামপুকুরের বাড়ীতে, ঠাকুরের ঘরে। অপরাহ্ন চারিটার সময় ডাক্তার সরকার আসিয়া উপস্থিত হইলেন তাঁহার এক ডাক্তারবন্ধুকে সঙ্গে লইয়া। নরেন্দ্রনাথ তখন ভজন গাহিতে আরম্ভ

করিলেন। সেই দিব্য স্বরলহরী সকলকেই অভিভূত করিল। ঠাকুর তাঁহার সমীপে উপবিষ্ট ডাক্তার সরকারকে মৃদুস্বরে সঙ্গীতের ভাবার্থ বুঝাইয়া দিতে এবং একএক বার অল্পক্ষণের জন্য সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন। ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ ভাবাবেশে বাহ্যচৈতন্য হারাইলেন।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি সাড়ে সাতটা হইল। নরেন্দ্রনাথকে বাৎসল্যভরে আলিঙ্গন করিয়া ও ঠাকুরের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুরও হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহসা গভীরসমাধিমগ্ন হইলেন। ভক্তেরা কানাকানি করিতে লাগিলেন, এই সময় সন্ধিপূজা কিনা, সেইজন্য ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন! ডাক্তার এই সুযোগে যন্ত্রসাহায্যে ঠাকুরের হৃৎস্পন্দন পরীক্ষা করিয়া হতবুদ্ধি হইলেন কিছুমাত্র সাড়া না পাইয়া। তাঁহার বন্ধুটিও পরীক্ষা করিলেন ঠাকুরকে, তাঁহার উন্মীলিত চক্ষুতে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া। প্রায় আধঘণ্টা পরে ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইলে ডাক্তার ও তাঁহার বন্ধু চলিয়া গেলেন। ঠাকুর তখন ভক্তদিগকে তাঁহার সমাধিকালের দর্শন সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন: "এখান হইতে সুরেন্দ্রের বাড়ী পর্যন্ত একটা জ্যোতির রাস্তা খুলিয়া গেল। দেখিলাম তাহার ভক্তিতে প্রতিমায় মার আবেশ হইয়াছে; তৃতীয় নয়ন দিয়া জ্যোতীরশ্মি নির্গত হইতেছে! দালানের ভিতরে দেবীর সম্মুখে দীপমালা জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর উঠানে বসিয়া সুরেন্দ্র ব্যাকুলহৃদয়ে মা মা বলিয়া রোদন করিতেছে। তোমরা সকলে তাহার বাটীতে এখনই যাও, তোমাদের দেখিলে তাহার প্রাণ শীতল হইবে।"

ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া নরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ ভক্তেরা সকলেই সুরেন্দ্রের বাড়ীতে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন, বাস্তবিকই দালানে দেবীর সম্মুখে দীপমালা জ্বালা হইয়াছিল এবং সুরেন্দ্র উঠানে বসিয়া প্রাণের আবেগে প্রায় একঘণ্টা কাল 'মা মা' বলিয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন!

অন্য একদিনের ঘটনা। ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, ফলমূল-মিষ্টান্নাদি-নৈবেদ্য আনিয়া রাখা হইতেছে—আজ ৺শ্যামাপূজা।

ঠাকুর তাঁহার কোন কোন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, 'পূজার উপকরণ সংক্ষেপে সংগ্রহ করে রাখিস, কাল কালীপূজা করতে হবে।' দেখিতে দেখিতে সূর্যাস্ত হইয়া সাতটা বাজিয়া গেল। ধূপদীপ প্রজ্বলিত হওয়ায় সৌরভে ও আলোকে ঘরখানি ভরিয়া উঠিল। ত্রিশজনের অধিক ভক্ত নীরবে বসিয়া একমনে ঠাকুরকে দেখিতে লাগিলেন—কেহ তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছেন, কেহ বা জগন্মাতার চিন্তা করিতেছেন। দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে গন্ধপুষ্পাদি পূজার উপকরণ লইয়া ঠাকুর কখন কখন আপনাকে আপনি পূজা করিতেন, ভক্তগণের কেহ কেহ উহা দেখিয়াছিলেন। আজও তিনি সেইরূপে নিজ দেহমনরূপ প্রতীকাবলম্বনে জগচ্চৈতন্য ও জগচ্ছক্তিরূপিণীর পূজা করিবেন, অথবা জগন্মাতার সহিত অভেদজ্ঞানে শাস্ত্রোক্ত আত্মপূজা করিবেন, তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইলেও ঠাকুর কোনরূপ পূজাই করিলেন না বা পূজা করিবার জন্য কাহাকেও আদেশও দিলেন না; নিশ্চিন্ত মনে স্থির হইয়া বিছানায় বসিয়া রহিলেন।

ইহাতে ভক্তবর রামের মনে উদয় হইল—উনি পূজা করিবেন কি আমরা উঁহাকে পূজা করিব? পার্শ্ববর্তী গিরিশের কানে অতি মৃদুস্বরে রাম এই কথাটি কহিলেন। 'বলেন কী!' বলিয়া উল্লাসে আত্মহারা হইয়া গিরিশ তখনই পুষ্পপাত্র হইতে ফুলচন্দন গ্রহণ করিলেন ও 'জয় মা' বলিয়া ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি দিলেন। ঠাকুরের সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল ও তিনি গভীরসমাধিমগ্ন হইলেন। তাঁহার জ্যোতির্ময় মুখে দিব্যহাসি ফুটিয়া উঠিল ও দুই হাতে বরাভয়মুদ্রা দেখা দিল। ভক্তেরা দেখিলেন, জ্যোতির্ময়ী দক্ষিণামূর্তিতে দেবী সহসা তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছেন!

পুষ্পপাত্র হইতে ফুলচন্দন লইয়া ও ইচ্ছানুরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভক্তেরা প্রত্যেকেই শ্রীপাদপদ্ম পূজা করিলেন। 'জয় মা! জয় মা!' শব্দে গৃহ মুখরিত হইল ও একে একে অনেকগুলি সঙ্গীত গীত হইল।[১]

১ গিরিশ গাহিলেন :

ঠাকুর ক্রমে অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন দেখিয়া একটি ভক্ত সুজির পায়েসের পাত্রটি তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন ও ঠাকুর তাহা ভক্ষণ করিলেন। তিনি সকলপ্রকার মিষ্টান্ন এবং তাম্বূলও ভক্ষণ করিয়াছিলেন।

ভক্তেরা করিল মনে ব্যথা গেছে সেরে।
আজি অঙ্গে মা-কালীর আবেশের ভরে॥
... ... আনন্দ বাড়াবাড়ি।
সকলে প্রসাদ লয়ে করে কাড়াকাড়ি॥

কে রে নিবিড়-নীল-কাদম্বিনী সুরসমাজে।
কে রে রক্তোৎপল-চরণযুগল হর-উরসে বিরাজে॥
কে রে রজনীকর নখরে বাস, দিনকর কত পদে প্রকাশ,
মৃদু মৃদু হাস-ভাষ, ঘন ঘন ঘন গরজে॥

বিহারী গীতচ্ছলে প্রার্থনা করিলেন :

মনেরি বাসনা শ্যামা শবাসনা শোন মা বলি,
হৃদয়মাঝে উদয় হইও মা যখন হবে অন্তর্জলি।
তখন আমি মনে মনে তুলব জবা বনে বনে,
মিশাইয়ে ভক্তি-চন্দন মা পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি॥

১ কালীপদের বাড়ী ছিল শ্যামপুকুরে; তিনি ঠাকুর ও তাঁহার সেবকদের তত্ত্বাবধান করিতেন বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে ম্যানেজার বলিতেন। আর নরেন্দ্র তাঁহার নাম দিয়াছিলেন 'দানা' দানা-কালী কালীপূজার যাবতীয় দ্রব্য যোগাড় করিয়া আনিয়াছিলেন।

ফুলুকা ফুলুকা লুচি সুজির পায়েস।
নূতন খেজুরগুড়ে গোলালো সন্দেশ॥
সাদা সন্দেশাদি আর মিষ্টান্ন বহুল।
বিল্বপত্র গঙ্গাজল ধূপদীপ ফুল॥
যাবতীয় দ্রব্যাদি যোগাড় করি ঘরে।
শুভক্ষণে দিলা আনি প্রভুর গোচরে॥
অপর দ্রব্যাদি কালী আনিলা আপনি।
সুজির পায়েস আনে তাঁহার গৃহিণী॥

প্রভুদয়াল মিশ্র নামে জনেক খ্রীষ্টান ধর্মযাজক একদিন ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন শ্যামপুকুরে। ব্রাহ্মণবংশে তাঁহার জন্ম হইলেও ভগবান ঈশাকে ইষ্টদেবতারূপে গ্রহণ করিয়া তিনি নিত্য যোগাভ্যাস করিতেন। জাতিভেদ না মানিলেও তিনি যাহার তাহার হাতে খাইতেন না, স্বপাকে হবিষ্যান্ন ভোজন করিতেন। ভারতের ঈশ্বরপ্রেমিক যোগীরা বরাবর গৈরিক পরিধান করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া তিনিও গৈরিক পরিধান করিতেন। যোগাভ্যাসের কিছু কিছু ফলও তিনি পাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার জ্যোতিদর্শনাদি হইত। ধ্যানকালে একদিন তিনি ঠাকুরের সমাধিমগ্ন রূপ দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া পড়েন ও মিশ্র তাঁহার ধ্যানদৃষ্ট রূপটি প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হন। ঠাকুরকে তিনি সাক্ষাৎ ঈশা বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া নরেন্দ্রনাথ মিশ্রের প্রাণের কথাসকল বাহির করিয়া নিয়াছিলেন, এবং সাধু ও যোগী জানিয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ভক্তদের অনেকে তাঁহার পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম ও তাঁহার সহিত একত্র বসিয়া ঠাকুরের প্রসাদী মিষ্টান্নাদি ভোজন করিয়াছিলেন।

"শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাঁহার পুণ্যদর্শন ও কৃপালাভে সমাগত জনগণের সংখ্যাও তেমনি দিন দিন বাড়িয়া গিয়াছিল।" এখানে তিনি একদিন দেখিয়াছিলেন, স্থূলদেহের বাহিরে আসিয়া তাঁহার সূক্ষ্মশরীর গৃহমধ্যে ইতস্তত: বিচরণ করিতেছে, আর তাহার গলায় সংযোগস্থলে পৃষ্ঠদেশে কতকগুলি ক্ষত হইয়াছে। স্পর্শের দ্বারা দুষ্কর্মকারীদের পাপরাশি তাঁহার দেহে সংক্রমিত হওয়ার ফলেই ঐরূপ হইয়াছে, জগন্মাতা তাঁহাকে

সুজির পায়েস প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন দানা-কালীর কনিষ্ঠা ভগিনী মহামায়া। গৃহিণীর মাথাগরম ছিল বলিয়া তাঁহার পক্ষে এই কাজ সম্ভব ছিল না। শ্রীমতী মহামায়া মিত্রের সঙ্গে এক সময়ে আমাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল।

বুঝাইয়া দেন, এবং তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া আনন্দের সহিত সেই কথাটি তিনি নিজের সেবকদের কাছে ব্যক্ত করেন। ইহার ফলে, ঠাকুরের শরীর পূর্বের ন্যায় সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কোন নূতন লোক যাহাতে তাঁহার চরণস্পর্শ করিয়া প্রণাম না করে সেই বিষয়ে ভক্তেরা, বিশেষতঃ যুবক ভক্তেরা, সচেষ্ট হইলেন। কেহ কেহ নিজেদের পূর্ব দুষ্কৃতি স্মরণ করিয়া ঠাকুরের পবিত্র দেহ আর স্পর্শ করিবেন না, এইরূপ সংকল্প করিয়াও বসিলেন।

ঠাকুরের নিকটে নূতন লোকের গমনাগমন নিবারণের চেষ্টা দেখিয়া গিরিশ বলিয়াছিলেন,—চেষ্টা করচ কর, কিন্তু তা সফল হবে না; উনি যে লোকের পাপতাপ নেবার জন্যেই দেহধারণ করেচেন! দেখাও গেল, ভক্তগণের পরিচিত নবাগত ব্যক্তিগণকে, আর সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা ঠাকুরকে দর্শন করিতে ব্যাকুল তাহাদিগকে নিবারণ করা সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং নিয়ম করা হইল, যে-কেহ ঠাকুরের কাছে যাইবে তাহাকেই বলিয়া দেওয়া হইবে যেন সে ঠাকুরের চরণস্পর্শ না করে।

এই সব বিধিনিষেধ লইয়া একদিন এক মজার ব্যাপার ঘটিল। দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে ঠাকুর একদিন গিরিশের দক্ষযজ্ঞ নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন, এবং তাহাতে সতীর ভূমিকা যে অভিনেত্রী গ্রহণ করিয়াছিল তাহার অভিনয়নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেই অভিনেত্রী — শ্রীমতী বিনোদিনী—অভিনয়শেষে ঠাকুরের পাদবন্দনা করিবার সৌভাগ্য লাভ করে। তদবধি ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞান করিয়া সে ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছিল। ঠাকুরের নিদারুণ পীড়ার কথা শুনিয়া একটিবার তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠে, এবং ঠাকুরের কাছে যাইবার কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া গিরিশের বিশ্বস্ত সহচর কালীপদের শরণাপন্ন হয়। পুরুষের বেশে হ্যাটকোটে সজ্জিত করিয়া কালীপদ একদিন সায়ংকালে তাহাকে শ্যামপুকুরের বাসায় লইয়া যান, এবং নিজবন্ধু বলিয়া সেবকদের নিকটে তাহার পরিচয় দান করেন।

ঠাকুরের ঘরে কোন সেবকই সেই সময়ে ছিলেন না। বিনোদিনীকে দেখিয়াই ঠাকুর চিনিতে পারেন, তাহার সাহস ও দক্ষতার প্রশংসা করেন, এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসবতী ও নির্ভরশীলা হইয়া থাকিবার জন্য দুইচারিটি তত্ত্ব-কথা বলিয়া তাহাকে বিদায় দেন। অশ্রুমোচন করিতে করিতে ঠাকুরের শ্রীচরণে মস্তক রাখিয়া সে প্রণাম করিয়াছিল। প্রতারিত হইয়াছেন বলিয়া সেবকেরা কালীপদের উপরে তেমন কুপিত হইতে পারিলেন না; হাস্যপরিহাস করিয়া রঙ্গপ্রিয় ঠাকুর এই ব্যাপারটিকে অত্যন্ত লঘু করিয়া দিয়াছিলেন।[১]

১ গিরিশচন্দ্রের লেখায় আছে, কোন এক ভাগ্যবতী অভিনেত্রীর বুকে হস্ত দিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, মা, তোমার চৈতন্য হোক।' এই অভিনেত্রী বিনোদিনী বলিয়াই মনে হয়। বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী তারাসুন্দরীর কাছে ১৩৪৬ সালের ফাল্গুন মাসে শুনিয়াছিলাম বিনোদিনী তখনও জীবিতা থাকিয়া তপস্যা-ময় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছিলেন।

কাশীপুরে স্থানপরিবর্তন ও আত্মপ্রকাশে অভয়দান

"ক্রমে ব্যাধি বাড়িয়া উঠিল। অন্নের মণ্ডও গলাধঃকরণ হওয়া দুষ্কর হইতে লাগিল। স্বরভঙ্গের লক্ষণ প্রকাশ পাইল এবং শরীর জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িল। কোন চিকিৎসাই ফলদায়িনী হইল না। ডাক্তার সরকারের পরামর্শে কলিকাতার বাহিরে বায়ুপরিবর্তনের নিমিত্ত চেষ্টা হইতে লাগিল। ·· বাটীওয়ালারাও সেই সময় বাটী ছাড়িয়া দিবার জন্য বড় বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল।···জনৈক সেবক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'প্রভু, কোন্ দিকে বাটী অনুসন্ধান করা যাইবে?' পরমহংসদেব ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, 'আমি কি জানি?'···'কাশীপুর, বরাহনগর অঞ্চলে অন্বেষণ করিব?' তিনি ইঙ্গিতে আজ্ঞা দিলেন।···সেবক [রাম] তথায় যাত্রা করিলেন এবং মহিম চক্রবর্তী নামক তাঁহার জনৈক ভক্তের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করায় তিনি এক সুবৃহৎ উদ্যানের অনুসন্ধান বলিয়া দিলেন। পরে উদ্যানস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ৮০৲ টাকা মাসিক ভাড়ায়···ঐ উদ্যানটি আবদ্ধ করা হইল। যে দিবস বাড়ী ভাড়া হইল সেই দিবসই পরমহংসদেব তথায় গমন করিলেন।" [জীবনবৃত্তান্ত]

বর্তমান কাশীপুর রোডের উপরে, পূর্বপার্শ্বে, প্রায় চৌদ্দবিঘা জমির উপর অবস্থিত এই উদ্যানবাটীর স্বত্বাধিকারী ছিলেন রাণী কাত্যায়নীর জামাতা গোপালচন্দ্র ঘোষ। ভক্তেরা তাঁহারই নিকট হইতে প্রথমে ছয়মাসের এবং পরে আরও তিনমাসের জন্য উহা ভাড়া লইয়াছিলেন উদ্যানের চতুর্দিক উচ্চপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।

"উদ্যানের উত্তরসীমার প্রায় মধ্যভাগে প্রাচীরসংলগ্ন পাশাপাশি তিন-চারিখানি ছোট ছোট কুঠরি রন্ধন ও ভাঁড়ারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ঐ ঘরগুলির সম্মুখে উদ্যানপথের অপর পার্শ্বে, একখানি দ্বিতল বাসবাটী; উহার নীচে চারখানি ও উপরে দুইখানি ঘর ছিল। নিম্নের ঘরগুলির ভিতর মধ্যভাগের ঘরখানিই প্রশস্ত হলের ন্যায় ছিল। উহার উত্তরে পাশাপাশি দুইখানি ছোট ঘর, তন্মধ্যে পশ্চিমের ঘরখানি হইতে কাষ্ঠ-

নির্মিত সোপানপরম্পরায় দ্বিতলে উঠা যাইত এবং পূর্বের ঘরখানি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। পূর্বপশ্চিমে বিস্তৃত পূর্বোক্ত প্রশস্ত হলঘর ও তাহার দক্ষিণের ঘরখানি···সেবক ও ভক্তগণের শয়ন-উপবেশ-নাদির নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। নিম্নের হলঘরখানির উপরে দ্বিতলে সমপরিসর একখানি ঘর, উহাতেই ঠাকুর থাকিতেন। উহার দক্ষিণে, প্রাচীরবেষ্টিত স্বল্পপরিসর ছাদ, উহাতে ঠাকুর কখন কখন পাদচারণ ও উপবেশন করিতেন; এবং উত্তরে,···শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিমিত্ত নির্দিষ্ট ঘরখানির উপরে অবস্থিত সমপরিসর একখানি ক্ষুদ্র ঘর, উহা ঠাকুরের স্নানাদির এবং দুইএক জন সেবকের রাত্রিবাসের জন্য ব্যবহৃত হইত।

"বসতবাটীর পূর্বে ও পশ্চিমে কয়েকটি সোপান বাহিয়া নিম্নের হলঘরে প্রবেশ করা যাইত এবং উহার চতুর্দিকে ইষ্টকনির্মিত সুন্দর উদ্যানপথ প্রায় গোলাকারে প্রসারিত ছিল।···বসতবাটীর পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র ডোবা ছিল। ···উদ্যানের উত্তরপূর্ব কোণে উক্ত ডোবা অপেক্ষা একটি চারিপাঁচ গুণ বড় ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ও তাহার উত্তরপশ্চিম কোণে দুইতিনখানি একতলা ঘর ছিল।···উদ্যানের অন্য সর্বত্র আম্র, পনস, লিচু প্রভৃতি ফলবৃক্ষসমূহ ও উদ্যানপথসকলের উভয় পার্শ্ব পুষ্পবৃক্ষরাজিতে শোভিত ছিল···। আবার, বৃহৎ বৃক্ষসকলের অন্তরালে মধ্যে মধ্যে শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড বিদ্যমান থাকিয়া উদ্যানের রমণীয়ত্ব অধিকতর বর্ধিত করিয়াছিল।

"এই উদ্যানেই ঠাকুর অগ্রহায়ণের শেষে আগমনপূর্বক সন ১২৯১ সালের শীত ও বসন্তকাল এবং সন ১২৯২ সালের গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতু অতিবাহিত করিয়াছিলেন।"

"···উদ্যানের মুক্তবায়ুতে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি প্রফুল্ল হইয়া উহার চারিদিক লক্ষ্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আবার, দ্বিতলে তাঁহার বাসের জন্য নির্দিষ্ট প্রশস্ত ঘরখানিতে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে তিনি উহার দক্ষিণে অবস্থিত ছাদে উপস্থিত হইয়া···কিছুক্ষণ উদ্যানের শোভা নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। শ্যামপুকুরের বাটীতে যেরূপ রুদ্ধ সঙ্কুচিত ভাবে থাকিতে হইয়াছিল এখানে সেইভাবে থাকিতে হইবে না অথচ ঠাকুরের

সেবা পূর্বের স্থায়ই করিতে পারিবেন এই কথা ভাবিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও যে আনন্দিতা হইয়াছিলেন ইহা বুঝিতে পারা যায়। অতএব তাঁহাদিগের উভয়ের আনন্দে সেবকগণের মন প্রফুল্ল হইয়াছিল একথাও বলা বাহুল্য।

"উদ্যানবাটীতে...উপস্থিত হইয়া যেসকল ক্ষুদ্রবৃহৎ অসুবিধা প্রথম প্রথম নয়নগোচর হইতে লাগিল সেই সকল দূর করিতে কয়েকদিন কাটিয়া গেল।...নরেন্দ্রনাথ সহজেই বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুরের সেবার দায়িত্ব যাঁহারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের ও চিকিৎসকগণের আবাস হইতে দূরে অবস্থিত এই উদ্যানবাটীতে থাকিতে হইলে লোকবল এবং অর্থবল উভয়েরই পূর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন।...বলরাম, সুরেন্দ্র, রাম, গিরিশ, মহেন্দ্র প্রভৃতি যাঁহারা অর্থবলের কথা এপর্যন্ত চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা ঐবিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন এক উপায় নিশ্চয় স্থির করিবেন। কিন্তু লোকবলসংগ্রহে তাঁহাকেই ইতিপূর্বে চেষ্টা করিতে হইয়াছে এবং এখনও হইবে। ঐজন্য কাশীপুর উদ্যানে এখন হইতে তাঁহাকে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে হইবে।...

"...প্রশ্ন হইতে পারে, দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে যাঁহাকে আমরা বেদবেদান্তের পারের তত্ত্বসকলের সাক্ষাৎ উপলব্ধির সহিত একযোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৈনন্দিন বিষয়সকলে, এবং প্রত্যেক ভক্তের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে দেখিয়াছি সেই ঠাকুর কি এইকালে নিজ সম্বন্ধে কোন চিন্তা না করিয়া সকল বিষয়ে সর্বদা ভক্তগণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন? উত্তরে বলিতে হয়, তিনি চিরকাল যাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন সেই জগন্মাতার উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ ও একান্ত নির্ভর করিয়া এখনও ছিলেন, এবং ভক্তগণের প্রত্যেকের নিকট হইতে যে প্রকারের যতটুকু সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা লওয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার অভিপ্রেত ও তাহাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত—একথা পূর্ব হইতে জানিয়াই লইতেছিলেন...

"আবার ভক্তগণকৃত যেসকল বন্দোবস্ত তাঁহার মনঃপূত হইত না সেই সকল তিনি তাহাদিগের জ্ঞাতসারে এবং যেখানে বুঝিতেন তাহারা মনে কষ্ট পাইবে সেখানে অজ্ঞাতসারে পরিবর্তন করিয়া লইতেন। চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আসিবার কালে ঐজন্য বলরামকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, 'দেখ, দশজনে চাঁদা করিয়া আমার দৈনন্দিন ভোজনের বন্দোবস্ত করিবে এটা আমার নিতান্ত রুচিবিরুদ্ধ, কারণ কখন ঐরূপ করি নাই।...চিকিৎসার জন্য যতদিন দক্ষিণেশ্বরের বাহিরে থাকিব ততদিন আমার খাবারের খরচটা তুমিই দিও।' ঐরূপে কাশীপুরের উদ্যানবাটী যখন তাঁহার নিমিত্ত ভাড়া লওয়া হইল তখন উহার মাসিক ভাড়া অনেক টাকা জানিতে পারিয়া ...পরমভক্ত সুরেন্দ্রনাথকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ সুরেন্দর, এরা সব কেরাণী মেরাণী ছাপোষা লোক, এরা অত টাকা চাঁদায় তুলিতে কেমন করিয়া পারিবে, অতএব ভাড়ার টাকাটা সব তুমিই দিও। সুরেন্দ্রনাথও করজোড়ে 'যাহা আজ্ঞা' বলিয়া...সানন্দে স্বীকৃত হইলেন।...একদিন তিনি দুর্বলতার জন্য গৃহের বাহিরে শৌচাদি করিতে যাওয়া শীঘ্র অসম্ভব হইবে আমাদিগকে বলিতেছিলেন। যুবক ভক্ত লাটু...ঐকথায় ব্যথিত হইয়া সহসা করজোড়ে সরলগম্ভীরভাবে 'যে আজ্ঞা মশায়, হামি ত আপনকার মেস্তর (মেথর) হাজির আসি' বলিয়া তাঁহাকে ও আমাদিগকে দুঃখের ভিতরেও হাসাইয়াছিল।...

"ক্রমে...যুবক ভক্তেরা সকলেই এখানে একে একে উপস্থিত হইল। ঠাকুরের সেবাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে নরেন্দ্র তাহাদিগকে ধ্যান, ভজন, পাঠ, সদালাপ, শাস্ত্রচর্চা ইত্যাদিতে এমনভাবে নিযুক্ত রাখিতে লাগিলেন যে, পরম আনন্দে কোথা দিয়া দিনের পর দিন যাইতে লাগিল তাহা তাহাদিগের বোধগম্য হইল না। একদিকে ঠাকুরের শুদ্ধ নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রবল আকর্ষণ, অন্যদিকে নরেন্দ্রনাথের অপূর্ব সখ্যভাব ও উন্নত সঙ্গ একত্র মিলিত হইয়া তাহাদিগকে...এমন এক মধুর বন্ধনে আবদ্ধ করিল যে, একপরিবার মধ্যগত ব্যক্তিসকল অপেক্ষাও তাহারা পরস্পরকে আপনার বলিয়া সত্য সত্য জ্ঞান করিতে লাগিল।...শেষ পর্যন্ত এখানে

থাকিয়া যাহারা সংসারত্যাগে সেবাব্রতের উদ্‌যাপন করিয়াছিল সংখ্যায় তাহারা দ্বাদশ জনের অধিক না হইলেও প্রত্যেকে গুরুগতপ্রাণ এবং অসামান্য কর্মকুশল ছিল।*

"কাশীপুরে আসিবার কয়েকদিন মধ্যেই ঠাকুর একদিন উপর হইতে নীচে নামিয়া বাটীর চতুষ্পার্শ্বস্থ উদ্যানপথে অল্পক্ষণ পাদচারণ করিয়াছিলেন। ...ভক্তগণ উহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু...ঠাণ্ডা লাগিয়া বা অন্য কারণে পরদিন অধিকতর দুর্বল বোধ করায় কিছুদিন পর্যন্ত আর ঐরূপ করিতে পারেন নাই। শৈত্যের ভাবটা দুইতিন দিনেই কাটিয়া যাইল, কিন্তু দুর্বলতাবোধ দূর না হওয়ায় ডাক্তারেরা তাঁহাকে কচি পাঁঠার মাংসের সুরুয়া খাইতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। উহা ব্যবহারে...তিনি পূর্বাপেক্ষা সুস্থ বোধ করিয়াছিলেন। ঐরূপে এখানে আসিয়া কিঞ্চিদধিক একপক্ষ কাল পর্যন্ত তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়।...

"ঠাকুরের স্বাস্থ্যের সংবাদ চিকিৎসককে প্রদান করিতে এবং পথ্যের জন্য মাংস আনিতে যুবক সেবকদিগকে নিত্য কলিকাতা যাইতে হইত। একজনের উপরে উক্ত দুই কার্যের ভার প্রথমে অর্পণ করা হইয়াছিল। তাহাতে প্রায়ই বিশেষ অসুবিধা হইতে দেখিয়া...নিয়ম করা হইয়াছিল,... ঐ দুই কার্যের জন্য দুইজনকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। কলিকাতায় অন্য কোন প্রয়োজন থাকিলে ঐ দুইজন ভিন্ন অপর এক ব্যক্তি যাইবে। তদ্ভিন্ন বাটী ঘর পরিষ্কার রাখা, বরাহনগর হইতে নিত্য বাজার করিয়া আনা, দিবাভাগে ও রাত্রে ঠাকুরের নিকটে থাকিয়া তাঁহার আবশ্যকীয়

*...ঐ দ্বাদশ জনের নাম এখানে দেওয়া গেল। যথা নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, লাটু, তারক, গোপালদাদা (যুবক ভক্তদিগের মধ্যে ইনিই একমাত্র বৃদ্ধ ছিলেন), কালী, শশী, শরৎ এবং ছোট গোপাল। সারদা পিতার নির্যাতনে মধ্যে মধ্যে আসিয়া দুই এক দিন মাত্র থাকিতে সমর্থ হইত। সুবোধের কয়েকদিন আসিবার পর গৃহে ফিরিয়া মস্তিষ্কের বিকার জন্মে। হরি, তুলসী ও গঙ্গাধর বাটীতে থাকিয়া তপস্যা ও মধ্যে মধ্যে আসাযাওয়া করিত।...

সকল বিষয় করিয়া দেওয়া প্রভৃতি সকল কার্য পালাক্রমে যুবক ভক্তেরা সম্পাদন করিতে লাগিল; এবং নরেন্দ্রনাথ তাহাদিগের প্রত্যেকের কার্যের তত্ত্বাবধানে এবং সহসা উপস্থিত বিষয়সকলের বন্দোবস্ত করিতে নিযুক্ত রহিলেন।

"ঠাকুরের পথ্য প্রস্তুত করিবার ভার কিন্তু পূর্বের ন্যায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর হস্তেই রহিল।...বিশেষ কোনরূপ খাদ্য ঠাকুরের জন্য ব্যবস্থা করিলে চিকিৎসকের নিকট হইতে উহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া গোপালদাদাপ্রমুখ দুইএক জন...যাইয়া তাঁহাকে উক্ত প্রণালীতে পাক করিতে বুঝাইয়া দিত। ...শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী মধ্যাহ্নের কিছু পূর্বে এবং সন্ধ্যার কিছু পরে ঠাকুর যাহা আহার করিতেন তাহা স্বয়ং যাইয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়া আসিতেন।...তাঁহাকে সহায়তা করিতে এবং তাঁহার সঙ্গিনীর অভাব দূর করিবার জন্য ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীকে এই সময়ে আনাইয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকটে রাখা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে যাঁহারা সবদা যাতায়াত করিতেন সেই সকল স্ত্রীভক্তগণের কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত কয়েক ঘণ্টা হইতে কখন কখন দুইএক দিবস পর্যন্ত থাকিয়া যাইতে লাগিলেন।...

"গৃহী ভক্তেরাও ঐকালে নিশ্চিন্ত রহেন নাই। কিন্তু রামচন্দ্র অথবা গিরিশচন্দ্রের বাটীতে সুবিধামত সম্মিলিত হইয়া ঠাকুরের সেবায় কে কোন্ বিষয়ে কতটা অবসরকাল কাটাইতে এবং অর্থসাহায্য প্রদান করিতে পারিবেন তাহা স্থির করিয়া তদনুসারে কার্য করিতে লাগিলেন।...তাঁহারা প্রতি মাসেই দুইএকবার ঐরূপে একত্র মিলিত হইয়া সকল বিষয় পূর্ব হইতে স্থির করিবার সংকল্পও এই সময়ে করিয়াছিলেন।

"যুবক ভক্তদিগের অনেকেই সকল কার্যের শৃঙ্খলা না হওয়া পর্যন্ত নিজ নিজ বাটীতে স্বল্পকালের জন্যও গমন করে নাই। নিতান্ত আবশ্যকে যাহাদিগকে যাইতে হইয়াছিল তাহারা কয়েক ঘণ্টা বাদেই ফিরিয়াছিল, এবং বাটীতে সংবাদটাও কোনরূপে দিয়াছিল যে, ঠাকুর সুস্থ না হওয়া

পর্যন্ত তাহারা পূর্বের ন্যায় নিয়মিতভাবে বাটীতে আসিতে ও থাকিতে পারিবে না।...”

“কলিকাতার বহুবাজার-পল্লীনিবাসী...রাজেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আলোচনায় ও উহা শহরে প্রচলনে ইতিপূর্বে যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছিলেন।...মহেন্দ্রলাল সরকার ইহার সহিত মিলিত হইয়াই...ঐ প্রণালী অবলম্বনে চিকিৎসায় অগ্রসর হইয়াছিলেন।...গিরিশচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণের সহিত ইনি পরিচিত ছিলেন।...অতুলকৃষ্ণকে একদিন এই সময়ে...দেখিতে পাইয়া তিনি সহসা ঠাকুরের শারীরিক অসুস্থতার কথা জিজ্ঞাসা পূর্বক তাঁহাকে চিকিৎসা করিবার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং বলেন, ‘মহেন্দ্রকে বলিও আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা ঔষধ নির্বাচন করিয়া রাখিয়াছি, সেইটা প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাইবার আশা রাখি, তাহার মত থাকিলে সেইটা আমি একবার দিয়া দেখি।’...উহাতে কাহারও আপত্তি না হওয়ায়...রাজেন্দ্রবাবু ঠাকুরকে দেখিতে আসেন এবং...লাইকোপোডিয়াম (২০০) প্রয়োগ করেন। ঠাকুর উহাতে একপক্ষের অধিককাল বিশেষ উপকার অনুভব করিয়াছিলেন। ভক্তগণের উহাতে মনে হইয়াছিল, তিনি বোধ হয় এইবার অল্পদিনেই পূর্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিবেন। ক্রমে পৌষমাসের অর্ধেক অতীত হইয়া ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী [১৮ই পৌষ] উপস্থিত হইল।”

প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল, শুন বিবরণ।
হাটেতে ভাঙ্গিব হাঁড়ি যাইব যখন॥
সেই হাঁড়িভাঙ্গা-রঙ্গ আজিকার দিনে।

“পূর্ব সপ্তাহে তাঁহার কোন সেবক [রাম] হরিশ মুস্তফীর পরিত্রাণের জন্য পরমহংসদেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সে দিবস তিনি কোন উত্তর দেন নাই। ১লা জানুয়ারীর দিন হরিশবাবু পরমহংসদেবের নিকটে গমন করিবামাত্র তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। হরিশ আনন্দে উন্মত্তের ন্যায়

অশ্রুপূর্ণলোচনে নিম্নে আসিয়া উপরোক্ত সেবককে কহিলেন, 'ভাই রে, আমার আনন্দ যে ধরে না! এ কি ব্যাপার! জীবনে এমন ঘটনা একদিনও দেখি নাই।' সেবকের চক্ষেও জল আসিল। ··

"সকল ভক্তগণ একত্র বসিয়া আছেন, এমন সময়ে পরমহংসদেব দেবেন্দ্রকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। দেবেন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, 'পরমহংসদেব বলিলেন, রাম কেন আমায় অবতার বলে, এ কথাটা তোমরা স্থির কর দেখি। কেশবকে তাহার শিষ্যেরা অবতার বলিত।'··· অপরাহ্নকালে ভক্তেরা বাগানে বেড়াইতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন যে, পরমহংসদেব সেই দিকে আসিতেছেন।···সেইদিনকার রূপের কথা স্মরণ হইলে আমরা এখনও আশ্চর্য হইয়া থাকি। তাঁহার সর্বশরীর বস্ত্রাবৃত এবং মস্তকে সবুজ বনাতের কানঢাকা টুপি ছিল, কেবল মুখমণ্ডলের জ্যোতিতে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইয়াছিল। মুখের যে অত শোভা হইতে পারে তাহা কাহারও জ্ঞান ছিল না। সেই রূপ আর একদিন ইতিপূর্বে নবগোপাল ঘোষের বাটীতে সংকীর্তনের সময় দেখা গিয়াছিল।" [জীবনবৃত্তান্ত]

লীলাপ্রসঙ্গকার লিখিয়াছেনঃ "৩টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর লালপেড়ে ধুতি, একটি পিরান, লালপাড়-বসান একখানি মোটা চাদর, কানঢাকা টুপি ও চটিজুতাটি পরিয়া স্বামী অদ্ভুতানন্দের সহিত···ধীরে ধীরে নীচে নামিলেন এবং...পশ্চিমের দরজা দিয়া বাগানের পথে বেড়াইতে চলিলেন। গৃহী ভক্তেরা কেহ কেহ···সানন্দে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন।···শ্রীযুক্ত লাটু তাঁহাদিগকে ঐরূপে যাইতে দেখিয়া··· ক্ষুদ্র পুষ্করিণীটির দক্ষিণ পাড় পর্যন্ত আসিয়াই ফিরিলেন এবং অপর একজন যুবক ভক্তকে [শরচ্চন্দ্রকে] ডাকিয়া লইয়া ঠাকুর উপরে যে ঘরটিতে থাকেন সেটি ঝাঁটপাট দিয়া পরিষ্কার করিতে ও ঠাকুরের বিছানা প্রভৃতি রৌদ্রে দিতে ব্যাপৃত হইলেন।

"গৃহী ভক্তগণের ভিতর শ্রীযুত গিরিশের তখন প্রবল অনুরাগ। ঠাকুর···বলিয়াছিলেন, 'গিরিশের পাঁচসিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস···।' বিশ্বাস-

ভক্তির প্রবল প্রেরণায় গিরিশ তখন হইতে ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ভগবান—জীবোদ্ধারের জন্য কৃপায় অবতীর্ণ বলিয়া অনুক্ষণ দেখিতেন এবং ঠাকুর তাঁহাকে নিষেধ করিলেও তাঁহার ঐ ধারণা সকলের নিকট প্রকাশ্যে বলিয়া বেড়াইতেন। গিরিশও সেদিন বাগানে উপস্থিত আছেন এবং শ্রীযুত রাম-প্রমুখ অন্য কয়েকটি গৃহী ভক্তের সহিত একটি আমগাছের তলায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন।

"ঠাকুর···বাগানের গেটের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে··· শ্রীযুত রাম ও শ্রীযুত গিরিশকে দেখিতে পাইলেন এবং গিরিশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'গিরিশ, তুমি কী দেখেছ (আমার সম্বন্ধে) যে অত কথা যাকে তাকে বলে বেড়াও?' সহসা ঐরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়াও গিরিশের বিশ্বাস টলিল না। তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া রাস্তার উপরে আসিয়া ঠাকুরের পদতলে জানু পাতিয়া করজোড়ে উপবিষ্ট হইলেন এবং গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন, 'ব্যাস বাল্মীকি যাঁহার কথা বলিয়া অন্ত করিতে পারেন নাই, আমি তাঁহার সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিতে পারি!'···ঠাকুরের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল,···তিনি সমাধিস্থ হইলেন। গিরিশও তখন·· উল্লাসে চীৎকার করিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া বারবার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

"···ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশায় হাস্যমুখে উপস্থিত সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'তোমাদের কি আর বলিব, তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক।' ভক্তেরা সে অভয়বাণী শুনিয়া তখন আনন্দে জয়-জয় রব করিয়া কেহ প্রণাম, কেহ পুষ্পবর্ষণ, এবং কেহ বা আসিয়া তাঁহার পদস্পর্শ করিতে লাগিলেন। প্রথম ব্যক্তি পদস্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান হইবামাত্র ঠাকুর তাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া নীচের দিক হইতে উপরদিকে হস্ত সঞ্চালিত করিয়া বলিলেন, 'চৈতন্য হোক!' দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিয়া প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র তাহাকেও ঐরূপ করিলেন। তৃতীয় ব্যক্তিকেও ঐরূপ। চতুর্থকেও ঐরূপ। এইরূপে সমাগত ভক্তদিগের সকলকে একে একে ঐরূপে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। আর···প্রত্যেকের ভিতর অপূর্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া

কেহ হাসিতে, কেহ কাঁদিতে, কেহ বা ধ্যান করিতে, আবার কেহ বা নিজে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া অহেতুক-দয়ানিধি ঠাকুরের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইবার জন্য অপর সকলকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সে চীৎকার ও জয়রবে ত্যাগী ভক্তেরা কেহ নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, কেহ বা হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখেন, উদ্যানপথমধ্যে সকলে ঠাকুরকে ঘিরিয়া ঐরূপ পাগলের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন এবং দেখিয়াই বুঝিলেন, দক্ষিণেশ্বরে বিশেষ বিশেষ ভক্তের প্রতি কৃপায় ঠাকুরের দিব্যভাবাবেশে যে অদৃষ্টপূর্ব লীলার অভিনয় হইত তাহারই অদ্য এখানে সকলের প্রতি কৃপায় সকলকে লইয়া প্রকাশ! ত্যাগী ভক্তেরা আসিতে আসিতেই ঠাকুরের···সাধারণ সহজ ভাব উপস্থিত হইল। পরে গৃহী ভক্তদিগের অনেককে···জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল,—কাহারও সিদ্ধির নেশার মত একটা নেশা ও আনন্দ; কাহারও চক্ষু মুদ্রিত করিবামাত্র যে মূর্তির নিত্য ধ্যান করিতেন অথচ দর্শন পাইতেন না, ভিতরে সেই মূর্তির জাজ্বল্যমান দর্শন; কাহারও ভিতরে পূর্বে অননুভূত একটা পদার্থ বা শক্তি যেন সড়সড় করিয়া উপরে উঠিতেছে এইরূপ বোধ ও আনন্দ এবং কাহারও বা পূর্বে যাহা কখনও দেখেন নাই এরূপ একটা জ্যোতির চক্ষু মুদ্রিত করিলেই দর্শন ও আনন্দানুভব হইয়াছিল। ···একটা অসাধারণ দিব্য আনন্দে ভরপূর হইয়া যাইবার অনুভবটি সকলের সাধারণ প্রত্যক্ষ—একথাটি বেশ বুঝা গিয়াছিল।···

"··· যেসকল ব্যক্তি অদ্য তাঁহার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছিল তাহাদিগের ভিতর [বেলিয়াঘাটানিবাসী] হারাণচন্দ্র দাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। কারণ, হারাণ প্রণাম করিবামাত্র ভাবাবিষ্ট ঠাকুর তাহার মস্তকে নিজ পাদপদ্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐরূপে কৃপা করিতে আমরা তাঁহাকে অল্পই দেখিয়াছি।"

পুঁথিকার লিখিয়াছেন :

আমরা ক-জনে ছিনু গাছের উপর।
খেলিতেছিলাম ডালে বানর-বানর॥

দ্রুতপদে উপনীত হইনু সে ঠাঁই।
সভক্তে বিহরে যেথা জগত-গোসাঁই ॥
দাঁড়াইনু একধারে প্রভুর পশ্চাতে ;
অহরিয়া চাঁপা দুটি ছিল দুই হাতে ॥
... ...
... ... লীলার ঈশ্বর।
দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ পথের উপর ॥
পদপ্রান্তে গিয়া মুই এমন সময়ে।
তোলা দুটি চাঁপা ফুল দিনু দুটি পায়ে ॥
... ...
দূরে থেকে সম্ভাবিয়া কিগো বলি মোরে।
পরশিয়া হস্ত দিলা বক্ষের উপরে ॥
কানে কিবা বলিলেন আছয়ে স্মরণে।
মহামন্ত্র বাক্য তাই রাখিনু গোপনে ॥
কি দেখিনু কি শুনিনু নহে কহিবার।
মনোরথ পূর্ণ আজি হইল আমার ॥
... ...
শ্রীনবগোপালে কৃপা হৈল তারপর।
আজি কল্পতরুরূপ লীলার ঈশ্বর ॥
উপেন্দ্র মজুমদারে করি পরশন।
লোহার তাঁহার তনু করিলা কাঞ্চন
পরে কৃপা হৈল ভ্রাতৃপুত্র রামলালে
পরে গিরিশের ভাই অতুল অতুলে ॥
এসময়ে ভক্তবৃন্দ উন্মত্ত হইয়া।
করে আনন্দের ধ্বনি শূন্য বিভেদিয়া ॥
বিশেষতঃ রামচন্দ্র ভক্ত মহাবলী।
শ্রীচরণে দেন ফুল অঞ্জলি অঞ্জলি ॥
... ...
এখানে গিরিশচন্দ্র উন্মত্ত অধিক।
কে কোথা খুঁজিতে দ্রুত ছুটে চারিদিক ॥

পাকশালে গিয়া দেখে রাঁধুনী ব্রাহ্মণ।
রুটি বেলিবার তরে করে উপক্রম ॥
উপাধি গাঙ্গুলী তাঁর নাম নাহি জানি।
গিরিশ আসিতে তাঁরে করে টানাটানি ॥
ভাগ্যবান শ্রীগোচরে হইল আগত।
পাইল প্রভুর কৃপা আশার অতীত ॥
রাশি রাশি কৃপা ঢালি প্রভু ভগবান।
উপরে দ্বিতলভাগে কারলা পয়ান ॥
নিম্নতলে ভক্তদের আনন্দের মেলা।
এখানে শ্রীঅঙ্গে উঠে নিদারুণ জ্বালা ॥

... ...

সন্নিকটে রামলালে কন প্রভুরায়।
শালাদের পাপ লয়ে অঙ্গ জলে যায় ॥
করেছে কতই পাপ কিছু নাহি বাকি।
দে রে এনে গঙ্গাজল সর্ব অঙ্গে মাখি ॥
গঙ্গাজলে অঙ্গখানি করিলে মোক্ষণ।
তবে না হইল পরে জ্বালা নিবারণ ॥

দয়াময় ঠাকুর

কাশীপুর উদ্যানবাটী ঠাকুরের অন্ত্যলীলার স্থান। অন্ত্যলীলা—আত্মবিসর্জনের লীলা। জীবপ্রেমে দেহধারণ করিয়া বাল্যে ও কৈশোরে তিনি বৃন্দাবনলীলার পুনরভিনয় করিলেন কামারপুকুরে, ভাবুক ভক্তগণের অনুধ্যানের জন্য; যৌবনে দ্বাদশ বৎসর সাধনলীলায় মগ্ন হইয়া রহিলেন দক্ষিণেশ্বরে, সকল ধর্মের সত্যতা প্রমাণ ও সকলপ্রকার সাধনপথে শক্তি-সঞ্চার করিবার জন্য এবং সর্বভাবসমন্বিত যুগধর্ম দান করিয়া ধর্মবিবাদ-ভঞ্জন ও ধর্মপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য। দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যপীঠেই তাঁহার ধর্মদানরূপ মহাযজ্ঞের আরম্ভ ও বহুকালব্যাপী অনুষ্ঠান। সেই মহাযজ্ঞের অনির্বাণ অগ্নি সঙ্গে লইয়াই তিনি আসিলেন কলিকাতায়, শ্যামপুকুরে। অবশেষে সেই অগ্নি সঞ্চারিত করিলেন চিহ্নিত লীলাসহচরগণের বুকে বুকে, কাশীপুরে।

একই দিনে অনেকগুলি সংসারভীরু ও সাধনভজনে অপারগ ভক্তের দুষ্কর্মের ভোগ নিজাঙ্গে গ্রহণ করিয়া ঠাকুর তাঁহার অন্ত্যলীলারই সূচনা করিয়াছিলেন, যদিও অনেকেই তখন তাহা বুঝিতে পারেন নাই। একই সময়ে এতগুলি মানুষের জ্ঞানচৈতন্য লাভ ও তাহার ফলে জন্মমৃত্যু তরিয়া যাওয়া—চিরতরে অভয় হইয়া যাওয়া—আধ্যাত্মিক জগতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব না হইলেও ইহা এক সুদুর্লভ ঘটনা।

গিরিশচন্দ্র বলিয়াছেন: আমি শ্রীরামকৃষ্ণের পদাশ্রয় পাইবার চারি-পাঁচ দিন পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোর কী হইল?' আমি উত্তর করি, 'আমি আর কিছু ভয় করি না!' তিনি হাসিলেন।

তিনি আরও বলিয়াছেন: একদিন পরমহংসদেবের নিকট যাইয়া দেখি তিনি ঝরঝর করিয়া কাঁদিতেছেন ও বলিতেছেন, 'নিতাই আমার হেঁটে হেঁটে ঘরে ঘরে প্রেম দিয়েছিলেন; আমি কিন্তু গাড়ী না হলে চলতে পারি না!' আর এক সময়ে বলিয়াছিলেন, 'আমি সাগু খেয়েও পরের উপকার করব।' তিনি বলিতেন, 'আমি কোন জায়গায় আবদ্ধ নাই,

কেবল দয়া। সব গেছে, কেবল এক দয়া আছে।...যদি সহস্রবার জন্মগ্রহণ করে একজনের উদ্ধারসাধন করতে পারি তাহাও সার্থক বোধ করি।'

পুঁথিকার লিখিয়াছেন :

একদিন শ্রীমন্দিরে দয়াল ঠাকুর।
দুনয়নে বারিধারা কাঁদেন বসিয়া।
এই বলি তাপে তপ্ত জীবের লাগিয়া॥
কি হইল ওমা কালী, দেখ মম গায়।
সতত অস্থির, বল মাত্র নাহি তায়॥
চলিতে অসক্ত পদ—আদতে না চলে।
কোথা পাই, চাই যান কোথা যেতে হলে॥
কেবা দিবে গাড়ীভাড়া নিত্যই আমায়।
জীবের কল্যাণে বড় পড়িলাম দায়॥
নদীয়ায় গৌরচন্দ্র বীর বলবান।
দ্বারে দ্বারে ফিরে কৈলা জীবের কল্যাণ॥
বায়কুণ্ঠ জীবকুল আসক্ত কাঞ্চনে।
কড়া-বায়ে ঘোড়া যায় এই ভাবে মনে॥

গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন : একদিন পরমহংসদেব আমায় বলেন যে, মাড়োয়ারীরা তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতে আসিয়াছিল। 'বলে—টাকা দিতেছি, আপনি ভাণ্ডারা খুলুন, এ টাকা ত আপনার নিমিত্ত নিতেছেন না, তবে আপত্তি কি? আমি বল্লুম,—না।' আমি বুদ্ধিমান, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয়, এতে আপত্তি কি?' তিনি ভঙ্গী করিয়া বলিলেন—যে ভঙ্গী তাঁহাতেই দেখিয়াছি, যে ভঙ্গী আর দেখি নাই, দেখিবও না, যে ভঙ্গী অনন্ত কালস্রোতে কেহ কখন দেখে নাই—ভঙ্গীর সহিত (সে মনোহর ভঙ্গী এখনও চিত্তে অঙ্কিত রহিয়াছে) পরমহংসদেব বলিলেন, 'ও মনে পড়বেক, আবার আসতে হবেক।' যে মহাত্মা জীবের দুঃখে কাতর হইয়া শতশত জন্মগ্রহণে কৃতসংকল্প, সুকর্মফলভোগের নিমিত্ত তাঁহাকে দেহধারণে কুণ্ঠিত দেখিলাম।

রসিক দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে মেথরের কাজ করিত, অন্য কোথাও সে কাজ করিত না। ঠাকুরের উপর ছিল তাহার অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি। ঠাকুরকে সে 'বাবা' সম্বোধন করিত। একদিন সকালে রসিক যখন পঞ্চবটীর কাছে ঝাঁট দিতেছিল ঠাকুর বেড়াইতে বেড়াইতে সেইদিকে আসিলেন—পায়ে চটিজুতা, খালি গা, কোঁচার খুঁটটি কাঁধে ফেলা। ভূলুণ্ঠিত হইয়া রসিক তাঁহাকে প্রণাম করিল ও কাঁদিতে কাঁদিতে করজোড়ে কহিল, 'বাবা, শেষদিনে আমায় কৃপা করতে হবে।' ঠাকুর তাহাকে অভয় দিয়া চলিয়া গেলেন।

রসিকের অন্তিম সময়ের কথায় রামলাল বলিয়াছেন,—পরিবারকে সে তুলসীতলায় বিছানা করিয়া দিতে বলিয়াছিল ও সেই বিছানায় শুইয়া বলিয়া উঠিয়াছিল, 'আহা! দেখ দেখ ঐ আমার বাবা এসেচেন, আমায় ডাকচেন; বাবা, এস এস।'

দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ঠাকুর একদিন ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে আসিয়া দেখা দিলেন, একটি ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়া।

> ক্ষীণ মৃদু মন্দস্বরে কহেন বচন।
> বাসনা, পরমহংসদেবে-দরশন॥
> ... ...
> কোথা তিনি, আসিয়াছি তাঁরে দেখিবারে।
> বলিতে বলিতে দ্বিজ পশিল দুয়ারে॥

ব্রাহ্মণের প্রকৃতি বিনয়নম্র; গলার স্বরে তাঁহার অন্তরের দীনতা ফুটিয়া উঠিতেছিল। ঠাকুর তখন খাটে বসিয়া ছিলেন, একটি ভক্ত তাঁহাকে দেখাইয়া দিলে ব্রাহ্মণ ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া যুক্তকরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহাকে বসিতে বলিয়া—ঠাকুরের আদেশে কেহ একটি মাদুর পাতিয়া দিয়াছিলেন—

> অন্তরনিবাসী প্রভু পরম-ঈশ্বর।
> পাতি পাতি করি পাঠ দ্বিজের অন্তর॥
> বুঝিলেন ভবভয়ে ভয়ার্ত ব্রাহ্মণ।
> পরিত্রাণহেতু মাগে চরণে শরণ॥

ব্রাহ্মণের সমগ্র জীবন গিয়াছে কেবলই নানা বিষয়কর্ম করিয়া; প্রকাণ্ড এক সংসার তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে হইত। শেষের দিন ঘনাইয়া আসিতেছে দেখিয়া তিনি চিন্তাকুল হইয়াছেন; পরকালের কাজ করিবার শক্তি তাঁহার নাই, সময়ও নাই। এখন উপায় কী? পরমহংসদেবের কাছে গেলে উপায় হইবে, কেহ তাঁহাকে বলিয়াছিল।

মাদুরে উপবেশন করিয়া ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করিলেন: এই দুইজনের মধ্যে প্রভেদ কী?—একজন নানা পুণ্যকর্ম করিয়া জীবন কাটায়, তপজপ করে, কর্মেই তাহার মতি, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে মনের যোগ নাই; আর একজন বহুপরিবারী, ফেরেববাজি করিয়া সংসার নির্বাহ করে, কিন্তু মনের আগুনে রাতদিন পুড়িয়া মরে ও সংগোপনে শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া কাঁদে।

এমন সময়ে কন প্রভু অন্তর্যামী।
যে কাঁদে হরির তরে সেইজন তুমি॥

এই কথা শুনিবামাত্র ব্রাহ্মণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন ও কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার উদ্ধারের উপায় কী হইবে জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুর কহিলেন: ঈশ্বর পরম দয়ালু। সারাজীবন অবিদ্যাসেবা করিয়াও মৃত্যুর পূর্বে কেহ যদি একবারও তাঁহাকে ঠিকঠিক ডাকে, কাতরপ্রাণে ত্রাণভিক্ষা করে তাঁহার কাছে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে আশ্রয়দান করেন— চরণতরী দিয়া ভবসিন্ধু পার করিয়া দেন।

শ্রীবাক্য ভরসাভরা এমনপ্রকার।
শুনিলে হতাশে হয় আশার সঞ্চার॥

... ...

ব্রাহ্মণে অভয় দিয়া প্রভু দয়াময়।
বলিলেন, ভবপারে না করিবে ভয়॥

... ...

আঁধার-কুটির হৃদি দেখিয়া উজ্জ্বল।
আনন্দে ব্রাহ্মণ ফেলে দুনয়নে জল॥
বারে বারে পদরেণু লইয়া প্রভুর।
ভবনে গমন কৈল ব্রাহ্মণঠাকুর॥

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে তখন এরূপ বন্দেজ ছিল যে, কাঙ্গালীরা ত্বপুরবেলা সেখানে প্রসাদান্ন খাইতে পাইত। একদিন এক জরাগ্রস্তা বুড়ী খাইবার আশা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসিতে না পারায় ফটকের দারোয়ান তাহাকে ভিতরে ঢুকিতে বারণ করিয়াছে। অনাথিনীর উদরে ক্ষুধার জ্বালা, সে বারণ না শুনিয়া মিনতি-সহকারে ভিতরে যাইবার চেষ্টা করিতেই দারোয়ান তাহার পিঠে এক থাপ্পড় বসাইয়া দিল। কাঙ্গালিনী কাঁদিয়া উঠিল ও সেই কান্নার শব্দ ঠাকুর শুনিতে পাইলেন ফটক হইতে দূরে নিজের ঘরে বসিয়া। খোঁজ নিয়া যখন তিনি ঘটনাটি জানিতে পারিলেন তখন—

দুনয়নে বারিধারা মাটি ভিজে পড়ে।
কি বিচার মা তোমার, কন উচ্চৈঃস্বরে॥
একপাতা অন্ন মাত্র, নহে কিছু আর।
তাহার কারণে দিলি পিঠেতে প্রহার॥
এই বলি ডাক ছাড়ি শোকের ভাষায়।
কাঁদিয়া অস্থিরতনু প্রভুদেবরায়॥
একি অমানুষী দয়া জীবত্বঃখাতুর।
জীবের অপেক্ষা বেশী যাতনা প্রভুর॥

দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুরকে দর্শন করিতে গিয়াছি ত্বপুরবেলা। আরও কয়েকজন ভক্ত উপস্থিত আছেন, একজনকে বলিলেন, এখনই একখানা গাড়ী ডেকে নিয়ে এস, কালীঘাট যাবো। ঠাকুর ব্যস্তসমস্ত হইয়া, বেটুয়া ও গামছা লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন; সঙ্গে আমরা তিনচারি জন। গাড়োয়ানকে খুব জোরে গাড়ী হাঁকাইতে বলিলেন ও গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। কালীঘাটে মায়ের মন্দিরের কাছে গাড়ী হইতে নামিয়া দ্রুতপদে আদি গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিলেন; আমরা তাঁহাকে অনুসরণ করিলাম। হাঁফাইতে হাঁফাইতে ঘাটে পৌঁছিয়া চারিদিকে চাহিয়া কী যেন খুঁজিতে লাগিলেন, এবং ঘাটের দক্ষিণপূর্ব কোণে একটা লোক সাদা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া বসিয়া আছে দেখিতে পাইয়া

নিমেষে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন ও এক টানে চাদর তুলিয়া, তাহার হাত হইতে একগাছি পাকা ধানীলঙ্কার মালা সজোরে ছিনাইয়া লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিলেন। সক্রোধে কহিলেন: তুমি না ব্রাহ্মণের ছেলে? ছি ছি, তোমার এই কাজ? উঠে যাও এখান থেকে। খবরদার, অমন কাজ আর কখনো কোরো না। তারপরে গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া ও হাতমুখ ধুইয়া মন্দিরে গিয়া মাকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন। ফিরিয়া যাইতে যাইতে কহিলেন: ঐ বামুনের সঙ্গে একজনের শত্রুতা থাকায় সে ধানীলঙ্কার মন্ত্রপূত মালা জপ করছিল, যাতে সেই লোকটি মৃত্যুসময়ে ভীষণ যন্ত্রণা পেয়ে মরে। মায়ের প্রসাদ পেয়ে ছোট খাটটিতে বসবার পরেই এটি দেখতে পাই। দেখ তো বামুনের কী হীন বুদ্ধি! 'ওগুনো সিদ্ধাই।' ঠাকুর আবার কহিলেন।[১]

রঙ্গমঞ্চে গিরিশের 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক অভিনীত হইবে, তিনি নিজে আসিয়া ঠাকুরকে আমন্ত্রণ করিলেন দেখিতে যাইবার জন্য। 'আমি আর রামলাল যাব আখুন', ঠাকুর কহিলেন। অভিনয় আরম্ভ হইবার বেশ কিছুক্ষণ আগেই তাঁহারা যথাস্থানে আসিলেন, কিন্তু এক অপ্রশস্ত পথে ভিতরে প্রবেশ করিতে গিয়া—সেই পথে সাধারণতঃ মেয়েরা যাতায়াত করে ও উহার ধারে কাছে নানা আবর্জনা—কিছুটা অসুবিধায় পড়িলেন। এমন সময় একটি স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইয়া ঠাকুর কহিলেন, 'ওগো, গিরিশকে একবার ডেকে দাও না; বলগে, দক্ষিণেশ্বর থেকে সব এসেচে।' গিরিশ আসিয়া ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন ও অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিলেন তাঁহার পায়ে মাথা রাখিয়া। 'থাক্ থাক্, হয়েচে, গিরিশ, উঠ গো উঠ।' ঠাকুর বলিতে লাগিলেন। গিরিশের জামার বুকে ময়লা লাগিয়া গিয়াছিল, 'আহা দেখ দিকিনি, এমন সাদা জামাটা নোংরা হয়ে গেল!' বলিতে বলিতে ঠাকুর নিজের হাতে ময়লা মুছিয়া দিলেন। গিরিশ তখন ঠাকুরকে উপরে লইয়া গিয়া ভাল জায়গায় বসাইলেন ও অভিনেত্রীদের

১ দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গপ্রাপ্ত উপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর নিকট হইতে প্রাপ্ত।

নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন সত্বর সেখানে চলিয়া আসিবার জন্য। অভিনেত্রীরা তখন অঙ্গসজ্জা করিতে ব্যস্ত ছিল, ডাকার চোটে ছুটিয়া আসিতেই গিরিশ কহিলেন, 'নে নে, শীগগির ঠাকুরের পায়ে লুটে পড়্, তোদের এমন সুযোগ আর হবে না।' তাহারা ভূলুণ্ঠিত হইয়া ও ঠাকুরের পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিতে থাকিলে সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন: 'থাক্ থাক্, মা আনন্দময়ীরা, হয়েচে, উঠ উঠ। তোমরা নেচে গেয়ে সর্বপ্রকারে জীবদের আনন্দ দিচ্চ; যাও মা, এইবার সাজগোজ করগে।'

গিরিশে রাখিয়া মঞ্চে, প্রভুর মহিমা—।
বেশ্যা লম্পটের মধ্যে ভক্তির সূচনা॥
... ...
করুণাবতার প্রভু, সকলে করুণা।
বিষয়ী লম্পট বেশ্যা কারে নাই ঘৃণা॥

গিরিশ লিখিয়াছেন: কোন নাট্যাধ্যক্ষ তাঁহার [ঠাকুরের] নিকট সন্ন্যাস চাওয়ায় তিনি তাহাকে রঙ্গালয়ের কার্য করিতে আদেশ দেন এবং উৎসাহ-প্রদানে বলেন, 'তুমি যে কার্য করিতেছ তাহাতে সাধারণের বিশেষ মঙ্গল।'।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে একটি কুকুরী থাকিত। কালবশে এক গণ্ডা শাবক প্রসব করিয়া সে মারা গেল ও মাতৃহারা শাবকগুলি অনাহারে এক অহোরাত্র পড়িয়া রহিল। পরদিন ঠাকুরকে সেইদিকে আসিতে দেখিয়া তাহারা ছুটিয়া আসিল ও তাঁহার পায়ে লুটাইয়া কাঁইকুঁই শব্দ করিতে লাগিল। শাবকগুলিকে আশ্বাস দিয়া ঠাকুর নিজের ঘরে চলিয়া আসিলেন ও ইহার কিছুক্ষণ পরেই একজন আসিয়া কহিল:

কুকুরী মরিয়া গেছে প্রসবিয়া ছানা।
আজি কিন্তু দেখি এক অদ্ভুত ঘটনা॥
অপর কুকুরী এক তাহার মতন।
তেমতি চেহারা মুখ কেমতি বরণ॥
আসিয়াছে কোথা হতে না জানি সন্ধান।
শাবকেরা করিতেছে দুগ্ধ তার পান॥

শুনিয়া বড়ই তুষ্ট প্রভুদেবরায়।
বলিলেন সব হয় শ্যামার ইচ্ছায়।[১]

বাচ্চাগুলির সহিত ঠাকুরের ঘরে আস্তানা গাড়িয়া একটি বিড়াল ঠাকুরের চিন্তার কারণ হইয়াছিল। উহাদের জন্য একটা নিরাপদ স্থান ও একটু মাছদুধের ব্যবস্থা কেমন করিয়া হইবে তিনি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী শ্রীমতী নিস্তারিণী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন, এবং ঠাকুরের ভাবনার কথা শুনিয়া আনন্দের সহিত উহাদিগকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যান। নিস্তারিণী বিড়াল ভালবাসিতেন।

কলিকাতার একটি লোক ঠাকুরকে বিদ্বেষ করিত ও সকলের কাছে তাঁহার নিন্দা করিয়া বেড়াইত। বরাবর সে এই কাজটি করিয়া আসিয়াছে অনলসভাবে। নিন্দা করিতে গিয়া তাহাকে ঠাকুরের নাম লইতে হইয়াছে, ঠাকুরকে চিন্তা করিতেও হইয়াছে। ইহাকে একপ্রকার উপাসনাও বলা যাইতে পারে—শত্রুভাবের ভজনা।

ফুলে ফুলকীট যেন, নিন্দুক লীলায় তেন, অবতারে লক্ষ্য অনুক্ষণ।
নিন্দায় বন্দনা গায়, যাহে তেঁহ সুখ পায়, শ্রীপ্রভুর স্বজন যেমন॥

---

১ ঠাকুর শৃগাল-কুকুরদিগকেও ভালবাসিতেন, তাহাদিগকে খাইতে দিতেন।

কখন লইয়া লুচি মিষ্টান্ন আপনে।
ডাকিতেন শিবানী বলিয়া শ্রীবদনে॥
মধুর প্রভুর স্বর শুনে কুতূহলী॥
নিকটে আসিত ছুটে শৃগাল-শৃগালী॥
অতি বৃদ্ধ কুকুর আছিল এক তাঁর।
দিতেন প্রসাদ নিত্য করিতে আহার॥

কুকুরটিকে ঠাকুর 'কাপ্তেন' নাম দিয়াছিলেন। সে প্রায়ই মা-কালীর মন্দিরের সম্মুখের চাতালে বসিয়া থাকিত। ঠাকুর কাপ্তেনকে ডাকিলেই সে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ে গড়াগড়ি দিত। ঠাকুর বলিতেন: এত যে কুকুর রয়েচে, কাপ্তেনের মত কেউ মায়ের সামনে বসে না; গঙ্গার ধাপে বসতে, গঙ্গাজল খেতে ওর মত কাকেও দেখি নি। কাপ্তেনটা শাপভ্রষ্ট, ওর পূর্বজন্মের সংস্কার যা ছিল তাই করচে এখানে এসে—ধন্য হয়ে গেল!

চিকিৎসার জন্য ঠাকুর যখন শ্যামপুকুরে, সেই সময়ে এই 'পাষণ্ডী'র পরমপ্রিয় পুত্রটি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হয়। কত ডাক্তার কবিরাজ বাড়ীতে আনিয়া ছেলেকে সে দেখাইল কিন্তু কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। পীড়ার প্রকোপ দিনে দিনে বাড়িয়া ছেলের দেহ জেরবার করিল, অসহ্য যন্ত্রণায় চাৎকার করিতে করিতে সে বিছানায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল। বাড়ীতে হাহাকার পড়িল।

পাষণ্ডীর একান্ত ইচ্ছা, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া ছেলেকে দেখাইবে; কিন্তু ডাক্তারের এখন ব্যবসায়ের দিকে মন নাই, বহুলোক তাঁহাকে লইয়া যাইতে আসিয়া ফিরিয়া যায়।

শ্রীপ্রভুর চিকিৎসায় দিবসযামিনী যায়, এখানে আসিলে মাতামাতি।
রাত্রিকালে নিকেতনে চিন্তা করে মনে প্রাণে শ্রীপ্রভুর পীড়ার প্রকৃতি॥

... ...

নিন্দুক কাতরস্বরে ডাক্তারে কাকুতি করে যাইবারে তাহার ভবনে
ডাক্তার না শুনি তায় চড়ি গাড়ী উভরায় উপনীত প্রভুর সদনে॥

পাষণ্ডীর প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল, গাড়ীর পেছনে ছুটিতে ছুটিতে সে ঠাকুর যেখানে ভক্তবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। মনে তাহার লজ্জা ও ভয়, কথা কহিবার সাহস সে পাইতেছিল না। তাহাকে বিষন্নমুখে একপাশে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ঠাকুর ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে পুত্রের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা নিবেদন করিল। সমবেদনায় ঠাকুরের চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল ও ডাক্তারকে তিনি তখনই যাইয়া ছেলেটির চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

প্রভুর দেখিয়া দয়া নিন্দুকের শক্ত হিয়া. দ্রবিয়া তখন হৈল হুঁশ।
ভাবে আরে নিন্দা কার করিয়াছি বারবার, এ যে মহাপ্রেমিক পুরুষ॥

... ...

চক্ষে দেখা অবিকল, পাষাণে ঝরিল জল, নিরমল হৃদয়মুকুর।
চির অন্ধকারালয় পলকে আলোকময় মহতী মহিমা শ্রীপ্রভুর॥

ঠাকুরের ভাবের ইতি নাই

'তিনি [ঈশ্বর] নরলীলা করতে ভালবাসেন—কৃষ্ণ গোয়ালার ছেলে, রাম দশরথের বেটা।' বলিয়াছেন মাতাঠাকুরাণী। নরলীলা—নরবৎ প্রকটীকৃত ঈশ্বরীয় মহালীলা। ঈশ্বরের বা পরমদেবতার লীলা বলিয়াই উহা দিব্য। 'জন্ম কর্ম চ মে দিব্যং', বলিয়াছেন শ্রীভগবান অর্জুনকে। নরলীলামাধুর্যে মানুষ স্বতই আকৃষ্ট হয়। নরদেহধারী ভগবানকে আকারে-প্রকারে-ভাবে নিজেরই অনুরূপ দেখিয়া, তাঁহার লীলাচমৎকারিত্বে আকৃষ্ট হইয়া এবং পতি-পুত্র-সখাদিরূপে তাঁহাকে ভালবাসিয়া সে তাঁহার ভাবে ভাবিত হইয়া পড়ে। তদ্ভাবভাবিত হওয়ার ফলে নিজের বিস্মৃত স্বরূপের বা ভুলে-যাওয়া দেবত্বের অনুভূতি সে ফিরিয়া পায় ও পূর্ণকাম হইয়া জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার অতিক্রম করে।

'ঈশ্বর সাকার, নিরাকার, আরও কত কী!' বলিয়াছেন ঠাকুর। 'তাও বটে—তাও বটে, আর যদি কিছু থাকে তাও বটে!' সাকার-নিরাকার-প্রসঙ্গে ঠাকুরকে এই কথাটি বলিতে শুনিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র, এবং শুনিবামাত্র তাঁহার মনে যুগপৎ এই তিনটি ভাবের উদয় হইয়াছিল—ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের গোচর, মনের গোচর ও মনবুদ্ধির অগোচর।

ঈশ্বরের যেমন ইতি করা যায় না, তেমনি ঈশ্বরাবতার ঠাকুরেরও ভাবের ইতি করিতে পারেন নাই তাঁহার সাধনশক্তিসম্পন্ন শাস্ত্রমর্মদর্শী শিষ্যেরা। শ্রীবিবেকানন্দ তাঁহাকে 'অনন্তভাবময়' বলিয়াছেন। শ্রীসারদানন্দ লিখিয়াছেন: "ঠাকুর বলিতেন—শ্রীভগবানের ইতি নাই। আমাদের প্রত্যক্ষ, এ লোকোত্তর পুরুষেরও তদ্রূপ ভাবের ইতি নাই!" ঠাকুরের ভাবের বৈচিত্র্য তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক রাজ্যের সর্বক্ষেত্রে সর্ববিষয়ে।

গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন: "তাঁহার [ঠাকুরের] যে কি বর্ণ তাহা এত দেখিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। নানা সময়ে নানা বর্ণ দেখিয়াছি। পেনেটির পাটে অনেক বর্ণ দেখিয়াছি। জানি না তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি।

"শাস্ত্রে ঈশ্বর কাহাকে বলে জানি না, কিন্তু এই ধারণা ছিল যে, আমি যেমন আমাকে ভালবাসি তিনি যদি আমাকে সেইরূপ ভালবাসেন তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর। তিনি আমাকে আমার মত ভালবাসিতেন।

"মায়ামুক্ত অবস্থা ব্যতীত অ-মায়িক কার্য বোঝা যায় না। তাঁহার ন্যায় যদি মায়াশূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইতাম এবং আমার শিষ্য থাকিত, শিষ্যের প্রতি পরমহংসদেবের স্নেহ বুঝিবার কতক শক্তি হইত, কিন্তু বর্ণনা করিবার শক্তি হইত কি-না জানি না।

"আমি যখন বিল্বমঙ্গল লিখি, তাঁহার ভক্তেরা প্রশ্ন করিলে বলি—নাটক লেখাও তাঁর কাছে শেখা। নরেন্দ্র বলে—বিজ্ঞান তাঁর কাছে শেখা। মহেন্দ্র মাষ্টার বলেন—মাষ্টারী শেখা তাঁর কাছে। তাঁহার কেমন ভাব, কি বলিব?

"যোগানন্দকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'হাঁরে, আমাকে কি বোধ হয়?' সে বলিয়াছিল, 'না গৃহস্থ না সন্ন্যাসী!' তিনি মহা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তুই এত বড় কথাটা বল্লি!' "

লীলামৃতকার লিখিয়াছেন:

"রাখালরাজের [মানসপুত্র রাখালের] স্কন্ধে ভর দিয়া যাইতে যাইতে [ঠাকুর] গান করিতে থাকেন—'আর চলিতে নারি, চরণবেদন যে হলো সখি, সে মথুরা কত দূর!' অপরিচিত লোকদর্শনে গানে ক্ষান্ত দিয়া কহেন, 'রামপ্রসাদ এরূপ অবস্থায় পড়ে বলেছিল—মা, আবার যদি আসতে হয়, যেন হাড়িশুঁড়ির ঘরে জন্মে বেপরোয়া হয়ে তোর গুণগান করে পথে চলে যেতে পারি।'

"গিরিশচন্দ্র নিবেদন করেন—পরাভক্তি কি, জানিতে প্রার্থনা করি।···কথাটি না বলিয়া, শয্যাপার্শ্ব হইতে ধূলি লইয়া মাথায় দিয়া কহিলেন—ভগবান, ভক্ত ও ভাগবত নামে তিন হলেও বস্তুতঃ এক। তোমরা ঈশ্বরের ভক্ত, অতিপুণ্যময় সচ্চিদানন্দকথা তোমরা সকলে শুনলে, তোমাদের পদরেণুতে এস্থান পবিত্র হয়েছে, তাই আমি আজ ভক্তগণের পদধূলি নিয়ে কৃতার্থ হলাম!"

'সৎকথা'য় আছে :

"ঠাকুর বলতেন—আমি সন্ন্যাসীর রাজা।

"ঠাকুরের খাবার তৈরি। হঠাৎ বাইরে গিয়ে দক্ষিণেশ্বরে কোন লোকের বাড়ীতে খেয়ে পান চিবুতে চিবুতে এলেন। হৃদে এদিকে তাঁকে না দেখে ডাকাডাকি কচ্চে। উনি এসে বল্লেন—ওদের বাড়ীতে[1] খেয়ে এলুম। হৃদে দুঃখ করে বল্লে—কী দুর্ভাগ্য আমার। এমন চর্ব্যচূষ্য প্রসাদ তৈরি, কোথা খেতে গেলে মামা? ঠাকুর বল্লেন—যখন পরমহংস অবস্থা হয় তখন এমনি হয়ে থাকে, কোথায় খাবে তার কিছু ঠিকঠিকানা থাকে না।

"একদিন কালীবাড়ীর একজন চাকর তামাক খেয়ে যেমন হুঁকোটি রেখেচে, ঠাকুর দৌড়ে গিয়ে সেই হুঁকোয় টান দিলেন।[2] অমনি কালী-বাড়ীর বামুনরা বলে উঠল—ছোট ভট্টচাজ্জির জাত গিয়েচে, আর আমরা ওর সঙ্গে খাব না। ঠাকুর বলতে লাগলেন—আঃ বাঁচলুম! শালাদের সঙ্গে না খেতে হলে বাঁচি!"

লীলাপ্রসঙ্গকার বলিয়াছেন :

"ঠাকুর ধর্মলাভ সহজ করে দিতেই এসেছিলেন। আচার-নিয়মের বাড়াবাড়িতে মানুষ পিষে যাচ্ছিল। ভগবানের ভজন করবার জন্যে স্থানকালের অপেক্ষা অনাবশ্যক, যে কোন অবস্থায় তাঁকে ডাকা চলে। শুচি-অশুচির কোন তোয়াক্কাই তিনি রাখেন নি। আর উপায়?—যা

---

১ নবকুমার চাটুজ্যের বাড়ী? নবকুমার চাটুজ্যে ঈশান মুখুজ্যের মত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন, ঠাকুরকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। তাঁহাদের বাড়ীর রান্না খাইয়া ঠাকুর বলিতেন, আহা কী রান্না, প্রত্যেকটি জিনিস যেন ওজন করে বেঁধেচে!

২ ঠাকুর তামাক খাইতেন। একবার তাঁহার বায়ুবৃদ্ধি হইলে আগড়পাড়ার বিশ্বনাথ কবিরাজ চিকিৎসা করেন। 'হাঁগা, তামুক খেলে কী হয়?' এই প্রশ্নের উত্তরে কবিরাজ তাঁহাকে ছিলিমের উপর ধনের চাল ও মৌরী দিয়া তামাক খাইতে বলিয়াছিলেন। ঠাকুরও সেইরূপ করিতেন। [রামলাল-কথিত]

তোমার ভাল লাগে। সাকার ভাল লাগে?—তাতেই হবে। নিরাকার ভাল লাগে?—লেগে থাক, ওতেই তোমার উন্নতি হবে। ভগবান আছেন কি নাই সন্দেহ হয়েচে?—আচ্ছা তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর, 'প্রভু, তুমি আছ কি নাই জানি না, তুমি সাকার কি নিরাকার যেরূপ হও আমাকে বুঝিয়ে দাও।' কাপড় ছাড়া, স্নান করা, তিলক কাটা, বিছানা ছাড়া—পার তো কর, অসুবিধা হয়, ওদিকে খেয়াল না দিয়ে তাঁকে ডেকে যাও।

"ঠাকুর মঘা, অশ্লেষা, যোগিনী, ত্র্যহস্পর্শ, দিক্‌শূল, বৃহস্পতিবারের বারবেলা খুব মেনে চলতেন। কেন মানতেন তা বলতে পারি না। তিনি অনেক জিনিসই বিশ্বাস করতেন। তিনি মানতেন বলেই আমরা মানি।

"ঠাকুর শ্রাদ্ধের অন্নগ্রহণে ভক্তির হানি হয় বলতেন।···

"ঠাকুরের শরীর অত্যন্ত সুস্থ ছিল, নতুবা অত সাধনা সম্ভবপর হত না। ···আধসের থেকে দশ ছটাক চালের ভাত খেতেন সুস্থ অবস্থায়। ভাবাবেশে অনেক সময় অত্যধিক খেয়ে হজম করতেন।[১]

---

১ ভাবাবেশে ঠাকুরের অত্যধিক খাইয়া হজম করার কতিপয় ঘটনা লীলাপ্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে একটি এইরূপ :

ঠাকুর কামারপুকুরে আছেন। পেটের অসুখ হওয়ায় রাত্রে দুধবার্লি খাইয়া শয়ন করিয়াছেন। খানিক পরে ভাবাবেশে টলিতে টলিতে ঘরের বাহিরে আসিলেন ও রামলালের মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা শুলে যে? আমাকে কিছু খেতে না দিয়ে শুলে যে?

রামলালের মা—ওমা সে কী গো, তুমি যে এই খেলে!

ঠাকুর—কৈ খেলুম? আমি তো এই দক্ষিণেশ্বর থেকে আসচি—কৈ খাওয়ালে?

ঘরে অন্য কিছু না থাকায় রামলালের মা থালায় করিয়া মুড়ি আনিয়া ঠাকুরের সম্মুখে ধরিলেন। তাহাতে বালকের ন্যায় রাগ করিয়া ঠাকুর পেছন ফিরিয়া বসিলেন ও বলিতে লাগিলেন, শুধু মুড়ি আমি খাব না। অগত্যা রামলাল সেই গভীর রাত্রে দোকানে যাইয়া মিঠাই কিনিয়া আনিলেন। একসের মিঠাই ও সহজ লোকে যত খাইতে পারে তদপেক্ষা অধিক মুড়ি থালায় ঢালিয়া দেওয়া হইলে ঠাকুর খুশী হইয়া খাইতে বসিলেন এবং দেখিতে দেখিতে সমস্তই খাইয়া ফেলিলেন!

"ঠাকুরের লজ্জাসরম একেবারেই ছিল না। পরনে কাপড় প্রায়ই থাকত না। একদিন জামা গায়ে রয়েচে দেখে বলচেন, দেখ গায়ে জামা—ভদ্র হয়েচি। শ্রোতারা হাসতে লাগল। তখন হুঁশ হল যে পরনে কাপড় নাই। পঞ্চবটী পর্যন্ত গিয়ে কাপড় খুলে ফেলতেন। আমরা কেহ গাড়ু হাতে করে দাঁড়িয়ে আছি—বাহ্যে সেরে এসে শৌচ করবেন, জল ঢেলে দিতে হবে। পায়ে চটিজুতা থাকত, শরীর বড় কোমল হয়েছিল, খাসি পায়ে হাঁটতে পারতেন না।

"ঠাকুরের নিকট বিভিন্ন ভাবের ভক্ত এলে তাঁর সেই সেই ভাব হত। কেহ হয়তো শ্রীকৃষ্ণের উপাসক, ঐরূপ ব্যক্তি কাছে এলে ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণ-ভাব আসত। শাক্তভাবের সাধক কাছে এলে শক্তির আবির্ভাব অনুভব করতেন। মহাভাব রাধিকা, চৈতন্য মহাপ্রভু, আর ঠাকুরের জীবনে দেখা গেছে।"

'ঠাকুরের মানুষভাব'-শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন:

"শরীর, বস্ত্র, বিছানা প্রভৃতি অতি পরিষ্কার রাখা তাঁহার অভ্যাস ছিল। যে জিনিসটি যেখানে রাখা উচিত, সেই জিনিসটি ঠিক সেইখানে নিজে রাখিতে এবং অপরকেও রাখিতে শিখাইতে ভালবাসিতেন, কেহ অন্যরূপ করিলে বিরক্ত হইতেন। কোনস্থানে যাইতে হইলে গামছা বেটুয়া প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য ঠিকঠিক লওয়া হইয়াছে কি-না তাহার অনুসন্ধান করিতেন এবং সেখান হইতে ফিরিবার কালেও কোন জিনিস লইয়া আসিতে ভুল না হয়, সেজন্য সঙ্গী শিষ্যকে স্মরণ করাইয়া দিতেন। যে সময়ে যে কাজ করিব বলিতেন তাহা ঠিক সেই সময়ে করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। যাহার হস্ত হইতে যে জিনিস লইব বলিয়াছেন, মিথ্যাকথন হইবার ভয়ে সে ভিন্ন অপর কাহারও হস্ত হইতে ঐ বস্তু কখনও গ্রহণ করিতেন না।[১] তাহাতে যদি দীর্ঘকাল অসুবিধা ভোগ করিতে হইত তাহাও স্বীকার করিতেন। ছিন্ন বস্ত্র, ছত্র বা পাদুকাদি কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেখিলে, সমর্থ হইলে নূতন ক্রয় করিতে উপদেশ করিতেন এবং অসমর্থ হইলে কখন কখন নিজেও ক্রয় করিয়া দিতেন।

১ সত্যকথা কলির তপস্যা, ঠাকুর বলিতেন।

বলিতেন, ওরূপ বস্তু-ব্যবহারে মানুষ লক্ষ্মীছাড়া ও হতশ্রী হয়। অভিমান-অহঙ্কারসূচক বাক্য তাঁহার মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হওয়া এককালে অসম্ভব ছিল।[১] নিজের ভাব বা মত বলিতে হইলে নিজ শরীর নির্দেশ করিয়া 'এখানকার ভাব', 'এখানকার মত' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিতেন। শিষ্যবর্গের হাত পা চোখ মুখ প্রভৃতি···অঙ্গের গঠন এবং তাহাদের চালচলন আহারবিহার নিদ্রা প্রভৃতি কার্যকলাপ তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মানসিক প্রবৃত্তিনিচয়ের গতি, কোন্ প্রবৃত্তির কতদূর আধিক্য ইত্যাদি এরূপ স্থির করিতে পারিতেন যে, তাহার ব্যতিক্রম এ পর্যন্ত আমরা দেখিতে পাই নাই।

"অনেকে বলিয়া থাকেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রত্যেকেই মনে করেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকেই সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। আমাদের বোধ হয়, প্রত্যেক ব্যক্তির সুখদুঃখাদি-জীবনানুভবের সহিত তাঁহার যে প্রগাঢ় সহানুভূতি ছিল তাহাই উহার কারণ। সহানুভূতি ও ভালবাসা বা প্রেম দুইটি বিভিন্ন বস্তু হইলেও শেষোক্তের বাহ্যিক লক্ষণ প্রথমটির সহিত বিশেষ বিভিন্ন নহে। সেইজন্য সহানুভূতিকে প্রেম বলিয়া ভাবা বিশেষ বিচিত্র নহে। প্রত্যেক বস্তু ভাবিবার কালে উহাতে তন্ময় হওয়া তাঁহার মনের স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল। ঐ গুণ থাকাতেই তিনি প্রত্যেক শিষ্যের মনের অবস্থা ঠিকঠিক ধরিতে পারিতেন এবং ঐ চিত্তের উন্নতির জন্য যাহা আবশ্যক তাহাও ঠিকঠিক বিধান করিতে পারিতেন।···প্রত্যেক কার্যই বিচারবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া অনুষ্ঠান করিতে

---

১ ঠাকুরের অভিমানশূন্যতার সূচক দুইটি ছোট ঘটনা :

"একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাঁহার পিঠ চাপড়াইয়া তামাক সাজিতে বলিলে সানন্দে আজ্ঞা পালন করেন।" [লীলামৃত]

"ঠাকুর কালীবাটীর বাগানে কোঁচার খুঁটটি গলায় দিয়া বেড়াইতেছেন, অনৈক বাবু [কৈলাস ডাক্তার] তাঁহাকে সামান্য মালীজ্ঞানে বলিলেন, ওহে, আমাকে ঐ ফুলগুলি তুলিয়া দাও তো। ঠাকুরও দ্বিরুক্তি না করিয়া তদ্রূপ করিয়া দিয়া সেস্থান হইতে সরিয়া গেলেন।"

নিত্য উপদেশ করিতেন। বিচারবুদ্ধিই বস্তুর গুণাগুণ প্রকাশ করিয়া মনকে যথার্থ ত্যাগের দিকে অগ্রসর করিবে, একথা তাঁহাকে বারবার বলিতে শুনিয়াছি। বুদ্ধিহীনের অথবা একদেশী বুদ্ধিমানের আদর তাঁহার নিকট কখনই ছিল না। সকলেই তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছে, 'ভগবদ্ভক্ত হবি বলে বোকা হবি কেন?' অথবা, 'একঘেয়ে হস নি, একঘেয়ে হওয়া এখানকার ভাব নয়, এখানে ঝোলেও খাব, ঝালেও খাব, অম্বলেও খাব—এই ভাব।' একদেশী বুদ্ধিকেই তিনি একঘেয়ে বুদ্ধি বা একঘেয়ে ভাব বলিতেন। 'তুই তো বড় একঘেয়ে!'—ভগবদ্ভাবের বিশেষ কোনটিতে কোন শিষ্য আনন্দানুভব না করিতে পারিলে···তাঁহার বিশেষ তিরস্কারবাক্য ছিল। ঐ তিরস্কারবাক্য এরূপভাবে বলিতেন যে,···শিষ্যকে লজ্জায় মাটি হইয়া যাইতে হইত। ঐ উদার সার্বজনীন ভাবের প্রেরণাতেই যে তিনি সকল ধর্মমতের সর্বপ্রকার ভাবের সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া 'যত মত তত পথ' এই সত্যনিরূপণে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেদিন ঠাকুরকে দর্শন করেন, তাহার তিনসপ্তাহ পরে ঠাকুর তল্লিখিত 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থের কিয়দংশ শ্রবণ করেন ভক্তসঙ্গে পঞ্চবটীতে বসিয়া। মাষ্টার পাঠ করিয়াছিলেন। উপন্যাসের মাধ্যমে বঙ্কিম হিন্দুর সংসারযাত্রাকে উহার সনাতন ভারতীয় আদর্শে গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহার সেই শুভ প্রচেষ্টাকেই ঠাকুর মর্যাদাদান ও সমর্থন করিয়াছিলেন প্রকারান্তরে।

উপন্যাসের দেবী চৌধুরাণীর পূর্বনাম প্রফুল্ল। মিথ্যা অপবাদগ্রস্ত হইয়া সে স্বামীর ঘর করিতে পায় নাই, কিন্তু স্বামীকে সে ভালবাসিত। ঘটনাচক্রে স্বামীর সহিত পরে যখন তাহার মিলন হয় তখন স্বামীকে সে বলিয়াছিল: 'তুমি আমার দেবতা। আমি অন্য দেবতার অর্চনা করিতে শিখিতেছিলাম, শিখিতে পারি নাই। তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ।'

এই কথা শুনিয়া ঠাকুর সহাস্যে কহিলেন: 'শিখিতে পারি নাই!'—এর নাম পতিব্রতার ধর্ম। এও আছে।···প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয়, আর

স্বামী সারদানন্দ

জীয়ন্ত মানুষে কি হয় না? তিনিই মানুষ হয়ে লীলা করচেন।…কাঠ ঘসতে ঘসতে যেমন আগুন বেরোয়, ভক্তির জোর থাকলে মানুষেতেই ঈশ্বরদর্শন হয়। [কথামৃত]

কালীবাটীতে 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রাভিনয় হইয়াছে ৺ফলহারিণী-কালীপূজার অন্তে, শেষরাত্রি হইতে কিছু বেলা পর্যন্ত (১২৯১)। ঠাকুর দেখিয়াছেন। স্নানান্তে যাত্রাওয়ালারা তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলে তিনি সানন্দে তাহাদের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

ঠাকুর (বিদ্যা-অভিনেতার প্রতি)—তোমার অভিনয়টি বেশ হয়েচে। যদি কেউ গাইতে, বাজাতে, নাচতে, কি একটা কোন বিদ্যাতে ভাল হয়, সে যদি চেষ্টা করে, শীঘ্রই ঈশ্বরলাভ করতে পারে। আর তোমরা যেমন অনেক অভ্যাস করে গাইতে বাজাতে বা নাচতে শিখ, সেইরূপ ঈশ্বরেতে মনের যোগ অভ্যাস করতে হয়।…তোমার কি বিবাহ হয়েচে? ছেলেপুলে?

বিদ্যা—আজ্ঞা একটি কন্যা গত; আরো একটি সন্তান হয়েচে।

ঠাকুর—এর মধ্যে হল, গেল! তোমার এই কম বয়স। বলে—সাঁজ সকালে ভাতার ম'ল কাঁদব কত রাত! (সকলের হাস্য)। সংসারে সুখ তো দেখচ! যেমন আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া, খেলে হয় অম্লশূল।

যাত্রাওয়ালার কাজ করচ তা বেশ! কিন্তু বড় যন্ত্রণা। এখন কম বয়স, তাই গোলগাল চেহারা। তারপর সব তুবড়ে যাবে। যাত্রাওয়ালারা প্রায় ঐরকমই হয়—গাল-তোবড়া, পেট-মোটা, হাতে-তাগা। (সকলের হাস্য)।

আমি কেন বিদ্যাসুন্দর শুনলাম? দেখলাম—তাল, মান, গান বেশ। তারপর মা দেখিয়ে দিলেন যে, নারায়ণই এই যাত্রাওয়ালাদের রূপ ধারণ করে যাত্রা করচেন। [কথামৃত]

মুখুজ্যে-গিন্নী—ঠাকুরের ভক্ত বাগবাজারের মহেন্দ্র মুখুজ্যের স্ত্রী—বলিয়াছিলেন শেষ বয়সে কাশীতে: বাবার সঙ্গে আমার ছেলেবেলায় গিয়েছিলুম দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের ঘরে রোদে-রাখা ঘিয়ের বাটিতে

আমার পা ঠেকে যায়। বাবারা সবাই সঙ্কুচিত হয়ে পড়েচেন দেখে ঠাকুর বলেছিলেন, 'তাতে কী হয়েচে? বালিকা—কালিকা!'

কাতিক মাসের অপরাহ্ণ। শ্যামপুকুরের বাটীতে ঠাকুর ভক্তবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছেন। শিকদারপাড়ার প্রসিদ্ধ চিত্রকর অন্নদাপ্রসাদ বাগ্‌চি আসিয়া ঠাকুরকে কয়েকখানি চিত্র উপহার দিলেন।

"ঠাকুর আনন্দের সহিত পট দেখিতেছেন। ষড়্‌ভুজ মূর্তি দর্শন করিয়া ভক্তদের বলিতেছেন, 'দেখ, কেমন হয়েচে!' ভক্তদের আবার দেখাইবার জন্ম অহল্যা-পাষাণীর পট আনিতে বলিলেন। পটে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া আনন্দ করিতেছেন।

"শ্রীযুক্ত বাগ্‌চির মেয়েদের মত লম্বা চুল। ঠাকুর বলিতেছেন—অনেক কাল হল দক্ষিণেশ্বরে একটি সন্ন্যাসী দেখেছিলাম, ন হাত লম্বা চুল। সন্ন্যাসীটি 'রাধে রাধে' করত, ঢং নাই।" [কথামৃত]

অতুলকৃষ্ণ এইদিন তাঁহার বিশেষ বন্ধু মুন্‌সেফ উপেন্দ্রনাথ ঘোষকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছেন: "···একঘর লোক বসিয়া, আর নানারকম আজে-বাজে কথা হইতেছে,—যেমন, ছবি আঁকার কথা···, সেকরার দোকানে সোনারূপা গলানর কথা ইত্যাদি। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিলাম, একটিও ভাল কথা হইল না। ভাবিতে লাগিলাম, আজ এই নূতন লোকটিকে লইয়া আসিলাম আর আজই যত আজে-বাজে কথা! ও (উপেন) ঠাকুরের সম্বন্ধে কিরূপ ভাব লইয়া যাইবে!—ভাবিয়া আমার মুখ শুষ্ক হইতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে উপেনের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু যতবার দেখিলাম, দেখিলাম তাহার মুখ বেশ প্রসন্ন—যেন ঐসকল কথায় সে বেশ আনন্দ পাইতেছে! তখন ইশারা করিয়া তাহাকে উঠিতে বলিলাম, সে তাহাতে আর একটু বসিতে ইশারায় জানাইল। ঐরূপে দুইতিন বার ইশারা করার পরে সে উঠিয়া আসিল। তখন তাহাকে বলিলাম, কি শুনছিলি এতক্ষণ? ঐসব কথায় শুনিবার কি আছে বল্ দেখি?···সে বলিল, না হে, বেশ শুনিতে-ছিলাম। পূর্বে universal love (সকলের প্রতি সমান ভালবাসা)

কথাটা শুনেছি, কিন্তু কাহাতেও উহার প্রকাশ দেখি নাই। সকল বিষয় লইয়া সকলের সঙ্গে উঁহাকে (ঠাকুরকে) আনন্দ করিতে দেখিয়া আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম!"

১২৮৪ সালের ঘটনা। কালীবাটীর দারোয়ানদের মধ্যে সেই সময়ে দুইএক জন কুস্তিগির ছিল; তাহাদের কুস্তির আখড়াটি ছিল চাঁদনীর দক্ষিণদিকে, পোস্তার উপরে। ঠাকুর একএক দিন সেই আখড়ায় আসিতেন ও উবু হইয়া বসিযা—গায়ে কালো কোট, কোঁচার খুঁটটি কাঁধে ফেলা, পায়ে চটিজুতা—তাহাদের মল্লযুদ্ধ দেখিয়া আনন্দ করিতেন। শরচ্চন্দ্র মিত্র নামে আড়িয়াদহের এক তরুণ যুবক ব্যায়ামচর্চা করিতে ভালবাসিতেন ও কালীবাটীতে আসিয়া কুস্তি লড়িতেন। একদিন যখন তিনি গায়ে মাটি মাখিয়া লড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, ঠাকুর বলিলেন, দেখ্ যদি আজ তুই হিন্দুস্থানীকে হারাতে পারিস তবে বুঝব বাঙ্গালীর ছেলে বীর হয়েচে, আর আমি তোকে নিজের হাতে মেঠাই খাওয়াব। যুবকের জিতিবার সম্ভাবনা ছিল না, সেইজন্য ঠাকুরের কথায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করিয়া তিনি তাল ঠুকিয়া লড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অনেক ধস্তাধস্তির পরে তাঁহার শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাবু করিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর হাততালি-সহকারে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া কহিলেন, এই তো বাঙ্গালীর ছেলে বীর হয়েচে—কত বড় পালোয়ানকে হারিয়েচে! আয়, তোকে মেঠাই খাওয়াব। যুবক তখন হাঁফাইতেছিলেন ও দম লওয়ার চেষ্টা করিতেছিলেন। ঠাকুর তাঁহার কব্জি ধরিয়া এক-প্রকার জোর করিয়াই তাঁহাকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন ও তাকের উপর হইতে চেঙারি পাড়িয়া ও উহা হইতে একটি মেঠাই তুলিয়া লইয়া 'নে নে, খা খা' বলিয়া তাঁহার মুখে ধরিলেন। মুখে মেঠাই ও দুই হাতে ধরা চেঙারি লইয়া আখড়ায় ফিরিয়া যাইতে যাইতে যুবক শুনিতে পাইলেন, ঠাকুর বলিতেছেন: আমি নিজের হাতে মেঠাই খাওয়াব বলেছিলুম, সত্যরক্ষা হল![১]

---

১ ৺শরচ্চন্দ্রের পুত্র শিবানন্দ-শিষ্য শৈলভূষণ মিত্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

ঠাকুরের মধ্যে স্ত্রীভাব ও পুরুষভাবের সহাবস্থানের কথা আগেই বলা হইয়াছে। "ঠাকুরের নিজের পুরুষশরীর ছিল, সেজন্য তাঁহার পুরুষের ভাব বুঝা ও ধরাটা কতক বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু স্ত্রীজাতি—কোমলতা, সন্তানবাৎসল্য প্রভৃতি মনোভাবের জন্য ভগবান যাহাদের পুরুষ অপেক্ষা একটা অঙ্গই অধিক দিয়াছেন—তাহাদের সকল ভাব ঠাকুর কি করিয়া ঠিক ঠিক ধরিতেন তাহা ভাবিলে আর আশ্চর্যের সীমা থাকে না। ঠাকুরের স্ত্রীভক্তেরা বলেন,—ঠাকুরকে আমাদের পুরুষ বলিয়াই অনেক সময় মনে হইত না; মনে হইত যেন আমাদেরই একজন। সেজন্য পুরুষের নিকটে আমাদের যেমন সঙ্কোচ-লজ্জা আসে, ঠাকুরের নিকটে তাহার কিছুই আসিত না।

"উজ্জ্বল ভাবঘনতনু ঠাকুরের ভিতর সকলেই নিজ নিজ ভাবের পূর্ণাদর্শ দেখিতে পাইয়া আপনাদের কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছে। পুরুষ পুরুষত্বের পূর্ণবিকাশ দেখিয়া নতশির হইয়াছে; স্ত্রী স্ত্রীজনসুলভ সকল ভাবের বিকাশ তাঁহাতে দেখিতে পাইয়া নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে আপনার হইতেও আপনার জ্ঞান করিয়াছে। ঠাকুরের ভিতর স্ত্রী-পুরুষ উভয় ভাবের এইরূপ একত্র সমাবেশ তাঁহার প্রত্যেক ভক্তই কিছু-না-কিছু উপলব্ধি করিয়াছে। শ্রীযুত গিরিশ ঐরূপ উপলব্ধি করিয়া একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসাই করিয়া ফেলেন—'মশাই, আপনি পুরুষ না প্রকৃতি?' ঠাকুর হাসিয়া উত্তরে বলিলেন, 'জানি না!' "

ঠাকুরকে সকল মতের সকল পথের সাধকেরাই নিজ নিজ ভাবের লোক বলিয়া মনে করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সাধনায় বিশেষভাবে অগ্রসর তাঁহারা তাঁহাকে নিজ নিজ ইষ্টরূপে দর্শনও করিয়াছিলেন। জ্ঞানপন্থী সাধকেরা তাঁহাকে নির্বিকল্পসমাধিমান পরমহংসরূপে দর্শন করিতেন। হিন্দুধর্ম হইতে উদ্গত ও বৈদেশিক সভ্যতার সংঘর্ষে জাত শিখ ও ব্রাহ্মমতের সাধকেরাও নিজেদের আদর্শের পূর্ণতা তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করিতেন।

ঠাকুরের সমুদ্রবৎ গভীর ভাবরাশি পরিমাপ করা—ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করা—জীবের অসাধ্য। অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে স্বীয় সাধনাদিবিষয়ক গুহ্যকথা বলিতে আরম্ভ করিয়া, সহসা থামিয়া গিয়া তিনি বলিয়া উঠিতেন, 'এসব কথা কাকেই বা বলি, আর কেই বা বুঝবে!'

দিবসে একাধিকবার তিনি নিজানন্দে মগ্ন হইয়া অবস্থান করিতেন; অনুপম এক দিব্যহাসি সেই সময়ে তাঁহার রক্তিমাধরে খেলিয়া যাইত। কথামৃতে আছে, সেই হাসি দেখিয়া জনৈক হিন্দুস্থানী সাধু তাঁহার সঙ্গী সাধুকে বলিয়াছিলেন, 'আরে, দেখো দেখো! এস্‌কো পরমহংস অবস্থা বোল্‌তা হ্যায়।'

লীলামৃতকার একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়া দেখিলেন, শয্যাতে শয়ন করিয়া ও পায়ের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মুখবিবরে প্রবেশ করাইয়া ঠাকুর কতই না আনন্দ উপভোগ করিতেছেন!

স্বীয় অলৌকিক রূপমাধুর্যের উপলব্ধিতে উল্লাস বোধ করিয়াই যেন, আপন মনে কখন কখন তিনি গাহিতেন: 'দরবেশ দাঁড়া রে সাধের করোয়া-কিস্তিধারী, দাঁড়া রে তোর রূপ নেহারি।' অথবা, 'এসেচেন এক ভাবের ফকির, তিনি হিঁদুর ঠাকুর, মুসলমানের পীর!'

'অনেক ঈশ্বরীয় রূপ দেখচি, তার মধ্যে (নিজের শরীর দেখাইয়া) এটিও একটি।' বলিয়াছেন ঠাকুর। স্বহস্তে নিজের পট—ধ্যানমগ্ন বসা মূর্তি—পূজা করিয়াছেন ও বলিয়াছেন, 'উচ্চ যোগাবস্থার মূর্তি! কালে এই ছবি ঘরে ঘরে পূজা হবে।'

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন রামলালকে ডাকিয়া বলিলেন, আমাকে পীতবসন করে দে। রামলাল হলুদ বাটিয়া একখানা নূতন কাপড় গাঢ় পীত রঙে ছোপাইয়া আনিয়া ঠাকুরকে পরাইলেন ও তাঁহার গলায় সচন্দন ফুলের মালা দিলেন। বুকে হাত রাখিয়া, পরিহিত বসন ও মালা দেখাইয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, 'পীতাম্বর বনমালী, এবে যজ্ঞসূত্রধারী!' কথাটি বারবার বলিতে বলিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কাপড় খসিয়া পড়িল, মালা ছিঁড়িয়া গেল। রামলাল তখন

সাদা কাপড় পরাইয়া কৃষ্ণলীলা কীর্তন করিতে লাগিলেন, ঠাকুর গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন।

একদিন নিজের ঘরের পশ্চিমদিকের বারান্দা ঝাঁট দিতে দিতে তিনি আপন মনে বলিতেছিলেন ঃ

সহজ প্রেম সস্তা করে এ বাজারে কেউ নিলে না, কেউ নিলে না!
মনের দুঃখ রইল মনে, দরদী নইলে প্রাণে বাঁচে না।
যারে ধ্যানে না পায় মুনি, তারে ঝেঁটোয় ঝাঁটায় রাণী!!

ভক্তের ভগবান

খ্রীষ্টীয় নববর্ষের দিনে ভক্তগণের আনন্দমেলারূপ হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া —চৈতন্যদাতা জগদ্‌গুরুরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া—ঠাকুর তাঁহাদিগকে অভয়দান করিয়াছিলেন। সেইদিন হইতে তাঁহার স্বেচ্ছাবৃত ব্যাধির প্রকোপ, বহুজনের পাপতাপের ভোগ নিজাঙ্গে গ্রহণ করার ফলে, অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। অতঃপর কোনপ্রকার প্রতিকারচেষ্টাই সেই প্রকোপ আর হ্রাস করিতে পারে নাই।

ডাক্তার রাজেন্দ্র দত্ত তিনচারি মাস চিকিৎসা করিয়াছিলেন। "রাজেন্দ্র বাবু নিরস্ত হইলে বৃদ্ধ নবীন পালকে আহ্বান করা হইল। নবীন পালের ঔষধ ক্রমান্বয়ে কিছুদিন চলিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে অন্যান্য ডাক্তারেরাও আসিয়া দেখিতেন। যখন দেখা গেল যে, কাহারও দ্বারা কোনপ্রকার উপকার হইতেছে না, তখন পরমহংসদেবের সম্মতিক্রমে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সর্বপ্রধান ডাক্তার কোট্‌স্ সাহেবকে একবার দেখান হয়। তিনি ...চিকিৎসাতীত বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করেন।

"...মধ্যে মধ্যে [ঠাকুরের গলার] ঐ অন্তঃক্ষত শুষ্ক হইয়া স্ফোটকাকার ধারণ করিত, তাহাতে তিনি অত্যন্ত ক্লেশ বোধ করিতেন।...কখন কখন এই স্ফোটক এত বিস্তীর্ণ হইত যে, তদ্দ্বারা শ্বাসক্লেশ উপস্থিত হইত। যতদিন উহা বিদীর্ণ হইয়া না যাইত ততদিন আর কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। সে সময়ে আহার বন্ধ হইয়া যাইত। একপোয়া দুগ্ধ সেবন করাইলে এক ছটাক উদরস্থ হইত এবং অবশিষ্টাংশ বাহির হইয়া পড়িত। এমন সূত্রবৎ লালা নির্গত হইত যে, সে সময় কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিতে পারিতেন না। কিয়দ্দিন পরে এই স্ফোটক ফাটিয়া পূঁজ বহির্গত হইত। তাহাতে সাময়িক কিঞ্চিৎ সুস্থতা বোধ করিতেন বটে, কিন্তু রোগের বিক্রম কিছুই কমিত না। এই নিদারুণ রোগের যন্ত্রণা তিনি হাস্যাননে সহ্য করিতেন। একদিন বিমর্ষ অথবা চিন্তিত হন নাই। যখনই যে গিয়াছে তাহার সহিত ঐশ্বরিক বাক্যালাপ করিয়াছেন। লোকে ব্যাধির

বিভীষিকা দেখাইলে তিনি হাসিয়া উঠিতেন এবং বলিতেন, 'দেহ জানে, দুঃখ জানে, মন তুমি আনন্দে থাক।' " [জীবনবৃত্তান্ত]

"ঠাকুরের তখন অসুখ—কাশীপুরের বাগানে—বাড়াবাড়ি। শ্রীযুত শশধর তর্কচূড়ামণি, সঙ্গে কয়েকজন,···দেখিতে আসিলেন। পণ্ডিতজী কথায় কথায় ঠাকুরকে বলেন, 'মহাশয়, শাস্ত্রে পড়েছি আপনাদের ন্যায় পুরুষ ইচ্ছামাত্রেই শারীরিক রোগ আরাম করিয়া ফেলিতে পারেন। আরাম হোক মনে করে মন একাগ্র করে একবার অসুস্থ স্থানে কিছুক্ষণ রাখলেই সব সেরে যায়। আপনার একবার ঐরূপ করিলে হয় না?' ঠাকুর বলিলেন, 'তুমি পণ্ডিত হয়ে একথা কি করে বল্লে গো? যে মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি তাকে সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙ্গা হাড়-মাসের খাঁচাটার উপর দিতে কি আর প্রবৃত্তি হয়?'

"পণ্ডিতজী নিরুত্তর হইলেন; কিন্তু···ভক্তেরা নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। পণ্ডিতজী চলিয়া যাইবার পরেই ঠাকুরকে ঐরূপ করিবার জন্য একেবারে বিশেষভাবে ধরিয়া বসিলেন। বলিলেন, 'আপনাকে অসুখ সারাতেই হবে, আমাদের জন্য সারাতে হবে।' "

এই সময়ে ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথের মধ্যে নিম্নোক্তরূপ উক্তি-প্রত্যুক্তি হইয়াছিল:

'আমার কি ইচ্ছা রে, যে আমি রোগে ভুগি? আমি তো মনে করি সারুক, কিন্তু সারে কই?' সারা না-সারা মার হাত।'

'তবে মাকে বলুন সারিয়ে দিতে; তিনি আপনার কথা শুনবেনই শুনবেন।'

'তোরা তো বলচিস, কিন্তু ও কথা যে মুখ দিয়ে বেরোয় না রে।'

'তা হবে না মশাই, আপনাকে বলতেই হবে, আমাদের জন্যে বলতে হবে।'

'আচ্ছা দেখি, পারি তো বলব।'

[কয়েক ঘণ্টা অতীত হওয়ার পরে]

'মশায়, বলেছিলেন? মা কী বল্লেন?'

'মাকে বল্লুম, (গলার ক্ষত দেখাইয়া) এইটের দরুন কিছু খেতে পারি না, যাতে দুটি খেতে পারি করে দে। তা মা বল্লেন তোদের সকলকে দেখিয়ে, কেন?—এই যে এত মুখে খাচ্চিস! আমি আর লজ্জায় কথাটি কইতে পারলুম না!'

ভক্তচূড়ামণি দুর্গাচরণ নাগ ঠাকুরের ব্যাধিজনিত কষ্ট দেখিয়া সহ্য করিতে পারিতেন না, ঘন ঘন তাঁহার কাছে আসাযাওয়াও করিতেন না। ঠাকুর একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'ওগো, এগিয়ে এস, এগিয়ে এস, আমার গা ঘেঁষে বস; তোমার ঠাণ্ডা শরীর স্পর্শ করে আমার শরীর শীতল হবে।' ঠাকুর সেদিন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বসিয়াছিলেন অনেকক্ষণ ধরিয়া। অন্য একদিন কাছে বসিয়া মানসিক শক্তির বলে নাগ মহাশয় ঠাকুরের ব্যাধি নিজাঙ্গে আকর্ষণ করিয়া লইতে উদ্যত হইলে 'তা তুমি পার, রোগ সারাতে পার!'—বলিতে বলিতে ঠাকুর তাঁহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন।

"ঔষধ, পথ্য ও দিবারাত্র সেবার···বন্দোবস্ত হইবার পরে ভক্তগণ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, একথা বলিতে পারা যায় না।···শেষ পর্যন্ত সেবা চালাইবার ব্যয় কিরূপে নির্বাহ হইবে, ইহাই এখন তাঁহাদিগের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল।···বলরাম, সুরেন্দ্র, রামচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যাঁহারা···চিকিৎসাদির ভার লইয়াছিলেন তাঁহারা কেহই ধনী ছিলেন না। ···ঠাকুরের অসাধারণ অলৌকিকত্ব তাঁহাদিগের প্রাণে যে দিব্য আশা, আলোক, আনন্দ ও শান্তির ধারা প্রবাহিত করিয়াছিল, কেবলমাত্র তাহারই প্রেরণায় তাঁহারা ভবিষ্যতের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া ঐ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ পূতধারা যে সর্বক্ষণ একটানে বহিতে থাকিবে ···একথা বলিতে যাওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক। ফলে ঐরূপ হয়ও নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঐরূপ সময় উপস্থিত হইলেই তাঁহারা ঠাকুরের ভিতরে এমন নবীন আধ্যাত্মিক প্রকাশসকল দেখিতে পাইতেন যে,··· তাঁহাদিগের অন্তর পুনরায় নূতন উৎসাহ ও বলে পূর্ণ হইয়া উঠিত। তখন আনন্দের উদ্দাম উল্লাসে যেন বিচারবুদ্ধির অতীত ভূমিতে

আরোহণপূর্বক তাঁহারা দিব্যালোকে দেখিতে পাইতেন, যাঁহাকে তাঁহারা জীবনপথের পরম অবলম্বনস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন তিনি কেবলমাত্র অতিমানব নহেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের আশ্রয়, জীবকুলের পরমগতি—দেবমানব নারায়ণ! তাঁহার জন্ম, কর্ম, তপস্যা, আহার, বিহার, এমনকি দেহের অসুস্থতানিবন্ধন যন্ত্রণাভোগ পর্যন্ত সকলই বিশ্বমানবের কল্যাণের নিমিত্ত। নতুবা জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখদোষাদির অতীত, সত্যসঙ্কল্প পুরুষোত্তমের দেহের অসুস্থতা কোথায়? সেবাধিকার-প্রদানপূর্বক তাঁহাদিগকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ করিবেন বলিয়াই তিনি অধুনা ব্যাধিগ্রস্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন! দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত গমন করিয়া যাহাদিগের তাঁহাকে দর্শন করিবার অবসর ও সুযোগ নাই তাহাদিগের প্রাণে দিব্যালোকের উন্মেষ উপস্থিত করিবার জন্যই তিনি সম্প্রতি তাহাদিগের নিকটে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন!···তবে কেন এই আশঙ্কা—অর্থাভাব হইবে বলিয়া কিজন্য দুর্ভাবনা? যিনি সেবাধিকার প্রদান করিয়াছেন, উহা সম্পূর্ণ করিবার সামর্থ্য তিনিই তাঁহাদিগকে প্রদান করিবেন।

"···অর্থাভাববশতঃ ঠাকুরের সেবার ত্রুটি হইবার আশঙ্কায় মন্ত্রণা করিতে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা পূর্বোক্ত ভাবের প্রেরণায় আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। কেহ বা বলিয়াছেন, 'ঠাকুর নিজের যোগাড় নিজেই করিয়া লইবেন; যদি না করেন তাহাতেই বা ক্ষতি কি? (নিজ বাটী দেখাইয়া) যতক্ষণ ইটের উপরে ইট রহিয়াছে ততক্ষণ ভাবনা কি?—বাটী বন্ধক দিয়া তাঁহার সেবা চালাইব।' কেহ বা বলিয়াছেন, 'পুত্রকন্যার বিবাহ বা অসুস্থতা-কালে যেরূপে চালাইয়া থাকি সেইরূপে চালাইব; স্ত্রীর গাত্রে দুইচারিখানা অলঙ্কার যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ভাবনা কি?' আবার কেহ বা মুখে ঐরূপ প্রকাশ না করিলেও আপন সংসারের ব্যয় কমাইয়া অকাতরে ঠাকুরের সেবার ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া ঐ বিষয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।···

"ভক্তগণ ঐরূপে যে দিব্যোল্লাস প্রাণে অনুভব করিতেন তাহা এখন ঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদিগকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট এবং

সহানুভূতিসম্পন্ন করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তসঙ্ঘরূপ মহীরুহ দক্ষিণেশ্বরে অঙ্কুরিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দিষ্ট হইলেও, শ্যামপুকুরে ও কাশীপুর উদ্যানে উহা নিজ আকার ধারণপূর্বক এত দ্রুত বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভক্তগণের অনেকে তখন স্থির করিয়াছিলেন, ঐ বিষয়ের সাফল্য আনয়নই ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধির অন্যতম কারণ।”

জীবের পাপতাপের ভোগ নিজ দেবদেহে ধারণ করিয়া পরমকরুণ ঠাকুর যে দুঃসহ ব্যাধির যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলেন সেই ব্যাধির ঔষধ তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। দুর্বল মানুষ ঐ ভীষণ ব্যাধির সংক্রমণের ভয়ে ভীত হইবে ইহা অস্বাভাবিক নহে। ঠাকুর যে পাত্রে মুখামৃত রক্ষা করিতেন সেই পাত্র স্বহস্তে পরিষ্কার করিতে কেহ কেহ সঙ্কুচিত হয় বুঝিতে পারিয়া নরেন্দ্রনাথ ক্ষুদ্রবিশ্বাসীদের সমুচিত শিক্ষা দিতে চাহিলেন, এবং একদিন মুখামৃতে ভরা পাত্রটি হাতে লইয়া বহুজনসমক্ষে উহার কিয়দংশ গলাধঃকরণ করিলেন! তাঁহার দেখাদেখি নিরঞ্জন, শশী ও শরৎ বিনা দ্বিধায় উহার অবশিষ্টাংশ পান করিয়াছিলেন।

হরিনাথ গৃহে থাকিয়া সাধনা ও বেদান্তচর্চা করিতেন, এবং কখন কখন আসিয়া ঠাকুরকে দেখিয়া যাইতেন। ঠাকুর একদিন তাঁহাকে নিজের ব্যাধিজনিত দেহকষ্টের কথা বলিতে আরম্ভ করিলে হরিনাথ কহিলেন, ‘আপনার কোন কষ্টই হতে পারে না!’ ঠাকুর দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার তাঁহাকে স্বীয় দেহকষ্টের বিস্তৃত ও বিস্তৃততর বিবরণ শুনাইলেন, কিন্তু হরিনাথের সেই একই উত্তর। তখন ঠাকুর কহিলেন, ‘তুমি ঠিক বলেচ।’[১]

ডাক্তার সরকার একদিন ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কেমন আছেন?’ ঠাকুর উত্তর দিলেন, ‘যেমন ছিলুম ঠিক তাই আছি। যেমন ছিলুম ঠিক তাই যদি রইলুম তো চিন্তা কী?’

কাশীপুরে ঠাকুর একদিন নরেন্দ্র-রাখালাদি প্রিয় ভক্তগণকে সস্নেহে দেখিতে দেখিতে নিজের হৃদয়ে হাত রাখিয়া বলিয়াছিলেন: ‘এর ভিতর

১ স্বামী জগদানন্দ হরি-মহারাজের মুখে এই ঘটনাটি শুনিয়াছিলেন।

দুটি আছেন একটি তিনি; আর একটি ভক্ত হয়ে আছে। তারই হাত ভেঙ্গেছিল, তারই এই অসুখ . . . বুঝেচ?'

ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর বলিয়া যাইতে লাগিলেন:

'কারেই বা বলব, কেই বা বুঝবে!

'তিনি মানুষ হয়ে—অবতার হয়ে—ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেরা তাঁরই সঙ্গে আবার চলে যায়।...

'দেহ ধারণ করলে কষ্ট আছেই।

'একএক বার বলি, আর যেন আসতে না হয়। তবে একটা কথা আছে, নিমন্ত্রণ খেয়ে খেয়ে আর বাড়ীর কড়ায়ের ডাল ভাত ভাল লাগে না!

'আর যে দেহ ধারণ করা—এটি ভক্তের জন্যে।' [কথামৃত][১]

ভক্তপ্রিয় ভগবান। ঠাকুরের ভক্তপ্রিয়তার কয়েকটি ছোট ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন: পতু আর মণীন্দ্র এরা দুটিতে যখন ঠাকুরের কাছে যেত তখন ছেলেমানুষ, দশ-এগার বছরের। দোলের দিন সব বাইরে চলে গেছে, আবীর দিচ্চে, কাশীপুর বাগানে। এরা দুটি গেল না; ঠাকুরকে হাওয়া করতে লাগল—এই এ হাতে, এই সে হাতে! ছেলেমানুষ কিনা, হাতে পারে না। এই পা টিপচে! ঠাকুরের তখন কাশি ছিল, তাই মাথায় জ্বালা করত, হাওয়া দরকার হত। ঠাকুর বলচেন, 'যা যা, তোরা নীচে যা; আবীর খেলগে না, সবাই গেছে।' পতু বলচে, 'না মশাই, আমরা যাব না, আমরা এইখানে আছি। আপনি রয়েচেন, আমরা কি ফেলে যেতে পারি?' ওরা কিছুতেই গেল না। ঠাকুর কেঁদে বল্লেন, 'আরে, এরাই আমার সেই রামলালা, আমাকে সেবা করতে এসেচে। ছেলেমানুষ, তবু আমাকে ফেলে আমোদের দিকে ফিরে চাইলে না।'

---

১ 'আমার মুক্তি নাই' ঠাকুর বলিতেন। মাষ্টারকে বলিয়াছিলেন:

'আর একবার আসতে হবে, তাই পার্ষদদের সব জ্ঞান দিচ্চি না। (সহাস্যে) তোমাদের যদি সব জ্ঞান দিই, তা হলে তোমরা আর সহজে আমার কাছে আসবে কেন?'

১২৯৩ সালের ৪ঠা বৈশাখ, রাত্রিকাল। ঠাকুরের অসুখ আজ কিছু কম। ভক্তেরা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মেজের উপর বসিয়াছেন। গিরিশকে স্নেহসম্ভাষণ করিয়া ঠাকুর তাঁহাকে তামাক খাওয়াইতে এবং জলখাবার ও পান আনিয়া দিতে লাটুকে আদেশ করিলেন। জনৈক ভক্ত তাঁহার জন্য ফুলের মালা আনিয়াছিলেন, নিজের গলা হইতে দুইগাছি মালা লইয়া গিরিশকে দিলেন।

"গিরিশের জন্য জলখাবার আসিয়াছে: ফাগুর দোকানের গরম কচুরি, লুচি ও অন্যান্য মিষ্টান্ন।...ঠাকুর সেই সমস্ত খাবার সম্মুখে রাখাইয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন। তারপর নিজে হাতে করিয়া খাবার গিরিশের হাতে দিলেন। বলিলেন, বেশ কচুরি!

"গিরিশ সম্মুখে বসিয়া খাইতেছেন। গিরিশকে খাইবার জল দিতে হইবে। ঠাকুরের শয্যার দক্ষিণপূর্ব কোণে কুঁজায় করিয়া জল আছে।... ঠাকুর অতি অসুস্থ, দাঁড়াইবার শক্তি নাই। ভক্তেরা অবাক হইয়া... দেখিতেছেন—ঠাকুরের কোমরে কাপড় নাই, দিগম্বর। বালকের ন্যায় শয্যা হইতে এগিয়ে এগিয়ে যাচ্চেন, নিজে জল গড়াইয়া দিবেন। ভক্তদের নিশ্বাসবায়ু স্থির হইয়া গিয়াছে।...জল গড়াইলেন। গেলাস হইতে একটু জল হাতে লইয়া দেখিতেছেন ঠাণ্ডা কি-না। দেখিলেন জল তত ঠাণ্ডা নয়। অবশেষে অন্য ভাল জল পাওয়া যাইবে না বুঝিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে ঐ জলই দিলেন।" [কথামৃত]

যারা অন্তরঙ্গ তাদের মুক্তি হবে না। বায়ুকোণে আর একবার (আমার) দেহ হবে।' [কথামৃত]

'তখন অনেক লোক মুক্ত হবে; আর যারা না হবে, মুক্তির জন্যে তাদের দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে।' গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন ঠাকুর।

শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন:

'তিনি শত বৎসর সূক্ষ্মশরীরে ভক্তহৃদয়ে বাস করবেন বলেচেন; আর তাঁর অনেক শ্বেতাঙ্গ ভক্ত আসবে।

'তিনি বাউলবেশে আসবেন বলেচেন। বাউলবেশ—গায়ে আলখাল্লা, মাথায় ঝুঁটি, এতখানি দাড়ি।...বাঙ্গালী।'

লাটু এই সময়ে ঠাকুরকে মাষ্টারের পুত্রশোকের কথা বলিতে লাগিলেন মাষ্টারের একটি আট বছরের ছেলে এক বৎসর পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছিল; ছেলেটি ঠাকুরকে কখন ভক্তসঙ্গে, কখন কীর্তনানন্দে বহুবার দর্শন করিয়াছিল। লাটু কহিলেন: ইনি এঁর ছেলেটির বই দেখে কাল রাত্রে বড় কেঁদেছিলেন। পরিবারও ছেলের শোকে পাগলের মত হয়ে গেছে। নিজের ছেলেপুলেকে মারে, আছড়ায়। ইনি এখানে মাঝে মাঝে থাকেন, তাই বলে ভারি হেঙ্গাম করে।

ঠাকুর এই শোকের কথা শুনিয়া যেন চিন্তিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। গিরিশ কহিলেন: অর্জুন অত গীতাটীতা পড়ে অভিমন্যুর শোকে একেবারে মূছিত! তা এঁর ছেলের জন্যে শোক কিছু আশ্চর্য নয়।

ইহার পর এক সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। মাষ্টারের পরিবার উদ্যানবাটীতে আসিয়াছেন একটি সাত বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়া। রাত্রে যখন মাতাঠাকুরাণী ঠাকুরকে খাওয়াইতে আসিলেন, পরিবারও আসিলেন আলো হাতে করিয়া। "খাইতে খাইতে ঠাকুর তাঁহাকে ঘরকন্নার অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ও কিছুদিন ঐ বাগানে আসিয়া শ্রীশ্রীমার কাছে থাকিতে বলিলেন।...তাঁহার একটি কোলের মেয়ে ছিল,...ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, তাকেও আনবে।"

হীরানন্দ সিন্ধুদেশের অধিবাসী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পাস করিয়া দেশে চলিয়া যান ও দুইখানি সংবাদ-পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হন। কলিকাতায় থাকিতে তিনি কেশবের সমাজে যাইতেন ও মাঝে মাঝে আসিয়া ঠাকুরের কাছে থাকিতেন। ঠাকুর তাঁহাকে ভালবাসিতেন।

হীরানন্দ ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন তাঁহার অসুখের সংবাদ পাইয়া (১০ই বৈশাখ, ১২৯৩)। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ঠাকুর কহিলেন—মাষ্টারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন: তোমাদের সব আত্মীয় বোধ হয়, কেউ পর বোধ হয় না।

পরদিন সকালে হীরানন্দ আবার ঠাকুরকে দেখিতে আসিলেন, তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন ও তাঁহার ইচ্ছানুসারে সেখানেই প্রসাদ পাইলেন। ভাত সুসিদ্ধ না হওয়ায় হীরানন্দের খাওয়া ভাল হয় নাই শুনিয়া ঠাকুর দুঃখিত হইয়া বারবার বলিতে লাগিলেন, জলখাবার খাবে?

হীরানন্দ বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের দেশের পায়জামা পরিলে ঠাকুর আরামে থাকিবেন। তাই ঠাকুর তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যেন দেশে গিয়া তিনি পায়জামা পাঠাইয়া দেন।[১]

শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন: একদিন ঠাকুর—তখন অকাল—আমলকী খেতে চাইলেন। দুর্গাচরণ তিনদিন পরে গোটা দুইতিন আমলকী নিয়ে উপস্থিত হল। বেশ বড় আমলকী। তিনদিন তার খাওয়াদাওয়া নাই! ঠাকুরের আমলকী হাতে করে কান্না, বল্লেন—আমি ভেবেছিলুম তুমি বুঝি ঢাকা-টাকা চলে গেছ। আমাকে বল্লেন—ঝাল দিয়ে একটা চচ্চড়ি রেঁধে দাও; ওরা পূর্ববঙ্গের লোক, ঝাল বেশী খায়। আর সব রাঁধা ছিল, বল্লেন—একখানা থালায় সব বেড়ে দাও, ও প্রসাদ না হলে খাবে না। ঠাকুর তা প্রসাদ করে দিতে বসলেন। সে সব দিয়ে ভাত প্রায় এত কটা খেলেন, তবে দুর্গাচরণ প্রসাদ পেল।

আগেই বলা হইয়াছে, কাশীপুরে ঠাকুরের যুবক শিষ্যেরা পালাক্রমে শ্রীগুরুর সেবা ও নিজেদের সাধনভজন করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন—শশিভূষণ শ্রীগুরুর সেবাকেই সেরা সাধনা জ্ঞান করিতেন; শ্রীগুরুর সেবাই ছিল তাঁহার সাধনা। ঠাকুরের অপ্রকট হওয়ার পরেও তাঁহার এই সেবানিষ্ঠা অব্যাহত ছিল, আর উহাকে কেন্দ্র করিয়াই ঠাকুরের ত্যাগিসঙ্ঘ বা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ সহজেই গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছিল।

---

১ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের বাড়ীর দৌহিত্র ধীরেন্দ্র খুব সম্ভবতঃ দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া ঠাকুরের ভক্ত হন। "গৌরাঙ্গ, স্থূলকায়, সত্যনিষ্ঠ ধীরুকে ঠাকুর স্নেহ করিতেন। প্রভু কেবল ত ভারতের জন্য আসেন নাই,...তাই কাশীপুরে একদিন ভাবাবেশে বলেন, সমুদ্রপারে অনেক ভক্ত আছে, তাদের কৃপা করতে হলে তাদের মত পোশাক পরা দরকার। তাই ধীরু একটি পায়জামা আনিলে পরিয়া আনন্দ করেন।" [লীলামৃত]

কাশীপুরে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে রাম-মন্ত্র দিয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথও রামচন্দ্রের উপাসনায় প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

নরেন্দ্র সাধকশ্রেষ্ঠ রামের সাধনে।
একদিন দরশন কৈলা হনুমানে ॥
... ...
ভাবের প্রবল বেগে শরীর অস্থির।
হাতেতে ধরিয়া লাঠি ঘুরে শ্রীমন্দির ॥
একবারে মত্তুল্য নাহি বাহ্যজ্ঞান।
মন্দির বেষ্টন করি ঘুরিয়া বেড়ান ॥

"...তাঁহাকে প্রেমধনে ধনী করিবার বাসনায় [ঠাকুর] শয্যোপরি অঙ্গুলি দিয়া যেমন লিখিলেন, 'শ্রীমতী রাধে, নরেন্দ্রকে দয়া কর', অমনই যেন...কোন মহাশক্তির প্রেরণায় নরেন্দ্রনাথ রাধাভাবে বিভোর হইলেন এবং 'কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে' বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ দিবসত্রয় ভজনের পর শুষ্ক দার্শনিক সরস হইয়া কহেন, প্রভুর কৃপায় আজ এক নূতন আলোক পাইলাম। যদি এ ভাবটা না হইত তা হলে মাধুর্যবিহনে জীবনটা বিড়ম্বনা বোধ হইত।" [লীলামৃত]

তিনদিন সাধনার অন্তে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরাধার দর্শন পাইয়াছিলেন।

শ্রীসারদানন্দ বলিয়াছেন: ঠাকুর কাশীপুরের বাগানে স্বামীজীকে একমাসের মধ্যে নানা সাধন করিয়ে নির্বিকল্প সমাধি পাইয়ে দিয়েছিলেন। He was the rock upon which the structure was to be built. (তাঁকে ভিত্তি করেই যে গড়নটি দাঁড় করাতে হবে।)

কাশীপুরে আসিয়া স্ফুটভাবেই ঠাকুর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত শিষ্যগণের জীবন ত্যাগের পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন। বুড়োগোপাল গঙ্গাসাগরযাত্রী সন্ন্যাসিগণকে নববস্ত্র দান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন জানিয়া ঠাকুর তাঁহার সন্নিহিত সেবকগণকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, 'এদের মত সাধু কোথা পাবে তুমি? যদি সাধুদের কাপড় দিতে চাও তো এদের দাও।' তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী বুড়োগোপাল গৈরিকরঞ্জিত করিয়া কতকগুলি বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা লইয়া আসিলে ঠাকুর স্বহস্তে তাঁহার

এগার জন শিষ্যকে ঐ বস্ত্র ও মালা দান করেন।[১] পুঁথিতে উল্লিখিত আছে, অপ্রকট হওয়ার পূর্বে ঠাকুর ঐ এগার জন শিষ্যকে বিধিপূর্বক সন্ন্যাসও [পূর্ণাভিষেক ?] দিয়াছিলেন।

এই একাদশে আজ্ঞা দিলা গুণমণি।
যাবৎ তার থাস তোরা হইবে না হানি॥

একদিন ঠাকুর তাঁহার ত্যাগী শিষ্যগণকে কহিলেন, তোদের ভিক্ষার অন্ন খেতে মন যায়। পরদিন সকালে সহচরগণকে লইয়া নরেন্দ্রনাথ ভিক্ষায় বাহির হইলেন এবং প্রথমেই মাতাঠাকুরাণীর কাছে ভিক্ষা যাচ্ঞা করিলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহাদের ভিক্ষাপাত্রে যোল আনা দিলেন।

তামা-রূপা-তণ্ডুলাদি ভিক্ষার জিনিস।
নয়নে দেখিয়া প্রভু পরম হরিষ॥
সেই তণ্ডুলের মণ্ড তরল তরল।
খাইয়া বলেন প্রভু পরাণ শীতল॥

ঠাকুর আপনভাবে কখন কখন গাহিতেন :

এসে পড়েচি যে দায়, সে দায় বলব কায়,
যার দায় সে আপনি জানে, পর কি জানে, পরের দায় ?
হয়ে বিদেশিনী নারী, লাজে মুখ দেখাতে নারি,
বলতে নারি কইতে নারি, নারী হওয়া এ কী দায় !

আবার মাতাঠাকুরাণীকেও বলিতেন, 'শুধু কি আমারই দায় ? তোমারও দায় !' নিজে অপ্রকট হইলে পাছে তদ্‌গতপ্রাণা মাও দেহের মায়া ছিন্ন করেন সেইজন্য পূর্ব হইতেই ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন : 'কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতন কিলবিল কচ্চে, তুমি তাদের দেখবে।' 'আমি কী করেচি, তোমাকে এর চাইতে অনেক বেশী কত্তে হবে।'

---

১ যাঁহাদিগকে ঠাকুর স্বহস্তে গেরুয়া দিয়াছিলেন : নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, লাটু, তারক, বুড়োগোপাল, কালী, শশী, শরৎ।

একখানি বস্ত্র বাকি থাকে অবশেষে।
পরদিনে দান কৈলা শ্রীগিরিশ ঘোষে॥

বিভিন্ন সময়ে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন: 'তুমি কামারপুকুরে থাকবে, শাক বুনবে, শাকভাত খাবে আর হরিনাম করবে।' 'বরং পরভাতী ভাল, পরঘরী ভাল নয়, কামারপুকুরের নিজের ঘরখানি কখনো নষ্ট কোরো না।' 'কারো কাছে একটি পয়সার জন্মেও চিৎহাত কোরো না, তোমার মোটা ভাতকাপড়ের অভাব হবে না।'

কাশীপুরের বাগানে অত অসুখের মধ্যেও তিনি ভাইপো রামলালকে তাঁহার সাংসারিক কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। নিজের দিদি কাত্যায়নীর সন্তানদের সম্বন্ধে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন: ওদের খবর নিস রে রামলাল, নয় তো ওরা বলবে আমাদের মামার বাড়ীতে কেউ নাই। পূজার সময় একএকখানা কাপড় দিস।

এই কালের কথায় লীলামৃতকার লিখিয়াছেন:

"লীলাবিলাসে প্রাকৃত তনু ধারণ করিলেও, প্রভু নিজমহিমায় সদাই বিরাজমান। ··অধিক সময়ই ভাব-সমাধিতে নিমগ্ন থাকিতেন। তোদের কাছে আমার দর্শন-বিষয় লুকায়ে রাখব না, বোধ হয় এই অঙ্গীকারে কহেন—ভাবাবেশে দেখি, দেবগণ সূক্ষ্মশরীরে আমার কাছে উপস্থিত; আমিও ক, কা, কি, কুট্ আদি দেবভাষায় তাঁদের সঙ্গে আলাপন করছি। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে প্রভুর মুখে এই দেবভাষা অনেকবার শুনিয়াছি।

"আমাদের প্রবোধ দিবার জন্য কহিলেন—রোগে ভুগে দেহটা কেমন হয়েছে, সূক্ষ্মশরীরে বেরিয়ে এসে দেখি গলার ভিতর ঝাঁজরার মত হয়েছে, তা হতে পুঁজ-রক্ত পড়ছে, আর খোলটা যেন কেমন একরকম হয়েছে। ওরে, দেখে এত হাসি এল যে কি বলব! মানুষ এই নশ্বর দেহের ভালবাসায় ভগবানকে ভুলে বাঁচবার কামনা করে!

"রোগবৃদ্ধি-সঙ্গে সপ্তাহকাল আহারনিদ্রায় বঞ্চিত হইলেও এমন আনন্দবিকাশ হয় যাহা ইতিপূর্বে কেহ কখনও দেখেন নাই। কারণ যে কি, তাহা বুঝাও যায় নাই। নিশিদিন উৎফুল্ল বদন ও জ্যোতিঃপূর্ণ বপু দর্শনে সকলেই মোহিত। সচ্চিদানন্দের এই কি সেই পরম ভাব?··· কহেন—এ অবস্থায় তোরা যাকে তাকে আমার কাছে আনিস নি।"

"পরমহংসদেবের অবস্থা দিন দিন পরিবর্তন হইতে লাগিল। যখন আহার কমিয়া গেল, উত্থানশক্তি রহিত হইল, একেবারে স্বরভঙ্গ হইয়া গেল, তখন অনেকেই হতাশ হইয়া পড়িলেন।···চেষ্টার ত্রুটি কিছুই হইল না; ডাক্তারী, কবিরাজী, আবধৌতিক, টোটকা প্রভৃতি সকলেরই সাহায্য লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কিছুই হইল না। কোন কোন ভক্ত স্ত্রীলোক তারকনাথের সোমবার করিতেন এবং নারায়ণের চরণে তুলসী দিতেন, কোন ভক্ত তারকনাথের চরণামৃত ও বিল্বপত্রাদি আনাইয়া ধারণ করাইলেন এবং কেহ [শ্রীশ্রীমা] হত্যা দিয়াছিলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইয়া গেল···। পরমহংসদেবের নিকট কতবার ভক্তেরা কাঁদিয়া বলিয়াছেন, 'আপনি নিজে না আরোগ্য হইলে কেহ ব্যাধির শান্তিবিধান করিতে পারিবে না।' তিনি হাসিয়া কহিয়াছিলেন, 'শরীরটা কাগজের খাঁচা, আর গলায় একটা ছিদ্র হইয়াছে দেখিতে পাই,[১] ইহার জন্য আবার করিব কি?' এইরূপে সকল কথা উড়াইয়া দিতেন। ক্রমে শ্রাবণ মাস অতীত-প্রায় হইল।" [জীবনবৃত্তান্ত]

এই সময়ে ঠাকুর একদিন যোগীন্দ্রকে ২৫শে শ্রাবণ হইতে পঞ্জিকা পড়িয়া শুনাইতে আদেশ করিলেন। ৩১শে শ্রাবণ সংক্রান্তি; সেইদিন পর্যন্ত এক সপ্তাহের বার-তিথি-নক্ষত্রাদি শুনিয়া কহিলেন, 'থাক্, আর পড়ে কাজ নাই।'

এ সময় কিছুদিন ক্রমান্বয়ে প্রায়।
ভক্তেন্দ্র নরেন্দ্রনাথে কন প্রভুরায়— ॥
দেখ কি আশ্চর্য এক করি দরশন।
সুবিশাল ময়দানে শিশু একজন ॥
নানাবিধ রত্নমণি গাদা চারিধারে।
যারে যারে ইচ্ছা তায় বিতরণ করে ॥

··· ···

---

১ গলার ভিতরে ছিল বাসা বিয়াধির।
এখন বহির ভাগে হইল বাহির ॥

ব্রহ্মজ্ঞানে অবিরত এবে প্রভুরায়।
ব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্বকথা কথায় কথায়॥

... ...

দেহে মন ছাড়া ছাড়া দেহে উদাসীন।
সংগোপনে দেবেন্দ্রে কহেন একদিন—॥
প্রবল বাসনা সদা উঠিছে অন্তরে।
সমাধিস্থ হয়ে থাকি সপ্তমের ঘরে॥

৩১শে শ্রাবণ, রবিবার। এইদিনের কথায় লক্ষ্মীদেবী বলিয়াছেন: ঠাকুর বালিশে ঠেস দিয়ে বসে আছেন—সেইদিন রাত্রেই শরীর যাবে—চুপচাপ। সকলেই ভাবছিল কথা বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে। খুড়ীমা আর আমি যেতেই আস্তে আস্তে বল্লেন, 'এসেচ? দেখ, আমি যেন কোথায় যাচ্চি—জলের ভিতর দিয়ে—অ—নেক দূর!' খুড়ীমা অমনি কাঁদতে লাগলেন। ঠাকুর বল্লেন, 'তোমার ভাবনা কী? যেমন ছিলে তেমনি থাকবে। আর এরা আমায় যেমন করেচে, তোমায়ও তেমনি করবে। লক্ষ্মীটিকে দেখো, কাছে রেখো।'

বিকালে ডাক্তার পাল দেখিতে আসিলেন। "পরমহংসদেব কহিলেন, 'আজ আমার বড় ক্লেশ হইতেছে, দুইটি পার্শ্ব যেন জ্বলিয়া উঠিতেছে।'... নাড়ী দেখিয়া ডাক্তারের চক্ষু স্থির হইল। পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উপায় কি?' ডাক্তার...কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। পরমহংসদেব পুনরায় কহিলেন, 'কিছুতেই কিছু হইতেছে না, রোগ দুঃসাধ্য হইয়াছে?' ডাক্তার 'তাই ত!' বলিয়া অধোবদন হইলেন। পরমহংসদেব দেবেন্দ্রকে সম্ভাষণপূর্বক তুড়ি দিয়া কহিলেন, 'এরা এতদিন পরে বলে কি? ...যদি রোগই না সারে, তবে বৃথা কেন এ যন্ত্রণা?' তিনি রোগের কথা কিংবা ডাক্তারের কথা আর মুখে আনিলেন না। অতঃপর তিনি কহিতে লাগিলেন, 'দেখ, আমার হাঁড়ি হাঁড়ি ডালভাত [খিচুড়ি] খাইতে ইচ্ছা হইতেছে।' দেবেন্দ্র ছেলে ভুলাইবার মত কত কি বলিল।" [জীবনবৃত্তান্ত]

নাড়ীর পরীক্ষা আজি অনেকে করিল।
প্রকৃত অবস্থাখানি বুঝিতে নারিল॥
একাকী অতুলকৃষ্ণ ক্ষয়নাড়ী কয়।

সন্ধ্যার অলপ আগে প্রভু ভগবান।
বোধ করিলেন বুকে হাঁপানির টান॥
দেখাইয়া সেবাপর ভক্তদের দলে।
বলিলেন ইহাকেই নাভিশ্বাস বলে॥

নরেন্দ্রের আজ্ঞামত মুই[1] আজি দিনে।
রাত্রির মতন ছিনু সেবার কারণে॥
এমন সময় ডাক হইল আমায়।
দেখিনু শয্যার পাশে বসিয়া শ্রীরায়॥
সুজি খাওয়াইতে চেষ্টা ভক্তগণে করে।
মুখ বেয়ে পড়ে ভুঁয়ে না যায় উদরে॥
অতি অল্প পরিমাণে গলাধঃকরণ।
জঠরে যেমন ক্ষুধা রহিল তেমন॥
মুখ পাখালিয়া পুনঃ মুছায়ে বসনে।
বিছানায় শুয়াইয়া দিল সাবধানে॥
পদ-প্রসারণে শক্তি নাহিক প্রভুর।
বালিশে মেলায়ে দিলা শ্রীশশীঠাকুর॥
বিরাট তালের পাখা দিয়া মোর হাতে।
বলিলেন কোমলাঙ্গে ব্যজন করিতে॥
সেইমত আর পাখা শাণ্ডেলের করে।
তিনিও চালান পাখা শক্তি-অনুসারে॥
দেখিতে দেখিতে মাত্র চকিত-ভিতর।
সমাধিস্থ প্রভুদেব তনুখানি জড়॥

প্রভুর সমাধি ভঙ্গ দুপরের পর।
বলেন ক্ষুধায় মোর জ্বলিছে উদর॥
সেবাপর ভক্তগণে পাইলা পরাণী।
শ্রীবদনে শ্রীপ্রভুর শুনিয়া শ্রীবাণী॥

১ পুঁথিকার

উঠিয়া বসিলা প্রভু শয্যার উপর।
খাইলেন সব সুজি ভরিয়া উদর॥
পাত্র-পরিপূর্ণ সুজি খান অবহেলে।
গলায় বিয়াধি যেন নাই কোনকালে॥
ভোজনান্তে শান্তিবোধে কন ভগবান।
উদর-তৃপ্তিতে হৈল শীতল পরাণ॥

নরেন্দ্র শ্রীপ্রভুদেবে কহেন তখন।
নিদ্রায় আরাম-চেষ্টা উচিত এখন॥
এত শুনি গুণমণি লীলার ঈশ্বর।
বহুকালাবধি কণ্ঠে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বর॥
আজি পূর্ণকণ্ঠে নাহি বিয়াধি যেমন।
তিনবার কালী কালী কৈলা উচ্চারণ॥
মা-কালী জীবন তাঁর ডাকিয়া তাঁহারে।
ধীরে ধীরে শুইলেন শয্যার উপরে॥

প্রভুকে সুস্থির দেখি নরেন্দ্র তখন।
বিশ্রামের হেতু নীচে করেন গমন॥
ইতিমধ্যে কি হইল শুন অতঃপর।
কণ্টকিত চকিতে প্রভুর কলেবর॥
নাসিকার অগ্রভাগে আঁখিদৃষ্টি স্থির।
সুশোভন হাস্যানন সমাধি গম্ভীর॥
এই সমাধিতে হৈল সমাধি মহান।
লীলাধামে ফিরে না আইলা ভগবান॥

ঘড়িতে তখন একটা বাজিয়া ছয় মিনিট অতীত হইয়াছে। কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথি, কুম্ভরাশি, শতভিষা নক্ষত্র।

শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন: যেদিন এমনি হবে, খিচুড়ি রান্না হয়েছিল, খিচুড়ি ধরে গেল—নীচেরটা পুড়ে গেল। ছেলেরা আমার উপর উপর সেই খিচুড়িই খেলে। আমার একখানা শাড়ী ছাতে শুকচ্ছিল, কে চুরি করে নিলে। পরদিন আমি হাতের বালা খুলতে যাচ্ছি, তিনি খপ্ করে আমার হাত দুটো ধরে বল্লেন, 'আমি কি কোথাও গেছি গা? এই যেমন এঘর থেকে ওঘর!'

পরিশিষ্ট

গ্রন্থোক্ত ঘটনাবলীর প্রকৃত বা সম্ভাবিত সময়

বঙ্গাব্দ	খ্রীষ্টাব্দ	ঘটনা
১১৮১	১৭৭৪-৭৫	খুদিরামের জন্ম।
১১৯৭	১৭৯০-৯১	চন্দ্রাদেবীর জন্ম।
১২০৫	১৭৯৮-৯৯	খুদিরামের সহিত চন্দ্রার বিবাহ।
১২১১	১৮০৫	রামকুমারের জন্ম।
১২১৬	১৮১০	কাত্যায়নীর জন্ম।
১২২০	১৮১৪	খুদিরামের কামারপুকুরে আসিয়া বাস।
১২২৬	১৮২০	রামকুমারের ও কাত্যায়নীর বিবাহ।
১২৩০	১৮২৪	খুদিরামের ৺রামেশ্বর-যাত্রা।
১২৩২	১৮২৬	রামেশ্বরের জন্ম।
১২৪১	১৮৩৫	কাত্যায়নীর দেহে ভূতাবেশ। খুদিরামের গয়াতে গিয়া পিণ্ডদান ও ৺গদাধরের স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তি।
১২৪২, ৬ই ফাল্গুন	১৮৩৬, ১৭ই ফেব্রুয়ারী	শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব।
১২৪৫	১৮৩৯	সর্বমঙ্গলার জন্ম।
১২৪৯, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	১৮৪২, জুন	প্রথম সমাধি, কালো মেঘের কোলে উড়ন্ত সাদা বকপংক্তি দেখিয়া।
১২৪৯, ৺বিজয়া	১৮৪২	খুদিরামের দেহত্যাগ।
১২৫০	১৮৪৪	৺বিশালাক্ষীর আবেশ।
১২৫১-৫২	১৮৪৫-৪৬	উপনয়ন। পণ্ডিতসভায় কূটপ্রশ্নের মীমাংসা।
১২৫২, ১৪ই ফাল্গুন	১৮৪৬, ২৪ ফেব্রুয়ারী	শিবের আবেশ।
১২৫৪	১৮৪৮	রামেশ্বরের ও সর্বমঙ্গলার বিবাহ।
১২৫৫	১৮৪৯	রামকুমারের পুত্র অক্ষয়ের জন্ম ও পত্নীর মৃত্যু।
১২৫৬	১৮৫০	কলিকাতায় আসিয়া রামকুমারের ঝামাপুকুরে টোল খোলা।
১২৫৯	১৮৫৩	কলিকাতায় আগমন; ঝামাপুকুরে বাস।
১২৬০, ৮ই পৌষ	১৮৫৩, ২২শে ডিসেম্বর	শ্রীশ্রীসারদামাতার জন্ম।
১২৬১, আশ্বিন	১৮৫৪, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	আঁটপুরে ও দেশে গমন।

বঙ্গাব্দ	খ্রীষ্টাব্দ	ঘটনা
১২৬২, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ	১৮৫৫, ৩১শে মে	দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর প্রতিষ্ঠা। [হৃদয়ের আগমন। ঠাকুর পরপর মা-কালীর বেশকারীর পদে; ভগ্নমূর্তির পা জুড়িয়া বিষ্ণুমন্দিরে পূজারীর পদে; শাক্তী দীক্ষা লইয়া মা-কালীর পূজারীর পদে।]
১২৬৩	১৮৫৬-৫৭	রামকুমারের দেহত্যাগ। ঠাকুরের গাত্র-দাহ ও পাপপুরুষ-নাশ; দিব্যোন্মাদ ও ৺জগদম্বার দর্শনলাভ।
১২৬৪	১৮৫৭-৫৮	হলধারীর আগমন। ঠাকুরের রাগভক্তির পূজা দেখিয়া মথুরামোহনের বিস্ময়। রাণী রাসমণির দণ্ড। দাস্যভক্তির সাধনা ও মা-সীতার দর্শন লাভ। ঠাকুরকে রাসমণির ও মথুরের পরীক্ষা।
১২৬৫, আশ্বিন-কার্তিক	১৮৫৮, অক্টোবর	দেশে গমন।
১২৬৬, বৈশাখ	১৮৫৯, মে	বিবাহ।
১২৬৭, অগ্রহায়ণ	১৮৬০	দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন। দিব্যোন্মাদ ও কবিরাজী চিকিৎসা। ঠাকুরকে মথুরের শিব-কালী-রূপে দর্শন।
১২৬৭, ৮ই ফাল্গুন	১৮৬১, ১৮ই ফেব্রুয়ারী	রাসমণির দেবোত্তর দলিল রেজিষ্ট্রী।
১২৬৭, ৯ই ফাল্গুন	১৮৬১, ১৯শে ফেব্রুয়ারী	রাসমণির দেবীলোক-প্রাপ্তি।
১২৬৮-৬৯	১৮৬১-৬৩	ভৈরবী ব্রাহ্মণীর আগমন ও ঠাকুরকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া ঘোষণা। ঠাকুরের তন্ত্রসাধনা।
১২৭০	১৮৬৩-৬৪	তন্ত্রসাধনা সম্পূর্ণ। পণ্ডিত পদ্মলোচনের সহিত মিলন। মথুরের অন্নমেরু অনুষ্ঠান। চন্দ্রাদেবীর গঙ্গাবাস করিতে আগমন।
১২৭১	১৮৬৪-৬৫	জটাধারীর আগমন ও বাৎসল্যভাবের সাধনা। মধুরভাবের সাধনা। তোতাপুরীর আগমন ও ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা।

বঙ্গাব্দ	খ্রীষ্টাব্দ	ঘটনা
১২৭২	১৮৬৫-৬৬	হলধারীর কর্মবিরতি। অক্ষয় পূজকের পদে। তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ।
১২৭৩	১৮৬৬-৬৭	ঠাকুর ছয়মাস অদ্বৈতভূমিতে। জগদম্বা-দাসীকে নিরাময় করিয়া নিজদেহে ব্যাধিবরণ। ইসলাম-সাধনা।
১২৭৪, জ্যৈষ্ঠ	১৮৬৭	ব্রাহ্মণী ও হৃদয়ের সহিত দেশে গমন। শ্রীশ্রীমার কামারপুকুরে আগমন। ব্রাহ্মণীর বিদায়গ্রহণ।
১২৭৪, অগ্রহায়ণ	১৮৬৭	কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন।
১২৭৪, ১৪ই মাঘ	১৮৬৮, ২৭শে জানুয়ারী	মথুরবাবুদের সহিত তীর্থযাত্রা। [দেওঘরে দরিদ্রসেবা। কাশীতে ত্রৈলঙ্গ-স্বামীর ও বৃন্দাবনে গঙ্গামায়ীর সহিত মিলন।]
১২৭৫, জ্যৈষ্ঠ	১৮৬৮	তীর্থ হইতে প্রত্যাবর্তন। [হৃদয়ের পত্নীবিয়োগ, দুর্গোৎসব, দ্বিতীয়বার বিবাহ।]
১২৭৬	১৮৬৯-৭০	অক্ষয়ের বিবাহ ও মৃত্যু।
১২৭৭	১৮৭০-৭১	মথুরের সহিত তাঁহার বাটীতে ও গুরুগৃহে। কলুটোলায় চৈতন্যাসন গ্রহণ। নৌকায় করিয়া কালনায় গমন ও ভগবানদাস বাবাজীর সহিত মিলন। নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের দর্শনলাভ। পণ্ডিত গৌরীকান্তের দক্ষিণেশ্বরে আগমন। শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বরূপ-কথনে বৈষ্ণবচরণ ও গৌরী।
১২৭৮, ১লা শ্রবণ	১৮৭১, ১৬ই জুলাই	মথুরের দেহত্যাগ।
১২৭৮, ১১ই চৈত্র	১৮৭২, ২৩শে মার্চ	শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে আগমন।
১২৮০, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ	১৮৭৩, ২৫শে মে	ঠাকুরের ৺ষোড়শীপূজা।
১২৮০, কার্তিক	১৮৭৩	শ্রীশ্রীমার কামারপুকুরে প্রত্যাগমন।
১২৮০, ২৭শে অগ্র	১৮৭৩, ১১ই ডিসেম্বর	রামেশ্বরের মৃত্যু।
১২৮১, বৈশাখ	১৮৭৪, এপ্রিল	শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে আগমন ; শম্ভু-মল্লিক-নির্মিত ঘরে বাস।

বঙ্গাব্দ	খ্রীষ্টাব্দ	ঘটনা
১২৮১, চৈত্র	১৮৭৫, মার্চ	কেশব সেনের সহিত মিলন।
১১৮২, আশ্বিন	১৮৭৫	শ্রীশ্রীমার জয়রামবাটী গমন।
১২৮২, ১৬ই ফাল্গুন	১৮৭৬, ২৭শে ফেব্রুয়ারী	চন্দ্রাদেবীর গঙ্গাপ্রাপ্তি।
১২৮২, ৫ই চৈত্র	১৮৭৬, ১৭ই মার্চ	শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে আগমন।
১২৮৩-৮৫	১৮৭৬-৭৮	ঠাকুরের পরপর তিন বৎসর দেশে গমনা-গমন। সাত অহোরাত্র মহাসংকীর্তন। বনবিষ্ণুপুরে গমন।
১২৮৬, ৬ই আশ্বিন	১৮৭৯, ২১শে সেপ্টেম্বর	ঠাকুরের ফটো তোলা হয় কমলকুটিরে।
১২৮৬, ২৮শে কার্তিক	১৮৭৯, ১৩ই নবেম্বর	রাম ও মনোমোহনের আগমন।
১২৮৬, শেষাশেষি	১৮৮০	দেশে গমন। ৺রঘুবীরের সেবার জন্ম জমি ক্রয়।
১২৮৭, ১৮ই পৌষ	১৮৮১, ১লা জানুয়ারী	মথুরপত্নী জগদম্বাদাসীর মৃত্যু।
১২৮৭, শেষভাগ	১৮৮১	মানসপুত্র রাখালের আগমন।
১২৮৮, ৩১ শে জ্যৈষ্ঠ	১৮৮১, ১২ই জুন	হৃদয়ের কর্মচ্যুতি।
১২৮৮	১৮৮১, নবেম্বর	নরেন্দ্রনাথের সহিত মিলন।
১২৮৮, ২৬শে অগ্র	১৮৮১ ১০ই ডিসেম্বর	ঠাকুরের ফটো তোলা হয় বেঙ্গল ফটোগ্রাফার্স ষ্টুডিয়োতে।
১২৮৯, ২১শে শ্রবণ	১৮৮২, ৫ই আগষ্ট	বিদ্যাসাগরের সহিত মিলন।
১২৯০, ২৫শে পৌষ	১৮৮৪, ৮ই জানুয়ারী	কেশব সেনের দেহত্যাগ।
১২৯০, ২০শে মাঘ	১৮৮৪, ২রা ফেব্রুয়ারী	ঠাকুরের হাতে বাড় বাঁধা হয়।
১২৯১, ২২শে অগ্র	১৮৮৪, ৬ই ডিসেম্বর	বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের সহিত কথোপকথন।
১২৯১, ২৫শে চৈত্র	১৮৮৫, ৬ই এপ্রিল	দেবেন্দ্র মজুমদারের আহিরীটোলার বাসায়।
১২৯২, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ	১৮৮৫, ২৬শে মে	পানিহাটির মহোৎসবে।
১২৯২, ৩১শে আষাঢ়	১৮৮৫, ১৪ই জুলাই	৺রথযাত্রায় বসু-ভবনে।
১২৯২, ভাদ্রের তৃতীয় সপ্তাহ	১৮৮৫, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ	কলিকাতায় আগমন। [বসু-ভবনে এক সপ্তাহ, শ্যামপুকুরে তিন মাস।]
১২৯২, ২২শে কার্তিক	১৮৮৫, ৬ই নবেম্বর	ভক্তদের শ্যামাপূজা শ্যামপুকুরে।
১২৯২, ২৭শে অগ্র	১৮৮৫, ১১ই ডিসেম্বর	কাশীপুরে স্থানপরিবর্তন। [উদ্যান-বাটীতে আটমাস।]
১২৯২, ১৮ই পৌষ,	১৮৮৬ ১লা, জানুয়ারী	আত্মপ্রকাশে অভয়দান।
১২৯৩, ৩১শে শ্রাবণ	১৮৮৬, ১৫ই আগষ্ট	তিরোভাব।

ঠাকুরের ধর্মমত

স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরকে জ্ঞান-ভক্তি-সমন্বয়াচার্য বলিয়াছেন। জগতে যত প্রসিদ্ধ ধর্মমত প্রচলিত আছে তাহাদের কোন কোনটি জ্ঞান-প্রধান—যেমন, অদ্বৈত-বেদান্ত, বৌদ্ধ, সুফী; কোনটি বা ভক্তি-প্রধান—যেমন, ভাগবত বৈষ্ণব। জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয় বলিতে কাজেই বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয় বুঝায়। কিন্তু এই সমন্বয়ের স্বরূপ কী, উহা কোন দার্শনিক মতবাদে পর্যবসিত হইয়াছে কি না, তাহা ঠাকুরের জ্ঞান-ভক্তি-সম্পর্কিত বিভিন্ন উক্তি পর্যালোচনা করিয়া সম্যক ধারণা করা কঠিন। যাহা হউক, ভবিষ্য দার্শনিকের মননের সহায়তা হইলেও হইতে পারে ভাবিয়া এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

(১) বেদাতীত উপলব্ধি

নিজের কোন কোন গুহ্য দর্শনের কথা বিশিষ্ট ভক্তের কাছে বলিতে বলিতে ঠাকুর স্বগতভাবে বলিয়া উঠিতেন, 'এসব কথা কাকেই বা বলি, আর কেই বা বুঝবে!' কখনও বা বলিতেন, 'এখনকার অবস্থা বেদ-বেদান্তে যা লেখা আছে সে সকলকে ঢের ছাড়িয়ে চলে গেছে!'

তাঁহার এতাদৃশ আরও উক্তি আছে: ঈশ্বর সাকার, নিরাকার, আরও কত কী।' 'তার বড় ভাবটাও কেউ বুঝতে পারে না, ছোট ভাবটাও পারে না।' 'তিনি চিনির পাহাড়, শুকদেবাদি হদ্দ ডেঁও পিঁপড়ে!' নিজের অসমোর্ধ্ব ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে যাইয়া স্বামী বিবেকানন্দকে বলিয়াছিলেন, 'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ, কিন্তু তোর বেদান্তের দিক নিয়ে নয়।'[১]

(২) জ্ঞানী ও ভক্ত: তাঁহাদের অনুভূতির স্বরূপ

ঠাকুরের উক্তি হইতে জানা যায়, সাধকেরা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত শিবাংশ ও বিষ্ণু-অংশ। উভয়ের প্রকৃতি, আচার ব্যবহার ও ভজনানুরাগে পার্থক্য আছে; শিবাংশে জ্ঞানের ভাব ও বিষ্ণু-অংশে ভক্তির ভাব প্রবল হয়—স্বভাবতঃ তাঁহারা জ্ঞান বা ভক্তির দিকে ঝুঁকিয়া থাকেন।

ভক্তি বা জ্ঞান যে পথেরই পথিক হউন না কেন, সকলেই শেষে একস্থানে পৌঁছিয়া থাকেন। জ্ঞানপথে যেমন অবিদ্যার নাশ হয়, ভক্তিপথেও তেমনি। অবিদ্যার নাশই

---

১ 'বেদান্তের দিক দিয়ে নয়' কথাটা ঠাকুর কী অর্থে বলিয়াছেন তাহা জানিতে চাহিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দকে পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি এই মর্মে উত্তর দেন: কেহ কেহ বেদান্তের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, রাম, কৃষ্ণ এবং অন্যান্য মানুষ বা জীব সকলেই যখন স্বরূপে ব্রহ্ম, তখন যে-কেহ ইচ্ছা করিলে রাম বা কৃষ্ণ হইতে পারে। ঠাকুরের উক্তির মানে এই যে, যিনি ঈশ্বর তিনি চিরকালই ঈশ্বর; নরদেহে অবতীর্ণ হইলেও তিনি ঈশ্বরই থাকেন, কখনও জীবত্ব প্রাপ্ত হন না। জীব সাধনভজন করিয়া বড়জোর ব্রহ্মে লীন হইতে পারে, কিন্তু হাজার চেষ্টা করিয়াও জীব ঈশ্বর হইতে পারে না।

মুক্তি। অবিদ্যা নষ্ট হইলে বিদ্যা বা জ্ঞান থাকে; সেই জ্ঞান সকলেরই স্বরূপভূত বস্তু; সুতরাং জ্ঞান যায় না। সেই জ্ঞানে সর্বত্র 'একমেবাদ্বিতীয়ং' চিৎস্বরূপের স্ফুরণ বা সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন হয়। ঠাকুর বলিতেন, 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর।' 'শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি এক।'

সমাধি ব্যতীত স্বরূপজ্ঞান জন্মে না। সাধারণতঃ সমাধি দুই প্রকার—সবিকল্প বা চেতন, এবং নির্বিকল্প বা জড়। জ্ঞানী নির্বিকল্প সমাধিতে চরম স্বরূপানুভূতি লাভ করেন। সাধারণতঃ তিনি ঐ সমাধি হইতে ফিরেন না বা ব্যুত্থিত হন না। একুশ দিন নিরন্তর ঐ অবস্থায় থাকিলে তাঁহার শরীর শুষ্কপত্রের মত ঝরিয়া পড়িয়া যায়। তিনি কৈবল্য, বিদেহমুক্তি বা ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন। সে অবস্থা বাক্যমনের অতীত—দ্বৈতাদ্বৈতবর্জিত। তাহাকে 'একও বলা যায় না, দুইও বলা যায় না'; আবার 'অস্তিও বলা যায় না, নাস্তিও বলা যায় না'। কেন না, অস্তি-নাস্তি ইত্যাদি প্রকৃতির গুণ। সে অবস্থা প্রকৃতির পারে—নির্গুণ। প্রথম হইতেই জ্ঞানপথ বা বিচারপথ না ধরিলেও বৈধী ভক্তির অনুষ্ঠান হইতে ক্রমশঃ জ্ঞান উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মনির্বাণ হইতে পারে। 'বৈধী ভক্তির পর জ্ঞান, জ্ঞানের পর লয়।'

মুক্ত পুরুষদের অধিকাংশই এই লয় বা নির্বাণ লাভ করেন। তাঁহারা আর সংসারে ফিরেন না, তাঁহাদের ফিরিবার ইচ্ছাও থাকে না। কিন্তু আর এক শ্রেণীর মুক্ত পুরুষ আছেন যাঁহারা নির্বাণমুক্তি কামনা করেন না। তাঁহারা নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়াও উহা হইতে ফিরিয়া আসিতে পারেন ও আসিয়া থাকেন। স্বয়ং সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইয়াও তাঁহারা সচ্চিদানন্দ ভগবানকে অহৈতুকী ভক্তি করেন। ভগবানও তাই ইঁহাদের প্রেমে চির-আবদ্ধ। ইঁহারা নিত্যসিদ্ধ বা ঈশ্বরকোটি। ইঁহারা ঈশ্বরলীলার বা ঈশ্বরের অবতারলীলার নিত্যসহচর। পৃথিবী সময়ে সময়ে ইঁহাদের পদস্পর্শে পবিত্র হইয়া থাকেন। 'নিত্যেতে পৌঁছে আবার লীলায় থাকা, যেমন ওপারে গিয়ে আবার এপারে আসা, লোকশিক্ষা আর বিলাসের জন্য —আমোদের জন্য।'

এই অবস্থা সগুণ হইয়াও ত্রিগুণাতীত, অর্থাৎ প্রকৃতির দোষগুণ হইতে মুক্ত। 'ত্রিগুণাতীত ভক্ত আছে—নিত্যভক্ত, যেমন নারদাদি। সে ভক্তিতে চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় সেবক—নিত্য ঈশ্বর, নিত্য ভক্ত, নিত্য ধাম।' সর্বত্র চিৎস্বরূপের স্ফূর্তি থাকায় এই অবস্থাকে একপ্রকার সমাধিস্থিতি বলা যায়। 'ভক্তিযোগের সমাধিকে চেতন-সমাধি বলে। এতে সেব্য-সেবকের আমি থাকে—রস-রসিকের আমি। ঈশ্বর সেব্য, ভক্ত সেবক; ঈশ্বর রসস্বরূপ, ভক্ত রসিক; ঈশ্বর আস্বাদ্য, ভক্ত আস্বাদক। চিনি হব না, চিনি খেতে ভালবাসি।'

ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েই এক সচ্চিদানন্দকে দর্শন বা অনুভব করেন, তবে এই দর্শনের প্রকারভেদ আছে। একজন যেন একপাশ হইতে ঘরকে দেখেন, অপরে ঘরের মধ্য হইতেই ঘরকে দেখেন। 'একপাশ থেকে ঘরকে দেখচি এও যা, আর ঘরের মধ্য থেকে ঘরকে দেখচি সেও তাই।' তথাপি ঐ দর্শনের প্রকারভেদে সচ্চিদানন্দস্বরূপের স্ফূর্তিতে ভাবের তারতম্য ঘটে। 'জ্ঞানীর ঈশ্বর তেজোময়, ভক্তের রসময়।'

(৩) জ্ঞানের পর বিজ্ঞান ঃ নিত্যসাকার

ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত কতকগুলি উক্তি এইরূপ ঃ

"হরিই সেব্য, হরিই সেবক—এই ভাবটি পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথমে নেতি-নেতি করে হরিই সত্য আর সব মিথ্যা বলে বোধ হয়। তারপরে সেই দেখে যে, হরিই এই সব হয়েচেন—ঈশ্বরই মায়া, জীব, জগৎ এইসব হয়েচেন। অনুলোম হয়ে তারপর বিলোম। এইটি পুরাণের মত।...

"তবে কেউ বলতে পারে সচ্চিদানন্দ এত শক্ত হল কেমন করে—এই জগৎ টিপলে খুব কঠিন বোধ হয়। তার উত্তর এই যে, শোণিত-শুক্র এত তরল জিনিস, কিন্তু তাই থেকে এত বড় জীব মানুষ তৈয়ারি হচ্চে! তাঁ হতে সবই হতে পারে। একবার অখণ্ড সচ্চিদানন্দে পৌঁছে তারপর নেমে এসে এই সব দেখা।"

"ব্রহ্মজ্ঞানের পরও আছে—জ্ঞানের পর বিজ্ঞান···ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোধ, তার নাম জ্ঞান ; তাঁর সঙ্গে আলাপ, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা—বাৎসল্যভাবে, সখ্যভাবে, দাস্যভাবে, মধুরভাবে—এরই নাম বিজ্ঞান। জীবজগৎ তিনি হয়েচেন এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।"

"কালীঘরে পূজা করতাম। হঠাৎ দেখিয়ে দিলে সব চিন্ময়—কোশাকুশী, বেদী, ঘরের চৌকাট—সব চিন্ময়! মানুষ, জীব, জন্তু—সব চিন্ময়। তখন উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দিকে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলাম—যা দেখি তাই পূজা করি।"

"যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা—যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই লীলার জন্য নানারূপ ধরেচেন। ব্রহ্ম অটলঅচল সুমেরুবৎ। কিন্তু 'অচল' যার আছে তার 'চল'ও আছে।"

"নিত্য থেকে লীলা, লীলা থেকে নিত্য।···চোখ বুজলেই তিনি আছেন, আর চোখ চাইলেই নাই?...কেউ সাত তলার উপরে উঠে আর নামতে পারে না ; আবার কেউ উঠে নীচে আনাগোনা করতে পারে।"

এক সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরের 'তুই কী চাস?' এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'আমি সমাধিস্থ হয়ে থাকব।' তাহাতে ঠাকুর বলেন, 'তুই তো বড় হীনবুদ্ধি! সমাধির পারে যা। সমাধি তো তুচ্ছ কথা।'

নিত্য ও লীলা একসঙ্গে দর্শন হইতে পারে। ঠাকুরের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন: কেউ কেউ নিত্য আর লীলা এই দুটোই দেখেন। রাসলীলা যখন হচ্ছিল তখন এক সখী আর এক সখীকে বলেছিল, 'সখি, বেদান্তসিদ্ধান্তো নৃত্যতি।' বেদান্তসিদ্ধান্ত কিনা সেই পরব্রহ্ম—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। এখানে নিত্য আর লীলা এক। আর একটা আছে নিত্য লীলা দুইয়েরই পার।

একদা জনৈক ভক্ত ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন, 'ভক্ত—এর এককালে তো নির্বাণ চাই? ঠাকুর উত্তর দেন, 'নির্বাণ যে চাই এমন কিছু না। এইরকম আছে যে, নিত্যকৃষ্ণ তাঁর নিত্যভক্ত; চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম। যেমন, চন্দ্র যেখানে তারাগণও সেখানে।...বিষ্ণু-অংশে ভক্তির বীজ যায় না। আমি এক জ্ঞানীর পাল্লায় পড়েছিলুম, এগার মাস বেদান্ত শুনালে; কিন্তু...ফিরে ঘুরে সেই মা মা।

যাঁহাকে ঠাকুর 'অখণ্ডের ঘর' বলিয়াছেন, সেই নির্বিকল্পসমাধিমান মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার ইষ্টের রূপ নিত্য বলিতেন। কথা-প্রসঙ্গে স্বামী শিবানন্দ বলিয়াছিলেন: এসব কথা কোনো বইতে পাবে না, এ শুধু এখানকার কথা। স্বামীজী বলতেন, 'আমার ইষ্টের রূপ নিত্য, নিত্যসাকার।' ঠাকুর বলতেন, 'এমন জায়গা আছে যেখানে বরফ গলে না।' Perpetual snow (চিরস্থায়ী তুষার)। সেই Absoluteই (নির্গুণ ব্রহ্মই নিত্যসাকার রূপ ধরে আছেন।

স্বামী জগদানন্দের কাছে শুনিয়াছি, স্বামীজী নাকি প্রস্তরে দেখিত এক নারায়ণমূর্তি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, 'This is my God Absolute' (এই আমার নির্গুণ ব্রহ্ম)।

ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত উক্তিসমূহ পর্যালোচনা করিয়া আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে যে, উহারা পূর্ব হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত কোন দার্শনিক মতবাদে পর্যবসিত হয় নাই। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়, ঠাকুরের মতকে শ্রীশঙ্করাচার্যের মায়াবাদ বা বিবর্তবাদ—যে মতে, 'জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত' বা 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' সেই মত—বলা যাইতে পারে না। বিবর্তবাদে নিত্যসাকার থাকিতে পারে না। শাস্ত্রে যে বিষয়ের অভ্যাস বা পুনঃপুনঃ আবৃত্তি থাকে সেই বিষয়ে শাস্ত্রের তাৎপর্য অবধারিত হয়। 'যারই নিত্য তাঁরই লীলা' ইত্যাদি কথা ঠাকুর বারবার বলিয়াছেন দেখা যায়। 'জগৎ কি মিথ্যা'—এই সুস্পষ্ট প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, 'মিথ্যা কেন? ওসব বিচারের কথা।' 'সাধনের সময় নেতি-নেতি করে ত্যাগ করতে হয়; তাঁকে লাভের পর বুঝা যায় তিনিই সব হয়েছেন।' 'নিত্যে পৌঁছে লীলায় থাকা ভাল। লীলাও সত্য।' 'বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'; কিন্তু 'এখানকার অবস্থা বেদবেদান্ত ছাড়িয়ে চলে গেছে!'

ঠাকুরের নিজের সম্পর্কে উক্তিবিশেষ হইতেও জগতের সত্যতা প্রমাণিত হয়। তিনি বলিতেন, 'আমার মুক্তি নাই; সরকারী কর্মচারী—জমিদারির যেখানে গোলমাল উপস্থিত হবে, সেখানেই ছুটতে হবে।' জমিদারি সত্য না হইলে তাঁহার মুক্তিপক্ষে বাধা কী?

শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রমুখ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদকেও ঠাকুরের মত বলিয়া মানিতে পারা যায় না। ঠাকুর ভেদাভেদবর্জিত নির্গুণ অবস্থাও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ঐ মতবাদে যে 'নির্বিশেষ ব্রহ্ম' স্বীকার করা হয়, উহা অব্যক্তশক্তিক বা সগুণ। আবার ঐ ব্রহ্মকে কোথাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রভা বা অঙ্গকান্তি, কোথাও বা নারায়ণাদি-ঈশ্বরবিগ্রহসকলের নিত্যধাম 'পরব্যোমে'র বহিঃস্থ জ্যোতির্মণ্ডল—নামান্তরে 'সিদ্ধলোক'—বলা হইয়াছে। ঠাকুরের কথায় উহার সমর্থন পাই না। তিনি কোথাও নির্বিশেষকে সবিশেষ হইতে খাটো করেন নাই।

এতাবৎকাল পর্যন্ত বিবর্তবাদ ও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ-অবলম্বনে কেহ কেহ ঠাকুরের সর্বধর্মসমন্বয় ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আমরা ঐ দুইজাতীয় ব্যাখ্যার প্রতিকূলে ইঙ্গিতমাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। ভবিষ্যৎ দার্শনিক ঠাকুরের মতবাদ লইয়া যে দর্শন রচনা করিবেন তাহাতে ঠাকুরের শ্রীমুখোক্ত সকল কথার সামঞ্জস্য দেখাইতে হইবে।

আলোচ্য বিষয়ে স্বামী শর্বানন্দের প্রশ্নের উত্তরে স্বামী তুরীয়ানন্দ যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"ঠাকুরের মত বলা বড় সোজা নয়। তবে আমার মনে হয়, সকল ধর্মমতকে উৎসাহিত করবার জন্য তিনি বলেছেন - 'যত মত তত পথ।' সকল মত তিনি নিজে সাধন করে, এক সত্যে পৌঁছান যায় অনুভব করে, তবে ঐ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। পারমার্থিক সত্য এক অদ্বৈত, যাঁকে ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান ইত্যাদি অনেক নামে অভিহিত করা হয়। রুচির বিচিত্রতা অনুসারে সেই এককেই যিনি যেরূপভাবে উপলব্ধি করেছেন তিনি সেরূপ ভাব ব্যক্ত করবার চেষ্টা করে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়েছেন। তথাপি তাঁর সবটা বলতে পারেন নি। 'তিনি যা তিনি তাই'—এই বলে গেছেন। অবস্থাবিশেষে গৌড়পাদের অজাতবাদ, শঙ্করের বিবর্তবাদ, অন্যের পরিণামবাদ অথবা শিবাদ্বৈতবাদ—সকলই সত্য এবং এসমস্ত ছাড়া তিনি 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্'। এঁরা সকলেই তপস্যার দ্বারা ভগবৎকৃপায় আদিষ্ট হয়ে ভিন্ন ভিন্ন বাদ প্রচার করেছিলেন। তাঁকে লয়েই সকল বাদ, তিনি বাদ-বিচারের পার।

"এই সত্যটি প্রকাশ করাই যেন ঠাকুরের মত বলে মনে হয়। 'দেহবুদ্ধ্যা দাসোঽস্মি তে জীববুদ্ধ্যা ত্বদংশকঃ। আত্মবুদ্ধ্যা ত্বমেবাহমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥' ইহাই তিনি উত্তম সিদ্ধান্ত বলে প্রকাশ করতেন। আর চিন্ময় কোশাকুশী কেন হবে না? 'ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্'—তিনি ভিন্ন ত কিছুই নাই, সবই ত তিনি। আমরা তাঁকে না দেখেই ত অন্য জিনিস দেখি, নতুবা তিনিই সব। নামরূপ তো তাঁ থেকেই এবং এক তাঁতেই তরঙ্গ, ফেন, বুদ্বুদ, জল ছাড়া তো কিছুই নেই। এতে তোমার বিবর্তবাদ থাক আর যাক—এ সত্য যিনি দেখেছেন তিনি মিথ্যা বলতে পারেন না। তবে আবার ঠাকুরের এমন অবস্থা হতো যখন তিনি ভাবাতীত হয়ে যেতেন, তখন নামরূপ থাকতো না, তার পারে যেতেন, সে 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' অবস্থা। সেও বিবর্তবাদ প্রভৃতির পার। তখনও কিন্তু সেই একই আছেন অদ্বৈত, আর কিছুই নেই, সেখানে বিবর্ত কোথায়? অজাতই বা কোথায়? বিবর্ত, অজাত, পরিণাম প্রভৃতি সব তাঁতেই হচ্ছে। তিনি মাত্র সত্য, আবার তাঁ থেকে যে জীবজগৎ হচ্ছে তাও সত্য, যদি তাঁকে না ভুলা যায়। তাঁকে ভুলে নামরূপ দেখলেই মিথ্যা হয়ে গেল কেন? না, তারা থাকে না এইজন্য। কিন্তু যদি তাকে মনে থাকে তবে বুঝতে পারি, 'মাঝেরই খোল ও খোলেরই মাঝ।' 'ময়া ততমিদং সর্বং', 'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং' ইত্যাদি তখন যেন বোঝা যায়।

"আসল কথা, তাঁকে দেখতে হবে, তাঁকে দেখলে আর কিছু থাকে না। তিনি সবময় বোধ হয়ে যায়। তাঁকে দেখবার আগে অবধি যত গোল, যত বাদবিবাদ; তাঁকে জানলে সব গোল মেটে, কোন বাদই আর তখন থাকে না, মাত্র তিনিই থাকেন। তিনিই এক পারমার্থিক সত্য, তাঁকে আশ্রয় করেই সকল মতবাদ, তাঁকে পেলেই সব শান্তি। কোনওরূপে তাঁকেই পেতে হবে, এই ঠাকুরের মত। 'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর', অর্থাৎ তাঁকে লাভ করে যেমন অভিরুচি যে কোনও বাদ নিয়ে থাক, কোনও ক্ষতি হবে না। তবে তাঁকে জানলেই মুক্তি অবশ্যম্ভাবী, বন্ধন থাকে না। তারপর শরীর গ্রহণ—মরণান্তে আপন আপন রুচির উপর নির্ভর করছে। যারা নির্বাণ গ্রহণ করবে, তারা জগৎ স্বপ্নবৎ জেনে একমাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্মে মন সমাধান করে জ্যোতিমাত্রে লয় হয়ে যাবে। আর যারা প্রভুর ভক্তি নিয়ে থাকবে, তারা জগৎকে তাঁর বিভূতি জেনে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ যে তিনি, তাঁর লীলার খেলুড়ে হয়ে বারংবার শরীর ধারণ করতে কাতর হবে না; তাঁরা আত্মারাম হয়ে তাঁতে অহেতুকী ভক্তি করবে, নির্বাণাদি দিতে চাইলেও গ্রহণ করবে না।"*

* এই আলোচনাটি লেখকের 'শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থ হইতে সংকলিত।